ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

এই লেখকের ঃ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জেনারেল

অধ্যাপক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থটির জন্য কোন বিশেষ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। বাংলা ভাষায় ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের অভাব নেই, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতির উপর রচিত। এই সকল রচনার পাঠকেরা সচরাচর ভক্ত শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা ঐতিহাসিক সমস্যা বা বিচারপদ্ধতি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে যে অল্প কয়েকটি গ্রন্থ বাংলায় রচিত হয়েছে, সেগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে মূল্যবান হলেও, এমন একটা নির্ভরযোগ্য বই-এর অভাব বরাবরই থেকে গেছে যা-থেকে একজন সাধারণ শিক্ষিত পাঠক সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মব্যবস্থার প্রকৃত পরিচয় পেতে পারেন এবং সেগুলির উদ্ভব ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা গঠন করতে পারেন। মুখ্যত এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নি, তবে ইংরাজী উদ্ধৃতিগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া থাকলে বোধ করি আরও ভাল হত। আমার নিজের অনবধানতার জন্য কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে, কিন্তু সেগুলি খুবই সাধারণ ধরনের বলে আলাদা কোন শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল না। পাঠকবর্গ সেগুলিকে অনায়াসেই সংশোধন করে নিতে পারবেন। আমার ছাত্র শ্রীহিমাদ্রি ভট্টাচার্য গ্রন্থটির একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দিয়ে আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্সের কর্ণধার শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাসের প্রেরণা ও তাগাদা না থাকলে হয়ত বইটি লেখাই হয়ে উঠত না। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৭
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

১

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ প্রাক্-বৈদিক যুগ

১। প্রস্তাবনাঃ পদ্ধতি প্রসঙ্গে

ভারত-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, এইটিই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে মোটামুটি একটি ধারাবাহিকতা বজায় আছে, সুপ্রাচীন-কাল থেকে আজ পর্যন্ত। পর্যাপ্ত উপাদানের অভাবে ভারত-ইতিহাসের, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের, অন্যান্য শাখাগুলি এই ধারাবাহিকতা বহন করে না। ধর্মীয় ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌টি তাই সঙ্গতভাবেই ভারতের সামাজিক ইতিহাসের জটিল ও পর্যাপ্তভাবে না-জানা বহু বিষয়ের উপরই আলোক-পাত করতে সক্ষম।

সাধারণভাবে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে যে কথাটা সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে ভারতীয় জনজীবনের অসম বিকাশের সমস্যা, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় uneven development। ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন মানের সংস্কৃতির সীমায় আবদ্ধ থাকার দরুন এবং সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষীণ হবার কারণেই, যাদের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে চালানো হয়, তারা মূলতঃ উচ্চবর্ণের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ নয়। দ্বিতীয় যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির মতই, ধর্মব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধসমূহের বিবর্তন, এমন কি শিল্পকলা ও সাহিত্যের ভঙ্গী ও পদ্ধতিসমূহ, সবকিছুই উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের বিকাশের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। তাই ইতিহাসের কোন শাখাকেই অপরাপর শাখাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না।

উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নততর কলাকৌশলের সঙ্গে অর্ধোন্নত ও একান্ত অনুন্নত কলাকৌশলের বিচিত্র সহাবস্থান আজকের যুগের ভারতবর্ষের মত প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষেরও বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তার বহু বাস্তব চিত্র অতীত যুগের রচনাবলী থেকে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা ট্রাইবদের যে চিত্র আঁকা আছে, তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে বর্ণনা দেওয়া আছে, সেগুলির সঙ্গে আজকের যুগের পিছিয়ে-পড়ে-থাকা উপজাতি জীবনের বিশেষ পার্থক্য নেই, কালধর্মে বহিরঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে এইমাত্র। নিম্ন ও উচ্চ শিকারজীবী পর্যায়ের এবং নিম্ন কৃষি ও পশুপালক পর্যায়ের প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির কিছু অবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন। তবে এদেশে প্রাক্‌লিপি প্রত্নতত্ত্বের এখনও শৈশবাবস্থা এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে আজকের দিনের ট্রাইব-জীবন ও প্রাচীন যুগের সাহিত্যগত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়নি। খাদ্য-সংগ্রাহক স্তর থেকে খাদ্য-উৎপাদনের স্তরে উত্তরণ, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, উদ্বৃত্তের সৃষ্টি ও তা থেকে প্রাচীন নগরসমূহ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার পদ্ধতি নিয়ে এ পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তা যৎসামান্য।

যেহেতু ভারতের আধুনিক পরিস্থিতিতেও প্রাচীন অবস্থার অনেক কিছু টিঁকে

আছে, তাই প্রাচীন অবস্থাকে বোঝাবার জন্য আধুনিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করার দরকার। উৎপাদন ব্যবস্থার নিম্নতর পর্যায়গুলিতে আটকে থাকা বহু ট্রাইব আজও ভারতবর্ষে বর্তমান রয়েছে, নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে যারা স্বশাসিত, কিন্তু যাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়ে ওঠেনি। এদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি প্রাচীন যুগের মানবগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে। প্রাচীন যুগে রচিত পুঁথিসমূহে, এমন কি হেরোডোটাস বা মেগাস্থেনিসের মত বিদেশীদের রচনাতেও এই শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নিখুঁত-ভাবে জানতে গেলে আমাদের প্রয়োজন নৃতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য যে সকল তথ্য হাজির করে সেগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাবলীর আলোয় বিচার করা, কেননা প্রাচীন মানুষ যা 'করেছিল' তারই নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ব আমাদের সামনে হাজির করে। আমরা প্রথমে নৃতত্ত্ব দিয়ে শুরু করব।

২। শিকারী, পশুপালক ও কৃষিজীবীদের ধর্ম: নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা ট্রাইবগুলিকে, তাদের খাদ্য সংস্থান পদ্ধতির ভিত্তিতে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—শিকারী (নিম্ন ও উচ্চ), পশুপালক (নিম্ন ও উচ্চ) এবং কৃষিজীবী (নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ)।১ উচ্চ শিকারজীবী পর্যায়ে কিছুটা উন্নত ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, হাঁড়িকুড়ি তৈরি, কাপড় বোনা এবং পশুকে পোষ মানাবার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও, এই সমাজে কোন পেশাদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় না। নিম্ন পশুপালক পর্যায় নিছকই পশুপালন নির্ভর, যেখানে শিকারের ভূমিকা থাকলেও কৃষি অনুপস্থিত। অনুরূপ-ভাবে নিম্ন ও মধ্য কৃষিজীবী পর্যায়ে, ভক্ষ্য হিসাবে পশুর স্থান থাকলেও উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু উচ্চ-পশুপালক পর্যায়ে পশু পালনের সঙ্গে কৃষি যুক্ত হওয়ায় এবং উচ্চ কৃষিজীবী পর্যায়ে কৃষির সঙ্গে পশুপালন যুক্ত হওয়ায়, উৎপাদন ব্যবস্থার গুণগত রূপান্তর ঘটে। তাই পশুপালক ও কৃষিজীবী পর্যায়দ্বয়ের উচ্চতর স্তরগুলিতে কারিগরী বিদ্যা, স্থায়ী আবাস স্থাপন ও ধাতুর ব্যবহার বহুলাংশে বেড়ে যায়, পেশাদার শ্রেণীসমূহের উদ্ভব ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় এবং এই উদ্বৃত্তভোগী একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদয় হয়। পরিণামে সাম্যমূলক জ্ঞাতিভিত্তিক ট্রাইবাল ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়।২

শিকারজীবী পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত কিছু আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। ভক্ষ্য পশুগুলির উপর কিছুটা পবিত্রতা আরোপ করা হয় এবং সমবেত নৃত্যগীতমূলক আচার-অনুষ্ঠান সহকারে সেগুলিকে নিহত ও ভক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালের যাগযজ্ঞে শিকারজীবী পর্যায়ের এই আচার-অনুষ্ঠানগুলির পল্লবিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে জাদু বিশ্বাস (magic), প্রাথমিক ধরনের আত্মার ধারণা (animism), অচেতন বস্তুর শুভাশুভ বিষয়ক

১। L. T. Hobhouse, et al, *Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples,* 1930, 34 ff.

২। G. Thomson, *Studies in Ancient Greek Society,* 1949, I. 33.

সপ্রাণতায় বিশ্বাস (animatism) প্রভৃতি কিছু কিছু ধারণার উন্মেষ দেখা যায়। আরও দেখা যায় মাতৃকা দেবীর (Mother Goddess) প্রাথমিক কল্পনা। মাটি, পাথর বা হাড়ের তৈরি যে সকল প্রাচীন মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলির গঠন দেখেই অনুমিত হয় যে এই মূর্তিগুলি মাতৃত্ব, গর্ভধারণ প্রভৃতির প্রতীক হিসাবেই পূজিত হত। মাতৃকাপূজার ব্যাপকতার আরও একটি কারণ ছিল আদিম সমাজের স্বাভাবিক মাতৃপ্রাধান্য। জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা থাকলেও মানবসমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর ভূমিকাই ছিল স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃত, কেননা তার মাতৃত্বমূলক কাজের ক্ষেত্রে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। আর পুরুষ সঙ্গীর ভূমিকা গৌণ, কেননা, জন্মদানের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বের উপলব্ধি ঘটতে সময় লেগেছিল অনেককাল। আদিম সমাজে পিতৃত্বের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা ছিল। তাই নারীই ছিল জীবনদাত্রী, তার মাতৃত্বমূলক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ জীবন-দায়িকা শক্তির প্রতীক হিসাবে সর্বত্রই গড়ে উঠেছিল।১

পশুপালক পর্যায়ে পিতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যার সূচনা দেখা যায় উচ্চ শিকারজীবী পর্যায় থেকেই। পশুপালন মূলত পুরুষালি কাজ, সেই হিসাবে এই সমাজে পুরুষপ্রাধান্য কিছুটা অনিবার্য। উচ্চ-পশুপালক সমাজে পশু শুধু জীবনধারণেরই উপকরণ নয়, সম্পত্তিও বটে, যা রক্ষা করা যায়, লুণ্ঠন ও অপহরণের দ্বারা বর্ধিত করা যায়। শিকারজীবী সমাজে সম্পত্তিবোধ থাকে না, কৃষিজীবী সমাজের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতেও এই বোধ তীব্র নয়। সম্পত্তিই সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করে, এই কারণেই পশুপালক সমাজে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয় তাড়াতাড়ি। সম্পদের এই প্রেরণাই পশুপালক সমাজকে যুদ্ধপরায়ণ করে তোলে, কেননা যুদ্ধের দ্বারাই অপরের সম্পদ অধিকার করা যায়। সম্পত্তির সঙ্গে উত্তরাধিকারের প্রশ্নও জড়িত, এই কারণেই পশুপালক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক, যেখানে দাবি করা হয় স্ত্রী বা স্ত্রীরা সর্বদাই স্বামীর অনুগত থাকবে। পশুপালক সমাজের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি এখানে দেবতারূপে কল্পিত। দেবমণ্ডলীতে দেবীদের স্থান স্বাভাবিকভাবেই গৌণ। প্রধান দেবতা যুদ্ধবাজ দলনেতারই প্রতিচ্ছবি। তাদের পুরাণাদি যুদ্ধের কাহিনীতে ভরপুর। আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের শিকারজীবী ঐতিহ্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট, পুরাতন আমলের জাদুবিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠানগুলি যাগযজ্ঞ ও পশুবলিতে আরও পল্লবিত।

পক্ষান্তরে কৃষিজীবী সমাজের ধর্মব্যবস্থায় আরও সুদূর অতীতের মাতৃপ্রাধান্যের একটি নবরূপের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার ও মেয়েদের দ্বারাই বর্ধিত। তাই কৃষিজীবী সমাজজীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে, অন্তত পশুবাহিত লাঙল প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত, নারীপ্রাধান্য কিছুটা অবধারিত ছিল। বার্ণাল লিখেছেনঃ

As grain-gathering was women's business, agriculture was probably women's invention, and in any case women's work, at least till the invention of the ox-drawn hoe or plough, for it was done with the hoe, a derivative of the stone age digging

১। E. O. James, *Prehistoric Religion*, 1957, 153, 174.

stick with which women used to grab for roots. Where agriculture predominated over hunting in providing food, it accordingly raised the status of women and halted and reversed the tendency to change the reckoning of descent through the mother to that through the father which hunting at first induced. Only where stock raising predominated, as in the lands bordering the agricultural settlements, there was a complete transition to the patriarchy—as we see in the Bible.১

ধর্মের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়েছে। স্টারবাক্ লিখেছেন:

Female deities have often enjoyed the highest place among the gods. This depends upon the nature of the social organisation and the respect in which women are held. Clan life in which the mother is the head of the group is likely to lift the Mother Goddess into a supreme position.২

রবার্ট ব্রিফণ্ট এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

The development of agricultural civilization without any intervening pastoral phase enhanced the matriarchal position of women not only as owners and heiresses of the arable land but also through their traditional association with agricultural magic and religion, which assumed in archaic societies a momentous development in correlation with that of agricultural pursuits, the women retaining for a long period the character of priestess.৩

আদি কৃষিজীবীদের কল্পনায় জীবনদায়িনী মানবী মাতা ও শস্যদায়িনী পৃথিবী বা বসুমাতা একাকার হয়ে গেছে। মানবিক ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে। মাতৃত্বের দেবী শস্যের দেবীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন। আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের প্রভাব বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে জেমস্ লিখেছেন:

So intimate appeared to be the relation between the processes of birth and generation and those of fertility in general that the two aspects of the same mystery found very similar modes of ritual expression under prehistoric conditions.৪

প্রাকৃতিক ও মানবিক ফলপ্রসূতা একই রহস্যের দুই দিক। মানবিক প্রজননের অনুকরণ তাই প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার পক্ষেও অপরিহার্য। এই কারণেই লিঙ্গ ও

১। J. D. Bernal, *Science in History,* 1954, 61.
২। *Encyclopaedia of Religion and Ethics,* V. 828.
৩। R. Briffault, *The Mother,* II, 251.
৪। E. O. James, *op. cit.* 172.

যোনি পূজা ও কামমূলক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা আদিম কৃষিজীবী সমাজে লক্ষ্য করা যায়—তান্ত্রিক যৌনাচারসমূহে যেগুলির নিদর্শন আজও টিঁকে আছে। এইগুলির পিছনকার মূল বিশ্বাস নারী ও প্রকৃতি অভিন্না। নারী ক্ষেত্রস্বরূপা, পুরুষ বীজস্বরূপ, যে কারণে মনু বলেছেন 'ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্' (৯/৩৩)। এই দ্বৈতবাদ কালক্রমে ভারতীয় চেতনায় প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। নারী ও পুরুষের মিলনে যেভাবে সন্তানের সৃষ্টি হয়, বিশ্বসৃষ্টির মূলেও অনুরূপভাবে প্রকৃতি (Female Principle) এবং পুরুষের (Male Principle) মিলন ক্রিয়াশীল, কিন্তু প্রাধান্য প্রকৃতিরই।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিষয়টিকে এইভাবে দাঁড় করানো যায়। আদিম চেতনায় নারী কেবল উৎপাদনেরই প্রতীক ছিল না, সত্যকারের জীবনদায়িনীর ভূমিকাই তার ছিল। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গুণাবলী ওই জীবনদায়িনী শক্তিরই পরিচায়ক। সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরগুলিতে তাই এই মাতৃত্বেরই ভূমিকা ছিল প্রধান, জীবনদায়িনী মাতৃদেবীই তাই ছিলেন ধর্মের কেন্দ্রবস্তু। উন্নততর কৃষি এবং পশুপালন প্রচলিত হবার পর থেকে, অর্থাৎ সমাজবিকাশের কিছুটা উন্নততর পর্যায়ে, জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা একটু একটু করে স্বীকৃত হতে শুরু করে। সৃষ্টিতত্ত্বের এই পুরুষ উপাদানটি প্রথম পরিচিত হয় মাতৃদেবীর তাৎপর্যহীন প্রেমিক হিসাবে, কালক্রমে উভয়ের মর্যাদা সমান হয়, এবং অবশেষে পুরুষ উপাদানটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, সেখানে এই রূপান্তর খুব দ্রুত হয় নি। আদিম যুগের জীবনদায়িনী মাতার ভূমিকা শস্য ও উদ্ভিদ্‌জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিই মাতৃদেবীরূপে কল্পিতা হয়েছেন। কালক্রমে পিতৃপ্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠা হলেও পুরাতন মাতৃদেবীকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হয়নি, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যেখানকার সমাজজীবন আজও বহুলাংশে কৃষিভিত্তিক।

৩। ধর্ম-সম্পর্কিত কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক ধারণা

ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে নৃতত্ত্ববিদ টাইলর অ্যানিমিজ্‌ম্ (Animism) নামক একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন, বাংলায় যাকে 'প্রাথমিক ধরনের আত্মার ধারণা' বলা যেতে পারে। টাইলরের মতে ধর্মের পুরো সংজ্ঞা কি তা বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু একটা সর্বনিম্ন সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে, যা হচ্ছে আত্মায় বিশ্বাস। তাঁর মতে দুটি সমস্যা আদিম মানুষকে পীড়িত করেছিল। প্রথম, জীবিত ও মৃতের পার্থক্য কি? দ্বিতীয়, স্বপ্নে, তন্দ্রায়, নেশার ঝোঁকে যে সব ছায়ামূর্তি দেখা যায় তারা কারা? এই সমস্যা দুটির তারা সমাধান করেছিল আত্মার ধারণা সৃষ্টি করে। তারা ধরে নিয়েছিল পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের আত্মা বিরাজমান। তাই টাইলরের মতে, পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য আত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, যে প্রচেষ্টার মূল কথা হল দুষ্ট আত্মাদের বিতাড়ন ও শিষ্ট আত্মাদের সন্তুষ্টিবিধান। কালক্রমে ওই আত্মাদের উপরেই চামড়া ও মাংস বসেছে, তারা দেবতা এবং অপদেবতায় পর্যবসিত হয়েছে।[১]

১। E. B. Tylor, *Primitive Culture,* 1871, 1891.

তিনটি কারণে টাইলরের মতবাদ সমালোচিত হয়েছে। প্রথম, আত্মার বিশ্বাস সর্বব্যাপী নয় এবং সকল ধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়। দ্বিতীয়, আদিম মানুষ সচেতন-ভাবে জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল এবং বুদ্ধি খাটিয়ে আত্মার ধারণা গঠন করে ওই সকল সমস্যার সমাধান করেছিল, এ সম্ভব নয়। টাইলর নিজের চিন্তাকে তাদের উপর আরোপ করেছেন। তৃতীয়, একটি নির্দিষ্ট বস্তু হিসাবে আত্মার কল্পনা কিছুটা উন্নততর চেতনার পরিচায়ক, তাই অ্যানিমিজ্‌ম্‌ দিয়ে ধর্মের উদ্ভবের ব্যাখ্যা চলে না, কেননা এরও পিছনের পর্যায় আছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু এটা মানতে হবে যে এই অ্যানিমিজ্‌ম্‌ একেবারে ফেলে দেবার জিনিস নয়। মানুষের চিন্তাভাবনার বিকাশের একটি পর্যায়ে এর গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা আছে। আত্মার ধারণা প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে খুবই ব্যাপক, ভারতবর্ষে তো বটেই।

হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রেততত্ত্ব অনেকটা টাইলরের মতবাদের উপর নির্ভরশীল। স্পেন্সারের মতে অ্যানিমিজ্‌ম্‌ ধর্মের আদি পর্যায় নয়, একটি বিবর্তিত পর্যায়। তাঁর মতে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে প্রেতপূজার মধ্য দিয়ে, আসলে যা পূর্বপুরুষদের উপাসনা (Ancestor Worship)। মৃত ব্যক্তির আত্মা বা ভূতকে তার বংশধরেরা ভয় পায়, এবং সেই কারণেই মৃত পূর্বপুরুষদের প্রীত্যর্থে বলিদান, পিণ্ডদান, প্রভৃতি রীতি সর্বত্রই বর্তমান। স্পেন্সারের মতে এই প্রেতপূজাই ধর্মের আদিরূপ। মৃত পূর্বপুরুষদের প্রেত, যারা জীবিত ব্যক্তিদের নাগালের বাইরে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভীতির কারণ ছিল। ওই প্রেতদেরই সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব।

একথা সত্য, পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপকতা সকল ধর্মেই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সুবিস্তৃত শ্রাদ্ধবিধির কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ধর্মের মত একটি জটিল ব্যবস্থাকে, এরকম কোন একটি ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটা অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। এ বিষয়ে জস্ট্রো বলেছেনঃ

Religion is too complex a phenomena to be accounted for by the growth and spread of a single custom. Worship, of however primitive a character, is not the expression of a single thought or a single emotion, but the product of thoughts so complex, so powerful, as to force an expression in the same way in which a river, swollen by streams coming down the mountains from various directions, overflows its banks.[১]

স্পেন্সারের মতবাদ প্রসঙ্গে জেভন্স লিখেছেনঃ

It never happens that the spirits of the dead are conceived to be gods. Man is dependent on the gods, but the spirit of his dead ancestors are dependent on him......The worshipper's pride is that *his* ancestor was a god and no mere mortal...... The fact is that ancestors known to be human were not worship-

১। M. Jastrow, *The Study of Religion*, 1901, 185.

ped as gods, and that ancestors worshipped as gods were not believed to be human. ১

রবার্টসন স্মিথ২ এবং জেভন্স ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কিত একটি মতবাদ গড়ে তোলেন যা টোটেম-বিশ্বাস (Totemism) নামে পরিচিত। টোটেম বলতে বোঝায় কোন প্রাণী বা গাছ-পালা-ফুল-ফল, দু'একটি ক্ষেত্রে অচেতন বস্তুও হতে পারে, যা কোন গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরূপে কল্পিত, এবং যার নাম থেকেই সেই গোষ্ঠীর নামকরণ হয়। টোটেম ঠিক দেবতা নয়, কিন্তু এমন একটি সত্তা যা শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। টোটেম বস্তুটিকে যা তা ভাবে ব্যবহার করা যাবে না, তাকে হত্যা করা চলবে না বা ভক্ষণ করা চলবে না, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভক্ষণ চলতে পারে ওই টোটেমের শক্তিকে গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত করে নেবার জন্য। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, টোটেম হত্যা চলবে না, এক টোটেমের মানুষ সেই টোটেমের অন্তর্গত অন্য কোন মানুষকে হত্যা করবে না, এবং এক টোটেমের পুরুষ সেই টোটেমের মেয়েকে বিবাহ করবে না। হিন্দুদের গোত্রব্যবস্থার মূলে এই টোটেম বিশ্বাসের প্রভাব আছে। যার কাশ্যপ গোত্র সে কাছিম বধ করবে না, কাছিম খাবে না, এবং তার গোত্রের মেয়েকে বিবাহ করবে না। গোত্র নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলে সেগুলির অন্তর্গত টোটেম পশুটিকে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যেমন গোতম (গাভী), শাণ্ডিল্য (ষাঁড়), ভরদ্বাজ (পক্ষীবিশেষ), কাশ্যপ (কচ্ছপ) প্রভৃতি। কৃষ্ণ স্বয়ং কুকুর গোত্রের মানুষ ছিলেন। এমন কি ধর্মশাস্ত্রের নামও পশুর নামে দেওয়া হয়েছে যেমন মাণ্ডুক্য উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, গোভিল গৃহ্যসূত্র, আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্র প্রভৃতি। অবশ্য তর্ক উঠতে পারে এই বলে যে এমন অনেক গোত্রনাম আছে যেগুলি বিশ্লেষণ করলে কোন পশুপাখির নাম পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বক্তব্য, যে কোন বিষয় বা ব্যবস্থারই আদিরূপ ও পল্লবিত-রূপের অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে যায়, কালধর্মে মূল বিষয়টি তার আদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে।

রবার্টসন স্মিথের মতে বলিদানমূলক যাবতীয় যাগযজ্ঞ প্রথার উদ্ভবের মূলে টোটেম বিশ্বাস বর্তমান, এবং এই বিশ্বাসই আসলে ধর্ম বিশ্বাসের মূল। তাঁকে কিছুটা শুধরে নিয়ে জেভন্স বলেন টোটেম বিশ্বাস সর্বব্যাপী এবং এই বিশ্বাস প্রাচীনতম সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্বাস থেকেই বহুদেবতা-প্রথার (polytheism) উদ্ভব। তিনি টোটেম বিশ্বাসকে ধর্মের আদিতম রূপ বলেন না, একটি প্রাক্ টোটেম স্তরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর মতে ওই স্তরটি সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। তাঁর মতে বাহ্য-বস্তু হিসাবে পূজার যোগ্য পশুরাই প্রথম বিবেচিত হয় এবং টোটেম বিশ্বাস সেই আদিম পূজাপদ্ধতিরই পরিচায়ক। ওই টোটেম বা কুলদেবতা দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ক্লানের একেশ্বর হিসাবে পূজা পেয়েছে। এখানেই আছে একেশ্বরবাদের (monotheism) সর্বপ্রাচীন রূপ। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐক্যের খাতিরে প্রতিটি গোষ্ঠীর টোটেমই অপরাপর গোষ্ঠীর কাছেও মান্য হয়ে ওঠে এবং এইভাবে একদেবতাবাদ থেকে বহুদেবতাবাদের উদ্ভব হয়।৩

১। F. B. Jevons, *An Introduction to the History of Religion*, 1896, 196f.

২। W. Robertson Smith, *Religion of the Semites*, 1885.

৩। F. B. Jevons, *op. cit.* 99, 117, 395, 411, 413.

টোটেমতত্ত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই যে একটি টোটেম-স্তর পার হয়ে এসেছে তা ঠিক নয়। সকল স্থানেই টোটেম বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায় না। সর্বোপরি টোটেম-বিশ্বাসকে ধর্ম বলে ঠিক ঘোষণা করা যায় না। সিডনি হার্টল্যান্ড লিখেছেনঃ

Although regarded with reverence and looked to for help, the totem is never, where totemism is not decadent, prayed to as a god or a person with powers which we call supernatural.১

ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ দুর্কহাইম কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে টোটেম বিশ্বাস সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে সরল ধর্ম। তিনি বলেন টোটেম বিশ্বাসের গুরুত্ব বুঝতে গেলে তার অস্তিত্ব সর্বব্যাপক কিনা এই প্রশ্ন অবান্তর। সকল ধর্ম-বিশ্বাসের মূলে একটি ধারণাই আছে। তা হচ্ছে একটি রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা যা মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই শক্তির ধারণার মূলে আছে ব্যক্তির উপর সামাজিক কর্তৃত্বের বাস্তবতা। টোটেম হচ্ছে ওই সামাজিক কর্তৃত্বের দৃশ্যমান প্রতীক। যে কঠিন ভিত্তির উপর ওই টোটেম দাঁড়িয়ে আছে তা হচ্ছে সামাজিক নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান, বিধিনিষেধ, যা সমাজাশ্রিত ব্যক্তির নিকট অলঙ্ঘনীয়। তার আসল দেবতা সমাজ, যে সমাজের শক্তির প্রতীক ওই টোটেম।২

মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ট ফ্রয়েট টোটেম-বিশ্বাসের সাহায্যে আদিম মানুষের কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর মতে আদিম সমাজে পিতার প্রতি তার সন্তানদের মনোভাব টোটেমের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। এই মনোভাব একদিকে যেমন সম্ভ্রমের অন্যদিকে তেমনই ঘৃণার ও ঈর্ষার। সম্ভ্রম এই কারণে যে শিশুকাল থেকেই তারা পিতাকে সর্বশক্তিমান হিসাবে দেখে ও ভেবে এসেছে, এবং সেই দেখা ও ভাবাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর এই মনোভাবের পাশাপাশি একটি প্রচণ্ড ঘৃণার মনোভাবও গড়ে উঠেছে যার উদ্ভব যৌন ঈর্ষা থেকে। পরিণামে পিতাকে নিহত হতে হয়েছে, কিন্তু তাকে হত্যা করার পিছনে যে কারণ ছিল, তার মৃত্যুর পর কিন্তু সেই কারণের পরিব্যাপ্তি ঘটেনি। ঘৃণার চেয়ে সম্ভ্রমটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই মৃত জীবিতদের উপর বিজয়লাভ করেছে। সন্তানদের যে আচরণ জীবিত পিতার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল, অর্থাৎ পিতার অধিকৃতাদের প্রতি যৌন ইচ্ছা না করা, পিতার মৃত্যুতে তা অলঙ্ঘনীয় নির্দেশে পরিণত হয়েছে। পিতার প্রতীকরূপী টোটেমকে সাক্ষী রেখে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, নিজেদের কুলের মানুষকে হত্যা করা বা নিজ কুলের মেয়েদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না। বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে ফ্রয়েট খুব প্রাসঙ্গিক নন, তবে এটুকু বলা যায় যে তিনি গোড়া থেকেই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। যে বনিয়াদের উপর তিনি উপরিতল খাড়া করেছেন সেটাই সংশয়যুক্ত।

পরবর্তীকালে জর্জ টমসন টোটেম-বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু নূতন কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে অবিকৃত আকারে টোটেম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়

১। E. S. Hartland in *Encyclopaedia of Religion and Ethics* XII, 406f.

২। E. Durkheim, *Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse*, 1912, Eng. Trans. 1915.

অস্ট্রেলিয়ার নিম্ন-শিকারজীবীদের মধ্যে। আমেরিকা, মেলানেশিয়া, আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রচলিতরূপ বিকৃত ও পল্লবিত। এমন কি অস্ট্রেলিয়াতে তা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেলেও, ঠিক আদি ও আসলরূপে টোটেম-বিশ্বাসকে সেখানেও পাওয়া যায় না; যদিও যা পাওয়া যায় তা থেকে আদিরূপটিকে পুনর্গঠিত করা অসম্ভব। অস্ট্রেলিয়ার টোটেমসমূহের অধিকাংশই ভক্ষণযোগ্য পশু ও গাছপালা। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় অস্ট্রেলিয়াতে বিভিন্ন টোটেমের মানুষেরা সমবেত হয় কয়েকটি বিশেষ টোটেম-কেন্দ্রে, যেগুলি ওই টোটেম-পশুদের জন্ম ও বৃদ্ধির স্থান, এবং সেই সকল স্থানে তারা নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান করে। এই আচার-অনুষ্ঠানগুলি জাদুবিশ্বাসমূলক বৃদ্ধির অনুষ্ঠান। তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে টমসন দেখাচ্ছেন খাদ্য-সম্পর্কীয় যে বিধিনিষেধ, অর্থাৎ এক টোটেমের মানুষ সেই টোটেমের প্রতীক পশুকে ভক্ষণ করবে না, এই ধারণাটির বিকাশ টোটেম বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটেছিল। আদিতে টোটেম-পশুই ছিল তার অন্তর্গত গোষ্ঠীর ভক্ষ্য। কালক্রমে টোটেমীয় গোষ্ঠীগুলি অসংখ্য উপ-গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাবার দরুণ টোটেম-পশুর উপর অভক্ষ্যতা আরোপ করে, একটি স্বেচ্ছাকৃত খাদ্যের রেশনিং প্রবর্তিত করা হয়েছিল। যে গোষ্ঠীর টোটেম হাঁস সেই গোষ্ঠীর লোকেরা হাঁস ছাড়া আর সব খাবে যাতে হাঁস আর একটি ভিন্ন গোষ্ঠীর খাদ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে ক্যাঙারু টোটেমের লোকেরা ক্যাঙারু খাবে না যাতে তা হাঁস টোটেমের ভোগে লাগে। উৎপাদন ব্যবস্থার আদিমতম পর্যায়ে এভিন্ন উপায় ছিল না, কেননা ওই সকল ভক্ষ্য-পশুদের সংখ্যা বাড়াবার কায়দা তাদের জানা ছিল না। পরবর্তীকালে যে সেকল স্থানে উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতির ফলে খাদ্যের নূতন উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে, আদি টোটেম বিশ্বাস তার মূল তাৎপর্য হারিয়ে, নিছক কয়েকটি প্রথা ও ধারণারূপেই রয়ে গেছে। আরও পরবর্তী পর্যায়ে, সেগুলিরও সামাজিক মূল্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু রয়ে গেছে কয়েকটি ঝাপসা ধারণা, যেমন এক পূর্বপুরুষ, বহির্বিবাহ, খাদ্যের তাৎপর্যহীন বাধানিষেধ, প্রভৃতি। নূতন ধরনের টোটেম বস্তুরও সৃষ্টি হয়েছে যান্ত্রিকভাবে, যেমন পাথর, তারকা, নদী, সূর্য, ঝড় প্রভৃতি।[১]

ধর্মের উদ্ভব প্রসঙ্গে আরও একটি মতবাদের কথা উল্লেখযোগ্য, যা অনুযায়ী একটি ব্যাপক, অনির্বচনীয়, রহস্যময়, নৈর্ব্যক্তিক শক্তির অস্তিত্বের প্রতি আদিম মানুষের ভয়মিশ্রিত বিশ্বাস ধর্মের উদ্ভবের মূল কারণ। এই শক্তির নামকরণ করা হয়েছে 'মানা' (mana), শব্দটির উৎস মেলানেশীয়। 'মানা' বলতে বোঝায় একটি সর্বব্যাপী বোধাতীত শক্তি বা প্রভাব, যা অপ্রত্যাশিত উপায়ে কাজ করে। এটি একটি রহস্যময় বা জাদুমূলক শক্তি, যা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নয়, অথচ অনন্ত শক্তির উৎস, যা মানুষের ভাল এবং মন্দ দু-ই করতে পারে। কডরিংটন লিখেছেন ঃ

All conspicuous success is a proof that a man has *mana*... A man's power, though political or social in character, is his *mana*...If a man has been successful in fighting, it has not been his natural strength of arm, quickness of eye, or readiness of resource that has won success; he has certainly got the *mana*

১। G. Thomson, *Aeschylus and Athens,* 1950, 12-15.

of a spirit or of a deceased warrior to empower him, conveyed in an amulet or a stone around his neck, or a tuft of leaves in his belt...or in the form of words with which he brings supernatural assistance to his side......A canoe will not be swift unless *mana* be brought to bear upon it, a wind will not catch many fish, nor an arrow inflict a mortal wound.১

বস্তুত, একটি অনির্বচনীয় অথচ অদ্ভুত ক্রিয়াপ্রদানকারী এই মানার ধারণা দিয়ে যে কোন সমস্যারই ব্যাখ্যা করা যায়, এবং সেই কারণেই এই ধারণাটিকে কিছুটা মনগড়া ও অতিসরলীকৃত বলেই মনে হয়। নৃতত্ত্ববিদদের কাছে এই ধারণাটি জনপ্রিয় হয়েছিল।২ দুর্কহাইম তাঁর টোটেমতত্ত্ব বোঝাতে এই ধারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন।৩ ম্যারেটের মতে, মানার ধারণা প্রাক-অ্যানিমিজ্‌ম পর্যায়ের।৪ তিনি মনে করেন এই ধারণাটির একটি ঋণাত্মক দিক আছে, অর্থাৎ বিধিনিষেধের দিক, একটি পাল্টা ধারণা যে এটা এমন একটা জিনিস যাকে খুব সহজে নেওয়া যাবে না। এই ঋণাত্মক দিক্‌টিকে তিনি বলছেন টাবু। ম্যারেট লিখেছেন ঃ

Science, then, may adopt *mana* as a general category to designate the positive aspect of the supernatural, or whatever we are to call that order of miraculous happenings which, for the concrete experience, if not usually for the abstract thought of the savage, is marked off perceptibly from the order of ordinary happenings. *Tabu* on the other hand, may serve to designate its negative aspect. That is to say, negatively, the supernatural is *tabu*, not to be lightly approached, because, positively it is *mana*, instinct with power above the ordinary.৫

এর পর আমরা জাদুবিশ্বাস (Magic) নিয়ে আলোচনা করব, কেননা সকল ধর্মের সঙ্গে এই বিশ্বাসটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্য দেশের কথা বাদ দিলেও, প্রাচীন ভারতের একদা বহুল প্রচলিত যজ্ঞ-প্রথার বারো আনা অংশই জাদু-বিশ্বাসমূলক। বর্তমান হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি আজও পর্যন্ত জাদু-বিশ্বাসের নিদর্শন বহন করছে। জাদুবিশ্বাসের মূল ব্যাপারটা হল অনুকরণমূলক বা সংস্পর্শমূলক আচার অনুষ্ঠানের মারফৎ প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছানুবর্তী করা বাস্তবের কল্পনা দিয়ে কল্পনার বাস্তবকে অধিকার করা। স্যার ফ্রেজারের মতে ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাস হচ্ছে, স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি ধারণার অনুষঙ্গের নিয়মাবলীর প্রয়োগ, বিশেষ করে সাদৃশ্যমূলক ও সংস্পর্শমূলক অনুষঙ্গের নিয়মগুলি।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরুন, আমি বৃষ্টি ঘটাতে চাই। যদি আমি বৈজ্ঞানিক হই আমি খুঁজবো বৃষ্টির কারণগুলি কি, এবং চেষ্টা করব সেই

১। Bishop Codrington, *The Melanesians,* 1891, 118 ff.
২। E. S. Hartland, *Ritual and Belief,* 1914, 26-66.
৩। E. Durkheim, *op. cit.,* Eng. Trans., 188 ff.
৪। R. R. Marett, *The Threshold of Religion,* 1914, 1-28, 98-121 ff.
৫। *Ibid,* 99-100.

কারণগুলির বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে বৃষ্টি আনবার। যদি আমি ধর্মে বিশ্বাস করি আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করব, হে ঠাকুর জল দাও। কিন্তু যদি আমি ম্যাজিক মানি, আমি একটি ভাঁড় ফুটো করে তাতে জল ভরে একটি গাছের মাথায় টাঙিয়ে দেব। ওই যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়বে, আমি বিশ্বাস করব, ওটা বৃষ্টির অনুকরণ, যা করার ফলে বাস্তবে বৃষ্টি হবে। অথবা আমি ড্রাম বাজিয়ে মেঘের ডাকের নকল করব। অথবা আমি দলবল জুটিয়ে বৃষ্টির নাচ নাচব। অথবা আমি ব্যাঙের বিয়ে দেব, কেননা বৃষ্টির আগে ব্যাঙ ডাকে।

এগুলি হচ্ছে অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাসের উদাহরণ, কৃষিগত অজস্র আচার-অনুষ্ঠানের মূলে যা বর্তমান। এই বিশ্বাসই আদিম মানুষের চোখে নারীর সঙ্গে পৃথিবীর অভিন্নতা এনে দিয়েছে, মানবিক ফলপ্রসূতার ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করে প্রকৃতির ফলপ্রসূতো বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। আরও এক ধরনের জাদু-বিশ্বাস আছে যাকে বলা হয় সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস। ধরুন, কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়েছে, যাতে তার সুপ্রসব হয় সেজন্য আরও পাঁচজন পুত্রবতী মহিলাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল, যাতে ওই পুত্রবতীদের সংস্পর্শে এসে ওই গর্ভবতী মহিলাটির ভাল হয়। এটি সাধভক্ষণ নামক একটি হিন্দু অনুষ্ঠান। ধরুন, আমি শত্রুকে হত্যা করব। তার কুশপুত্তলিকা দাহ করলাম। এটি হল অনুকরণ-মূলক জাদুবিশ্বাস। তার মাথার একটু চুল বা তার পোষাকের একটু অংশ জোগাড় করে পুড়িয়ে দিলাম। এটি হল সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস।

এই জাদুবিশ্বাসের জাদুকাঠি দিয়েই স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার সারা পৃথিবীর পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষদের ধর্মবিশ্বাসের মূলতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তাঁর বারোখণ্ডে রচিত ভয়াবহ-সুন্দর মাথা-খারাপ করে দেওয়া বিখ্যাত গ্রন্থে।১ তথ্য ও পাদটীকায় ঠাসা নৃতত্ত্বের এই গ্রন্থটিকে অনায়াসেই এ-যুগের মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া যায়। সে যাই হোক না কেন, আমাদের প্রয়োজন ধর্মের সঙ্গে জাদুবিশ্বাসের সম্পর্কের অন্বেষণ।

জেভন্সের মতে ধর্ম ও জাদুবিশ্বাসের উৎস পৃথক, বিষয়বস্তুও পৃথক, কিন্তু ধর্মে, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, জাদুবিশ্বাসের (যেখানে অতিপ্রাকৃতের স্থান নেই) চেয়ে পূর্ববর্তী।২ ফ্রেজারের মতে জাদুবিশ্বাস সর্বত্রই ধর্মের পূর্ববর্তী। তাঁর মতে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক তেলের সঙ্গে জলের মত, যা মেশবার নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় মানুষ যখন বুঝল যে জাদুবিশ্বাস বাস্তবে ফলপ্রসূ নয়, বৃষ্টির নকল করলেই বৃষ্টি আসে না, শিকারের মহড়া দিলেই শিকার জোটে না, তখন সে অন্য রাস্তা নিল। একশ্রেণীর মানুষ প্রকৃতির নিয়মাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেগুলি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে চাইল। এরা হল বৈজ্ঞানিকদের পূর্বপুরুষ। অপর একদল মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর ভরসা রাখতে না পেরে অতিপ্রাকৃতকেই আশ্রয় করল। এই অতিপ্রাকৃতে আস্থা রাখার পথ, সমস্ত ঘটনার পিছনে একটি নৈর্ব্যক্তিক অলৌকিক শক্তির রহস্যময় ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস, এই দিয়েই শুরু হল ধর্মের জয়যাত্রা। এইভাবেই ম্যাজিকের যুগের পরিবর্তে ধর্মের যুগের সূত্রপাত হল।৩

১। J. G. Frazer, *The Golden Bough,* 1911, abridged ed., 1923.
২। F. B. Jevons, *op. cit.* 25.
৩। J. G. Frazer, *op. cit.* I, 220-43.

কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। আসলে তিনি জাদুবিশ্বাসের গূঢ় রহস্যটি ধরতে পারেননি, যা হচ্ছে তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য। ধর্মকে তিনি জাদুবিশ্বাসের চেয়ে মহৎ চেতনা হিসাবে ধরে নিয়েছেন, কিন্তু এতে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া আদিম মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র রাতারাতি গম্ভীর প্রকৃতির দার্শনিক বনে গিয়ে জাদুবিশ্বাসের অসারত্ব উপলব্ধি করে ধর্মের আশ্রয় নেবে এটা একান্তই কষ্টকল্পনা। এখনও বহু দেশ আছে যেখানে তথাকথিত এই ধর্মবোধ জাগেনি অথচ ম্যাজিক আছে। ফ্রেজারের মতবাদ এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না, কেন পৃথিবীর সকল উন্নততর ধর্মের সঙ্গেই কোন না কোন ধরনের জাদুবিশ্বাস জড়িয়ে আছে, কেন পরবর্তীকালে অজস্র জাদুবিশ্বাস তৈরী হয়েছে, আজও তা হচ্ছে কেন?

ধর্মের সঙ্গে জাদুবিশ্বাসের সম্পর্কটা ঠিক তেল ও জলের সম্পর্ক নয়। ম্যারেট লিখেছেন:

Magic and religion are differentiated out of a common plasm of crude beliefs about the awful and the occult. ১

তাঁর মতে কিন্তু জাদুবিশ্বাসের মধ্যে ধর্মের মতই অতিপ্রাকৃতের স্থান আছে।২ হার্টল্যাণ্ডের মতেও জাদুবিশ্বাস ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য টানা যায় না।

In the lowest societies of which we have evidence, practices usually regarded as magical are indistinguishable from those regarded as religious. ৩

কিন্তু ফ্রেজারের ধারণাটাই সঠিক যে ম্যাজিক ও ধর্ম পৃথক, যদিও এই পার্থক্যের সুস্পষ্ট কারণটি তিনি বোঝাতে পারেননি। পক্ষান্তরে যাঁরা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে চাননা তাঁরা বিভিন্ন ধর্মব্যবস্থার মধ্যে জাদুবিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন। দুর্কহাইমও ধর্ম ও ম্যাজিকের আকারগত পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁর মতে—

There is no church of magic...The magician has a clientele and not a church......Religion on the other hand is inseparable from the idea of a church. ৪

তৎসত্ত্বেও কিন্তু তাঁর মতে প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়ের উৎস এক, এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই সেই এক প্রেরণা যাকে মানা (mana) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাসকে বুঝতে গেলে তা বোঝা দরকার তার প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায়, যেদিকে ফ্রেজার সহ কেউই নজর দেননি। সকলেই ধরে নিয়েছেন জাদুবিশ্বাস একটা ভ্রান্ত পন্থা, যার প্রয়োগটাই অপপ্রয়োগ (misapplication of the laws of the association of ideas) যার তুলনায় ধর্ম একটা উন্নততর মানসিকতার পরিচায়ক। এঁরা ধরে নিয়েছেন ম্যাজিক

১। R. R. Marett, *op. cit.*, XI.

২। *Ibid.* 30.

৩। E. S. Hartland, *Ritual and Belief*, 1914, 74-75.

৪। E. Durkheim, *op. cit.*, Eng. Trans., 44-45.

একটা জাল-বিজ্ঞান (pseudo-science) এবং নিষ্ফল কলা-কৌশল (abortive art)। কিন্তু সত্যই কি তাই?

জাদুবিশ্বাসকে বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজে, যেখানে উৎপাদনের কলা-কৌশল ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, হাতিয়ার ও উপকরণ ছিল যৎসামান্য। বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে এই ঘাটতির পরিপূরক ছিল ম্যাজিক, বাস্তব কলাকৌশলের পরিপূরক কাল্পনিক কলাকৌশল, এবং সেই হিসাবে জীবনসংগ্রামের একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। বিরাট পণ্ডিতেরা এইখানেই ভুল করেছেন। টমসন্ লিখেছেনঃ

Primitive magic is founded on the notion that, by creating the illusion that you control reality, you can actually control it. It is an illusory technique complementary to the deficiencies of the real technique. Owing to the low level of production, the subject is as yet imperfectly conscious of the objectivity of external world, and consequently the performance of the preliminary rite appears as the cause of success in the real task; but at the same time, as a guide to action, magic embodies the valuable truth that the external world can in fact be changed by man's subjective attitude towards it. The huntsmen whose energies have been stimulated and organised by the mimetic rite are actually better huntsmen than they were before. ১

জাদুবিশ্বাসের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা একার নয়, সকলের। সমবেত অনুষ্ঠান ছাড়া জাদু হয় না, অন্তত সেই আদিম যুগে হত না। আজও পর্যন্ত পিছিয়ে পড়ে থাকা মানবসমাজে জাদুবিশ্বাসের যে সকল নিদর্শন দেখা যায় সকল ক্ষেত্রেই সেগুলি সমবেত অনুষ্ঠান। জেন হ্যারিসন লিখেছেনঃ

One element in the rite we have already observed and that is that it must be done collectively, by a number of persons feeling the same emotion. A meal digested alone is certainly no rite; a meal eaten in common under the influence of a common emotion, may, and often does, tend to become a rite. ২

অর্থাৎ জাদুবিশ্বাসকে বুঝতে গেলে সুপ্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তা বুঝতে হবে। উৎপাদনব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কাজই সমবেত প্রচেষ্টা ও সমবেত প্রেরণা ভিন্ন সম্ভব ছিল না এবং এই প্রেরণা একমাত্র জাদুবিশ্বাস থেকেই পাওয়া সম্ভব ছিল। পরবর্তীকালে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে প্রাচীন জাদুবিশ্বাস তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জাদুবিশ্বাসের প্রয়োগ পদ্ধতি বদলে যায়, তা সুবিধাভোগী শ্রেণীর গুহ্যবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। যে সমবেত জীবনচর্যায় সকলের অধিকার ছিল, তা একটি

১। G. Thomson, *op. cit.* 13-14.
২। J. E. Harrison, *Ancient Art and Ritual*, 1913, 37.

পেশাদার শ্রেণীর হাতে চলে যায়। পেশাদার জাদুকরেরাই পুরোহিত শ্রেণীর পূর্বসূরী। বৈদিক সাহিত্যের দিকে তাকালেই দেখা যাবে আদিতে যজমানরাই ছিল যজ্ঞের পুরোহিত, কিন্তু পরবর্তীকালে যজ্ঞকার্য তাদের হাতে থাকেনি, তা চলে গেছে পেশাদার পুরোহিত শ্রেণীর হাতে। প্রাক্-বিভক্ত সমাজব্যবস্থা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত প্রকৃতির উপর প্রভুত্বকারী জাদুবিশ্বাসের মৃত্যু ঘটে, এবং তার জায়গায় গড়ে ওঠে দেবতাতন্ত্র, শ্রেণীসমাজের প্রতিভূদের মতই যাঁদের সেবা ও পূজা করতে হয়, তাঁরা অনুগ্রহ করে কিছু দিলেও দিতে পারেন, না দিলেও পূজা ঠিকমত পাওয়া চাই। একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জাদুবিশ্বাস তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেললেও, জনজীবন থেকে তা একেবারে মুছে যায়নি, বিভিন্ন ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে তার অস্তিত্ব আজও খুঁজে পাওয়া যায়; যদিও তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে।

৪। উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস ও মাতৃকাপূজা

আমরা আগেই বলেছি, জাদুবিশ্বাসমূলক যে সকল অনুষ্ঠান ভূমির উর্বরতা বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রাচীন মানুষের চিন্তায় সেগুলিকে মেয়েদের বিশেষ ব্যাপার বলে গণ্য করা হত। পৃথিবীর ফলোৎপাদিকা শক্তিকে মেয়েদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার রীতি পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান। সংস্পর্শ অথবা অনুকরণের দ্বারা একের প্রভাব অন্যের উপর সঞ্চারিত করা সম্ভব। যে সকল পূর্ব শর্ত নারীকে ফলপ্রসূ করে তা পৃথিবীরূপী মাতৃদেবীকে ফলপ্রসূ করে। এই ধারণা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় কেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মাতৃদেবীগণ মধ্যে মধ্যে রজঃস্বলা হন। (ভারতের ক্ষেত্রে যে সকল দেবীর রজঃস্বলা হবার ঘটনা ও তৎসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান বিশেষ প্রসিদ্ধ তাঁরা হলেন উত্তর ভারতের পার্বতী, কেরলের ভগবতী ও আসামের কামাখ্যা)। প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে আনার জন্য প্রাচীন মানুষ নরনারীর জননাঙ্গের উপর, ওই একই যুক্তিতে, চরম গুরুত্ব আরোপ করেছিল। লিঙ্গ ও যোনি পূজার ব্যাপকতা তারই ফল, মৈথুন কৃষিকর্মের অনুকরণ, পুরুষাঙ্গ ও তার ক্রিয়া যেখানে লাঙ্গল দেবার প্রতীক, নারী-অঙ্গ শস্যোৎপাদিকা ধরিত্রীর সঙ্গে অভিন্ন। লাঙ্গল ও লিঙ্গ একই ধাতুনিষ্পন্ন।[১] তান্ত্রিক যৌনাচারসমূহের আদিম তাৎপর্য এখানেই নিহিত।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, মহেঞ্জোদারো নাটকীয়ভাবে আবিষ্কৃত হবার ছয় বছর আগে রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছিলেনঃ

For a conception of a godhead analogous to the Sakta conception of the Devi we should travel beyond the countries diminated by the Vedic Aryans and the Avestic Iranians to Asia Minor, Syria, Egypt and other countries bordering on the Mediterranean. There is a strong resemblence between the Indian Sakta conception of Sakti and the Sakta ritual of the followers of the Vamacara and Kulacara, who practised ceremonial promiscuity on the one hand and the Semetic conception of Astart,

---

১। P. C. Bagchi, *Pre-Dravidian and Pre-Aryan in India,* 1929, 10, 14.

the Egyptian conception of Isis, and the Phrygian conception of Cybele, on the other.১

শাক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে পূর্বে অব্যক্ত প্রকৃতিই একমাত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন এবং মহাদেবীর রূপ ধারণ করে নিজ দেহ থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করলেন, এবং নিজেকে ত্রিধাবিভক্ত করে তাঁদের সঙ্গিনী হলেন। মহেঞ্জোদারোর মাতৃকাদেবী প্রসঙ্গে মার্শাল সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, পরবর্তীকালে মাতৃকা পূজার শাক্ত পর্যায়ে দেবী সর্বশক্তিমতী প্রকৃতি বা শক্তিতে রূপান্তরিতা হয়েছেন, এবং পুরুষের সহযোগে জগদম্বা বা জগন্মাতা রূপে তিনি বিশ্বচরাচর ও দেবগণকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোচ্চরূপে তিনি মহাদেবী, শিবের প্রেয়সী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর স্রষ্টা।২ এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগর উপকূলে অজস্র মাতৃদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, একজন গৌণ সঙ্গীসহ, যিনি তাঁর পুত্র এবং প্রেমিক। হোগার্থ লিখেছেন ঃ

In Punic Africa, she is Tanit with her son ; in Egypt, Isis with Horus ; in Phoenicia, Asteroth with Tammuj (Adonis) ; in Asia Minor, Cybele with Attis ; in Greece (and especially in the Greek Crete itself), Rhea with young Zeus. Everywhere she is *unwed*, but made the mother first of her companion by immaculate conception, and then of the gods and of all life by the embrace of her own son. In memory of these the original facts of her cult (especially the most esoteric mysteries of it) are marked by various practices and observances symbolic to the negation of true marriage and obliteration of sex. ৩

কুমারী দেবীদের এইসব কাহিনী এমন একটা যুগের স্মারক যখন পিতার কোন তাৎপর্য ছিল না এবং এমন একটি সমাজের, যেখানে জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা কদাচিৎ স্বীকৃত হত। কিন্তু এই সকল কাহিনী পাওয়া যায় অনেক পরবর্তী-কালের লিখিত পুঁথিতে, যা থেকে বোঝা যায় প্রাচীন কৃষিজীবী মানুষেরা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে পৃথিবীরূপিণী মাতৃদেবীর পূজা করত, যিনি সকলের সৃষ্টিকারিণী, যাঁর মেজাজের প্রতিফলন ঘটত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীতে, যাঁর প্রেমিকরা ধরিত্রী-উপজাত শিশু-ফসলের প্রতীক, যাঁর গুণাবলীর উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত দেবীরা। পৃথিবীরূপিণী সেই প্রাচীনা মাতৃদেবীর প্রেমিকের বার্ষিক জন্মমৃত্যুর কাহিনী, যা নিয়ে অজস্র কৃষিগত রূপক (agricultural myth) রচিত হয়েছে, উদ্ভিজ্জীবনের বাৎসরিক মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রতীক।৪ কিন্তু লিখিত পুঁথিপত্র প্রাচীন যুগের স্মারক হলেও মানব-ইতিহাসের আদি পর্যায়গুলির অন্বেষণে আমাদের পুঁথিপত্রের এলাকার বাইরে প্রত্নতত্ত্বের এলাকায় যেতে হবে।

১। R. P. Chanda, *Indo-Aryan Races,* 1916, 148-49.
২। J. Marshall, *Mohenjodaro and Indus Civilization,* 1931, I. 48 ff.
৩। *Encyclopaedia of Religion and Ethics,* I. 147.
৪। N. N. Bhattacharyya, *Indian Mother Goddess,* 1970, 7 ff.

৫। প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগ

নৃতত্ত্ববিদ্দের কল্পিত শিকারজীবী পর্যায় বা খাদ্য-সংগ্রহের যুগ, যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, মর্গান যাকে বলেছেন বন্য যুগ, প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিচারে প্রত্নাশ্মীয় বা পুরাতন প্রস্তর যুগ (Palaeolithic) হিসাবে কল্পিত, ভূতত্ত্ববিদেরা যে যুগটিকে আখ্যা দিয়েছেন Pleistocene। শিকারজীবী এই পর্যায়টি আজও নানাভাবে টিঁকে আছে মালয়েশিয়া, মধ্য আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং উত্তর মেরু অঞ্চলে। প্রত্নাশ্মীয় যুগের তিনটি স্তর—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। উচ্চ পর্যায়ের জীবিকা মূলত শিকার, মাছ-ধরা ও সংগ্রহ হলেও, হাতিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে অনেকটা উন্নতি ঘটেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নাশ্মীয় যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে পাঞ্জাব ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে, গুজরাত থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং অন্যত্র। প্রাপ্ত হাতিয়ারসমূহ অধিকাংশই ফ্লেকধর্মী, অর্থাৎ ধারালো পাথরের চাক্‌লা বা ফালি যা ছেদনকার্যের পক্ষে অনেকটা উপযোগী। প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির একটি অগ্রসর পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারত, গুজরাত ও পাঞ্জাবের কয়েকটি স্থানে। গুজরাত অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে কয়েকটি কঙ্কাল পাওয়া গেছে যেগুলির উপবিষ্ট ধরন দেখে অনুমিত হয় যে কিছুটা পারলৌকিক ধারণা সেযুগে সেখানে বর্তমান ছিল।

নবাশ্মীয় বা নব্য প্রস্তর (neolithic) পর্যায়কে নির্ধারণ করা রীতিমত কঠিন, তার কারণ খাদ্যসংগ্রহ থেকে খাদ্যউৎপাদন পর্যায়ে উত্তরণ সর্বত্র একই সময়ে এবং একইভাবে হয়নি। ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও গোলমেলে, কেননা এখানে নবাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহ কোন ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুসরণে গড়ে ওঠেনি। তবে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও উড়িষ্যায় নবাশ্মীয় সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন মিলেছে, বিশেষ করে হাতিয়ার, যেগুলিতে পর্যাপ্ত পালিশের চিহ্ন প্রকট। নবাশ্মীয় সংস্কৃতির মানুষেরা অগ্নির ব্যবহার জেনেছিল, হাঁড়ি-কুড়ি তৈরি করতে, চাষবাস ও পশুপালন করতে শিখেছিল। এই নূতন খাদ্য-উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক পর্যায়কে মর্গান বলেছেন বর্বর যুগ। বাড়তি জনসংখ্যার উপযোগী খাদ্যের যোগান নবাশ্মীয় সমাজ বাড়াতে পেরেছিল, এবং সেই হিসাবে নবাশ্মীয় উৎপাদন ব্যবস্থা একটি বিপ্লব, পূর্ববর্তী শিকারজীবী পর্যায়ের একটি গুণগত রূপান্তর।১

শিকারজীবী পর্যায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহ এই নবাশ্মীয় বিপ্লবের পটভূমিকায় নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতির উপর বর্ধিত অধিকার আসা সত্ত্বেও, পৃথিবীর ফলপ্রসূতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য জাদুবিশ্বাসের ভূমিকা বেড়েছিল বই কমেনি। অধিকাংশ নবাশ্মীয় সমাজ পূর্ববর্তী প্রত্নাশ্মীয় সমাজের চেয়ে অনেকটা বেশি আড়ম্বর ও সামাজিক প্রচেষ্টা সহকারে মৃতদেহ সমাধিস্থ করত। উচ্চ প্রত্নাশ্মীয় যুগের সমাধিসমূহে খাদ্য, হাতিয়ার ও কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে কঙ্কালটিতে লাল রং মাখানো হত। ম্যাকালিস্টার লিখেছেন:

১। V. G. Childe, *What Happened in History*, 1959, 27-47.

To paint bones with the ruddy colouring of life was the nearest thing to mummification which the palaeolithic people knew; it was an attempt to make the body again serviceable for its owner's use.১

টমসন লিখেছেনঃ

The symbolism becomes quite clear when we find, as we commonly do, that the skeleton has been laid in the contracted or uterine posture. Smeared with the colour of life, curled up like a babe in the womb—what more could the primitive man do to ensure that the soul of the departed would be born again? ২

নবাশ্মীয় সমাজে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার উদ্দেশ্যের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। ভূমিতে সমাধিস্থ মৃত কোন না কোন ভাবে শস্যোৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে, এরকম একটা বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছিল, যে বিশ্বাস ভূমিরূপিণী মাতৃদেবীকে মৃতের রক্ষক হিসাবেও কল্পনা করেছিল, যিনি ভূমিস্থ বীজের মতই মৃতের সঙ্গে সম্পর্কিতা।৩ নবাশ্মীয় সমাজের মাতৃদেবী নিছক জীবনদায়িনী মাতাই ছিলেন না, যে ধরিত্রীর বক্ষে ফসল জন্মায় সেই ধরিত্রী এই সমাজে দেবীরূপে কল্পিতা, যিনি নারীর মতই অনুরোধ ও উপহারের দ্বারা প্রীতা হন, আবার অনুকরণমূলক অনুষ্ঠান ও মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা বশীভূতা হন। পাথর অথবা মাটি কিংবা হাড়ের দ্বারা নির্মিত অনেক নবাশ্মীয় সমাজের মাতৃকামূর্তি পাওয়া গেছে মিশর, সিরিয়া, ইরান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকে। এই সকল মূর্তি নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের বিখ্যাত দেবীদের ভিত্তিস্বরূপা।

দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের ধর্মীয় ধারণা-সমূহের কোন সুস্পষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নেই বললেই চলে। কাজেই এদেশের প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় ধর্মব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে গেলে অপরাপর দেশের পরি-প্রেক্ষিতে অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা ভিন্ন উপায় নেই। এটি হল অসুবিধার দিক। কিন্তু একটি সুবিধার দিকও আছে, যা হচ্ছে, আমাদের দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলসমূহের স্থানীয় পূজাপার্বন ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে তাদের আদিম উদ্ভবের পরিচয় বহন করে, কেননা আজও পর্যন্ত আদিম ধরনের জীবনযাত্রা ভারতবর্ষের নানা স্থানে টি'কে আছে। এদেশের অনগ্রসর, অদক্ষ এবং নিছকই স্থানীয় ধরনের কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচুর ট্রাইবাল অর্থাৎ উপজাতীয় উপাদান টি'কে আছে। বর্তমান যুগের হিন্দু সমাজের তথাকথিত ছোট জাতের মানুষেরা অসংখ্য উপজাতীয় আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস আজও পর্যন্ত টি'কিয়ে রেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে, যদিও কাগজে-কলমে এদেশে চতুর্বর্ণ-প্রথা স্বীকৃত, বাস্তবে কিন্তু এদেশে আছে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত অসংখ্য ছোটবড় জাত,

১। R. A. S. Macalister, *Textbook of European Archaeology*, 1921, I. 502.
২। G. Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, 1949, I. 210.
৩। S. Piggott, *Prehistoric India*, 1950, 127.

যাদের অধিকাংশই এসেছে বিভিন্ন উপজাতি থেকে।১ বিষয়টি আমরা পরে আলোচনা করব।

এদেশের টিঁকে থাকা উপজাতীয় ধর্মসমূহ এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সকল উপজাতীয় উপাদান বর্তমান আছে, সেগুলিকে চর্চা করলে ভারতবর্ষের প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় সমাজসমূহের প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থাকে বোঝবার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু সূত্র পাওয়া যায়। এই সকল টিঁকে-থাকা উপাদান মূলত মাতৃকাপূজা সম্পর্কিত। আমরা আগেই বলেছি এদেশে নবাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের বিকাশ কোন সুনির্দিষ্ট কালানুক্রম মেনে চলেনি। এখানে প্রাগৈতিহাসিক সমাজ বহুক্ষেত্রে অগ্রসর সমাজের পাশাপাশি বহাল তবিয়তে বর্তমান রয়েছে। অগ্রসর সমাজের মানুষদের লিখিত বিবরণসমূহে, যেগুলি বিভিন্ন যুগে রচিত, পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের সম্পর্কেও কিছু তথ্য আছে, মূলত মাতৃকাদেবী সংক্রান্ত, যিনি শবরীরূপে কল্পিতা এবং মদ্য-মাংস-পশু-প্রিয়া।

৬। ভারতের উপজাতীয় ধর্মসমূহ

ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'পঞ্চকৃষ্টি'-র ব্যাখ্যা যাস্ক করেছেন 'পঞ্চমনুষ্যজাতিনি' বলে, যার অর্থ চতুর্বর্ণ সহ পঞ্চম বর্ণ নিষাদ।২ যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে নিষাদ হিসাবে আট জাতের মানুষকে উল্লেখ করা হয়েছে যাদের মধ্যে ব্রাত, পুঞ্জিষ্ট, শ্বনিন্ এবং মৃগায়ু নিঃসন্দেহে শিকারজীবী।৩ টীকাকার মহীধর বাজসনেয়ী সংহিতায়৪ বর্ণিত নিষাদদের ভিল্ল বা ভীল বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে৫ নিষাদদের বিন্ধ্য অঞ্চলের অধার্মিক বাসিন্দা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণ-সমূহে তারা বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণকায়, ক্ষুদ্রাকার, কঠিন চোয়াল, চাপা নাক, লাল চোখ ও তাম্রাভ কেশযুক্ত হিসাবে,৬ যে বর্ণনার সঙ্গে বর্তমানের অনেক উপজাতির সাদৃশ্য দেখা যায়। পদ্মপুরাণে৭ নিষাদদের বংশধর হিসাবে কিরাত, ভিল্ল, নাহলক, ভ্রমর ও পুলিন্দদের কথা বলা হয়েছে।

শবরেরা উল্লিখিত হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শিকারজীবী ট্রাইব হিসাবে, এবং অন্ধ্র, পুলিন্দ, মূতিব এবং পুণ্ড্রদের সঙ্গে তাদেরও দস্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছে।৮ বাণভট্টের হর্ষচরিতে একটি শবর যুবকের চমৎকার দৈহিক বর্ণনা আছে।৯ পুরাণসমূহের জনপদ তালিকায় শবরদের বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা বলা হয়েছে। শাওরা নামক একটি ট্রাইব আজও বাস করে পূর্বঘাট অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশে ও উড়িষ্যায়, যারা পুরাণোক্ত শবরদের বংশধর হতে পারে। যাদবপ্রকাশের

১। D. D. Kosambi, *Culture and Civilization of Ancient India*, 1965, 14 ff.

২। নিরুক্ত ৩।৮; ১০।৩; দ্রঃ বৃহদ্দেবতা ৭।৬৯।

৩। নিষাদ সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য কাঠক সংহিতা ১৮।১৩; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৫।৪।২; মৈত্রায়ণী সংহিতা ১৬।২৭; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।১১; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৬।৬।৮।

৪। ১৬, ২৭; ৩০, ৮; ৫। ১২, ৫৯, ৯৪-৯৭; ৬। বিষ্ণুপুরাণ ১, ১৩; ভাগবত পুরাণ ৪, ১৪, ৪৪ ইত্যাদি; ৭। ২, ২৭, ৪২-৪৩।

৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭, ১৮; শাংখ্যায়ন স্রৌতসূত্র ২৫, ২৬, ৬।

৯। Eng. Trans. Cowell and Thomas, 230.

অভিধানে শবরদের দাক্ষিণাত্যের বাসিন্দা বলা হয়েছে। টলেমি১ Sabarai বা শবরদের উল্লেখ করেছেন বিন্ধ্যের উত্তরে গঙ্গাভিমুখী অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে, অর্থাৎ বর্তমানে যে রাস্তাটি রেওয়া থেকে মির্জাপুর গেছে তারই আশপাশে।

শবরদের মত পুলিন্দরাও দাক্ষিণাত্যের শিকারজীবী ট্রাইব ছিল।২ টলেমি পুলিন্দদের (Poulindai) কাঁচা মাংস ও বন্যফলভোজী ট্রাইব হিসাবে উল্লেখ করেছেন।৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্র এবং অপরাপর ট্রাইবদের সঙ্গে পুলিন্দরাও উল্লিখিত হয়েছে, যা আমরা আগে দেখেছি। অশোকের লিপিতেও পুলিন্দদের উল্লেখ আছে। বৃহৎসংহিতায়৪ পুলিন্দদের সুস্পষ্টভাবে ট্রাইব বা গণ বলা হয়েছে। লেখমালাসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় পুলিন্দদের অনেকগুলি শাখা ছিল—একটি পশ্চিমা শাখা, একটি হিমালয় অঞ্চলীয় শাখা যা কিরাত ও তঙ্গনদের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং একটি দক্ষিণীশাখা।৫ কথাসরিৎসাগর৬ থেকে জানা যায় যে পুলিন্দরা কোশাম্বী থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত অঞ্চলে বাস করত। বৌদ্ধ-সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, যে কোন শিকারজীবী ট্রাইবকেই পুলিন্দ বলা চলত। এমন কি সিংহলের বেন্দদেরও পুলিন্দ বলা হয়েছে।৭

কিরাত নামটিও একটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হত। পুরাণসমূহের জনপদ-তালিকায় কিরাতদের উত্তরাপথবাসী এবং পর্বতাশ্রয়ী বা হিমালয় অঞ্চলের বাসিন্দা বলা হয়েছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় তাদের হিমালয়ের অধিবাসী বলা হয়েছে।৮ পেরিপ্লাস গ্রন্থে কিরাতদের (Kirrhadae) বন্য, খর্বনাসা, অশ্বমুখাকৃতি এবং লম্বামুখযুক্ত (পুরাণ বর্ণিত অশ্বমুখ ও দীর্ঘাস্য) কাঁচা মাংসভোজী ট্রাইব বলা হয়েছে যারা বাস করত Dosarene অর্থাৎ পুরী-কটক অঞ্চলে।৯ টলেমিও কিরাতদের উল্লেখ করেছেন গঙ্গার উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে।১০ নিষাদ, শবর, পুলিন্দ ও কিরাত ছাড়া অন্ধ্র, পুণ্ড্র প্রভৃতি অসংখ্য ট্রাইবের উল্লেখ প্রাচীন রচনাসমূহে পাওয়া যায়।

উপরে যা বলা হল তা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয় যে নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, কিরাত প্রভৃতি নামের দ্বারা ব্যাপকভাবে শিকারজীবী ট্রাইবদের বোঝাত। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্য থেকে এই সব ট্রাইবদের ধর্ম সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে তারা মূলত মাতৃদেবীর উপাসক ছিল। দেবীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে হরিবংশে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তিনি শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিতা হন (শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব-পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা)১১ মহাভারতের দুর্গাস্তোত্রে১২

১। ৭, ১, ৮০।

২। মহাভারত ১২, ২০৭, ৪২; মৎস্যপুরাণ ১১৪, ৪৬-৪৮; বায়ুপুরাণ ৪৫, ৪৮। ৩। ৬, ১, ৬৪।

৪। ৪, ২২; ৫, ৩৯, ৭৭-৭৮; ৯, ১৭, ২৯, ৪০; ১৬, ২, ৩৩।

৫। *Epigraphia Indica,* I. 334 ff; IV. 40 ff.

৬। ৪, ২২।

৭। G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names,* 1937-38, II. 241.

৮। ৩০, ১৬; দ্রঃ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩, ৪, ১২, ১।

৯। *Periplus of the Erythrean Sea,* ed. Schoff, Sec. LXII.

১০। ৭, ২, ২। ১১। হরিবংশ ৫৮ অ। ১২। ৪, ৬।

দেবীকে বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলের নিবাসিনী বলা হয়েছে, শুধু তাই নয় তিনি মদ্য-মাংস-পশু-প্রিয়া রূপে কল্পিতা হয়েছেন যা থেকে স্পষ্টই সে যুগে উপজাতীয় শিকারজীবী মানুষদের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। মহাভারতে কিরাত-পর্বাধ্যায়ে শিব ও দেবী যথাক্রমে কিরাত ও কিরাতিনীর ছদ্মবেশেই অর্জুনের সামনে হাজির হয়েছিলেন। বরাহপুরাণে১ দেবীকে বলা হয়েছে কিরাতিনী বা কিরাত নারী। বাক্‌পতির গৌড়বহো নামক প্রাকৃত কাব্যে২ দেবীকে শবরী বলা হয়েছে। বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী আদিতে বৃহৎসংহিতা কথিত পর্ণশবর ট্রাইবের দেবী ছিলেন। দুর্গাপূজার একটি প্রচলিত অঙ্গ হচ্ছে শাবরোৎসব বা শবরদের উৎসব, যা অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া দশমীর দিন। জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থে এই শাবরোৎসবের বিশদ বর্ণনা আছে। হৈ-হল্লা, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, যৌনমূলক ভাবভঙ্গী এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে তা অবলুপ্ত হলেও শাবরোৎসব দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য এই লেখকের হয়েছে। এখনও কোন কোন গ্রামাঞ্চলের দুর্গাপূজায় এই বৈশিষ্ট্যটি টিঁকে আছে। বাক্‌পতির পূর্বোক্ত গ্রন্থে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে কালী অথবা পার্বতীর সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই দেবী কোল ও শবরদের দ্বারা পূজিতা এবং এঁর সামনে নরবলি দেওয়া হয়।৩ বাণভট্টের কাদম্বরীতে দেবীর সম্মুখে নরবলি দিয়ে শবরদের পূজাপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।৪ শবরদের এই দেবীর সঙ্গে পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ মেলে হর্ষচরিতে। সুবন্ধুর বাসবদত্তায় শবরদের উপাসিতা রক্ত-পিপাসু দেবী কাত্যায়নী বা ভগবতীর উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতীমাধবেও এই ধরনের দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগরের একটি কাহিনী থেকে জানা যায় যে জীমূতবাহনকে একদল ডাকাত ধরে নিয়ে একটি শবর পল্লীতে হাজির হয় এবং তাদের উপাস্যা দেবীর সম্মুখে তাঁকে বলি দেবার আয়োজন করে।৫

শবর অর্থাৎ প্রাচীন শিকারজীবী ট্রাইবদের ধর্মবিশ্বাসের যে নিদর্শন পাওয়া গেল তার দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। একটি হচ্ছে তাদের ধর্মের কেন্দ্র-বিন্দু হচ্ছেন মাতৃদেবী এবং অপরটি হচ্ছে এই দেবীর পূজার প্রধানতম উপকরণ হচ্ছে বলিদান, এবং সেটা নরবলি হলেই ভাল হয়। তাদের বর্তমান বংশধরদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও এই দুটি বৈশিষ্ট্য প্রকট। আসামের একটি উপজাতীয় ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গেট লিখেছেনঃ

The religion of the Chutiyas was a curious one. They worshipped various forms of Kali, with the aid not of Brahmanas but of their tribal priests or Deoris. The favourite form in which they worshipped this deity was that of Kesai Khati 'the eater of raw flesh', to whom human sacrifices were offered. After their subjugation by the Ahoms, the Deoris were permitted to continue their ghastly rites; but they were usually given, for the purpose,

---

১। ২৮, ৩৪। ২। শ্লোক ৩০৫। ৩। শ্লোক ২৮৫-৩৪৭।
৪। পূর্বভাগ/কথামুখ।
৫। C. H. Tawney, *Ocean of Stories,* 1890, II. 22.

criminals who had been sentenced to capital punishment. If none were available, victims were taken from a particular clan, which in return was accorded certain previleges. The person selected was fed sumptuously until he was plump to suit the supposed taste of the goddess, and he was then decapitated at the copper temple at Sadia, or at some other shrine of the tribe. Human sacrifices were also formerly offered by the Tipperas, Kacharis, Koches, Jaintias and other Assam tribes.১

আসামের বিখ্যাতা দেবী কামাখ্যাও পরম রক্তপিপাসু। আদিতে ইনি ছিলেন খাসি উপজাতির মাতৃদেবী কা-মেখা। পরে তিনি কামরূপ বা আসামের জাতীয় দেবীতে এবং আরও পরে তান্ত্রিক দেবী হিসাবে সর্বভারতে প্রসিদ্ধা হয়ে ওঠেন। কামাখ্যার কোন মূর্তি নেই, তিনি যোনি-রূপে পূজিতা, প্রস্তর নির্মিত একটি যোনি তাঁর প্রতীক। এই দেবী নির্দিষ্ট সময়ে রজঃস্বলা হন এবং সেই রজঃ যা বর্তমানে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়, পরম পবিত্র জীবদায়িনী শক্তি হিসাবে ভক্তগণের নিকট বিবেচিত। এই দেবীর উদ্দেশে নরবলি দান প্রসঙ্গে গেট্ লিখেছেন ঃ

When the new temple of Kamakhya was opened, the occasion was celebrated by the immolation of no less than a hundred and forty men, whose heads were offered to the goddess on salvers made of copper. According to *Haft Iqlim* there was in Kamarupa a class of persons called *bhogis* who were voluntary victims. From the time when they announced that the goddess had called them, they were treated as privileged persons ; they were allowed to do whatever they liked, and every woman was at their command ; but when the annual festival came round, they were killed. ২

খাসি উপজাতির ধর্মবিশ্বাসে মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লায়াল বলেছেন ঃ

In the veneration of ancestors, which is the foundation of tribal piety, the primal ancestress (Ka Iawbei) and her brother are the only person regarded. The flat memorial stones set up to perpetuate the memory of the dead are called after the woman who represents the clan (maw Kynthei), and the standing stones ranged behind are dedicated to the male kinsmen on the mother's side. The powers of sickness and death are all female, and these are most frequently worshipped. The two

১। E. A. Gait, *History of Assam*, 1906, 42.
২। *ibid* 56.

protectors of the household are goddesses...Priestesses assist at all sacrifies, and the male officiants are only their deputies.১

গারোদের ধর্মেও অনুরূপ মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয় আছে২, মণিপুরীদের মধ্যেও তাই।৩ আসামের অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে ভূমিদেবী ও তাঁর প্রণয়ীর পূজা বর্তমান। উড়িষ্যার উপজাতীয় দেবীরা ঠাকুরাণী বা গ্রামদেবতা নামে পরিচিত। এবং তাঁরা প্রত্যেকেই রক্তপিপাসু, যাঁদের মধ্যে আবার বিখ্যাত হচ্ছেন গঞ্জাম জেলার অরুবা, বাবুরি ও ভোণ্ডারিদের ঠাকুরাণীরা। কেওনঝরের ভুনিয়া, বেন্দকর বা শবর প্রভৃতি উপজাতিদের ঠাকুরাণীরা আগে নরবলি গ্রহণ করিতেন। উড়িষ্যার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামদেবতাই হচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন নামের ঠাকুরাণী, এবং প্রত্যেকেই কোন-না-কোন উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত।৪

বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের উপজাতিরা আজকাল হিন্দুঘেঁষা হয়ে পড়েছে, ফলে তাদের পুরাতন মাতৃদেবীরা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু নাম পেয়েছেন। উত্তর ভারতের আহিরগণের মাতৃদেবী সচরাচর দেবী নামেই পরিচিত, যাঁর প্রেমিক সর্বত্র শিব। ওঁরাওদের সর্না-বুড়ি বিখ্যাত দেবী। তাছাড়া, তাদের আলাদা ভূমিদেবীও আছেন, যিনি ধর্মদেবের স্ত্রী। শিকারের দেবী হিসাবে তারা চণ্ডা বা চণ্ডীর পূজাও করে। সিংভূম ও লোহারডাগার ভুঁইয়াদের ঠাকুরাণী-মা বর্তমানে দুর্গা বা কালী হিসাবে পরিচিত। বেদিয়াদের মাতৃদেবী, দেবী, কালী, জ্বালামুখী প্রভৃতি নামে পূজিতা। আগারিয়াদের লোহাসুর দেবী কামারের চুল্লীর অধিষ্ঠাত্রী। পালামৌ জেলার কারোয়ারদের দেবীর নাম চণ্ডা বা চন্দা যিনি বিহার ও উত্তর-প্রদেশের নানাস্থানে ধরতি (ধরিত্রী), পুর্গাহৈলি বা ডাকিনী, জ্বালামুখী, অঙ্গারমতী প্রভৃতি নামে পূজিতা হন। ছোটনাগপুরের খারোয়ারদের দেবীর নাম মুচক রাণী। হাজারিবাগের বিরহোররা জঙ্গলের দেবী বনহি, পৃথিবী দেবী লুগু, বুঢ়িয়া-মাই, দুধা-মাই প্রভৃতির পূজা করে। বিহার বা উত্তরপ্রদেশের শাওরা বা শবরদের মধ্যে শীতলা-মাই ও বনসুরি দেবী জনপ্রিয়। মুণ্ডাদের মধ্যে বহু নামের দেবী আছেন, যেমন—জহির-এরা, দেশাউলি, ঝকরা-বুড়ি প্রভৃতি। মুসাহরদের মধ্যে কালী ও বনস্পতির কদর বেশি, শেষোক্ত দেবী বনের অধিষ্ঠাত্রী এবং গনসাম বা বনসগোপালের প্রেমিকা। ছোটনাগপুরের কুরেরা নাগ-ভুইয়ান বা নাগিনী-মাতার পূজা করে। বিহার ও উত্তর-প্রদেশের কালোয়াররা কালী, দুর্গা, রৎমা প্রভৃতির পূজা করে। মাঝোয়ারদের দেবীর নাম দেওহারিন, তারা নাগিন নামক সর্পদেবীর পূজা করে। মাল, মাল-পাহাড়ী প্রভৃতির মধ্যে মনসার ব্যাপক প্রভাব আছে। মধ্যপ্রদেশের শবরদের প্রধান দেবী ভবানী। বিন্ধ্যের উত্তরাঞ্চলের সানসিদের দেবীরা কালী, জ্বালামুখী নামে প্রসিদ্ধ। মাহারদের দেবীর নাম আই-ভবানী, প্রত্যেক ঘরে ঘরে যাঁর মূর্তি থাকে। বসন্তের দেবীরা নানা নামে পূজিতা। গোন্দদের মধ্যে তিনি দন্তেশ্বরী। তাঁর অপরাপর নাম মাতা, দেবী, শীতলা, পার্বতী, বজর, দিদিঠাকরুণ প্রভৃতি। ভারতের নানাস্থানে ছড়ানো চামারদের

১। Lyall, intro. to P. R. T. Gurdon's, *The Khasis*, 1907, XXIII.

২। A Playfair, *The Garos*, 1909, 80 ff.

৩। E. T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, 1872, 50.

৪। E. Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, 1909, I. 60, 180, 230, 264; II. 108; J. K. Das, *Tribes of Orissa*, 1972, *passim*.

প্রধানা দেবী ধরতি মাতা বা ধরিত্রী। ভীলদের দেবীদের সাধারণ নাম মাতা। রাজস্থানের উপজাতীয় দেবীরা সচরাচর মামা দেবী, অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী, মাতাজননী, আশাপূর্ণা প্রভৃতি হিন্দু নামে পরিচিতা। সবচেয়ে প্রভাবশালী হচ্ছেন শস্যদেবী গৌরী। পশ্চিম ভারতের তুতুরিয়া-মা, কচ্ছের বহুচারজী, পাঞ্জাব, উত্তর-গুজরাত ও পশ্চিম রাজস্থানের শীতলা ও ভবানী প্রভৃতির নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।১

দক্ষিণভারতের উপজাতীয় দেবীদের সংখ্যাও অজস্র, এবং অধিকাংশেরই নামের শেষে মাতৃত্ববাচক আম্মা শব্দটি যুক্ত। এইসব দেবীরা কোন বৃহৎ প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক নন, ছোট-খাট গ্রাম্য ব্যাপার নিয়ে এঁদের কারবার, যেমন কৃষিকাজ, পশুরোগ, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি। একথা উত্তর ভারতের ক্ষেত্রেও সত্য। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল দেবীরা প্রায় সকলেই পশুবলি সহকারে পূজিতা হন। তৃতীয়তঃ, পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ নন, নীচজাতীয়। চতুর্থতঃ, যেটা বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতেরই ব্যাপার, তিন-চার মাইল অন্তর অন্তর একই দেবীর নাম বদলায়। পঞ্চমতঃ, এঁরা অবিমিশ্র হিতকারী নন অবিমিশ্র সর্বনাশীও নন। ষষ্ঠতঃ, এঁদের সুনির্দিষ্ট মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম, সাধারণতঃ কোন স্থানে, গাছের তলায়, চৌরাস্তার মোড়ে, এঁদের পূজা হয়। কোন পাকাপাকি মূর্তিও এঁদের নেই, তবে অনেক সময় কাঠ বা মাটির কাল্পনিক মূর্তি গড়া হয়, কখনও কখনও আকারহীন পাথর দিয়েই দেবতার কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তাতে মোটামুটি ভারতের উপজাতীয় ও গ্রাম্য জীবনের ধর্ম ব্যবস্থার একটা আভাস পাওয়া গেল মাত্র। এখানে দেবীপ্রাধান্য থাকলেও পুরুষ দেবতাদের কিছু ভূমিকা আছে। উপজাতীয় ও গ্রাম্য দেবীদের অধিকাংশ ভূমি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিতা। ভারতের সর্বত্রই পৃথিবীকে দেবী হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থা রাখা হয়। ওঁরাও চাষীরা চাষের আগে মাতা পৃথিবীর নিকট মদ্য উৎসর্গ করে, এবং তাঁকে উর্বর করার জন্য মেয়েরা মাটি চাপড়ায়।২ হোসঙ্গবাদ অঞ্চলে বীজবপন হয়ে গেলে ভূমিদেবী মচন্দ্রীর উদ্দেশে কৃত্রিম হলকর্ষণের মহড়া দেয়, এবং তাঁর পূজার উপকরণগুলি যত্নের সঙ্গে রাখে আগামী বছরের ভালো ফসলের আশায়। পূর্ব পাঞ্জাবে ভূমিদেবী শাওদ-মাতা রূপে পূজিতা হন। মির্জাপুরের খারোয়াররা বীজবপনের সময় শস্য-দেবী হরিয়ারীর নামে অনুষ্ঠান করে। ভূমিদেবীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য খন্দেরা পশুবলি ও নরবলি দেয়।৩

ভূমিদেবীর সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বৃষ্টির জাদু অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যেও দেখা যায়। ভারতের বহু স্থানে অনাবৃষ্টি হলে মেয়েরা নগ্ন হয়ে বৃষ্টিকে আহ্বান করে। দুজন মেয়ে লাঙ্গলে পশুর ভূমিকায় অভিনয় করে, তৃতীয়জন লাঙ্গল চালায়, এবং এইভাবে লাঙ্গল দেবার একটা অনুকরণ করা হয়। উইলিয়ম ক্রুক ১৮৭৩-এর গোরখপুর দুর্ভিক্ষের সময় এরকম অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন।৪ ২৪শে জুলাই

১। N. N. Bhattacharyya, *Indian Mother Goddess,* 1970, 56-61.

২। S. C. Roy, *Oraons of Chotanagpur,* 1915, 142.

৩। N. N. Bhattacharyya, *op. cit.* 25-27.

৪। W. Crooke, *Popular Religion and Folklore in Northern India,* 1896, 69.

১৮৯২-এ এই রকম একটি ঘটনার বিবরণ চুনার থেকে পাওয়া গিয়েছিল।১ ৩০শে জুলাই ১৯৬৩-তে হুবহু একই অনুষ্ঠান করা হয় লক্ষ্মৌতে, যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সন্তান উৎপাদনের জন্য নারীর যেমন শুক্রের প্রয়োজন, ফসলের উৎপাদনের জন্য পৃথিবীরও সেইরকম জলের প্রয়োজন, তাই এই নগ্নতার অনুষ্ঠান। ফ্রেজার লিখেছেন ঃ

Such attempts are by no means confined, as the cultivated reader might imagine, to the naked inhabitants of those sultry lands like Central Australia and some parts of Eastern or Southern Africa where for months together the pitiless sun beats down out of a blue and cloudless sky on the parched and gaping earth. They are, or used to be common enough, among outwardly civilized folk in the moist climate of Europe.২

রাজস্থানে ভূমি বা শস্যদেবী হিসাবে গৌরীর পুজা করা হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে দেবী ও তাঁর স্বামী শিবের দুটি মাটির মূর্তি তৈরি করা হয়। পুজার স্থানে একটি ছোট মাটির খাদ তৈরি করা হয় এবং তাতে যব প্রভৃতি বপন করা হয়।৩ দেবতার সামনে এই রকম নকল কৃষিক্ষেত্র তৈরি করার রীতি (বাংলাদেশের ইতুপুজা স্মর্তব্য) পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচলিত আছে। ফ্রেজার এই নকল কৃষিক্ষেত্রের নাম দিয়েছেন Garden of Adonis। ওঁরাও ও মুণ্ডাদের মধ্যে কৃষির শুরুতে মেয়েরা এরকম নকল কৃষিক্ষেত্র রচনা করে।৪ দক্ষিণ ভারতে আবার এই জিনিস করা হয় বিবাহসভায়।৫ উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিমালয়ান্তর্গত জেলসমূহে শিবপার্বতীর পুজার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গই হচ্ছে এই আদোনিসের বাগান।৬ মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরের বিখ্যাত পদ্মাবতীর মন্দিরে নবরাত্র উৎসবে নকল কৃষিক্ষেত্র রচনা করা হয়।৭ অনুরূপ অনুষ্ঠান শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে উত্তর ভারতের বহু স্থানেই করা হয়।

কৃষিমূলক এইসব অনুষ্ঠান ছাড়াও, যৌনধর্মী কিছু কিছু অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আজও প্রচলিত আছে। মণিপুরের নাগাদের মধ্যে বীজবপন ও ফলোদ্গমের সময় একটি উৎসব হয়, যেখানে পুরুষ ও নারীরা অশ্লীল আচরণ করে। তারা মনে করে এগুলি একজাতীয় তুক্ যা ফসলকে রক্ষা করবে।৮ ছোটনাগপুরের হো উপজাতিরা জানুয়ারী মাসে একটি বিরাট উৎসব করে যেখানে ঃ

When the granaries are full of grain, and the people, to use their own expression, full of devilry. They have a strange

---

১। *North Indian Notes and Queries* I. 210.

২। J. G. Frazer, *The Golden Bough,* ab, 78.

৩। J. Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan,* ed. Crooke 1920, I. 570 ff.

৪। E. T. Dalton, *op. cit.* 259.

৫। *Indian Antiquary,* XXV. 144.

৬। E. Atkinson, *Himalayan Districts of the North Western Provinces of India,* 1884, II. 870.

৭। *Bombay Gazetteer,* XX. 454.

৮। T. C. Hodson, *The Naga Tribes of Manipur,* 1911, 168.

notion that at this period, men and women are so overcharged with vicious propensities, that it is absolutely necessary for the safety of the person to let off the steam by allowing for a time full vents to the passions. The festival therefore becomes a Saturnalia, during which servants forget their duty to their masters, children their reverence for parents, men their respect for women, and women all notions of modesty, delicacy and gentleness. ১

উড়িষ্যার ভুঁইয়াদের মধ্যে একটি উৎসব আছে যার নাম মাঘ পোরাই, যাতে মদ্যপান ও যৌনমূলক আচরণ অবাধে চলে। এই উৎসব চলে তিন দিন ধরেঃ

During which all respect for blood relation are set at nought, and even sisters and brothers make indecent jokes regarding each other. ২

অনুরূপভাবে আসামের বিহু উৎসবঃ

Has always been claimed by the female sex as a period of considerable licence ; and the exercise of their freedom does not seem to be attended with any stain, blemish or loss of reputation.৩

উইলিয়ম ক্রুক দেখিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত হোলি উৎসব আসলে কৃষিমূলক জাদুবিশ্বাসের অভিব্যক্তি।৪ এছাড়াও এই উৎসবের সঙ্গে প্রাচীন যুগের মৃত্যু ও নবজীবনের ধারণাও সম্পর্কিত, যা ফসলের বার্ষিক জন্ম-মৃত্যুর ধারণারই অভিব্যক্তি ও পরিব্যাপ্তি।৫ যৌনাচার একদা এই উৎসবের অঙ্গ ছিল, যার নিদর্শন ও অনুকরণ আজও বর্তমান।

Most of the observers of the feast imagine that the object of their worship is Cupid and that the mock funs they observe are on account of Kama the god of love. ৬

It is the regular Saturnalia of India. Persons of great responsibility, without regard to rank or age, are not ashamed to take part in the orgies which mark the season of the year.৭

কৃষিমূলক যৌন অনুষ্ঠান জয়পুরের পাঙ্গা, নীলগিরির কোটা প্রভৃতি বহু

১। E. T. Dalton, *op. cit.* 196.

২। Macmillan in *Calcutta Review*, CII. 188.

৩। J. Butler, *Travels and Adventures in the Provinces of Assam*, 1885, 226.

৪। W. Crooke in *Folklore*, XXV. 183.

৫। N. N. Bhattacharyya, *Ancient Indian Rituals and Their Social Contents*, 1975, 114-129.

৬। S. M. Natesa Sastri, *Hindu Feasts and Ceremonials*, 1903, 44 ff.

৭। E. Rousselet, *India and its Native Princes*, 1876, 173.

ট্রাইবের মধ্যেও বর্তমান, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। তাই ব্রিফল্ট লিখেছেন ঃ

The belief that sexual act assists the promotion of an abundant harvest of the earth's fruits, and is indispensable to secure it is universal in the lower phases of culture.১

ফ্রেজারের মতে ঃ

At the present day it might perhaps be vain to look in civilized Europe for customs of this sort. But ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of sexes as a means to ensure the fruitfulness of the earth; and some rites which are still, or were till lately, kept up in Europe can be reasonably explained only as stunted relics of a similar practice....It was an important social duty in default of which it was not lawful to sow the seeds. ২

৭। ভাষাতত্ত্বের সাক্ষ্য

নৃতত্ত্ব ছাড়াও ভাষাতত্ত্ব পুরাতন যুগের ধর্মব্যবস্থার খোঁজখবর পেতে আমাদের সাহায্য করে। ভারতের জনসমাজ মোটামুটি চারটি ভাষা-পরিবারে বিভক্ত—অষ্ট্রিক, চৈনিক-তিব্বতী, দ্রাবিড় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য। অষ্ট্রিক ভাষা-পরিবারের প্রভাব কোল বা মুণ্ডা, নিকোবরীয় প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে টিঁকে আছে, আমাদের বাংলাভাষারও অনেক শব্দের উৎস এখানে। এদেশের আদি অষ্ট্রিক-ভাষীরা মূলত খাদ্য সংগ্রাহক ছিল, তবে তাদের কয়েকটি অগ্রসর গোষ্ঠী কৃষির কলাকৌশল রপ্ত করেছিল। তাদের ব্যবহৃত শব্দ লকুট, লগুড়, লিঙ্গ, যা দিয়ে পুরুষাঙ্গ ও খননের খুরপি দুই-ই বোঝাত, পরবর্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষায় গৃহীত হয়েছিল।৩ তাদের দেবীবাচক শব্দ 'মাতৃকা' (পলিনেশীয় মাতারিকি) এখানে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। অষ্ট্রিকভাষীরা চন্দ্রকে দেবী হিসাবে পূজা করত নিন্দ-চান্দো নামের আড়ালে, যাঁর প্রেমিক ছিলেন সূর্যদেবতা সিঞ বোঙা। রাকা ও কুহু, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চাঁদ, বৈদিক সাহিত্যে দেবী হিসাবে স্থান পেয়েছেন। কৃষ্ণত্বক ও খর্বনাসা এই অষ্ট্রিকভাষীরাই সম্ভবত ভারতীয় সাহিত্য-বর্ণিত নিষাদ। চৈনিক-তিব্বতী ভাষা-পরিবারের মানুষেরা উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের হিমালয় অঞ্চলের বাসিন্দা। অর্থনৈতিক দিক্ থেকে তারাও ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক পর্যায়ের, তবে তাদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। হিমালয় অঞ্চলের কিছু স্থান নাম থেকে অনুমিত হয় যে তাদের ধর্মেও মাতৃকা-পূজার একটি বিশেষ স্থান ছিল।

১। R. Briffault, *The Mothers,* 1952, III. 196.
২। J. G. Frazer, *The Golden Bough,* ab, 135-36.
৩। P. C. Bagchi, *op. cit.* 10, 14.

দ্রাবিড়ভাষীরা মূলত দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ থাকলেও, একদা উত্তর ভারতেও তাদের এলাকা ছিল। বালুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট, যা থেকে অনুমান করা হয় যে, আদিতে দ্রাবিড়ভাষীদের এলাকা ছিল অনেক ব্যাপক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দ্রাবিড়ভাষীদের আদি বাস ছিল ঈজিয়ান সাগর সন্নিহিত অঞ্চলে। সেখান থেকে তারা প্রথমে আসে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং সেখান থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের নানাস্থানে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কিত অনুমানের মত এটাও একটা নিছক অনুমান। হরপ্পা সংস্কৃতির অধিবাসীরা দ্রাবিড়ভাষী ছিল এই রকম একটা অনুমান একদা জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু এরও কোন ভিত্তি নেই। প্রাচীন তামিল শব্দসমূহের সাক্ষ্য থেকে আদি দ্রাবিড়ভাষীদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে তারা মূলত কৃষিজীবী ছিল (এর=লাঙ্গল, বেলন্মাই=কৃষি), বাস করত গ্রামে (পড়্ড়ি) অথবা শহরে (ঊর, পেট্টাই), যা কোন দেশের জেলার (নটু) অংশ ছিল, যেখানে রাজা (কো, বেন্তন, মান্নান) রাজত্ব করতেন, যিনি বাস করতেন প্রাসাদে (কোট্টই অরণ) এবং আইন ও লোকাচার (কট্টড়ই, পজক্কম্‌) রক্ষা করতেন। সৈন্যরা ধনুক (বিড়), তীর (অম্পু), বর্শা (বেড়) এবং তরবারি (বাড়) নিয়ে যুদ্ধ করত, যা ধাতুর ব্যবহারের পরিচায়ক। পান্‌সি, নৌকা এমন কি জাহাজও (টোনী, ওটম, বল্লম, কপ্পল, পটবু) তাদের পরিচিত ছিল। তারা তালপাতায় (ওড়ই) লিখতে জানত এবং এইরকম তালপাতার পুঁথিও (এটু) ছিল। রাজাকে বলা হত কো, এবং দেবতাকেও ওই একই নামে সম্বোধন করা হত যাঁর উদ্দেশে তারা মন্দির (কোইল, কোবিল) নির্মাণ করত। কাপড় বোনা (নূল, নে) এবং রং করা (নিরম) প্রচলিত ছিল।১

একসময় মনে করা হত, হিন্দুধর্মে দ্রাবিড় অথবা প্রাক্‌-বৈদিক যা কিছু অবদান, তার সবটাই নগণ্য ও কুসংস্কারমূলক। বর্তমানে এ ধারণার অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে, এবং হিন্দুধর্মের উপর প্রাক্‌-বৈদিক উপাদানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। মন্দির নির্মাণ, সাকার দেবতার কল্পনা, শিব ও দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ধর্মীয় ও দার্শনিক বিশ্বাস, লিঙ্গ ও যোনি পূজা, তীর্থযাত্রা, যোগাভ্যাস, কর্মবাদ ও জন্মান্তরের ধারণা, বৈদিক যজ্ঞের বদলে ভক্তিমূলক পূজা-পদ্ধতি, উর্বরতামূলক ধর্মবিশ্বাস, মূর্তিপূজা প্রভৃতির উৎস প্রাক্‌-বৈদিক বলে স্বীকৃত হয়েছে।২ বহুকাল পূর্বে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন উমা শব্দটির উদ্ভব সংস্কৃত থেকে হয়নি, এর উৎস মা, যে নামের আড়ালে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের মানুষেরা প্রাচীন মাতৃদেবীর পূজা করত। মা অথবা কুবিলি (সিবিলী) ও অ্যাটিস, কিংবা হেপিট ও তেসুবের সুপ্রাচীন পূজাই (প্রথমোক্তের বাহন সিংহ, এবং শেষোক্তের ষাঁড়) হিন্দু ভারতে উমা ও শিবপূজার

১। Bishop Caldwell, *Comparative Grammar of Dravidian Language*, 1913, 113.

২। C. Kunhan Raja in *History of Philosophy: Eastern and Western*, ed. S. Radhakrishnan, I. 39; S. K. Chatterji, *Indo-Aryan and Hindi*, 1942, 31 ff.

জন্ম দিয়েছে।১ অবশ্য এগুলি অনুমান, তবে একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

The patriarchal social organisation of the Aryans presented a contrast to the matriarchal ones of the Dravidians. The great Mother Goddess of a matriarchal society who was brought into India by the Dravidians from the Asia Minor and the Eastern Mediterranean Islands, was also conceived as an all powerful force which was identical with nature itself. In front of this puissant and eternally active *Sakti* or power that was the Great Mother of the universe her male counterpart was virtually an ineffective being. This idea also developed in India and in the Tantras one of the basic concepts is that of the Sakti or the wife or the Female Counterpart of a God. The God was a mere male and all his power lay in his female form who was looked upon as his wife, repository or mainspring of his *Sakti* or power. ২

৮। হরপ্পা সংস্কৃতি

প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় ভারতের ধর্মব্যবস্থা কি রকম ছিল সে বিষয়ে বিশেষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও, ভারতের উপজাতীয় ধর্মব্যবস্থার যে পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তা থেকে কিছুটা আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে। নবাশ্মীয় অর্থনীতির স্ববিরোধ দেখাতে গিয়ে চাইল্ড্ লিখেছেন ঃ

The worst contradictions of the Neolithic economy were transcended when farmers were persuaded or compelled to wring from the soil a surplus above their domestic requirements, and when the surplus was made available to support the new economic classes not directly engaged in producing their own food.৩

এই সামাজিক উদ্বৃত্ত খাদ্য-উৎপাদনের দায়মুক্ত একটি নূতন নাগরিক শ্রেণীর প্রতিপালক হয়েছিল, যে শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল কারিগর, পুরোহিত, কর্মচারী, বণিক প্রভৃতি। এই নাগরিক বিপ্লব গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে তামা ও ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের পর। ধাতব হাতিয়ারের ব্যবহার একটি নূতন কারিগরশ্রেণীর সৃষ্টি করে, বিশুদ্ধ নবাশ্মীয় সংস্কৃতিতে যাদের কোন স্থান ছিল না। জাদুকর বা পুরোহিতদের পর এই শ্রেণীই প্রথম খাদ্য-উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়। তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগ, অথবা তাম্রশ্মীয় যুগ নাইল, ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস এবং সিন্ধুর উর্বর উপত্যকায় গড়ে ওঠে, নদীতীরবর্তী কয়েকটি গ্রামের নগরে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে।

১। *Modern Review*, 1924, 679; H. C. Raychaudhuri, *Studies in Indian Antiquities*, 1959, 200-04.

২। *Journal of the Asiatic Society*, 1959, I. 107-08.

৩। V. G. Childe, *What Happened in History*, 1959, 69.

ভারতবর্ষেও প্রাক্-হরপ্পা কয়েকটি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সংস্কৃতির মধ্যে, ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে, বালুচিস্তানের অন্তর্গত ঝোব ও কুল্লি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা এই দুটি স্থান থেকেই ভারতীয় ধর্মের সর্বপ্রাচীন প্রত্যক্ষ নিদর্শন, কয়েকটি মাতৃকামূর্তি পাওয়া গেছে। কুল্লি থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি ছোট ছোট স্তম্ভের উপর কোমর পর্যন্ত বর্তমান, বাহুদ্বয় বক্র এবং হস্ত কটিবদ্ধ, বক্ষঃদেশ দৃশ্যমান, গোলাকৃতি চক্ষু যা ছোট পাথর দিয়ে তৈরি, দেহে কড়ির মত ছাঁদের অলঙ্কার, হাতে বালা এবং মাথার চুল সুবিন্যস্ত। ঝোব থেকে পাওয়া মূর্তিকাগুলিতেও অলঙ্কারের বাহুল্য, এগুলি দীর্ঘ ও পক্ষী-চঞ্চুর মত বক্র নাসাযুক্ত, আবৃত মস্তক, উন্নত বক্ষঃদেশ, গোলাকৃতি ও ভিতরে ঢোকানো চক্ষু এবং ভয়াবহ মুখশ্রী বিশিষ্ট। ঝোব নদীর পশ্চিম তীরে মুঘল-ঘুণ্ডাই নামক স্থানে একটি বৃহদায়তন লিঙ্গ বর্তমান, এবং অপর তীরে পেরিয়ানো-ঘুণ্ডাই-এ একটি বিশালাকার যোনিও পাওয়া গেছে। এই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে এবং মূর্তিগুলিতে কড়ি-ছাঁচের অলঙ্কারের ধরন দেখে অনুমান করা হয় যে মাতৃকামূর্তিগুলির পিছনে আদিম উর্বরতামূলক বিশ্বাসসমূহ কার্যকর ছিল।[১]

ঝোব ও কুল্লি সংস্কৃতিদ্বয় বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে পরবর্তী হরপ্পা-সংস্কৃতির পূর্বসূরী হয়ে ওঠে। হরপ্পা সংস্কৃতি সিন্ধুতীরে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চান্‌হুদারো প্রভৃতি স্থানে গড়ে ওঠে নাগরিক বসতিরূপে, যা পূর্বতন পরস্পর বিচ্ছিন্ন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সংস্কৃতিগুলির চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক। হরপ্পা সংস্কৃতির অবশেষ পাওয়া গেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, মাক্‌রান উপকূল থেকে কাথিয়াবাড় এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত, এবং যা দর্শককে অভিভূত করে তা হচ্ছে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের ঐক্য ও সাদৃশ্য। অনুমান করা হয় যে এই বিরাট অঞ্চল কোন কেন্দ্রীয় শাসনাধীন ছিল। হরপ্পার সমাজ নিঃসন্দেহে শ্রেণীসমাজ ছিল, গৃহাদির গঠনগত বৈশিষ্ট্য থেকে যা বুঝতে অসুবিধা নেই। বিশালাকার আরামদায়ক গৃহগুলির সঙ্গে শ্রমিকদের লম্বা ব্যারাক বা ধাওড়াগুলির তুলনা করলে এটা সহজেই বোঝা যায়। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই নাগরিক অধিবাসীদের খাদ্যের যোগান আসত সন্নিহিত অসংখ্য গ্রাম থেকে।

হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারোর মত শহরের লোকসংখ্যা ছিল মিশ্র প্রকৃতির। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলসমূহ থেকে অসংখ্য মানুষ এখানে এসেছিল রুজি-রোজগারের তাগিদে। বুঝতে অসুবিধা নেই তারা তাদের চিরাচরিত ধর্মীয় ধ্যানধারণা-গুলিকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, একালেও যেমন হয়। এই ধর্মীয়ধারণাগুলি মূলত কৃষিজীবী সমাজের বহুল প্রচলিত মাতৃকাদেবী সম্পর্কিত। হরপ্পা সংস্কৃতির জাতীয় ধর্মে মূলত তারই প্রতিফলন ঘটেছে। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত মাতৃকামূর্তির অধিকাংশই লাল রং মাখানো, যেমন দেখা যায় মিশর, মেসোপটেমিয়া ও মাল্টা থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির ক্ষেত্রে।[২] কিন্তু হরপ্পার মূর্তি-

---

১। M. A. Stein, *An Archaeological Tour in Waziristan and North Baluchistan*, MASI 37, 1929, 38 ff. *An Archaeological Tour in Gedrosia*, MASI 43, 1931, 37 ff.

২। G. Brunton and G. Caton-Thompson, *The Badarian Civilization*, 1928, 29.

গুলিতে কোন রং-এর প্রলেপ নেই।১ দেবীদের সকলেরই মস্তকাবরণ আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয়েছে পিছন থেকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সোজাসুজি মাথার উপর থেকেই। দেবী প্রায় উলঙ্গ, তবে কোমরের উপর জড়ানো খুব ছোট একটি আবরণ আছে। মূর্তিগুলিতে অলঙ্কারের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিগুলি কুল্লি বা ঝোব থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মত নিছক বাস্ট নয়, হাত-পা আছে, এবং বহু ও বিচিত্র ভঙ্গিমায় সেগুলিকে গড়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় শিল্পকলায় অগ্রসরতার পরিচায়ক।

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সুমের ও ব্যাবিলনের সংযোগ ছিল। হরপ্পার শীল পাওয়া গেছে উর, কিশ এবং তেল-অল-আস্‌মার থেকে যেগুলি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের। যেহেতু সুমের ও আক্কাদের সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগ প্রমাণিত, চাইল্‌ড্‌ মন্তব্য করেছেনঃ

The forgotten civilization must have made direct if undefinable contributions to the cultural tradition we inherit through Mesopotamia.২

মার্শালও হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিমের সংস্কৃতিগত বন্ধনের কথা বলেছেন। এই বন্ধনের প্রকৃত পরিচয় আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, তবে ধর্মের ক্ষেত্রে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতাগুলির সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। সুমেরীয় প্রাচীন মাতৃদেবী, যাঁর গুণাবলী পরবর্তীকালে উর্কের ননা, নিনেভের নিনা, ইরেখের ইনন্না, লাগাসের বাউ, নিপ্পুরের নিল্‌লিল্‌, আক্কাদের আনুইত, ব্যাবিলনের ৎসারপাইস্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দেবীরা আত্মস্থ করেছিলেন, হরপ্পার প্রধানা মাতৃদেবীরই অনুরূপ, যাঁর গুণাবলী অবলম্বন ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে অসংখ্য দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। উপরিউক্ত পশ্চিম-এশীয় দেবীগণ পরবর্তীকালে যত্রতত্র গমন করেছেন। যেমন দেবী ইনন্না, যিনি ননা, ননই প্রভৃতি নামে পরিচিতা, যিনি অ্যাটিসের মাতা এবং ইস্তার, আস্তার্তি, আর্তেমিস, আনাইতিস এবং আফ্রোদিতির সঙ্গে অভিন্না হিসাবে ঘোষিতা, শক ও কুষাণযুগে ভারতবর্ষে আস্তানা গেড়েছিলেন, যিনি কুলু উপত্যকা, সিরমুর ও বিলাসপুরের নয়নাদেবী, বালুচিস্তানের বিবি নানী, নৈনিতালের নৈনিদেবী প্রভৃতি নামে এদেশে পরিচিত হয়েছিলেন। ইস্তার গ্রুপের দেবীরা (ইস্তার, আস্তার্তি, আস্তারোথ, আতারগতিস ইত্যাদি) পরবর্তীকালের তান্ত্রিক তারার নাম ও কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত একটি শীলের এক পিঠে একটি নগ্ন নারীমূর্তি দেখা যায় যাঁর মাথা নীচের দিকে এবং পদযুগল উপর দিকে উত্থিত ও প্রসারিত, এবং যোনিপ্রদেশ থেকে একটি গাছের চারা নির্গত হয়েছে।৩ অনেকে মনে করেন এটি পুরাণ কথিত শাকম্ভরীদেবী কল্পনার একটি প্রাথমিক পর্যায়, যে দেবী তাঁর দেহ থেকে নির্গত উদ্ভিদের দ্বারা পৃথিবীর ক্ষুধার নিবৃত্তি করেছিলেন। শীলটির অপর পিঠে অবিন্যস্ত কেশদাম ও ভয়ে উত্তোলিত হস্ত একটি নারীমূর্তি এবং তার সামনে

১। M. S. Vats, *Excavations at Harappa*, 1950, 292.
২। V. G. Childe, *op. cit.* 129.
৩। J. Marshall, *Mohenjodaro and Indus Civilization*, 1931, I. 52.

কাস্তেজাতীয় অস্ত্রধারী একটি পুরুষমূর্তি দেখা যায়। মার্শালের মতে শীলটির অপর পিঠে অঙ্কিত ভূমিদেবীর উদ্দেশ্যে একটি নরবলিদানের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। দেবীশক্তির সঙ্গে উদ্ভিদজগতের যোগাযোগ এই একটি শীলেই সীমাবদ্ধ নেই, হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য শীলে এই সম্পর্কের নিদর্শন আছে।

মাতৃকামূর্তিসমূহ, শীল ও অনুষ্ঠানমূলক দ্রব্যসমূহের উপর অঙ্কিত দৃশ্যাবলী, প্রস্তর নির্মিত লিঙ্গ ও যোনিসমূহ, হরপ্পা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে উর্বরতা-মূলক জাদুবিশ্বাসের সুনির্দিষ্ট পরিচয় বহন করে, যা তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি ও দেবতাদের উৎস। হিন্দুধর্মে লিঙ্গ ও যোনি যথাক্রমে শিব ও দেবীর প্রতীক, যাঁদের আদিরূপের বহু নিদর্শন হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। মাথায় শিং লাগানো, এবং একটি ক্ষেত্রে পশুদের দ্বারা সমাকীর্ণ, তিনমুখ বিশিষ্ট পুরুষ দেবতার নিদর্শন পাওয়া গেছে কয়েকটি শীলের উপর, যিনি যোগাসনে উপবিষ্ট এবং যাঁকে পরবর্তীকালের শিবের আদি পর্যায়ের কোন দেবতারূপে গণ্য করা হয়।

৯। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের আদি পর্যায়

হিন্দুধর্ম ও দর্শনের কয়েকটি জীবন্ত বৈশিষ্ট্যের উৎস এই প্রাক্-বৈদিক হরপ্পা সভ্যতার ধর্মব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়, এবং এই প্রসঙ্গে আমরা তন্ত্র, সাংখ্য, যোগ এবং বর্তমান শাক্ত-ধর্মের কথা বলতে পারি। তথাকথিত আর্য বা বৈদিক ঐতিহ্যের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এগুলি প্রতিফলিত হয়নি যদিও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, মহাকাব্যদ্বয়ে এবং পুরাণে এগুলির প্রতিফলন ঘটেছে, যখন এই বিশিষ্ট প্রাক্-বৈদিক ধারাটি, যা বৃহত্তর জনসমাজের অবদমিত ধর্ম হিসাবে বর্তমান ছিল (ইংরাজীতে আরও গুছিয়ে বলা যায় suppressed religion of the masses), মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে। এই ধারাটির মূলে একটি সামাজিক মাতৃপ্রাধান্যের প্রভাব আছে। হরপ্পায় নাগরিক সভ্যতার বিকাশ, কিংবা পরবর্তী বৈদিক যুগের পশুপালননির্ভর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদিও মাতৃ-প্রাধান্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করেছিল স্বাভাবিক ঐতিহাসিক নিয়মেই, ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাতৃপ্রাধান্যের স্মারকগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে যে অসংখ্য লিঙ্গ ও যোনির নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় প্রাক্-বৈদিক কৃষিপ্রধান সমাজব্যবস্থার ধর্মীয় আদর্শের উপর উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের প্রভাব কতদূর ব্যাপক ছিল। এই জাতীয় পূজাপদ্ধতির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীকালের পশুপালননির্ভর আদি বৈদিক সমাজের কোন আস্থা ছিল না। ঋগ্বেদে তাই দেখা যায় ইন্দ্র এই শিশ্ন বা লিঙ্গ উপাসকদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন।[১]

শুধু কি তাই? পিতৃতান্ত্রিক পশুপালক বৈদিক সমাজের যে ধর্মব্যবস্থা সেখানে দেবীদের স্থান নেই বললেই হয়।[২] তবে এই সমাজেরও একটি সুপ্রাচীন অতীত ছিল, এবং সেই অতীতের স্মারক হিসাবে দুজন দেবীকে অন্তত অস্বীকার করা যায়নি। এঁরা হলেন অদিতি ও ঊষা। অদিতি হলেন দেবজননী, কিন্তু তা

১। ঋগ্বেদ ৭, ২৭, ৫; ১০, ৯৯, ৩ ইত্যাদি।
২। A. Macdonell, *Vedic Mythology*, 1897, 124.

সত্ত্বেও ঋগ্বেদে তাঁর স্থান গৌণ। কোন স্বতন্ত্র সূক্ত তাঁর নামে নেই, এমন কি তাঁর দেবজননীত্বের গৌরবও খর্ব করার চেষ্টা যথেষ্ট। উষা যদিও ২০টি স্বতন্ত্র সূক্তে উল্লিখিত হয়েছেন, এবং সমগ্র ঋগ্বেদে তাঁর উল্লেখ ৩০০ বারেরও বেশি, তথাপি তাঁর প্রতি ঋগ্বেদের কবিদের মনোভাব যে খুব সম্ভ্রমপূর্ণ সেকথা বলা যায় না। এই দেবী ইন্দ্র কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছেন, তাঁর শকট ভঙ্গ করা হয়েছে, প্রাণভয়ে তিনি বিপাশার পশ্চিমে পালিয়ে গেছেন।১

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত শীলসমূহে যৌগিক ভঙ্গীতে উপবিষ্ট দেবতার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।২ ওই একই যৌগিক ভঙ্গী কতিপয় ভাঙ্গা মূর্তিতেও পাওয়া যায়, যে প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন ঃ

The only part of the statuettes that is in fair state of preservation, the bust, is characterised by a stiff erect posture of the head, the neck and the chest, and half-shut eyes looking fixedly at the tip of the nose. This posture is not met with in the figure sculptures whether prehistoric or historic, of any people outside India; but this is very conspicuous in the images worshipped by all Indian sects including the Jainas and the Buddhists, and is known as the posture of the *yogis* or one engaged in practising concentration.৩

যোগসাধনার উৎস যে অবৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক তা অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিতেরই চোখে ধরা পড়েছে।৪ আর এই ভিন্ন উৎসের জন্যই বৈদিক মানুষেরা এই বিষয়টিকে প্রীতির চক্ষে দেখেনি। কৌষীতকি উপনিষদে৫ ইন্দ্র বলেছেন ঃ ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রং অহনং অরুন্মুখান্ যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রায়চ্ছম্, অর্থাৎ তিনি ত্বষ্টৃর তিন-মাথাওয়ালা ছেলেকে হত্যা করেছেন, যতিদের নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে ফেলেছেন। এই যতি কারা? রমাপ্রসাদ চন্দের মতে ঃ

The only possible answer to this question is that the *yatis* were not original priests of the Vedic cult like the Bhrigus and Kanvas, but of non-Vedic rites practised by the indigenous pre-Aryan population of the Indus Valley. In the legend of the slaughter of the *yatis* by Indra, we probably hear an echo of the conflict between the native priesthood and the intruding Rsis in the protohistoric period. If this interpretation of the legend is correct, it may be asked what was the religious or magico-

---

১। ঋগ্বেদ ৪, ৩০, ৮-১১; আরও দ্রষ্টব্য ২, ১৫, ৬; ১০, ৭৩, ৬; ১০, ১০৮, ৫।

২। Marshall, *op. cit.* I. 53-54; Vats, *op. cit.* I. 129-30.

৩। R. P. Chanda, *Survival of the Prehistoric Civilization of the Indus Valley*, MASI 41, 1929, 25.

৪। R. Garbe in *Encyclopaedia of Religion and Ethics* XII. 833; A. E. Gough, *Philosophy of the Upanisads*, 1882, 18; S. K. Belvalkar and R. D. Ranade, *History of Indian Philosophy*, 1927, II. 81, 405.

৫। ৩, ১।

religious practice of the *yatis*? In classical Sanskrit *yati* denotes an ascetic. The term is derived from the root *yat*, to strive, to exert oneself, and is also connected with the root *yam*, to restrain, to subdue, to control. As applied to the priest, etymologically *yati* can only mean a person engaged in religious exercise such as *tapas*, austerities and yoga. The marble statue of Mohenjo-daro with head, neck and body, quite erect and half-shut eyes fixed on the tip of the nose has the exact posture of one engaged in practising Yoga. I therefore propose to recognise in these statuettes the images of the *yatis* of the protohistoric and prehistoric Indus Valley. ১

ইন্দ্র কর্তৃক যোগী বা যতি নিধনের অনেক সংবাদ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়।২ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে তাই অনুমিত হয় যে ভারতের প্রাক্-বৈদিক ধর্ম-ব্যবস্থা মূলত মাতৃকাপূজো, তৎসংশ্লিষ্ট লিঙ্গ ও যোনি পূজা ও দার্শনিক যৌন-দ্বৈতের ধারণা, অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে পুরুষ ও স্ত্রী আদর্শের সংযোগ (অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির ধারণা) ও যোগসাধনা (যার মূল কথা মানবদেহই বিশ্বপ্রকৃতির সকল রহস্যের আধার) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এগুলির কোনটিই কোনটির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং সেই হিসাবে সামগ্রিকভাবে এগুলির দ্বারা এমন একটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল যাকে আমরা তান্ত্রিক ঐতিহ্য আখ্যা দিতে পারি। মনুস্মৃতির টীকাকার কুল্লুকভট্ট সঠিকভাবেই বলেছিলেন—শ্রুতি দ্বিবিধ, তান্ত্রিক ও বৈদিক। দ্বিতীয় ধারাটি প্রথমটিকে সহজে মেনে নিতে পারেনি, তাই দেখা যায় ঋগ্বেদের ইন্দ্র প্রাচীন মাতৃদেবীদের আক্রমণ ও ধ্বংস করেছেন, শিশ্ন-উপাসকদের নগরাদি তছনছ করেছেন, যতিদের নেকড়ের সামনে নিক্ষেপ করছেন।

জীব সৃষ্টির মূলে নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক বর্তমান, এই মূল ধারণার যে দার্শনিক ও আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি তন্ত্রে ও সাংখ্যে ঘটেছে তা প্রাক্-বৈদিক এবং বেদ-বিরোধী। সাংখ্যের যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তা হচ্ছে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা যার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে। কিন্তু সাংখ্য অনেক পূর্ববর্তী কেননা উপনিষদসমূহ ও মহাভারতে সাংখ্যের উল্লেখ আছে। বুদ্ধঘোষের মতে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করার পর সাংখ্যদর্শনের পাঠ নেন। বৌদ্ধধর্মের উপর সাংখ্যের প্রভাব আছে। বুদ্ধের সমকালীন পকুধ কচ্চায়নের মতবাদ রীতিমত সাংখ্যনির্ভর। এতেই প্রমাণিত হয় সাংখ্যদর্শন কত প্রাচীন, কিন্তু যেটা আমাদের দুর্ভাগ্য তা হচ্ছে সাংখ্যের প্রাচীনতর পর্যায়গুলিকে বোঝার উপযুক্ত রচনাগুলি বিলুপ্ত হয়েছে।

কাজেই, পরবর্তীকালের দার্শনিকদের চোখ দিয়েই আমাদের সাংখ্যকে বিচার করতে হবে। শংকরাচার্যের মতে সাংখ্য বেদ-বিরোধী, (কপিলস্য তন্ত্রস্য বেদ-বিরুদ্ধত্বং বেদানুসারিমনুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ) শুধু বেদ বিরোধীই নয়, বেদানুসারী মনু প্রভৃতিরও বিরোধী, যে কারণে সাংখ্য তাঁর প্রধান শত্রু (প্রধানমল্ল)। তাঁর

১। R. P. Chanda, *Survival*...33.

২। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩, ৩, ৭, ৩; ২, ৫, ১, ১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭, ২৮; শতপথ ব্রাহ্মণ ১, ২, ৩, ২; ১২, ৭, ১, ১; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৪, ১১, ২৮ ইত্যাদি।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের অধিকাংশই সাংখ্যদর্শন খণ্ডনে ব্যয়িত হয়েছে। জড় প্রকৃতির বিবর্তনের ফলেই বিশ্বচরাচরের উদ্ভব হয়েছে, সাংখ্যের এই বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ বেদান্তকথিত নিছক চৈতন্যময় ব্রহ্মের ধারণার আমূল বিরোধী। এটা সাংখ্যের বর্তমান চেহারা দেখেও বোঝা যায়, যদিও এদেশে দার্শনিক সাহিত্য রচিত হবার সময় থেকেই সাংখ্যকে বেদান্তের মালমশলা নিয়ে বোঝাই করে বিকৃত করা হয়েছে। রিচার্ড গার্বে এবং হারমান যাকোবি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে উপনিষদ ও মহাভারতে সাংখ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বাইরের ভেজাল প্রচুর দেওয়া হয়েছে।১ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সঠিকভাবেই লিখেছেন ঃ

It seems, however, pretty certain that Sankara's contention that the Sankhya was non-Vedic is right. The apparent references to Sankhya in *Katha* and *Svetasvatara* show that these ideas have no organic connection with the general Upanisadic scheme of thought.২

পরবর্তীকালে সাংখ্যকে সুস্পষ্টভাবেই বেদান্তে পরিণত করার প্রয়াস ঘটেছিল—গৌড়পাদ, বিজ্ঞানভিক্ষু, অনিরুদ্ধ, মহাদেব প্রভৃতি বৈদান্তিকদের দ্বারা যাঁরা নিজেদের মতলব গোপন করেননি। যুগ-যুগান্ত ধরে সাংখ্যকে নিয়ে এই টানাহ্যাঁচড়া করার কারণই হচ্ছে তার মৌলিক বেদ-বিরোধী চরিত্র, যার সম্বন্ধে গার্বে বলেছেন ঃ

Originally the Sankhya must have taken up a position of direct opposition to the doctrine of the Brahmanas, as is proved *inter alia* by its polemic against their ceremonial.৩

* * *

The origin of the Sankhya system appears in the proper light only when we understand that in those regions of India which were little influenced by Brahmanism, the first attempt had been made to explain the riddles of the world and of our existence merely by means of reason. For the Sankhya philosophy is, in its essence, not only atheistic but also inimical to Veda. All appeal to Sruti in the Sankhya texts lying before us are subsequent additions. We may altogether remove the Vedic elements grafted upon the system, and it will not in the least be affected hereby. The Sankhya philosophy had been originally, and has remained up to the present day in its real contents, un-Vedic and independent of Brahmanical tradition.৪

মূলত সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি বা প্রধান-এর দর্শন, কিন্তু এখানে পুরুষেরও একটি

১। Belvalkar and Ranade, *op. cit.* 414, 417.

২। S. N. Dasgupta in *Indian Culture*, I. 79-80.

৩। R. Garbe in *Encyclopeadia of Religion and Ethics*, XI. 189.

৪। R. Garbe, *Aniruddha's Commentary on the Original Parts of Vedantin Mahadeva's Commentary on the Sankhyasutra*, 1892, XX-XXI.

স্থান আছে, যে স্থানটি প্রচণ্ড গোলমেলে। এই পুরুষ আবার এক নয়, একাধিক। প্রকৃতিই সর্বেসর্বা, পুরুষ উদাসীন, অক্ষম ও নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র। সাংখ্যের এই পুরুষ-প্রকৃতি ধারণা, বিশেষ করে প্রকৃতি-প্রাধান্য, যে প্রকৃতি আবার জড় হয়েও সৃষ্টির মূল কারণ, এই সকল ধারণার সঙ্গে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধারণা, যার উদ্ভব উপনিষদে এবং পরিণতি বেদান্তদর্শনে, সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। সাংখ্য বা তন্ত্রোক্ত এই প্রকৃতির ধারণা, বাস্তব প্রকৃতি অর্থাৎ ফলদায়িকা পৃথিবীর কল্পনারই পরিব্যাপ্তি। সাংখ্যে পরিণামবাদ নামক একটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয় যা অনুযায়ী যা কার্যে ব্যক্ত তা অব্যক্তভাবে কারণে নিহিত থাকে। কাজেই এই বস্তুভিত্তিক বিশ্বচরাচর যদি একটি কার্য হয় তার কারণও বস্তুসর্বস্ব হতে বাধ্য। প্রকৃতি সেই সর্বাদিতম বস্তুসত্তা যার বিবর্তনে সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে। সাংখ্যের প্রকৃতি শুধু আদি বস্তুই নয়, তা আদিম নারীত্বেরও অভিব্যক্তি। প্রকৃতি নারীরূপে কল্পিতা।১ পরবর্তীকালে পুরুষ আত্মারূপে ঘোষিত হলেও, আসলে সে পুরুষ, এবং তার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটা নিছক নারী-পুরুষেরই। যেমন স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে সন্তান জন্মায়, সেই রকম প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনেই সবকিছুর সৃষ্টি।২

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষেরও একটি ভূমিকা আছে, অথচ এই পুরুষকে দেখানো হয়েছে অক্ষম, উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হিসাবে। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা স্ববিরোধ, শঙ্করাচার্যের চোখেও যা ধরা পড়েছিল। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন কথংোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়েৎ? একালেও সেই একই প্রশ্ন তুলেছেন রিচার্ড গার্বেঃ

> What place, however, in a system which holds such views is to be found for the Purusa? Strangely enough, former scholars who made exhaustive investigations into the Sankhya system did not succeed in answering the question. They regard the Purusa in this system as entirely superfluous and hold that its founder would have shown himself much more logical if he had altogether eliminated it. ৩

এই স্ববিরোধের ব্যাখ্যা একমাত্র কোন মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই করা সম্ভবপর। মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থায় মা-ই হচ্ছে পরিবারের প্রধান ও পারিবারিক বন্ধনের কেন্দ্র। পুত্র-কন্যার সঙ্গে পিতার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই যারা তাদের মায়ের গোষ্ঠীর অন্তর্গত। স্বামী হিসাবে সে তার স্ত্রীর গোষ্ঠীতে বহিরাগত, অথচ পুত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে তার একটা ভূমিকা আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের মূল বক্তব্য খাপ খায় তা অতি প্রাচীন, এবং সেই হিসাবে সাংখ্যদর্শন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দর্শন। সাংখ্যের প্রকৃতি বাস্তব পৃথিবী-মা, ভূমিদেবী, যাকে কেন্দ্র করে নানাবিধ উর্বরতা-মূলক জাদু অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। আদি-তন্ত্র ওই সকল প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানেরই অভিব্যক্তি, যেগুলির অধিকাংশই আবার যৌনমূলক, যার কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। প্রকৃতির রহস্য মানবদেহেরই রহস্য, কারণ

১। সাংখ্যসূত্র ৩, ৬৮।
২। সাংখ্যকারিকা ২১।
৩। R. Garbe in *Encyclopaedia of Religion and Ethics,* XI. 191.

মানবদেহই বিশ্বপ্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার। তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের এটাই মূল কথা, বিশ্বপ্রকৃতির জন্মের রহস্য মানবীয় প্রজনন রহস্যের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। তন্ত্রের যে সকল পুঁথি আমরা পেয়েছি, তন্ত্র সেগুলির চেয়ে অনেক পুরাতন। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এই তান্ত্রিক ধারাটি সুদূরতম অতীত থেকে ভারতের ধর্মের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। তন্ত্রের আদি রূপ এবং পল্লবিত রূপ এক নয়। প্রথমটিকে বুঝতে আমাদের যেতে হবে বহু বহু যুগ পিছিয়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর সমাজ-ব্যবস্থায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সুদূর অতীত নিয়ে আলোচনা করার মত প্রাচীন মালমসলা আমাদের হাতে নেই। তথাপি সেই প্রাচীন ব্যবস্থার একটু আধটু যে স্মারক এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে, সেগুলিকে অবলম্বন করে আমরা কতদূর যেতে পারি দেখা যাক্।

১০। মাতৃপ্রাধান্যঃ সমাজে ও ধর্মে

আমরা দেখলাম সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ কল্পনার সঙ্গে মাতৃপ্রধান সমাজ-পদ্ধতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ভারতের কোন কোন স্থানে এখনও মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা টিঁকে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্তমান মেঘালয়ের খাসিদের কথা উল্লেখ করা যায়। খাসিদের সমাজ-ব্যবস্থার যে কটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেগুলি হচ্ছে, (ক) মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার অর্থাৎ সম্পত্তির মালিক মা যার উত্তরাধিকারিত্ব বর্তায় মেয়েদের উপর, ছোট মেয়ের ভাগ আবার সবচেয়ে বেশি; (খ) মাতৃ-অনুসারী বংশধারা, যেখানে ছেলে মেয়ে মায়ের গোষ্ঠীর, মায়ের নামে ও উপাধিতে তাদের পরিচয়; (গ) মাতৃপ্রভাবিত বিবাহ-ব্যবস্থা, যেখানে বিবাহের পর বরকে থাকতে হবে কনের পরিবারে এবং তৎকর্তৃক উৎপাদিত সন্তানাদি তার স্ত্রীর কুলের লোক বলেই গণ্য হবে; (ঘ) মাতৃপ্রধান ধর্ম, যেখানে পুরোহিতানী ও জাদুকরীদের বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। কেরলের নায়ারদের মধ্যেও অনুরূপ মাতৃপ্রধান সমাজের প্রভাব বর্তমান, বিশেষ করে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বংশধারা ও বিবাহের ক্ষেত্রে। ভারতের অসংখ্য উপজাতি ও জাতির মধ্যে প্রাচীন মাতৃপ্রাধান্যের কিছু কিছু স্মারক এখনও বর্তমান।[১]

ধর্মের ইতিহাসে মাতৃপ্রাধান্যের স্মারক অনেক প্রবলভাবে বর্তমান। বিশেষ করে তন্ত্র প্রভাবিত ধর্মসমূহে এই প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে, একদা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানসমূহ মেয়েদেরই একচেটিয়া ছিল। তন্ত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেখানে প্রত্যেকটি মেয়েকে সাক্ষাৎ দেবীরূপে দেখা হয়, তাদের মধ্যে ভালমন্দ নেই, এমনকি মেয়েদের তথাকথিত নৈতিক স্খলনকেও গ্রাহ্য করা হয় না। একাধিক পুরুষ সংসর্গ করলেও তাদের কোন অপরাধ হয় না, কেননা তারা প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ ভগবতী। তারা দীক্ষাগুরু হতে পারে। তন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য সেখানে জাতিপ্রথার স্থান নেই, শূদ্র, চণ্ডাল, ডোম যে কেউ গুরু হতে পারে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যই স্মার্ত-পৌরাণিক সামাজিক আদর্শের বিরোধী, এবং সম্ভবত এই কারণেই স্মার্ত-পৌরাণিক আদর্শ

১। O. R. Ehrenfels, *Mother-right in India*, 1941, 18 ff.; D. P. Chattopadhyaya, *Lokayata*, 1959, 232 ff.; N. N. Bhattacharyya, *Indian Mother Goddess*, 1970, 65 ff.; K. M. Kapadia, *Marriage and Family in India*, 1966, 336 ff.

প্রচারকারী রচনাসমূহে তন্ত্রের উপর কালিমা লেপন করা হয়েছে এবং তান্ত্রিকদের অসামাজিক জীব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে ব্যাকোফেন বলেছেনঃ

Wherever gynaecocracy meets us, the mystery of religion is bound up with it and it lends to motherhood an incorporation of some divinity.১

ব্যাকোফেনের মতবাদের কিছু কিছু অংশ আজকের দিনে মানা না হলেও যা আমরা পরে দেখব, উপরি-উক্ত কথাটি সঠিক। তন্ত্রের মূল কথা নারী সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা ভগবতী, তাকে তুষ্ট করলেই দেবী তুষ্ট হন। এই কারণেই তন্ত্রে কুমারীপূজার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।২ তান্ত্রিক ধর্মের মাতৃ-প্রাধান্যের আর একটি স্মারক ভৈরবী, যোগিনী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের সাধিকারদের অস্তিত্ব। মানবদেহের মধ্যে তন্ত্র মতে যে সাতটি পদ্ম আছে, সেগুলি নারীত্বের সাতটি আসন। কুলকুণ্ডলিনী, বারুণী, লাকিনী প্রভৃতি যে শক্তিরা ওই সকল পদ্মে অবস্থান করেন তাঁরাও নারী। এমনকি বৈষ্ণব সহজিয়া রচনাসমূহেও কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে রাধা বলা হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেনঃ

In the Carya songs we find frequent references to this female force variously called as Candali, Dombi, Yogini, Nairamani, Sahajasundari, etc., and we also find frequent mention of the union of the Yogin with this personified female deity.৩

স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতেঃ

The ambition of every pious follower of the system is to become identical with Tripurasundari, and one of his religious exercises is to habituate himself to think that god is a woman. Thus the followers of the Sakti school justify their appellation by the belief that god is a woman and it ought to be the aim of all to become a woman.৪

আচারভেদ-তন্ত্রে বলা হয়েছে, একমাত্র নারীতে রূপান্তরিত হয়েই পরাশক্তিকে পূজা করা যায়ঃ পঞ্চতত্ত্ব খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্। বামাচারো ভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্।৫ শাক্ত কাহিনী অনুযায়ী দেবীকে তাঁর সর্বোচ্চ রূপে দেখার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে নারীতে রূপান্তরিত হতে হয়েছিল।৬ যৌন-পরিবর্তনের এই কাহিনীগুলির সঙ্গে পূজা বা অনুষ্ঠানের পূর্বে পুরোহিতদের মেয়েদের পোশাক পরা এবং মেয়েলী প্রতীকসমূহ ধারণ করার বহু প্রচলিত রীতির

১। J. J. Bachofen, *Das Mutterrecht*, 1861, XV.

২। তন্ত্রসার (বসুমতী) ৬৪২ প; দেবী ভাগবত ৩, ২৬-২৭।

৩। S. B. Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, 1946, 116.

৪। R. G. Bhandarkar, *Collected Works*, IV. 208.

৫। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, ৭, ৫১২।

৬। দেবীভাগবত ৩, ৪, ৬-১০।

সম্পর্ক আছে। কালিফোর্নিয়ার উপজাতিদের মধ্যে পুরোহিতরা সর্বদাই মেয়েদের পোশাক পরে থাকে।১ বাহ্যিকভাবে নারীতে রূপান্তরিত এই জাতীয় পুরোহিতদের পরিচয় মেলে বোর্ণিওর ডায়াক, দক্ষিণ সেলেবিসের বুগি, দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়ান, উত্তর আমেরিকার এলেউসিয়ান এবং আরও নানা ট্রাইব, কঙ্গোলী, মাদাগাস্কারের অধিবাসী প্রভৃতির মধ্যে, যাদের কথা উল্লেখ করে ফ্রেজার বলছেন, এই সকল পুরোহিতরা আসলে পুরোহিতানীদের উত্তরাধিকারী, যে উত্তরাধিকার তারা পেয়েছিল সমাজ-ব্যবস্থায় মাতৃপ্রাধান্য থেকে পিতৃপ্রাধান্যে রূপান্তরের সময়ে, কিন্তু তা পেলেও পুরোনো আমলের ওই স্মারকগুলিকে পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।২

লামাবর্গ বা তিব্বতী লামাদের আচরণের উল্লেখ করে প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেছেন যে লামারা আদিতে ছিল মেয়ে-তান্ত্রিকদের গোপন গোষ্ঠী এবং একথা লাকিনী, ডাকিনী ও শাকিনীদের ক্ষেত্রেও খাটে।৩ জয়দ্রথ যামলের মতে লামাবর্গের অনুসরণকারীরা স্ত্রীলোকের সাহচর্যে আত্মসংযম অভ্যাস করবে। শাকিনীদের বিশেষত্ব তত্ত্ব এই যে দীক্ষিতদের যোগিনীদের সাহচর্যে বাস করতে হবে। এই সকল ব্যবস্থাপনা থেকে মনে হয়, তান্ত্রিক গুহ্য অভ্যাসগুলি পুরুষেরা গ্রহণ করার আগে মেয়েদেরই অধিকার ছিল। প্রাচীনতম বৌদ্ধ তন্ত্র গুহ্যসমাজে প্রজ্ঞাভিষেক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে গুরু বিদ্যা বা শক্তিরূপিণী একটি সুন্দরী মেয়েকে শিষ্যের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে বলবেন যে, যেহেতু অপর কোন উপায়ে বুদ্ধত্ব পাবার নয়, এই বিদ্যাকে গ্রহণ করতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে এই বিদ্যা রক্তমাংসের নারী। সম্মোহ-তন্ত্রে এই রকম বিদ্যার একটি তালিকা দেওয়া আছে যাদের পূজা ভারতের নানাস্থানে চলত। এই তালিকায় অনেক বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ দেবীর নাম আছে। সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে এঁরা আগে রক্তমাংসের নারী ছিলেন, পরে দেবীতে রূপান্তরিতা হয়েছিলেন।

তান্ত্রিক ধ্যানধারণায় এই যে মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া গেল সেগুলিকে স্বাভাবিক ভাবেই মাতৃপ্রধান প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এই জাতীয় সমাজ-সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে আমরা যা খবর জেনেছি তার একটা হিসাব-নিকাশ নেওয়া দরকার। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকোফেন প্রথম জানান যে পৃথিবীর সর্বত্রই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশের পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান ছিল, যার কারণ ছিল আদিম সমাজে প্রচলিত অর্থে বিবাহ প্রথার অনুপস্থিতি। ১৮৬৫-তে ম্যাকলেনানও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। ১৮৬৯-এ মর্গান বলেন যে মোনোগ্যামি বা এক পুরুষ এক নারীর বিবাহ নানান ধরনের সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং এই রূপান্তরের একটি পর্যায়ে ততদিন পর্যন্ত মাতৃপ্রাধান্য বজায় ছিল যতদিন না পিতৃত্বের আসল কারণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে চেতনার উদ্ভব হয়েছে। ব্রক, মাইনে ও হার্টল্যাণ্ড বলেন যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আদিম যুগের যৌন-নৈরাজ্যের স্বাভাবিক পরিণতি এবং সর্বত্রই তা পিতৃপ্রধান সমাজের পূর্ববর্তী ছিল। পক্ষান্তরে গ্রাবনার ও শ্মিড্টের মতে বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে পিতৃপ্রধান ও মাতৃপ্রধান সমাজের উদ্ভব

১। S. Powers, *Tribes of California*, 1877, 152, 270.

২। J. G. Frazer, *Adonis Attis Osiris*, 1907, 428 ff.

৩। P. C. Bagchi, *Studies in the Tantras*, 1939, 45 ff.

হয়েছিল, এবং মাতৃপ্রধান সমাজের মানুষদের স্থানান্তর গমনের ফলে তাদের প্রভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মানুষদের মধ্যেও কিছু কিছু মাতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশ হয়। কিন্তু ওয়েষ্টারমার্ক, গোল্‌ডেনভাইজার, হোরেসিও হেল এবং ভান গেন্নেপ মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে পুনরায় নূতনভাবে আলোকপাত করলেন রবার্ট ব্রিফল্ট ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকোফেন যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা তুলে ধরে, এবং পরবর্তীকালে যে চাঞ্চল্য অনেকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, ব্রিফেল্টর বিরাট তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ *The Mothers* প্রকাশিত হবার পর তা আবার নূতন করে জেগে উঠেছিল। ব্রিফেল্টের একটা বড় কৃতিত্ব ছিল মর্গানবাদকে নূতন করে প্রতিষ্ঠা করা, যা অনেক নৃতত্ত্ববিদের পছন্দ হয়নি। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। আমেরিকা মহাদেশের উপজাতিদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করে মর্গান একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যা হচ্ছে বর্তমান যুগের পুঁজিবাদ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠিত সমাজ সম্পর্ক, পিতৃতান্ত্রিক বিবাহ প্রথা, সবকিছুই মানবসভ্যতার বিকাশের বিশেষ পর্যায় মাত্র, শেষ কথা নয়। মর্গানের এই বক্তব্য মার্কসবাদী লেখকেরা লুফে নিয়েছিলেন, এর উপরই ভিত্তি করে এঙ্গেলস লিখেছিলেন *Origin of the Family, Private Property and State,* কাউট্‌স্কি লিখেছিলেন *Entestehung der Ehi und Familie*। মর্গানের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সমর্থক নৃতত্ত্ববিদদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল এবং তাঁরা মর্গানকে খণ্ডন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। এঁদের মুখপত্র হয়েছিলেন ওয়েষ্টারমার্ক। এঁরা যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার মূল কথা হচ্ছে মানবসভ্যতার বিকাশের কোন ঐতিহাসিক নিয়ম নেই, লাউই-র ভাষায় যা 'পরিকল্পনাহীন খিচুড়ি'। সকল প্রতিকূল সমালোচনাকে খণ্ডন করে ব্রিফল্ট, নিজস্ব সংশোধনী সহ, মর্গান-বাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালের পশ্চিমী নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অধিকাংশই কিন্তু ব্রিফল্টকে এড়িয়ে গেছেন, যার কারণ সহজেই অনুমেয়।

এছাড়া পরবর্তীকালে সামাজিক নৃতত্ত্বচর্চার পদ্ধতিও বদলে যায়। ১৯২৬ সালেই ম্যালিনোভস্কি সামাজিক নৃতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্র সংকুচিত করে আনার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে এই চর্চার ক্ষেত্র হওয়া উচিত বর্তমান যুগের বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাসমূহ, অতীত যুগের সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়। এই বক্তব্যকে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এবং বলেন বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থা ও রীতিনীতিসমূহ একটা প্রদত্ত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাই নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মাতৃ-অনুসারী বংশধারা, মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার, মাতৃপ্রভাবিত বিবাহ-ব্যবস্থা প্রভৃতি যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি এখনও বর্তমান রয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ বা তুলনামূলক পর্যালোচনা চলতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে একটি সুপ্রাচীন ব্যবস্থার স্মারক হিসাবে দেখা উচিত হবে না। এই রকম বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা করে তাঁরা দেখেছেন, যেখানে বংশধারা পিতৃ-অনুসারী সেখানে কর্তৃত্ব পুরুষদের হাতে, যারা স্বামী, পিতা অথবা পিতার পিতা। অনুরূপভাবে যেখানে বংশধারা মাতৃ-অনুসারী সেখানেও কর্তৃত্ব কিন্তু পুরুষদেরই হাতে, যারা ভাই, মায়ের ভাই, অথবা মায়ের মায়ের ভাই,

কোন ক্ষেত্রেই মাতৃপ্রাধান্য নেই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জেনেশুনেই অবহেলা করেছেন। (ক) তাঁরা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন, বা ইচ্ছা করেই বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন, যে উপজাতীয় জীবনেরও বিবর্তন আছে এবং তা বরাবর এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। অতি সাম্প্রতিক যুগের যে উদাহরণগুলি তাঁরা পেশ করেন সেগুলি আসলে প্রাচীন অবস্থার বিবর্তিত ও অনেকটা রূপান্তরিত পর্যায়। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। ১৯০৭ সালে গার্ডন খাসিদের মাতৃ-অনুসারী বংশধারা লক্ষ্য করেছিলেন, আজকের নৃতত্ত্ববিদ্‌ও তাদের মধ্যে মাতৃ-অনুসারী বংশধারা লক্ষ্য করেন। কিন্তু গার্ডনের বই-এ খাসিদের সমাজ ব্যবস্থার যে সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় তার সঙ্গে আজকের যুগের খাসি সমাজের যথেষ্ট প্রভেদ। (খ) তাঁরা আরও লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এই পরিবর্তনের কারণটা অর্থনৈতিক, এবং (গ) অনগ্রসর সমাজের মানুষরা পাশাপাশি বসবাসকারী অগ্রসর মানুষদের সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বরাবরই যে হয়ে এসেছে তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জাতি-প্রথা আলোচনার সময় দেখব।১

খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য-উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম সমাজে পুরুষ প্রাধান্য ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই প্রণালীর সূত্রপাত শিকারজীবী পর্যায় থেকেই, সম্ভবত বর্শার ব্যবহার প্রচলিত হবার পর থেকে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ পশুপালক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ প্রাধান্য রীতিমত পাকাপাকি হয়ে যায়। কিন্তু যেখানে শিকারজীবীর পর কৃষিজীবী পর্যায়ের সূচনা হয়েছে, সেখানে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়েছে। আবার এও লক্ষ্য করা যায় কোন কোন রীতিমত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পিতৃ-অনুসারী বংশধারা বর্তমান, কিন্তু তাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়া মানুষদের ক্ষেত্রে মাতৃ-অনুসারী বংশধারা ও সামাজিক মাতৃপ্রাধান্য কার্যকর। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জর্জ টমসন বলেন : ১

The sexual division of labour characteristic of a hunting economy is such as to impart to that economy an inherent tendency to paternal descent. The reason why so high a proportion of modern hunting tribes are patrilinial is that their economic life has been arrested at that level. Conversely, when we find, as we shall find, that in the prehistory of civilized peoples matrilinial descent persisted to a much higher stage than the ethnographical data might lead us to expect, the explanation is that these peoples passed rapidly through hunting to agriculture. ২

বাস্তবিকই ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে, এবং যেখানকার অনগ্রসর অর্থনীতি আজও অসংখ্য উপজাতীয় সমাজকে টিঁকিয়ে রেখেছে, মাতৃপ্রাধান্যের প্রচুর স্মারক থাকা উচিত এবং সত্যই তা আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে স্ত্রী-রাজ্যের অসংখ্য উল্লেখ আছে। স্বয়ং হিউয়েনসাং দুটি স্ত্রীরাজ্য দেখেছেন, একটি

১। N. N. Bhattacharyya, *Indian Mother Goddess*, 65-97.

২। G. Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, 1949, I. 43.

বর্তমান বালুচিস্তানের অন্তর্গত লাঙ্গল নামক স্থানে, অপরটি কুমাওন গাড়োয়াল অঞ্চলে সুবর্ণগোত্র নামক দেশে।১ সুবর্ণগোত্র দেশসহ অপরাপর স্ত্রীরাজ্য বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।২ বাৎস্যায়ণের কামসূত্রের যশোধরকৃত জয়মঙ্গলা নামক টীকাগ্রন্থে বজ্রবন্ত দেশের পশ্চিমে স্ত্রীরাজ্যের অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ,৩ মহাভারত,৪ রামায়ণ৫ ও কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীতে৬ বিভিন্ন স্ত্রীরাজ্যের উল্লেখ বর্তমান। মেগাস্থেনেস পাণ্ড্যদেশে নারীশাসনের কথা শুনেছিলেন, এবং এই ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেছেন আরিয়ান, পলিয়ানোস এবং সোলিনোস।৭

আসামের খাসিদের সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গারোদের সমাজও মাতৃপ্রধান। তাদের ক্লান বা কুলসমূহ মাহারি বা মাতৃকেন্দ্রিক শাখায় বিভক্ত। সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তায় মেয়েদের উপর। স্বামী স্ত্রীর কুলে বাস করে এবং তার ঔরসজাত ছেলেমেয়েরা তার স্ত্রীর কুলের অন্তর্গত হয়। কেরলের নায়ারদের যৌথ পরিবার তারওয়াদ্‌ নামে পরিচিত, যা গঠিত হয় কোন মহিলা, তার মেয়েরা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। যখন এই তারওয়াদ্‌গুলি অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায় তখন সেগুলি তাবাঝি নামক কয়েকটি ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি তারওয়াদের সম্পত্তি তা থেকে উপজাত তাবাঝিসমূহের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নায়ার নারীরা একাধিক স্বামী রাখতে পারে। সম্বন্ধম্‌ নামে তাদের যে বিবাহ-প্রথা, যদিও তা আইনের দ্বারা স্বীকৃত, যে কোন পক্ষের ইচ্ছাতেই যখন তখন ভেঙে যেতে পারে, এবং বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য স্বামীর কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। যদিও নায়ারদের এই চিরন্তন ব্যবস্থা বর্তমানকালে কিছুটা শিথিল হয়েছে, তা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে তারা যে এই ব্যবস্থা ত্যাগ করে অন্যত্র প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে গ্রহণ করবে তার কোন বিশেষ লক্ষণ এখনও দেখা যায়নি।৮

মহাভারতে৯ বর্ণিত হয়েছে যে আরট্ট ও বাহীকদের মধ্যে ভাগ্নে মামার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের রাজাদের উত্তরাধিকারও এই নিয়মে চলত, যার স্থানীয় নাম আলিয়া-সন্তান। এই উত্তরাধিকার প্রথা দক্ষিণ ভারতের বহুজাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অম্বট্টন, অম্পলবাসি, আগাসা, বেদার, বেস্থা, বাণ্ট, বিল্লভ, চাক্কিয়ার, চালিয়ান, চেট্টি, গুরুক্কল, গুদিগারা, হেলবা, হোলেয়া, কুদন, কুদিয়া, কল্লন, কলাসি, কম্নুবান, কোরাগাই, কোট্টই, কুম্বর, কবাটি, কৃষ্ণবক্কর, কুদুনি, কুরব, কুরুকল, মালয়ারায়ন, মারাবান, মাদিগা, মুক্কবান, মালি, মান্নান, মাপ্পিলা, নান্‌গুদি, নত্তুবন, পলিয়ান,

---

১। T. Watters, *On Yuan Chawang's Travels in India,* 1904, I. 330, II. 257.

২। গরুড়পুরাণ ৫৫ অ; বৃহৎসংহিতা ১৪, ২২; স্কন্দপুরাণ, মহেশ্বর-কুমারিকা, ৩৯, ২৭ প; বিক্রমাঙ্কদেবচরিত ১৮, ৫৭ ইত্যাদি।

৩। ৫৮, ৩৯; ৪। ৩, ৫১; ১২, ৪; ৫। ৪, ৪৩, ২০।

৬। ৪, ১৭৩, ১৮৫, ৫৮৭, ৬৬৬।

৭। R. C. Majumdar, *Classical Accounts of India,* 1960, 222-23, 456-58.

৮। P. R. T. Gurdon, *The Khasis,* 1907, 62 ff. A. Playfair, *The Garos,* 1909, 80 ff.; K. M. Kapadia, *Marriage and Family in India,* 1966, 336 ff.; L. K. A. K. Iyer, *Cochin Tribes and Castes,* 1909, II. 49.

৯। ৮, ৪৫, ১৩।

পানান, পরাবান, পট্টরিয়া, পুষ্পকন, পারায়ান, পাল্লান, সমান্তান, তিয়ান, উন্নি, উল্লাদন, ভারিয়ার, বিল্লাস, বেলুতেদান প্রভৃতি।১ মামার সম্পত্তিতে ভাগ্নের এই অধিকার মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার প্রথার একটি পরিবর্তিত পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে উত্তরাধিকার পরিপূর্ণভাবেই মা থেকে মেয়েতে বর্তায়, যা নিউ মেক্সিকো ও আরিজোনার পুয়েব্লোদের মধ্যে বা আসামের খাসিদের মধ্যে এখনও বর্তমান। পরবর্তী পর্যায়ে এই অধিকারটাই বজায় থাকে, তবে তা পুরুষের তত্ত্বাবধানে, যেমন আছে ইরোকারাদের মধ্যে। তৃতীয় পর্যায়ে উত্তরাধিকার বর্তায় পুরুষ থেকে পুরুষে, কিন্তু মেয়েদের লাইনে, যথা মামার থেকে ভাগ্নে অথবা শ্বশুর থেকে জামাই।

মাতৃপ্রভাবিত বিবাহ-ব্যবস্থা, একাধিক স্বামীসহ বসবাস, মেয়েদের যৌন স্বাধীনতা প্রভৃতি মাতৃপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বর্তমান। উপরে উল্লিখিত জাতি ও উপজাতিসমূহ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে মাতৃপ্রাধান্যমূলক বিবাহের অসংখ্য নিদর্শন দেখা যায়। এমন কি যারা পিতৃতন্ত্রের আওতায় চলে এসেছে তাদের মধ্যেও এই প্রাচীনতর ব্যবস্থা লোপ পায়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাদাগাদের কথা উল্লেখ করা যায় যাদের মেয়েরা যে কোন মুহূর্তেই এক স্বামীকে খারিজ করে অপর স্বামীকে গ্রহণ করতে পারে। মহাভারতে২ বলা হয়েছে যে আরট্ট, বাহীক, সিন্ধু-সৌবীর ও মদ্রকদের মধ্যে মেয়েদের পুরোপুরি যৌন স্বাধীনতা ছিল। মহাভারতে বর্ণিত উৎসব-সংকেতদের মধ্যে প্রচলিত অর্থে কোন বিবাহ-ব্যবস্থাই ছিল না।৩ শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার কাহিনী থেকে জানা যায় কিভাবে পিতৃতান্ত্রিক বিবাহপ্রথা সমাজের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।৪ গালব ও মাধবীর কাহিনী থেকে জানা যায় যে তথাকথিত সতীত্বের অর্থহীন কল্পনায় জন্ম হয়েছে অনেক পরে। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে ভগিনীবিবাহের অসংখ্য উল্লেখ আছে। দীর্ঘ নিকায়,৫ মহাবস্তু৬ কুনালজাতক৭ এবং সুত্তনিপাতের৮ টীকা থেকে জানা যায় যে শাক্যদের মধ্যে ভগিনীবিবাহের প্রচলন ছিল। দশরথ জাতকে সীতা একই সঙ্গে রামের স্ত্রী ও ভগ্নী। সিংহলী গ্রন্থ মহাবংস৯ অনুযায়ী বঙ্গ ও রাঢ়ের রাজা সীহবাহু তাঁর ভগ্নী সিহসীবলীকে বিবাহ করেছিলেন। জৈন আবশ্যক-চূর্ণি১০ গ্রন্থে দেখা যায় যে রাজা উষভ তাঁর নিজের বোনকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা পুষ্পকেতু নিজের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, এবং গোল্লদেশে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দ্রৌপদীর পঞ্চপতি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, মহাভারতে এই রকম আরও দুটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একাধিক পতি নিয়ে ঘর করার রীতি মাদুরার কল্লান, কেরালার কানিয়ান, মান্নান, মুদুবর ও তোত্তিয়ান, তেলুগু কাপু

১। E. Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, 1909, *passim*; H. V. Nanjundayya and L. K. A. K. Iyer, *Mysore Tribes and Castes*, 1928-35, *passim*.

২। ৮, ৪০, ২৪-২৫।

৩। ২, ২৭, ১৬; নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য; ৪। মহাভারত ১, ১০৪, ১২২।

৫। ৩, ১৪।

৬। J. J. Jones, *The Mahavastu*, 1949, I. 296.

৭। ৫৩৬ সংখ্যক; ৮। ১, ৩৫৭; ৯। ৬, ৩৬-৩৭; ১০। ২, ৮১, ১৭৮।

বা রেড্ডি, নীলগিরি বাগাদা, চেরুমান বা পুলায়ান, তেলুগু যোগী, কানারী কম্পালিয়ন, খন্দ, নয়দি, মধ্যপ্রদেশের ভুইয়া, বারি, চামার, গোণ্ডরি, কর্কু, হোসঙ্গাবাদের জাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বর্তমান। এই রীতি আজও পর্যন্ত তিব্বত, লাহুল, সরাজ, সিমলা পাহাড়, উত্তর শতদ্রুর আনাউর জেলা, হিন্দুকুশ ও চিত্রলে বর্তমান।

ভারতবর্ষে মাতৃপ্রধান সমাজের অস্তিত্ব ও তার প্রভাব কতদূর ব্যাপক তা ব্যারণ ওমর রলফ্ এহেরেনফেলস তাঁর *Mother right in India* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে ভারতে মাতৃপ্রাধান্যের শক্তি এত বেশি ছিল যে তা জোর করে দমানো হয়েছে বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধ কর্তৃক বালিকা বিবাহ ও সতীদাহ প্রথার প্রবর্তন করে। তাঁর মতে এত উৎকটভাবে মাতৃপ্রাধান্যকে দমাবার চেষ্টা পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতৃপ্রাধান্যের সুবিস্তৃত স্মারকগুলিকে মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি, জনজীবনে এখনও তার প্রভাব আছে। এর কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতেঃ

If the undeveloped agricultural economy had a natural tendency to create matriarchal society and if by far the largest proportion of Indian masses remained predominantly agricultural, then it was but logical that the most extravagant methods would have been necessary to coerce upon them the supremacy of the male...

Yet the peculiar tenacity with which the elements of mother right have survived in the lives of the Indian people is quite striking. Could the reason be that the vast majority of them remained the tillers of the soil?...By contrast, the economic life of the early Vedic people was predominantly pastoral. That accounts for their highly patriarchal society along with a characteristically male-dominated world outlook.[১]

১। D. Chattopadhyaya, *Lokayata,* 1959, XX. 257.

২

বৈদিক যুগের ধর্ম

১। বৈদিক যুগ ও আর্যসমস্যা

খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত সারা উত্তরভারতে আমরা একটি বিশিষ্ট, অথচ মিশ্র ও পরিবর্তনশীল বিভিন্ন সংস্কৃতির সমবায়ে গঠিত সভ্যতার পরিচয় পাই, যা বৈদিক সভ্যতা নামে খ্যাত। এই সভ্যতার কোন সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, কিন্তু আর এক ধরনের প্রমাণ আছে। এই সভ্যতার মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার রচনা করেছিল যা বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। কথাটি বেদ থেকে এসেছে।

এই মানুষদের ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে বাইরের দেশের কয়েকটি প্রাচীন ভাষার সাদৃশ্য দেখে একদা পণ্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন যে এই সব ভাষার সৃষ্টি হয়েছে একটি আদি ভাষা থেকে যার ব্যবহারকারীরা কোন একটি কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের নামকরণ করা হয়েছিল আর্য। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এই আর্য নামক ধারণাটি অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যেহেতু আদি আর্য বা তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন ভাষাগুলির যোগ বেশি এবং যেহেতু ইউরোপীয়রা জ্ঞানবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতর, সেই হেতু ওই আর্য নামক ধারণাটির সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, যার ফলে আর্যদের বংশধরত্বের দাবিদারও হয়ে ওঠে অসংখ্য দেশ, ইউরোপীয় দেশগুলি তো বটেই, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষও। আর্য ধারণাটি বৃটিশ শাসনাধীন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতীয়দের হীনমন্যতা দূরীকরণে কিছুটা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, উচ্চবর্ণের ভারতীয়রা ও তাদের মালিক ইংরাজেরা যে আসলে একই গাছের ফল, এইরকম একটা বিশ্বাস এদেশে সহজেই দানা বেঁধেছিল। সেই হিসাবে আর্য শব্দটি এখানে আজও জনপ্রিয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন জীবনের যা কিছু ভাল দিক তা সবই নাকি ওই আর্য সভ্যতার দান আর যা কিছু খারাপ ও কুসংস্কারমূলক সবই নাকি অনার্য। আজকাল বাংলায় আবার আর্যেতর বলে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যেহেতু বৈদিক সাহিত্য কোন একটি সংস্কৃতির পরিচয় দেয় না, যেহেতু সেখানে বহু জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল বহু সংস্কৃতির নিদর্শন মেলে, আর্য-অনার্য প্রসঙ্গ ভারত ইতিহাসে একেবারে মূল্যহীন। কাজেই আর্যরা কারা ছিল, তারা কোন্ দেশ থেকে এসেছিল এই সকল কথা ঐতিহাসিক বোঝাপড়ার পক্ষে একান্তই অবাস্তব। আমরা শুধু এটুকু বলব যে ভারত ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যে সাহিত্য থেকে ওই যুগের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনযাপন সম্পর্কে বহু কথা জানা যায়, যাদের সংস্কৃতি বিভিন্ন হলেও ভাষার ক্ষেত্রে একটি বন্ধন ছিল, এই পর্যন্ত।

২। বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি এবং মূলত চার শ্রেণীতে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতা প্রধানত গান, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সঙ্কলন, সংখ্যায় তা চারটি—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত যাগযজ্ঞ বিষয়ক সুবিশাল সাহিত্য যা সংহিতার সঙ্গে যুক্ত। আরণ্যক অরণ্যে রচিত একজাতীয় সাহিত্য, বিশ্বরহস্যের সমাধান অন্বেষণই যার লক্ষ্য; উপনিষদেরও উদ্দেশ্য তাই। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সবসময় সুস্পষ্ট নয়। নিম্নলিখিত ছকটি থেকেই বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় মিলবে।

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ্
ঋগ্বেদ	ঐতরেয় কৌষীতকি	ঐতরেয় কৌষীতকি	ঐতরেয় কৌষীতকি
সামবেদ	পঞ্চবিংশত বা তাণ্ড্য মহা ষড়বিংশ জৈমিনীয়	আরণ্যক সংহিতা আরণ্যক গান জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ	ছান্দোগ্য কেন
যজুর্বেদ	কঠ তৈত্তিরীয় শতপথ	কঠ তৈত্তিরীয়- শতপথ	কঠ তৈত্তিরীয় মৈত্রায়ণী শ্বেতাশ্বতর বৃহদারণ্যক ঈশা
অথর্ববেদ	গোপথ		মণ্ডুক মাণ্ডুক্য প্রশ্ন

এইগুলি ছাড়া কিছু সহায়ক গ্রন্থকে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলি বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত। এগুলিকে বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গ মোট ছয় ভাগে বিভক্ত—(১) শিক্ষা, যথা ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য, অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয়ী-প্রাতিশাখ্য, পুষ্পসূত্র, পঞ্চবিধান; (২) কল্প, যথা শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, শুল্বসূত্র; (৩) ব্যাকরণ, (৪) যাস্করচিত নিরুক্ত, (৫) ছন্দঃ (৬) জ্যোতিষ।

এই বিশাল সাহিত্যসম্ভার একযুগে রচিত হয়নি। পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ১২০০ থেকে ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে, পরবর্তী সংহিতা ও প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির রচনাকাল ১০০০ থেকে ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে, পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনতর আরণ্যক-উপনিষদ্গুলির রচনাকাল ৮০০ থেকে ৬০০

খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। পরবর্তী উপনিষদ্ ও সূত্রগ্রন্থগুলির রচনাকাল ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে। এই সুদীর্ঘ ৬০০ কি তার চেয়েও বেশি বছর ধরে যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মেই একটি পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বৈদিক মানুষেরা তাদের আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল, যার যথাযথ পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়।

আমরা সংহিতাগুলি দিয়েই আরম্ভ করব যেগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম হচ্ছে ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম এবং অর্বাচীনতম অংশের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান বর্তমান। ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়—শাকল, বাষ্কল, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন এবং মান্ডুক। এখন শুধুমাত্র শাকল শাখাটিই টিঁকে আছে। মোট ১০২৮টি অধ্যায় বা সূক্ত ঋগ্বেদে সঙ্কলিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে দশটি খণ্ডে বা মণ্ডলে।

এতগুলি অধ্যায়ের অন্তর্গত দশ সহস্রাধিক শ্লোক নিশ্চয়ই একজনের রচনা নয়, এমন কি মধ্যযুগের টীকাকার সায়ণাচার্য পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতেন এবং তিনি ১১টি সূক্ত বা অধ্যায়কে (যেগুলিকে বালখিল্য বলা হয়) উপেক্ষা করেছিলেন। বাকি ১০১৭টি অধ্যায়ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হস্তে রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটি অপরগুলির তুলনায় অনেক পরবর্তী-কালের রচনা, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ, এবং প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল এ দুয়ের মধ্যবর্তী। নবম মণ্ডলটি একটি পৃথক্ সঙ্কলন, যা পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলের অধিকাংশ অধ্যায়ের কবি বা ঋষি হিসাবে পাওয়া যায় ছয়টি গোত্রনাম, যথা গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ এবং বশিষ্ঠ।

বিষয়বস্তু হিসাবে ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহকে প্রথম শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী শ্লোকগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও আধ্যাত্মিকী। যে শ্লোকগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে দেবতাদের গুণগান করে তাঁদের করুণা ভিক্ষা করা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যক্ষ। দুঃখের বিষয়, অপর দুইশ্রেণীর কোন নিদর্শন যাস্ক দেখাননি। ঋগ্বেদে সঙ্কলিত সূক্তগুলি আদিতে যে উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন, পরবর্তী যুগে এগুলিকে নানাভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে, অনেক সময় প্রাচীন ঋক্-গুলির, এমন কি প্রাচীন শব্দগুলির নূতন অর্থ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাও হয়েছে। যাস্ক কর্তৃক নিরুক্ত রচনার যুগেই বেদবিদ্‌দের মধ্যে বেদার্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে নানারকম গভীর ও মৌলিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল; যাস্ক অন্তত সতের জন পূর্বানুগামী টীকাকারের উল্লেখ করেছেন যাঁদের মতামত ও ব্যাখ্যা বহুলাংশেই পরস্পরবিরোধী ছিল। যাস্ক-পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের মতই তাঁর পরবর্তী ভাষ্য-কারদের রচনাসমূহও বিলুপ্ত হয়েছে। ঋগ্বেদের সামগ্রিক ভাষ্য বলতে আমরা যা পাই তা হল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের সায়ণের রচনা। কিন্তু রুড্‌লফ রোটের মত পণ্ডিতেরা বলেন, ঋগ্বেদ রচিত হবার দু হাজার বছর পরে সায়ণ ঋগ্বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তাঁর মনগড়া হতে বাধ্য, তাই সায়ণ-ভাষ্যের উপর নির্ভর না করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। যদিও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সায়ণের ব্যাখ্যা তাঁর একান্তই মনগড়া, কিন্তু সেই সঙ্গে একাও ভুললে চলবে না যে কোন না কোন প্রাচীন ঐতিহ্য, হয়ত বা

কোন প্রাচীন ভাষ্যের সঙ্গে সায়ণ পরিচিত ছিলেন, নতুবা আগাগোড়া মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ঋগ্বেদের ভাষ্যরচনার সাহস তিনি পেতেন না।১

অথর্ববেদের কোন কোন অংশ প্রাচীনত্বের দিক থেকে ঋগ্বেদের প্রায় সমকালীন। ভারতীয় সাহিত্যে অথর্ববেদের প্রাচীনতম নাম হল অথর্বাঙ্গিরস, অর্থাৎ অথর্বন ও আঙ্গিরস। এই দুটি শব্দের তাৎপর্য আমরা পরে ব্যাখ্যা করব। অথর্ববেদের দুটি শাখা বর্তমানে টিঁকে আছে—শৌনক ও পৈপ্পলাদ। অথর্ববেদের মোট ৭৩১টি সূক্ত আছে যেগুলি ২০টি অধ্যায়ে বিনস্ত। অথর্ববেদের একসপ্তমাংশ ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

কুড়িটি অধ্যায়ের প্রথম সাতটি অসংখ্য ছোট ছোট সূক্তের সমষ্টি, প্রতিটি সূক্ত কয়েকটি করে শ্লোকে বিভক্ত। অষ্টম থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ে এবং সপ্তদশ অধ্যায়ের সূক্তগুলি দীর্ঘ ধরনের। পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় দুটির অধিকাংশই গদ্যে রচিত। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে অধ্যায়গুলি বিভক্ত হয়নি, শুধু দুটি অধ্যায় ব্যতিক্রম, চতুর্দশ অধ্যায়টি বিবাহ-সংক্রান্ত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়টির সামগ্রিক বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃতের সৎকার। মোটের উপর অথর্ববেদের ভাষা ও ছন্দ ঋগ্বেদের অনুরূপ হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের নিদর্শন আছে।

অথর্ববেদের কোন কোন অংশ ঋগ্বেদের সমকালীন হলেও অধিকাংশই যে পরবর্তীকালে রচিত তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষের এমন সব স্থানের উল্লেখ অথর্ববেদে আছে যেগুলির কথা ঋগ্বেদে বলা হয়নি। অথর্ববেদে বর্ণিত যে সমাজ ব্যবস্থার চিত্র আমরা পাই তার সঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য দুস্তর। তৃতীয়ত, অথর্ববেদে ঋগ্বেদের দেবতাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু অথর্ববেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাদুমন্ত্র, যেগুলির উদ্দেশ্য অপদেবতাদের তুষ্টিসাধন, বন্ধুদের আশীর্বাদ এবং শত্রুদের অভিসম্পাত প্রদান। আদিম অবিভক্ত সমাজের জাদুবিশ্বাস ও তৎকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠানসমূহের নিদর্শন অথর্ববেদে প্রচুর, কিন্তু এই সকল জাদুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানসমূহ অথর্ববেদের যুগেই পেশাদার জাদুকরদের হাতে এসে গেছে। অথর্ববেদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর, কেননা সেখানে আছে তৎকালীন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি।২

সামবেদের মোট তিনটি শাখা—কৌথুম, রাণয়নীয় এবং জৈমিনীয় বা তালবকার —কিন্তু এগুলির মধ্যে কৌথুম শাখাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এই শাখাটির

১। ঋগ্বেদের সম্পাদনাঃ Friedrich Rosen (1838 আংশিক), Th. Aufrecht (দুইখণ্ডে 1861-63), F. Max Muller (1849-1863, সায়ণভাষ্যসহ পদ ও সংহিতা অংশ, দ্বিতীয় সং 1890-92), বৈদিক সংশোধন মণ্ডল কর্তৃক (1933, চার খণ্ডে)। ইংরাজী অনুবাদঃ H. H. Wilson (1850-60), R. T. H. Griffith (1889-92), অংশবিশেষ F. Max Muller and H. Oldenberg (*Sacred Books of the East*, XXXII, XLVI)। জার্মান অনুবাদ H. Grassmann (1876-77), A. Ludwig (1876-88), K. F. Geldner 1923)। বঙ্গানুবাদঃ রমেশচন্দ্র দত্ত।

২। অথর্ববেদের সম্পাদনাঃ Roth and Whitney (1856) C. R. Lanman (1905); ইংরেজী অনুবাদঃ R. T. H. Griffith (1895-96), W. D. Whitney (1905), M. M. Bloomfield (1897, বাছাই অংশ, *Sacred Books of the East* XLII)। জার্মান অনুবাদ, J. Grill (1886 আংশিক), A. Ludwig (1878), A. Weber (1895-96 আংশিক), Th. Aufrecht (1887 আংশিক), C. A. Florenz (1887 আংশিক)। ফরাসী অনুবাদঃ V. Henry (1891-96)।

দুটি অংশ, আর্চিক ও উত্তরার্চিক। উভয় অংশ মিলিয়ে মোট শ্লোকের সংখ্যা ১৮১০টি, এবং পুনরুক্তি বাদ দিলে ১৫৪৯টি, কিন্তু ৭৫টি ছাড়া বাকি সবগুলিই ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডলে পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি গায়ত্রী বা প্রগাথ ছন্দে রচিত, একান্তই সঙ্গীতের প্রয়োজনে।

সামবেদের প্রথম অংশ যাকে আর্চিক বলা হয়, মোট ৫৮৫টি স্তবক বা ঋক্ নিয়ে গঠিত হয়েছে। সাম বা সামন্, যে কথাটি দিয়ে সমগ্র সংহিতাটিকেই সূচিত করা হয়, তার অর্থই হল গান। সামবেদের স্তবক বা ঋক্‌গুলিকে যোনি আখ্যাও দেওয়া হয়। Ritual Chorus-এর সঙ্গে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের যে সম্পর্ক নৃতত্ত্ববিদেরা টেনে থাকেন, যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে যোনি শব্দটির ব্যবহার, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সামবেদের দ্বিতীয় অংশ, যাকে বলা হয় উত্তরার্চিক, তা হ'ল আসলে একটি বিশেষ ধরনের স্তোত্রসঙ্কলন যেখানে প্রতি স্তোত্রে সাধারণতঃ তিনটি করে ঋক্ বা স্তবক থাকে। উদ্গাতা প্রথমে আর্চিক মারফৎ সুরগুলি আয়ত্ত করবেন এবং তারপর উত্তরার্চিক অংশের সাহায্যে তিনি ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি সুর করে গাইবেন। তবে সামবেদের সকল গানই জনসমক্ষে গাওয়া হত না। দু'ধরনের গান ছিল, গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যগত দৃষ্টিকোণে সামবেদ ঋগ্বেদের কতকগুলি শ্লোকের সঙ্কলন মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামবেদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। আদিম সমাজজীবনে সঙ্গীতের তাৎপর্য যে কি তা আমরা পরে দেখব। সামবেদের সঙ্গীতের সার্থকতা ততটা সঙ্গীতে নয় যতটা সঙ্গীতের আচার বা ritual-এ। উত্তরকালে পুরোহিতেরা এই গানগুলিকে যে উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করুন না কেন, সামবেদের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের সামবেদের যুগের চেয়ে অনেক পিছনের দিকে যেতে হবে।[১]

সামবেদ যেমন উদ্গাতা নামক পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গীতের পুস্তক, যজুর্বেদ সেইরকম অধ্বর্যু নামক পুরোহিত শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের উপযোগী গ্রন্থ। যজুর্বেদ দুভাগে বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদের একটি মাত্রই শাখা পাওয়া যায় যার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখা—কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতা, তৈত্তিরীয় বা আপস্তম্ব সংহিতা এবং মৈত্রায়ণী সংহিতা।

বাজসনেয়ী সংহিতা এই গ্রন্থের তথাকথিত প্রবক্তা বাজসনয়ের নামানুসারী। এই সংহিতার আবার দুটি সংস্করণ আছে, কাণ্ব ও মাধ্যান্দিন, অবশ্য উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। বাজসনেয়ী সংহিতা মোট ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু যতদূর মনে হয়, শেষের ২২টি অধ্যায় পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। প্রায় দুটি অধ্যায় হচ্ছে দর্শপূর্ণমাস অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমার যজ্ঞ। তৃতীয় অধ্যায়ে গার্হস্থ্য যজ্ঞসমূহ স্থান পেয়েছে। চতুর্থ থেকে দশম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে সোমযজ্ঞ, একাদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে অসংখ্য মন্ত্র ও ক্রিয়াপদ্ধতির বর্ণনা, বিশেষ করে অগ্নিচয়ন পদ্ধতি, উনবিংশ থেকে একবিংশ অধ্যায়ে আছে সৌত্রামণী অনুষ্ঠানের কথা। দ্বাবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আছে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা। মূল সংহিতা এখানেই শেষ হচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে বলা হয় খিল বা পরিশিষ্ট।

১। সামবেদের কৌথুম শাখার সম্পাদনা ও অনুবাদঃ E. Benfy (1848), বঙ্গানুবাদঃ সত্যব্রত সামশ্রমী (1873), রাণয়নীয় শাখার সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদঃ J. Stevenson (1842)। জৈমিনীয় শাখার সম্পাদনা W. Caland (1907)।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের চারটি শাখার মধ্যে কপিষ্ঠলু কঠ-সংহিতার যৎ-সামান্য অংশই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বাকি তিনটির বিষয়বস্তু বাজসনেয়ী সংহিতার অনুরূপ তবে এখানে আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা আছে যা পূর্বোক্ত সংহিতায় অনুপস্থিত। এই কারণেই পণ্ডিতেরা বলেন যে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ অধিকতর প্রাচীন, এবং কৃষ্ণ-যজুর্বেদের বিষয়-বস্তুকে প্রয়োজনানুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে শুক্ল-যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা রচিত হয়েছিল। যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ স্থানবিশেষে গদ্যে রচিত।১

চলতি ধারণা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে বেদের ব্যাখ্যা বলা হয়। আসলে কিন্তু সামবেদ যেমন উদ্গাতা নামক পুরোহিতদের আশ্রয়স্থল, যজুর্বেদ যেমন অধ্বর্যুদের, তেমনই হোতাদের জন্য এই ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ। ঋগ্বেদে দুটি ব্রাহ্মণ —ঐতরেয় এবং কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় আবার আটটি করে পঞ্চকে বিভক্ত। সম্ভবত মহিদাস ঐতরেয় এই গ্রন্থের সংকলক। এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু সোমযাগ, অগ্নিহোত্র ও রাজসূয় যজ্ঞ। শেষ দশটি অধ্যায় সম্ভবত পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ তিরিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিষয়বস্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুরূপ, প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে আছে সাধারণ গার্হস্থ্য যাগযজ্ঞ, বিশেষ করে অগ্নিযজ্ঞ, এবং সপ্তম থেকে ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে সোমযাগের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে।

সামবেদকে কেন্দ্র করে যে ব্রাহ্মণগুলি রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের কথা। এই গ্রন্থটির অপর নাম তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ যেখানে অনেক কথা ও কাহিনীর এবং বিশেষভাবে ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞের কথা আছে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ। সামবেদের তৃতীয় ব্রাহ্মণটির, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ের চেয়ে অনেক বেশি পুরাতন এবং যার অতি সামান্য অংশই পাওয়া গেছে, নাম জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হচ্ছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যা পূর্বকথিত তৈত্তিরীয় সংহিতার অনুসৃতি। এতে পুরুষমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য দেওয়া আছে। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের আর একটি ব্রাহ্মণের নাম হল কঠ-ব্রাহ্মণ। শুক্ল-যজুর্বেদের একটি মাত্রই ব্রাহ্মণ আছে যার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ যা এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। এই গ্রন্থটিরও দুটি শাখা আছে, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। সমগ্র গ্রন্থটি চোদ্দটি খণ্ডে বিভক্ত। অথর্ববেদের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে সংহিতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলেও, দুই শ্রেণীর গ্রন্থের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের বিষয়-বস্তু মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত— বিধি ও অর্থবাদ। প্রথমটি নির্দেশ, দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা। একালের পণ্ডিতদের মতে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। অবশ্যই এটা একটা অতিসরলীকৃত ধারণা।২

১। মহীধরের টীকাসহ বাজসনেয়ী এবং মাধবের টীকাসহ তৈত্তিরীয়ের সম্পাদনা করেছেন A. Weber, মৈত্রায়ণী ও কাঠক সংহিতার Von Schroeder। ইংরাজী অনুবাদঃ বাজসনেয়ী সংহিতা R. T. H. Griffith (1899); তৈত্তিরীয় সংহিতা A. B. Keith (1914)।

২। সম্পাদনাঃ ঐতরেয়, Th. Aufrecht (1879); K. S. Agase (1896); তৈত্তিরীয়, R. L. Mitra (1855-70), গোপথ, R. L. Mitra (1872); কৌষীতকি, E. B. Cowell (1861); দৈবত, J. Vidyasagara (1881); ষড়্বিংশ, J. Vidyasagara

অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু কাগজে কলমে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির সঙ্গে যুক্ত হলেও আরণ্যক ও উপনিষদসমূহের চরিত্র পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির চেয়ে পৃথক্। আরণ্যক শব্দটিই সূচিত করে যে এই জাতীয় গ্রন্থগুলি অরণ্যে রচিত হয়েছে। সে যুগে রাজ-রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে রীতি ছিল প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করার। মূলত ক্ষত্রিয়শ্রেণী অর্থাৎ রাজপুরুষ ও শাসকশ্রেণীর মধ্যেই বানপ্রস্থের রীতি ছিল।

যাই হোক সমাজ জীবনের বাইরে অরণ্যবাসের ফলে এই বাণপ্রস্থী রাজা বা রাজপুরুষেরা কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পেরেছিলেন। তাঁরা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন এই যে, তাঁরা যে আজীবন ব্রাহ্মণদের মন্ত্রণায় যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ করে এসেছেন তার কোন সার্থকতা আদৌ আছে কিনা। এই প্রশ্ন আরণ্যকেই প্রতিফলিত হয়েছিল, কিন্তু উপনিষদ্‌সমূহে তা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্পূর্ণভাবেই ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি। এই ব্রহ্মতত্ত্ব যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য থেকে শুধু পৃথক্ তাই নয়, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের বিরোধীও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উপনিষদের এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকেই সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এবং উপনিষদের বারো আনা অংশই যে যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপমূলক, সেটা আড়াল করে গেছেন।

উপ-নি-সদ কথাটির অর্থ 'কারো নিকটে বসা', অর্থাৎ গুরুর নিকটে বসে লব্ধ যে জ্ঞান তা উপনিষদ্ শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, কয়েকটি উপনিষদ্ গ্রন্থ ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের ধারানুসারী। এগুলি হচ্ছে ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, কৌষীতকি, মহানারায়ণ, বৃহদারণ্যক এবং কেন। এগুলির মধ্যে এক মহানারায়ণ ছাড়া বাকি সবগুলিই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির কিছুটা সমকালীন এবং নিঃসন্দেহে গৌতম বুদ্ধ ও পাণিনির পূর্ববর্তী। দ্বিতীয় স্তরের উপনিষদগুলি হচ্ছে কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, ঈশা, মুণ্ডক, প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য ও মৈত্রায়ণীয়। এগুলি বুদ্ধ পরবর্তী যুগের, এবং পরবর্তীকালের দার্শনিক চিন্তাধারা এগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এরপর যেগুলি বাকি রইল, তা নেহাৎ কম নয়, কেন না উপনিষদের সংখ্যা ১০৮টি, সেগুলিকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। সর্বশেষ উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল, সম্রাট আকবরের সময়।

বৈদিক যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে সূত্র সাহিত্য নামে একপ্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বিশেষ করে ছাত্র ও পেশাদারদের জন্য। এগুলিকে বেদাঙ্গও বলা হয়। বিষয়বস্তু হিসাবে এই সূত্রসাহিত্য ছয়ভাগে বিভক্ত—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এখানে আমাদের প্রয়োজন প্রথম তিনটি।

শিক্ষা পর্যায়ের গ্রন্থগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদান, যাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে ছাত্র বৈদিক গ্রন্থসমূহ পড়তে পারে। তাছাড়াও এগুলিতে আচার অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ ইত্যাদিরও কথা আছে। এই জাতীয় গ্রন্থ-

---

(1881), সামবিধান সংহিতোপনিষৎ, আর্ষেয়, বংশ, A. C. Burnell (1873, 1876, 1878), পঞ্চবিংশ Vedantavagisa (1869-74)। অনুবাদঃ ঐতরেয় ও কৌষীতকি, A. B. Keith (Harvard Oriental Series Vol. 25), M. Haug; শতপথ, J. Eggelling (*Sacred Books of the East* Vols. XII, XXVI, XLI, XLIII, XLIV)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সমূহের মধ্যে 'প্রাতিশাখ্য' এই শিরোনামায় রচিত গ্রন্থগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এছাড়া ছিল অনুক্রমণী বা তালিকা সাহিত্য, যেমন ঋগ্বেদ সর্বানুক্রমণী, যাতে ঋগ্বেদের প্রতি সূক্তের রচকের নাম, সংশ্লিষ্ট দেবতার নাম, ছন্দের নাম ও প্রথম লাইনটি দেওয়া আছে। শৌনক রচিত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ঋগ্বেদ-বর্ণিত দেবগণের কথা ও কাহিনী বলা আছে। অনুরূপ আরও একটি গ্রন্থের নাম ঋগ্বিধান। এটিও শৌনকের নামে প্রচলিত। যাস্ক রচিত নিরুক্ত গ্রন্থে সংহিতাসমূহের যে সকল শব্দের অর্থগুলি কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেই অপ্রচলিত শব্দসমূহের তালিকার নাম নিঘণ্টু এবং এইগুলির ব্যাখ্যাই হচ্ছে যাস্কের কৃতিত্ব। যাস্কের রচনাতে তাঁর পূর্বসূরীদের কথা বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের রচিত কোন গ্রন্থ আমরা পাইনি।

কল্পশ্রেণীর রচনাগুলি সূত্রসাহিত্যের প্রাচীনতম পর্যায়। মোটামুটি তিনভাগে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে ভাগ করা যায়—গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শ্রৌতসূত্র। গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে ধর্মসূত্রের পার্থক্য অতি সামান্যই। তফাৎ হচ্ছে গৃহ্যসূত্রে যেখানে পারিবারিক জীবনের আচার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, ধর্মসূত্রে তার এলাকা অনেকটা বর্ধিত হয়েছে। শ্রৌতসূত্রসমূহের বিষয়-বস্তু যাগযজ্ঞ এবং সেই হিসাবে চরিত্রের দিক থেকে এগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের অনুরূপ। গৃহ্য, ধর্ম ও শ্রৌতসূত্রের অন্তর্গত রচনাগুলি আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, বৌধায়ন কাত্যায়ন, গৌতম প্রভৃতি কুলের নামে পরিচিত। এইসব সূত্রগ্রন্থের অনেক টীকা-টিপ্পনী বা নোট-বই পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল, যেমন শ্রাদ্ধকল্প, পিতৃমেধসূত্র, পরিশিষ্ট, প্রয়োগ, পদ্ধতি ও কারিকা সিরিজ।[১]

৩। বৈদিক সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

ঋগ্বেদের যুগের অর্থনীতি প্রায় সর্বাংশেই ছিল পশুপালন নির্ভর, আর এখানেই ছিল প্রাক্-বৈদিক হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার প্রধান প্রভেদ, কেননা তা ছিল সর্বাংশে কৃষিনির্ভর। পশুপালক সমাজ নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারে না, এবং সেই কারণেই আদি বৈদিক সভ্যতার প্রকৃতি গ্রামীণ। অসংখ্য নজীর তুলে দেখানো যায় যে ঋগ্বেদের কবিদের কল্পনায় পশু ভিন্ন আর কিছু ছিল না। মোট ১০,৪৬২টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র ২৫টিতে কৃষি কাজের উল্লেখ আছে,[২] কিন্তু এই ২৫টি শ্লোকের মধ্যে ২২টির স্থান ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশে, যা নিঃসন্দেহে

১। ঐতরেয় আরণ্যকের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন A. B. Keith (1909) এবং শাংখ্যায়ন আরণ্যকের সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে Friedlander, E. B. Cowell এবং A. B. Keith, এবং সামগ্রিক অনুবাদ করেছিলেন শেষোক্তজন (1908)। উপনিষদ্‌সমূহের ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদ বহুজনকৃত ও সহজলভ্য। প্রামাণ্য ইংরাজী অনুবাদঃ R. Hume, *Thirteen Principal Upanisads* (1921)। অপ্রধান উপনিষদগুলিও সামগ্রিকভাবে ও পৃথকভাবে ইংরাজী ও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। প্রধান গৃহ্যসূত্রগুলির অনুবাদ করেছেন H. Oldenberg, এবং ধর্মসূত্রগুলির G. Buhler (দ্রষ্টব্য *Sacred Books of the East* II, XIV, XXIX, XXX)।

২। ১, ২৩, ১৫; ১১৭, ২১; ২, ১৪, ১১; ৪, ৫৭, ১-৮; ৫, ৫৩, ১৩; ৬, ৬, ৪; ৮, ২০, ১৯; ২২, ৬; ৭৮, ১০; ১০, ৩৪, ১৩; ৪৮, ৭; ৮৩, ৩৭; ৯৪, ১৩; ১০১, ৩-৪; ১১৭, ৭; ১৪৬, ৬।

পরবর্তীকালে রচিত। বাকি তিনটিতেও১ কৃষি প্রসঙ্গ এত পরোক্ষভাবে উল্লিখিত যে তা থেকে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এগুলি যদি ঋগ্বেদের মানুষদের মধ্যে কৃষিকাজের অবধারিত পরিচায়ক হয়, তাহলেও বৈদিক অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গৌণত্বই প্রমাণিত হবে, কেননা তুলনায় গো ও তজ্জাত শব্দ সহস্রগুণ। বস্তুত সমগ্র ঋগ্বেদই যে পশুকামনায় ভরপুর একথা বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। গরু সম্বন্ধে বৈদিক কবিদের উৎসাহ এমনই অসম্ভব যে তাঁরা দেবতাদেরও গো-জাত বলে কল্পনা করতে দ্বিধা করেন নি।

ঋগ্বেদ রচিত হতে সময় লেগেছিল দীর্ঘকাল। প্রাক্-বিভক্ত পর্যায় থেকে সমাজ ততদিনে শ্রেণীবিভক্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ঋগ্বেদ শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই রচনা, তবুও তার এখানে ওখানে বহু জায়গায় প্রাক্-বিভক্ত সাম্য সমাজের বহু স্মারক রয়েছে যা খুঁজে নিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। চতুর্বর্ণ-প্রথা ঋগ্বেদের আদি অংশে অনুপস্থিত। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত,২ যেখানে জাতিপ্রথার কথা রয়েছে, ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশের মধ্যেই পড়ে, যা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে রচিত। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থের যুগে সামাজিক শ্রেণীভেদ আরও অনেক ব্যাপক হয়েছে। এই যুগেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক ধারার মিশ্রণ ঘটেছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নগরজীবনেরও সূত্রপাত হয়েছে। আগের যুগের পশুপালকেরা কৃষির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ফলে, কৃষিকার্যে গবাদি পশুর ব্যবহার হবার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে ও তার ফলভোগী একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহ পরিবর্তিত হয়েছে। পুরোদস্তুর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার দরুন মেয়েরা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের শূদ্র, কাক ও কুকুরের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।৩

উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশার উদ্ভব হয়েছে, এবং নিম্নবৃত্তি অবলম্বনকারীরা শূদ্র নামে পরিচিত হয়েছে যাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নিপীড়নের বোঝা। আমরা পরে দেখব, পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগেই রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার উদ্ভব হয়েছে। ধর্মব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। পুরাতন আমলের দেবদেবীরা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিরা দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁদের জায়গায় নূতন দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন প্রজাপতি, যিনি মর্তের রাজার আদর্শেই কল্পিত, স্রষ্টা ও সকলের প্রভু, আর এই ধারণারই চরম পরিণতি উপনিষদের ব্রহ্মকল্পনা, সেই এক ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। প্রাচীন যজ্ঞসমূহেরও চরিত্রের বদল ঘটেছে, সেগুলি সাধারণ মানুষের এলাকার বাইরে চলে গিয়ে উচ্চতর শ্রেণীসমূহের নিজস্ব ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

ঋগ্বেদে রাজন্ বা রাজা শব্দটির ব্যবহার দেখেই পণ্ডিতেরা সাব্যস্ত করে নিয়েছিলেন যে ঋগ্বেদের যুগে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। ঋগ্বেদে৪ পরিষ্কার বলা হয়েছে রাজা হচ্ছে গণের সেনানী এবং ব্রাতের প্রথম। গণ ও ব্রাত দুটি শব্দই ট্রাইবকে নির্দেশ করে। তাহলে রাজা বলতে

১। ২, ১৪, ১১; ৫, ৫৩, ১৩; ৬, ৬, ৪। ২। ১০, ৯০।
৩। অথর্ববেদ ৬, ১১, ৩; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭, ১৫; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬, ৫, ৮, ২। ৪। ১০, ৩৪।

ঋগ্বেদে বুঝিয়েছে ট্রাইবের যুদ্ধনেতা ও প্রথম ব্যক্তি, সোজা কথায় tribal chief। বৈদিক সাহিত্যের বহু জায়গায় সভা ও সমিতিতে বহুবচনে রাজাদের আগমন ও উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে, যা নিশ্চয়ই রাজতন্ত্রের দ্যোতক নয়। রাজতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে রাজার একত্ব এবং অনন্যত্ব। দলে দলে রাজারা সমিতিতে হাজির হয়েছে, এ সম্ভব নয়, কিন্তু ট্রাইবসমূহের প্রধানরা একত্র হয়েছে এটা খুবই সম্ভব। রাজানঃ সমিতৌ ইব—রাজাগণ যেমন সমিতিতে একত্রিত হন—এই বহুত্বই প্রমাণ করে যে বৈদিক রাজা আসলে দলনেতা, রাজতন্ত্রের রাজা নয়। নিঘণ্টু মতে সমিতি একটি যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, কাজেই রাজাদের, অর্থাৎ যুদ্ধ নেতাদের, সমিতিতে একত্রিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। বর্তমান যুগের ধারণা অতীতের উপর চাপিয়ে দিলে যে কি বিড়ম্বনাকর অবস্থা হয় তার প্রমাণ ঋগ্বেদের দাশরাজ্ঞ, যে শব্দটির মধ্যে রাজার গন্ধ পেয়ে পণ্ডিতেরা ঘটনাটিকে battle of ten kings বলে অভিহিত করেছেন, যদিও নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁরা লিখতে বাধ্য হয়েছেন ব্যাপারটা ট্রাইবদেরই, যার সঙ্গে রাজার কোন সম্পর্ক নেই। কমপক্ষে দশজন সুবিখ্যাত বেদবিদ্ এই স্ববিরোধী কাণ্ডটি করেছেন, তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতেই, একালের ধারণা সেকালের উপর প্রয়োগ করে।

ঋগ্বেদে সভা, সমিতি, বিদথ প্রভৃতির বহু উল্লেখ দেখা যায়, যেগুলির তর্জমায় পণ্ডিতেরা Assembly, Council ইত্যাদি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন। বহুস্থলেই সভা বা বিদথে ধনবণ্টনের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের বিভিন্ন অংশে আদিম সাম্যমূলক সমাজের স্মারক পাওয়া যায় যেখানে সুপ্রাচীন সমবণ্টনের নিয়মের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই সমবণ্টনের নিয়মটির সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় শিকারজীবী পর্যায়ের মানুষদের মধ্যে। এই পর্যায়ে মানুষের ধনসম্পদ বলতে যেহেতু প্রধানত খাদ্যদ্রব্য বোঝায় সেইহেতু সমবণ্টনও মূলত ওই খাদ্য দ্রব্যেরই বণ্টন, অন্নবিভাগ। ঋগ্বেদের মানুষেরা অবশ্যই শিকারজীবী পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল না। ধনসম্পদ বলতে তাদের কাছে বোঝাত প্রধানতই পশু এবং পরে যুদ্ধে জিত ধন। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এই পর্যায়েও বৈদিক কবিদের স্মৃতি থেকেও প্রাচীন নিয়মের প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি। ঋগ্বেদে ধনবাচক একটি শব্দ হল বার্য। সায়ন দেখাচ্ছেন বৃঙ্ ধাতু থেকে এই শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ ভাগ করা। ধনবাচক এই শব্দটির পিছনে সুপ্রাচীন সমবণ্টনের নিয়মটির ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু শব্দতত্ত্বগত ইঙ্গিতই নয়, ঋগ্বেদের বহুস্থলেই খোলাখুলি ভাবে সম্পদের সমবণ্টনের কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের শেষ সূক্তে, যেখানে প্রাচীন সাম্যজীবনের প্রতি গভীর আকুতি প্রকাশ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, 'যেমন অতীতের দেবগণ সচেতন ভাবে একত্র বসে তাঁদের ভাগ গ্রহণ করতেন', যা থেকে সহজেই বোঝা যায় অতীতের এই ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছে, ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে জিত ধনে ইন্দ্রের ভাগ অপরের চেয়ে বেশি।

পশুপালনমূলক অর্থনীতির বিকাশের ফলে ট্রাইবগুলি যতই যুদ্ধপরায়ণ হয়ে ওঠে, ততই ধ্বংস পায় প্রাচীন ট্রাইবাল গণতন্ত্র এবং তারই ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভাব হয় রাজশক্তির তথা রাষ্ট্রশক্তির। বৈদিক ট্রাইবগুলি যে ক্রমশই একান্ত যুদ্ধপরায়ণ হয়ে উঠেছিল একথা সুবিদিত। তারই ফলে ঋগ্বেদে অন্য সব দেবতার গৌরব ম্লান করে যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রের ঐকান্তিক গৌরব কীর্তিত হয়েছে। এই দিক থেকে, ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে প্রাচীন গণতন্ত্রের অবসানের লক্ষণসমূহ দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সভা, সমিতি বিদথ প্রমুখ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির

অবলুপ্তি সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে খোলাখুলি বলা হয়েছে সামরিক প্রয়োজনেই রাষ্ট্র তথা রাজার প্রয়োজন।১ শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে রাজাই হচ্ছেন প্রজাপতির দৃশ্যমান প্রতিনিধি।২ ধর্মসূত্রসমূহে রাজাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সার্বভৌম রাজার ধারণা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ওই খ্যাতি লাভ করা যেত।৩

৪। জাতিপ্রথার উদ্ভব

একশো বছরেরও আগে হাণ্টার মন্তব্য করেছিলেন, ভারতবর্ষ যেন জাতিতত্ত্বের অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে আটকে থাকা বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর এক বিরাট জাদুঘর যেখানে মানুষকে তার সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা যায়। হাণ্টারের সামনে ছিল আংশিকভাবে কৃত ১৮৭১-এর সেন্সাস রিপোর্ট, যাতে দেখানো হয়েছিল ১৮৬০ লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে ১৮০ লক্ষ ট্রাইবাল, সরকারী ভাষায় aboriginal। বাকি ১৬৮০ লক্ষের মধ্যে ১৬০ লক্ষ উচ্চবর্ণের মানুষ যারা নাকি আর্যবংশীয়। অবশিষ্ট ১৫২০ লক্ষ মানুষ কোথা থেকে এসেছিল তার কোন হিসাব নেই। বলা হল এরা আদিতে ছিল অনার্য ও সভ্যতাবিহীন, আর্যরা তাদের ক্রমে ক্রমে সভ্য করেছে, একালের ইংরাজ-দের মতই। এই ট্রাইবাল মানুষদের সভ্য করার পদ্ধতি হচ্ছে, হাণ্টার যা বলেছেন, তথাকথিত 'সভ্য' সমাজগুলির জন্য এদের থেকে মানুষ সংগ্রহ করা, চাষের প্রয়োজনে, উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য প্রয়োজনে এবং সামরিক প্রয়োজনে। ১৮৭১-এর সেন্সাস রিপোর্টকারদের মতে যদি ১৫২০ লক্ষ লোকের 'সভ্য' হবার ইতিহাস এই হয়, তাহলে এই ইতিহাস খুবই প্রাচীন হতে বাধ্য এবং সত্যই তাই। বহু পূর্বে কৌটিল্য খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন, যে কোন উপায়েই হোক গণ বা সংঘগুলিকে, অর্থাৎ ট্রাইবাল সমাজগুলিকে, ভেঙে চুরমার করতে হবে, এবং তারপর সেই ট্রাইবাল মানুষদের গণবন্ধন থেকে মুক্ত করে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে, বৃত্তিমূলক কর্মে এবং সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কৌটিল্য যে পদ্ধতির সুপারিশ করেছিলেন, সেই পদ্ধতিই যুগের পর যুগ ধরে কার্যকর রয়েছে, আর এই অ-ট্রাইবীকরণ, process of detribalisation, আজও সমানে চলেছে, যদিও তা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৫১-এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের আদিবাসী বা ট্রাইবাল মানুষদের সংখ্যা ১৯১ লক্ষ, প্রতি ১০০০ ভারতীয়ের মধ্যে ৫৪ জন। ১৯৬১-র রিপোর্টে ওই সংখ্যা ৩ কোটির কাছাকাটি, ১৯৭১-এ তা বেড়ে প্রায় ৪ কোটি হয়েছে। এছাড়া আরও যে কোটি কোটি মানুষ আমাদের সমাজব্যবস্থার নিম্নতর স্তরগুলিতে অবস্থান করছে, নিম্ন বলে কথিত অসংখ্য বৃত্তির কোন একটিকে অবলম্বন করে টিঁকে আছে, তারা নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত process of detribalisation-এর

১। ১, ১, ১৪। ২। ৫, ৩, ৩, ১২।
৩। N. N. Bhattacharyya, *Ancient Indian Rituals and Their Social Contents* (1975), 25-47.

পরিণতি। নানাপ্রকার প্রলোভনের দ্বারা বিভিন্ন ট্রাইব থেকে মানুষ এনে তাদের গ্রামে জনপদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের উপর নির্দিষ্ট পেশা আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে ট্রাইবাল পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে তারা প্রথমে পরিণত হয়েছে পেশাদার গোষ্ঠীসমূহে (occupational groups) এবং পরে এই পেশাদার গোষ্ঠীগুলি, তাদের পেশার গুরুত্ব অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দুসমাজের আওতায় বিভিন্ন মর্যাদার Caste বা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ব্যাপারটি যে একতরফা ঘটেছে তা নয়। বহু ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে নিজেদের অভ্যস্ত পরিবেশে জীবিকাসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে, ট্রাইবাল মানুষেরা নিজেরাই লোকালয়ের দিকে এগিয়েছে, অপেক্ষাকৃত উন্নততর মানবগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন পেশা অবলম্বনে টিঁকে থাকতে চেয়েছে এবং কালক্রমে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। অধিকতর আদিম ট্রাইবসমূহ, যারা কোন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি, অন্য কথায় যাদের মধ্যে উৎপাদন মনস্কতা গড়ে ওঠেনি, যারা ছিল মুখ্যত শিকার ও সংগ্রহজীবী, বহুক্ষেত্রে এমন অবস্থাও ঘটেছে যে নিজেদের আরণ্যক পরিবেশে খাদ্যসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে তারা বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু উৎপাদনমূলক বৃত্তি অবলম্বন করতে না পেরে তারা ভিক্ষুক ও চোর ডাকাতে পরিণত হয়েছে।

ট্রাইবাল পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে যারা এই ভাবে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের আওতায় এসেছে, বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন Caste বা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এদের নিয়ে শাস্ত্রকারদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। প্রাচীন পুঁথিপত্রে যে চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা একটা কল্পিত সামাজিক আদর্শ, যার বাস্তব অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না, আজও নেই, যা আছে তা হচ্ছে পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজ, নির্দিষ্ট পেশাসহ অসংখ্য জাতি। শাস্ত্রকারদের সমস্যা ছিল এই হাজার হাজার জাতিকে চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে ঢোকাবার ও তার ব্যাখ্যা করার সমস্যা, আর তা করতে গিয়ে তাঁরা আজগুবি বর্ণসংকর তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন, যে তত্ত্বের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রিচার্ড ফিক দেখিয়েছেন, যে সকল জাতিকে বর্ণসংকর আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলির উৎস সম্বন্ধে কাল্পনিক কাহিনীর প্রচার করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশেরই নাম স্থানবাচক বা ট্রাইববাচক।

আমাদের দেশের পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষদের মধ্যে বাস্তবে ট্রাইবাল ব্যবস্থা ও জাতব্যবস্থার সীমারেখা মোটেই স্পষ্ট নয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করেছেন এবং সুনিশ্চিত ভাবে দেখিয়েছেন যে জাতিভেদ প্রথা আসলে ট্রাইবাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম—ট্রাইবাল সমাজের ধ্বংসাবশেষ এরই মধ্যে টিঁকে আছে, যদিও ট্রাইবাল সমাজের মূল প্রাণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসাবশেষটির আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের দেশে উৎপাদন কৌশলের উন্নতির উপর নির্ভর করে ট্রাইবাল সমাজ ভিতর থেকে ভেঙে সর্বক্ষেত্রে নূতন সমাজের পথ করে দেয়নি। এখানে স্থানে স্থানে রাষ্ট্রশক্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাদের ঘিরে ছিল পুরোনো ট্রাইবাল সমাজ, যেগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা এই সমাজগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন, এবং এই সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে গ্রামনিবেশ করেছিলেন। আর এই পদ্ধতির অনুসরণ চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। স্বভাবতই ভারতের গ্রামজীবনের মধ্যে ট্রাইবাল সমাজের চিহ্ন অনেক স্পষ্টভাবে টিঁকে আছে, যেমন জাতিভেদ, গ্রামসমবায়, লোকসন্যায় মূলক আইন, লোকায়তিক ধর্ম-আচার

অনুষ্ঠান ইত্যাদি, যেগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি, যদিও এই স্মারকগুলির আদি তাৎপর্যের রূপান্তর ঘটেছে।১

৫। ঋগ্বেদের দেবতারা

পশুপালন নির্ভর সমাজ পুরুষ প্রধান, অতএব পশুপালকদের চেতনাতেও পুরুষ প্রাধান্যের পরিচয় স্বাভাবিক। ঋগ্বেদে তাই দেবীদের তুলনায় দেবতাদেরই প্রাধান্য। ঋগ্বেদের দেবতারা তিন প্রকার—দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিত্র, পূষা, বিষ্ণু, উষা, আদিত্যগণ, অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি; অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা, যথা ইন্দ্র, ত্রিত আপ্ত্য, মাতরিশ্বা, রুদ্র, মরুদ্‌গণ, বায়ু, পর্জন্য ইত্যাদি; এবং ভূলোক বা পৃথিবীর দেবতা, যেমন অগ্নি, পৃথিবী, সোম ইত্যাদি। অধিকাংশ দেবতার প্রাকৃতিক পটভূমি খুবই স্পষ্ট, যেমন উষা, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, আপঃ, পৃথিবী, দ্যৌঃ ইত্যাদি। অনেকের ক্ষেত্রে তা অর্ধস্বচ্ছ, যেমন ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি, অনেকের ক্ষেত্রে তা একেবারেই অস্বচ্ছ, যেমন অশ্বিদ্বয়, অদিতি প্রভৃতি। গোড়ার দিকে প্রত্যেক দেবতার মর্যাদা ছিল সমান, এবং তাঁদের এই সাম্যাবস্থাকে মক্ষমুলর *henotheism* নামে অভিহিত করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ছিল আদি বৈদিক ট্রাইবাল মানুষদের সামাজিক সাম্যের প্রতিচ্ছবি। কালক্রমে সমাজে শ্রেণীভেদ এসেছে, ইন্দ্রের যজ্ঞভাগের পরিমাণও বেড়েছে।

ঋগ্বেদের ধর্মের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেখানে *anthropomorphism* বা প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর মানবত্ব আরোপের প্রয়াস। ঋগ্বেদের অধিকাংশ দেবতারই প্রাকৃতিক পটভূমি বেশ স্পষ্ট, কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে এই প্রাকৃতিক শক্তি-গুলিকে মানবীয় রূপ দেবার একটা সচেতন প্রয়াস ঘটেছে। যেমন উষা কল্পিতা হয়েছেন একজন মোহময়ী যুবতী নারী হিসাবে যিনি তাঁর প্রেমিকের নিকট নিজ বক্ষঃদেশ উন্মোচন করছেন। অগ্নির দেহে পুরোহিতের পোশাক চাপানো হয়েছে। মানবত্ব-আরোপণের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক পটভূমি অনেকটা অস্পষ্ট হয়েছে, যেমন ইন্দ্র বা বরুণের চরিত্রে আমরা দেখি। প্রথম নজরেই তাঁদের প্রাকৃতিক পটভূমিকাটি দৃষ্টিগোচর হবে না, কিন্তু যে সব কথা ও কাহিনীর সঙ্গে তাঁরা সংযুক্ত সেগুলিকে বিচার করলেই তাঁদের প্রাকৃতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর দেবতাদের যদি স্বচ্ছ (transparent) আখ্যা দেওয়া যায়, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারা হলেন অর্ধস্বচ্ছ (translucent)। আরও একশ্রেণীর দেবতা আছেন, যেমন অশ্বিদ্বয়, যাঁরা একেবারেই অস্বচ্ছ (opaque), যাঁদের ক্ষেত্রে anthropomorphism বা মানবত্ব আরোপণের প্রক্রিয়া এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেখানে তাঁদের প্রাকৃতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

দ্যুলোকের দেবতাদের মধ্যে আমরা দ্যৌঃ-কে দিয়ে শুরু করতে পারি যাঁর নামটি গ্রীক জিউসকে (Zeus) স্মরণ করিয়ে দেয়। ইনি সুস্পষ্ট ভাবে আকাশ। এঁর প্রণয়িনী হচ্ছেন পৃথিবী এবং উভয়ে একত্রে দ্যাব্যা-পৃথিবী হিসাবে পরিচিত এবং সমগ্র জগতের পিতামাতা হিসাবে পরিকল্পিত। দ্যৌঃ-র প্রাকৃতিক ভিত্তি খুবই পরিষ্কার। এর পর আসেন সূর্য-সংক্রান্ত দেবতারা যাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিত্র। ইনি সূর্যদেব এবং সর্বদাই বরুণের সঙ্গে যুক্ত, এবং

১। D. P. Chattopadhyaya, *Lokayata* (1959), 171-231.

বরুণের চক্ষু হিসাবে কল্পিত। মাত্র একটি সূক্তে১ মিত্র পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। ঈরানে এই দেবতাটির মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। ঈরানীয় অবেস্তায় ইনি মিথ্র নামে পরিচিত। পৃথক্ একজন সূর্য, দেবতা হিসাবে ঋগ্বেদে বর্তমান। তাঁকে কল্পনা করা কয়েছে সর্বদ্রষ্টা এবং মিত্র, বরুণ, অগ্নি ও অপর দেবতাদের চক্ষু হিসাবে। উষা তাঁকে উৎপন্ন করেন, যদিও তিনি অদিতি এবং দ্যৌঃ-এরও পুত্র। তিনি রক্তবর্ণ পক্ষীস্বরূপ যিনি দিগন্ত পরিভ্রমণ করেন। অবেস্তায় তিনি উল্লিখিত হয়েছেন হ্বরে (স্বরে) হিসাবে যিনি দ্রুতগামী অশ্বের অধিকারী এবং অহুর মজদার চক্ষু। সবিতৃ বা সবিতাও সূর্যদেবতা যাঁর সব কিছুই সুবর্ণময়। তিনি দুঃস্বপ্ন দূর করেন এবং কুকর্মকারী শক্তিসমূহকে ধ্বংস করেন। বিখ্যাত গায়ত্রী শ্লোকে২ তাঁর উল্লেখ আছে। পূষন্ বা পূষাও একজন সূর্যদেবতা, যদিও মানবত্ব-আরোপণ পদ্ধতির গুণে তাঁর মূল চরিত্রটি খুঁজতে একটু বেগ পেতে হয়। তাঁর মাথায় জটা এবং মুখে দাড়ি আছে। তিনি ছাগ বাহিত যানে সুবর্ণনির্মিত অস্ত্র হস্তে পরিভ্রমণ করেন। বিবাহাদি ব্যাপারের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট।৩ তিনি সূর্যের দূত হিসাবে কাজ করেন। তিনি পথের দেবতা, বিপত্তারণ এবং সর্বোপরি পশুদের রক্ষক। দ্যুলোকের আরও একজন প্রসিদ্ধ দেবতা হচ্ছেন উষা, যিনি প্রভাতের দেবীরূপে কল্পিতা। তিনি সর্বদাই সুন্দরী নর্তকীর ন্যায় লঘু পরিচ্ছদ পরিহিতা, যিনি পূর্বদিকে উদিতা হন এবং নিজ কান্তি প্রদর্শন করেন। তিনি অনন্তযৌবনা, যদিও প্রাচীনা। তিনি সূর্যের প্রণয়িনী, মাতাও বটে। তিনি রাত্রির ভগিনী। অগ্নির সঙ্গেও তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বর্তমান। ঋগ্বেদের কুড়িটি সূক্ত উষার উদ্দেশেই নিবেদিত, এবং সেই হিসাবে তাঁর যথেষ্ট গুরুত্বও আছে। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এরপর আমরা দ্যুলোকের সেই সব দেবতার কথা বলব যাঁদের অস্বচ্ছ বা অর্ধস্বচ্ছের পর্যায়ে ফেলা যায়। প্রথমেই অশ্বিদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা নাসত্য নামেও পরিচিত। তাঁরা যুগ্মদেবতা, উষার ভ্রাতা এবং সূর্যার স্বামী। তাঁরা মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয় চিকিৎসক হিসাবে। অশ্বিদ্বয়ের প্রাকৃতিক ভিত্তি যাস্ক থেকে শুরু করে আজকের পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেরই সমস্যা। লেটীয় পুরাণে অশ্বিদ্বয়ের অনুরূপ একজোড়া দেবতা আছেন। গ্রীক দিওস্কুরোই-র কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ বলেন অশ্বিদ্বয় হচ্ছেন শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা। কিন্তু এঁরা যে আসলে কি ছিলেন সে বিষয় স্পষ্ট করে কিছুই বলা যায় না। দ্যুলোকের আর একজন দেবতা হচ্ছেন অদিতি, যিনি আদি দেবজননী, যাঁর বিষয় আমরা পূর্বে কিছু বলেছি। এঁরও প্রাকৃতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। শব্দার্থের বিচারে তাঁর নামের তাৎপর্য বন্ধনহীনতা, অর্থাৎ তিনি একজন দেবী যিনি মানুষকে নানাপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু এ জাতীয় ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত। অদিতি দেবগণের মাতা এবং তাঁর পুত্রগণ আদিত্য নামে পরিচিত।৪ এই আদিত্যগণের মধ্যে আছেন বরুণ, মিত্র, অর্যমা, ভগ, দক্ষ ও অংশ। ইন্দ্র ও বিষ্ণুও আদিত্য হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি অদিতি হচ্ছেন অতি প্রাচীনা একজন মাতৃদেবী যাঁর মূল চরিত্র ঋগ্বেদের যুগেও হারিয়ে গিয়েছিল। অশ্বিদ্বয় ও অদিতি ছাড়া

১। ৩, ৫৯। ২। ৩, ৬২, ১০। ৩। ১০, ৮৫।
৪। ২, ২৭, ১।

দ্যুলোকের আর যে দেবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু, যাঁর প্রাকৃতিক ভিত্তি একেবারেই চাপা পড়েনি। ঋগ্বেদের বিষ্ণু পুরোদস্তুর সূর্যদেবতা, তিনটি পদক্ষেপ যাঁকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। তিনি উরু-গায় বা বিস্তৃতগামী এবং উরু-ক্রম বা বিস্তৃত পদক্ষেপকারী। তাঁর তিনটি পদক্ষেপ যথাক্রমে প্রভাত-সূর্য, মধ্যাহ্ন-সূর্য ও অস্তগামী-সূর্যের প্রতীক।

দ্যুলোকের দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর চরিত্র বরুণ। আদি বৈদিক ধর্মে সম্ভবত এই বরুণই ছিলেন প্রধানতম দেবতা যদিও ঋগ্বেদে ইন্দ্র তাঁকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন, যেখানে বরুণের গৌরবকে হ্রাস করার প্রচেষ্টা খুবই ব্যক্ত। পশ্চিম এশিয়ার বোখাজ-কোই লেখে বরুণ ইন্দ্র, মিত্র ও নাসত্যের সঙ্গে বর্তমান। ঈরানীয় ধর্মের বরুণ হচ্ছেন দেবরাজ যাঁর উপাধি অসুর মেধা (অহুর মজদা)। তাঁর নামটি গ্রীক উরানোস (ইউরেনাস)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। বরুণের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ঋতের রক্ষক, প্রাকৃতিক ও নৈতিক নিয়মসমূহকে তিনি ঊর্ধ্বে তুলে রাখেন। তাঁর অংখ্য চর আছে, যাদের কেউ প্রতারিত করতে পারে না। কোন স্খলনই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর শক্তির নাম মায়া যা দিয়ে তিনি পৃথিবীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর সঙ্গী মিত্র যিনি তাঁর সকল কাজের সহায়। বরুণ মহাদাতা, দুহাত ভরে তিনি মানুষকে দান করেন। তিনি বর্ষণের দেবতা, ঋতুসমূহের নিয়ামক, তাঁর উপাধি ধৃতব্রত, যিনি সকল কিছু ধারণ করে আছেন। কিন্তু তিনি অন্যায়কারীকে ক্ষমা করেন না, তাঁর 'পাশ' দিয়ে তিনি তাদের বন্ধন করেন। তিনি জলাধিপতিও বটে। আদিতে সম্ভবত তিনি ছিলেন আকাশ দেবতা। পরবর্তীকালে এই বিরাট দেবতাটির ব্যাপকভাবে চরিত্র হনন করা হয়েছে, যে কাহিনী আমরা পরে বলব।

এরপর আমরা অন্তরীক্ষের দেবতাদের পরিচিত করব। এঁদের মধ্যে যাঁরা স্বচ্ছ তাঁরা হলেন মরুৎ-গণ, বায়ু ও বাত এবং আপঃ। মরুৎ-গণ হচ্ছেন ঝড়-বৃষ্টির দেবতাদের একটি দল যাঁরা রুদ্র, পৃশ্নি অথবা বায়ুর পুত্র। তাঁরা সুবর্ণ-বর্ণ, স্বয়ং-আলোকিত রক্তিম ও বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁরা অনেক সময় পুরোহিত হিসাবেও স্তুত। পর্জন্যও ঝড়-বৃষ্টির দেবতা, যাঁর অর্থ বৃষ্টিবাহী মেঘ। তাঁকে একটি ষণ্ডরূপে কল্পনা করা হয়েছে যিনি উদ্ভিদ জগতের বৃদ্ধির সহায়ক। বায়ু ও বাত, নামেই স্বপ্রকাশ। এঁরা দৃশ্যতই বায়ুদেবতা। আপঃ সুস্পষ্টভাবেই জল, যাঁরা মাতৃরূপে কল্পিতা। এঁরা দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ উভয় পর্যায়েই স্থান পেয়েছেন। যে দেবতাটির সঙ্গে এঁরা বিশেষভাবে সম্পর্কিত তিনি হচ্ছেন বরুণ। অবেস্তায় এঁরা বর্ণিত হয়েছেন আপো এই নামে। অন্তরীক্ষের অস্বচ্ছ দেবতা হিসাবে যাঁরা পরিচিত তাঁরা হলেন মিত্র আপ্ত্য, অপাং-নপাত, মাতরিশ্ব, অহি বুধ্ন্য এবং অজ একপাদ। এঁদের ক্ষেত্রে মানবত্ব আরোপণ এত বেশি মাত্রায় হয়েছে যে এঁরা আসলে কিসের দেবতা তা বোঝার উপায় নেই। আরও একজন প্রায় অস্বচ্ছ অথচ প্রধান দেবতা হলেন রুদ্র। তিনি মরুৎ-গণের পিতা, ভয়াল দর্শন, বাদামী বর্ণ ও তাম্রাভ জটাযুক্ত। তিনি ষাঁড় ও শূকররূপে কখনও কখনও কল্পিত, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, প্রভু (ঈশান) ও জগতের পিতা। তিনি আহ্বান করলেই আসেন এবং শুভপ্রদও বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ক্ষতি করার শক্তিও রাখেন অসাধারণ। তিনি চিকিৎসকও বটে। তাঁর প্রাকৃতিক ভিত্তি, আগেই বলেছি, অস্বচ্ছ, তবে হয়ত তিনি ঝড় বৃষ্টির কোন এক প্রাচীনতর দেবতা হতে পারেন। পরবর্তী শৈবধর্মের উপর এই দেবতাটির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

অন্তরীক্ষের দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন ইন্দ্র যাঁর উদ্দেশে ঋগ্বেদের সর্বাধিক অংশ ব্যয়িত হয়েছে। যদিও অবেস্তায় তাঁকে অত্যন্ত হীন প্রতিপন্ন করা হয়েছে, সমগ্র ঋগ্বেদই ইন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইন্দ্র অর্ধস্বচ্ছ দেবতা, তবে তাঁর সংক্রান্ত রূপকসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি আসলে জলাধিপতি, আকাশ, মেঘ ও বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত, যদিও পরবর্তীকালে তাঁকে দলনেতা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। বজ্র তাঁর আয়ুধ। তিনি রথারোহী যোদ্ধা (রথেষ্ট) যাঁর সুবর্ণময় রথ দুটি শক্তিশালী অশ্ব বহন করে। ইন্দ্র প্রচুর সোমপান করেন যে কারণে তাঁর উপাধি সোমপা। তাঁর পিতা দ্যৌঃ অথবা ত্বষ্টৃ যাঁকে তিনি নিহত করেছেন। অগ্নি তাঁর যমজ ভাই, মরুৎ-গণ তাঁর সঙ্গী। তিনি বৃত্র নিধনকারী, যে বৃত্র কখনও কখনও অহি বা সর্প হিসাবেও পরিচিত। তিনি পর্বত বিদীর্ণ করে জলধারাকে মুক্ত করেন। তিনি শত্রুদের অশ্মনির্মিত পুরসমূহ ধ্বংস করেন, ঊষাকে ধর্ষণ করেন। নিজ পিতাকে নিহত করতেও তাঁর বাধে না। বরুণের মহত্ত্ব ও নীতিবোধ তাঁর নেই, তবে তিনি মিত্রদের প্রতি সদয় ও দাক্ষিণ্য-যুক্ত। তাঁর চরিত্রের মূল প্রাকৃতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় বৃত্রবধের রূপক ভেদ করলে। যা আবরণ করে (বৃত্রের যা আক্ষরিক অর্থ) সেই মেঘকে তিনি বজ্রের দ্বারা বিদারণ করে বৃষ্টি আনয়ন করেন। অতীতের এই জলাধিপতি পরে যুদ্ধ নেতা হয়েছেন, পুরোদস্তুর হিংস্র পশুপালক ট্রাইবের সর্দার, এবং এই চরিত্রটিই ঋগ্বেদে অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু ঋগ্বেদে এত যাঁর দাপট সেই ইন্দ্র পরবর্তীকালে ভারতীয় ধর্মীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারেই অপসারিত হয়েছেন।

এরপর পার্থিব দেবতাদের কথা, যাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন পৃথিবী, অগ্নি ও সোম। ঋগ্বেদে পৃথিবীর উদ্দেশে মাত্র একটি সূক্ত আছে।[১] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সঙ্গী দ্যৌঃ-এর সঙ্গে একত্রে স্তুত হন দ্যাব্যাপৃথিবী হিসাবে। অগ্নি দেবগণের পুরোহিত হিসাবে কল্পিত। তিনি যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতিসমূহ ভক্ষণ করেন। তাঁর কেশ অগ্নিশিখার মতই। কাষ্ঠ তাঁর খাদ্য, ঘৃত তাঁর পানীয়, তিনি সোমপায়ীও বটে। তাঁর মুখ দিয়েই দেবতারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। তিনি ধূম্র-লাঞ্ছন। প্রত্যহ তিনি দুটি অরণি থেকে উদ্ভূত হন, যদিও প্রাচীন, তথাপি চিরনবীন। গৃহবাসীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতি নিবিড়। তিনি গৃহপতি, অতিথি, জ্ঞাতি এবং সর্বোপরি দূত। তিনি ঋত্বিক, বিপ্র, পুরোহিত, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মরূপে আখ্যাত। তিনি সর্বজ্ঞ, জাতবেদা। তিনি মৃতকে পিতৃগণের নিকট নিয়ে যান। অগ্নির পরেই যিনি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন সোম, ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলটিই যাঁর নামে উৎসর্গীত। তিনি সোমলতা, যা থেকে দেব ও মানুষের প্রয়োজনীয় মদ্য উৎপন্ন হয়। ঈরানীয় অবেস্তায় এই দেবতাটির খুবই দাপট। সোমলতার শীষ বা অংশ পাথরের জাঁতায় পেষণ করা হয় এবং সেই রস পরিশ্রুত করা হয় মেষলোমের ছাঁকনির দ্বারা, যার নাম পবমান। দিনে তিনবার সোম পেষণ করা হয়, প্রভাতের পেষণ ইন্দ্রাদি দেবতার নামে, মধ্যাহ্নের পেষণ কেবলমাত্র ইন্দ্রের নামে, এবং সায়াহ্নের পেষণ ঋভুগণের নামে। সোম মস্ত দেবতা, সাক্ষাৎ অমৃত-স্বরূপ। তিনি মৃতসঞ্জিবনী। তিনি রোগের আরোগ্য করেন। দেবতা হিসাবে তিনি মহৎ দ্রষ্টা, এবং কবি, যিনি চিন্তা ও শ্লোকরচনার প্রেরণাদাতা। তিনি ইন্দ্রের দেহে বলাধান করেন। তিনি বনস্পতি, চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়।

১। ৫, ৮৪।

গৌণ দেবতাদের মধ্যে বৃহস্পতি, যাঁর অপর নাম ব্রহ্মণস্পতি, অগ্নির মতই পুরোহিত ও ব্রহ্ম হিসাবে পরিচিত, যিনি সকল প্রার্থনার উদ্গাতা। ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে আহূত হন এবং ইন্দ্রের উপাধি মঘবা ও বজ্রীর ভাগীদার তিনিও। অতিপয় নদীকে দেবতার পর্যায়ে তোলা হয়েছে যেগুলির মধ্যে প্রধান হলেন সরস্বতী। অতিপয় মানসিক ধারণাও দেবতা হিসাবে কল্পিত হয়েছে যেমন মন্যু (ক্রোধ), শ্রদ্ধা ইত্যাদি। ঋগ্বেদে দেবীদের প্রতিপত্তি নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রম শুধু উষা ও অদিতি। ঋগ্বেদের দেবীরা স্বামীদের ছায়া, দেবতাদের নামের সঙ্গে আনী প্রত্যয় যোগ করে তাঁদের নামকরণ করা হয়েছে, যেমন ইন্দ্রাণী, বরুণানী ইত্যাদি। ইলা, রাকা, কুহূ, ধীষণা প্রভৃতি কিছু কিছু দেবীর উল্লেখ ঋগ্বেদে থাকলেও তাঁদের কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। তবে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বেশ কয়েকজন শক্তিমতী দেবী স্থান করে নিয়েছেন। সম্ভবত আদিতে এ'রা ছিলেন প্রাক্-বৈদিক ও অবৈদিক। সুযোগ ও সুবিধা বুঝে এ'রা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছেন।

ঋগ্বেদের শেষ শ্লোকে একটি অতি প্রাচীন যুগের স্মারক পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে একদা দেবতারা একত্রে বসে সচেতনভাবে ও সমভাবে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতেন। ঋগ্বেদ রচিত হতে সময় লেগেছিল বহুকাল, যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন বহু হয়েছিল, প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর শ্রেণী-সমাজ গঠিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের দেবতাদের চরিত্র চিত্রণের মধ্যে একটা সাম্য ছিল, প্রতিটি দেবতাই সমান ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এই অবস্থাকে মক্ষমুলর বলেছেন Henotheism বা Kathenotheism যার সংজ্ঞা দিতে তিনি বলেছেন the belief in individual gods alternately regarded as the highest। বহু শ্লোকে বিশ্বদেব বা সকল দেবতার একত্র উল্লেখ আছে, সমমর্যাদার ভিত্তিতে যাঁদের দেখা হয়েছে। ম্যাকডোনেল লিখেছেনঃ

> In the frequent hymns addressed to the Visvadevas or All-gods, all the deities, even the lesser ones, are praised in succession, and that the great mass of the Vedic hymns was composed for the ritual of Soma-offering which included the worship of almost the entire pantheon, the technical priest could not but know the exact relative position of each god in that ritual.[১]

একমাত্র প্রাক্-বিভক্ত আদিম সাম্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দেবগণের এই মর্যাদার সমতার ব্যাখ্যা করা যায়। আদিম সাম্যাবস্থা বিলুপ্ত হবার পরেও তার স্মারক থেকে যায় গণ-দেবতাগণের ধারণার মধ্যে যেমন—বসুগণ, মরুৎগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ—যেখানে দেবতাদের গণ বা ট্রাইবাল চরিত্রের একেবারে বিলুপ্তি ঘটেনি। কালক্রমে শ্রেণীসমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমষ্টির স্থানে ব্যক্তির ভূমিকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, দেবতাদের নাম, চরিত্র ও মর্যাদার ভেদ ঘটতে শুরু করে। সূর্য, বায়ু, আকাশ, ঝড়ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়গুলির প্রত্যেকটি একাধিক বিশিষ্ট চরিত্রের দেবতায় পর্যবসিত হয়। ক্রমে এই দেবতাদের প্রাকৃতিক ভিত্তিগুলিও হারিয়ে যায়, এবং নূতন সামাজিক পরিবেশে তাঁরা তাঁদের মূল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে ক্রমশ

১। A. Macdonell, *Vedic Mythology* (1897) 16.

বিলুপ্ত হয়ে যান। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আমরা নূতন ধরনের দেবতাদের দেখি, যাঁদের কোন প্রাকৃতিক ভিত্তি নেই, যাঁরা নূতন সমাজের শাসক শ্রেণীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তারাও বেশিদিন থাকেন নি, কেন না রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, স্বাভাবিক নিয়মেই একাধিক শক্তিমান দেবতার অস্তিত্ব বাহুল্য হয়ে পড়ে। দেবতা হবেন একজনই, এবং তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি কল্পিত হবেন মর্তলোকের রাজার আদর্শে, এটাই হল একেশ্বরবাদের মূল কথা, যা পরবর্তী একেশ্বরবাদী ভারতীয় ধর্মসমূহের মূল প্রেরণা।

পণ্ডিতেরা বর্তমান যুগের ধ্যানধারণা অনুযায়ী ধরে নিয়েছেন যে বহুদেবতা-প্রথার চেয়ে একেশ্বরবাদ অনেক ভাল এবং তা উন্নততর চেতনার পরিচায়ক। কিন্তু কিসে একথা প্রমাণ হবে? তাঁদের দৃষ্টিতে একটি স্থূল সত্য এড়িয়ে গেছে যে ধর্মীয় ধ্যানধারণাসমূহের উদ্ভব মানুষের মনের খেয়াল বা মগজের চিন্তায় হয় না, তা আপনই গড়ে ওঠে একটা বিশেষ যুগের ও একটা বিশেষ সমাজের চাহিদা মেটাতে, যদিও এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই সামাজিক চাহিদার প্রবক্তা হতে পারেন। একেশ্বরবাদ যদি সত্যই উন্নততর চিন্তার পরিচায়ক হয়, তাহলে পূর্ব-মীমাংসা দর্শনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? কুমারিল ভট্ট বেদ মানেন, যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপ মানেন, ছোটখাট দেবতাদের মানতেও তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথায় তিনি ক্ষেপে ওঠেন কেন? এ-সকল প্রশ্নের সম্মুখীন কেউ হননি।[১]

৬। ঋগ্বেদ ও অবেস্তা

ঋগ্বেদে দেবতাদের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে ঋগ্বেদের বহু দেবতা, বরং বলা যায় প্রায় সকল দেবতাই ঈরানীয় ধর্মগ্রন্থ অবেস্তায় বর্তমান। মিত্র এবং বরুণ অবেস্তার খুব বড় দেবতা, সোমের স্থানও সেখানে বড় কম নয়, ইন্দ্রও সেখানে আছেন যদিও তাঁর স্থানটা খুব গৌরবের নয়। শুধু ঈরানেই নয়, আমরা আগেই দেখেছি, পশ্চিম এশিয়ায় বোঘাজ-কোই নামক স্থানে আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের একটি লেখে—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্য—এই চারজন বৈদিক দেবতা সশরীরে বিদ্যমান।

এখনকার ভৌগোলিক দেশবিভাগ ঋগ্বেদের যুগে নিশ্চয়ই সেইরকম ছিল না। যে সকল সংস্কৃতিকে আমরা বৈদিক আখ্যা দিয়েছি ঋগ্বেদের যুগে তাদের ক্ষেত্র ছিল বর্তমান ঈরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান নিয়ে। কালক্রমে ওই সংস্কৃতিগুলির বিস্তার পূর্বদিকে যত হয়েছে পশ্চিমের সঙ্গে যোগ ধীরে ধীরে সেই অনুপাতে কমে গেছে। ঋগ্বেদের যুগেই ঈরানীয় ট্রাইবদের সঙ্গে বৈদিক ট্রাইবদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল।

ঈরানীয় ধর্মকে, যার পরিচয় অবেস্তায় পাওয়া যায়, অসুর আখ্যা দেওয়া হয়, যে নামটি গ্রহণ করা হয়েছে অসুর দেশের (আসিরিয়া) নাম থেকে। পক্ষান্তরে ভারতীয় বৈদিক ধর্ম দৈব নামে পরিচিত। পুরাণোক্ত যে দেবাসুর-সংগ্রাম তা আসলে দুটি দেশের প্রায় একই ধরনের ধর্মবিশ্বাসের জ্ঞাতিশত্রুতা; আর জ্ঞাতি-

১। এ সকল বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের অন্যত্র করা হয়েছে।

শত্রুদের দ্বন্দ্ব যে খুবই মারাত্মক হয় সে তো আজকের যুগেও দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের ফলে দেব ও অসুর দুটি শব্দেরই অর্থ বিপর্যয় ঘটেছে উভয় দেশে। পরবর্তী-কালের ঈরানীয় রচনাসমূহে দৈব বা দেব শব্দটি ঘৃণিত, যদিও প্রাচীনতর রচনা-সমূহে তা নয়, পক্ষান্তরে পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে অসুর শব্দটি ঘৃণাব্যঞ্জক, যদিও ঋগ্বেদে তা নয়, যেখানে অসুর অনেক দেবতারই উপাধি। বরুণ তো এক নম্বরের অসুর। বৈদিক যুগে অসুর-পন্থায় বিশ্বাসী অনেকেই ভারতবর্ষে বাস করত। যেমন ঈরানে বাস করত অনেকেই যারা দেব-পন্থায় বিশ্বাসী। কালক্রমে এদেশে বৈদিক ধর্ম থেকে অসুর উপাদানগুলিকে নির্মূল করার চেষ্টা হয়, এবং ঈরানীয় ধর্মে দৈব উপাদানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন জরথুষ্ট্র (জরদ্-উষ্ট্র)। তথাপি সম্রাট জেরেক্সেসের লেখ থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেও ঈরানে দেবপন্থায় বিশ্বাসী অনেক মানুষ ছিল।[১]

বৈদিক ভারতীয়রা ও প্রাচীন ঈরানীয়রা একই অগ্নিপূজা ও সোম-যাগের শরিক ছিল। বৈদিক ও ঈরানীয় যাগযজ্ঞের ব্যাপারটা ছিল একই রকম এবং উভয় ক্ষেত্রে একই পরিভাষার ব্যবহার ছিল যেমন হওম=সোম, যাওতর=হোতৃ, অথ্রবন্=অথর্বন্, মনথ্র=মন্ত্র, যযত=যজত, যশ্ন=যজ্ঞ, আযুইতি=আহুতি, ইত্যাদি। বেদ ও অবেস্তায় একই ধরনের উপনয়ন প্রথার অস্তিত্ব দেখা যায়, এবং উভয় ক্ষেত্রেই দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ। মিত্র (মিথ্র) এবং বরুণ (অসুর) বিশ্বচরাচরের নিয়ম-রক্ষক, বৈদিক ঋত ও অবেস্তীয় অশ ওই নিয়মশৃঙ্খলার প্রতীক। বৈদিক ইন্দ্র অবেস্তাতেও বর্তমান, যদিও সেখানে তাঁর মর্যাদা হানি করা হয়েছে। নাসত্য বেদ ও অবেস্তা উভয় স্থানেই বর্তমান। অপাং-নপাতের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। বৈদিক গন্ধর্ব অবেস্তার গন্দরেওয়, কৃশানু কৃশনি, যম যিম।

অবেস্তা গ্রন্থটির কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। মূল অবেস্তা রচিত হয়েছিল ১০০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। কিন্তু বর্তমানে যে অবেস্তা পাওয়া যায় তাতে মূলের খুব সামান্য অংশই রক্ষিত আছে। অবেস্তার বর্তমান যে রূপ আমরা দেখি তা সংকলিত হয়েছিল সাসানীয় আমলে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। অর্থাৎ মূল গ্রন্থের রচনাকাল ও তার সংকলনকালের মধ্যে সর্বনিম্ন সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৮০০ বছর। কাজেই এই অবস্থায় আসল অবেস্তার সামান্য অংশকেই ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। জরথুষ্ট্রের গাথাসমূহ মূল অবেস্তা গ্রন্থের সবচেয়ে অর্বাচীন অংশ, কিন্তু সংকলিত অবেস্তায় সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন। পহ্লবী ভাষায় সংকলিত অবেস্তার নাম আপিস্তক-উ-জেন্দ। 'আপিস্তক' শব্দটির অর্থ 'মূল-গ্রন্থ' এবং 'জেন্দ' শব্দটির অর্থ 'টীকা'। সংকলিত অবেস্তা চারভাগে বিভক্ত—যশ্ন, বিস্পরদ, যশৎ এবং বেন্দিদাদ্।

যশ্ন-এর (য-জন, অজ-ন, যজ্ঞ) বিষয়বস্তু যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত। ৭২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটির প্রথম ২৭টি অধ্যায় ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত। নবম থেকে একাদশ অধ্যায়ে হওম যস্ত বা সোম যজ্ঞের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ২৮ থেকে ৫৪ অধ্যায় জরথুষ্ট্রীয় গাথাসমূহ, যেখানে বহু-দেবতাকে বর্জন করে একমাত্র বরুণকেই (অহুর-মজদা) পরমেশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। অবশ্য অহুর-মজদাই জরথুষ্ট্রীয় ধর্মে একমাত্র সত্তা নন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে আহ্রিমন বা অন্ধকার, পাপ ও অসুন্দরের প্রতীক। এই দুই দেবতার সংঘাত অনন্তকাল ধরে

১। S. Sen, *Old Persian Inscriptions*, 143-56.

চলছে। যশ্নের ৫৫ থেকে ৭২ অধ্যায় অপরো-যশন বা পরবর্তী যশন নামে পরিচিত যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বন্দনা। অবেস্তার বিস্পরদ অংশটি ২২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে বরুণ (অহুর-মজদা) ও সংশ্লিষ্ট সকল দেবতার নিকট প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। বিস্পরদ শব্দটির অর্থ 'সকল দেবতার প্রতি' (বিশ্বেরতবো)। যশৎ সম্ভবত আদি অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ ছিল। এখানে প্রাক্-জরথুষ্ট্রীয় ঈরানীয় ধর্মের, বিশেষ করে সোম যজ্ঞের, কথা বলা হয়েছে। গাথায় এখানে ধর্মসংক্রান্ত পরিভাষা, প্রার্থনামূলক কবিতা ও বীরগাথা বর্ণিত হয়েছে। বেন্দিদাদে সংগৃহীত হয়েছে প্রাচীন ঈরানীয় আইন-কানুনসমূহ। 'বেন্দিদাদ্' শব্দটি বি-দয়েব-দাত (সংস্কৃতঃ বি-দেব-হিত) শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ হচ্ছে 'দৈবদের প্রতিকূলে রচিত আইনসমূহ'।১

৭। ঋগ্বেদে জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা

আমরা পরে দেখব, ঋগ্বেদের দেবতারা যেমনই হোন আর যাঁরাই হোন, মন্ত্র ও যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে তাঁদের বাধ্য করা যায়, এই বিশ্বাস ঋগ্বেদ সহ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যাগযজ্ঞ সম্পর্কে আমাদের বহু ধারণাগত ভ্রান্তি আছে। বৈদিক ধর্মের এই দিক্গুলি নিন্দনীয় ও কুসংস্কারমূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং এর সবটাই বোঝার ভুল। বিষয়টি আমরা পৃথক্ ভাবে আলোচনা করব।

ঋগ্বেদে পাপপুণ্য সংক্রান্ত কিছু কিছু ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।২ বলা হয়েছে যে ঋতের অনুশাসন ভঙ্গ করলেই পাপের উৎপত্তি হয়। ঋত বলতে পণ্ডিতেরা নিয়ম শাসিত প্রকৃতি বুঝেছেন, যদিও খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে তা হচ্ছে গোষ্ঠীজীবনের নিয়মশৃংখলা, যা আমরা পরে দেখব। বন্ধু প্রতিবেশী, সহকর্মী, এমন কি অপরিচিত ব্যক্তির প্রতিও অন্যায় করা পাপ।৩ মানুষের প্রতি মানুষের কয়েকটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য আছে, যেগুলির থেকে বিচ্যুতির নামই পাপ।৪ পরবর্তীকালে ভারতীয় চিন্তায় যে কর্মফলবাদের পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্বেদে তা অনুপস্থিত। অসৎকারীরা নরকে যায় যা নীচু এবং অন্ধকার,৫ গভীর খাদের মত।৬ জন্মান্তরবাদের কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই।

মৃত্যুর পর কি দশা হয় তা নিয়ে ঋগ্বেদে কিছু পরস্পর বিরোধী কথা আছে। একটি মত, যা সর্বপ্রাচীন বলে মনে হয়, অনুযায়ী মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।৭ দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, মৃত্যুর পর মানুষ যমলোকে যায় (যমই প্রথম মানুষ যিনি মারা গিয়েছিলেন) এবং যেখানে সুখে কাল কাটায়।৮ মৃত্যুর পর

১। অবেস্তার সম্পাদনা করেন N. L. Westergard (1852-54) এবং K. Geldner (1886-96)। ইংরেজী অনুবাদ J. Darmesteter এবং H. Mills.

২। ৮, ৮৬, ৬; ৮, ৮৮, ৫-৬ ইত্যাদি।

৩। ৫, ৮৫, ৭।

৪। ১০, ১১৭।

৫। ১০, ১৫২, ৪।

৬। ৯, ৭৩, ৮।

৭। ১০, ১৬।

৮। ১০, ১৪।

মানুষ সূর্যলোকেও যেতে পারে।১ দেবযান ও পিতৃযানেরও কিছু পরোক্ষ উল্লেখ ঋগ্বেদে বর্তমান।২ পরবর্তীকালের ধারণায় মৃত মানুষের আত্মার যে পরিচয় পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে সেরকম কোন ব্যাপার নেই, যদিও অনেকে গায়ের জোরে শ্লোকের অর্থ বিকৃত করে তা প্রমাণ করতে চান।

ঋগ্বেদে দৈহিক ও কারিগরী শ্রমের সঙ্গে মানসিক শ্রমের কোন ভেদ করা হয়নি, এবং সর্বত্রই দৈহিক শ্রমের জয়গান করা হয়েছে। কারিগরী কলাকৌশলকে অনেক ক্ষেত্রেই মায়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অনেক পন্ডিতই এই সরল ও সোজা অর্থটি মানতে নারাজ, যাঁরা ওই শব্দটির মধ্যে বৈদান্তিক ধারণার উদ্ভব খোঁজেন একটি বিশেষ শ্লোকের৩ অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে। যাঁরা এতদূর যেতে চান না তাঁরা মায়া বলতে অতিলৌকিক ক্ষমতা বোঝেন। সে যাই হোক, কারিগরী কলাকৌশল ঋগ্বেদে কতটা প্রাধান্য লাভ করেছিল তা বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না, যখন আমরা দেখি যে বিশ্বসৃষ্টির সমগ্র ব্যাপারটাই কারিগরী কৌশল হিসাবেই দেখা হয়েছে, বলা হয়েছে, কি সেই কাঠ, কি সেই গাছ, যা থেকে তাঁরা আকাশ ও পৃথিবী গড়ল?৪

বিশ্বসৃষ্টি প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের কবিরা যে সকল কথা বলেছেন তা থেকে দু'ধরনের বক্তব্য প্রকাশ পায়—একটি বস্তুবাদী বিশ্লেষণ, অপরটি ভাববাদ-অনুসারী বক্তব্য, যদিও পুরোদস্তুর ভাববাদী চেতনার উদ্ভব ঋগ্বেদের যুগে হয়নি। ঋগ্বেদের একস্থলে প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রথম জাতককে কে দেখেছে, কোথা হতে জীবন ও পৃথিবীর উদ্ভব হয়েছে?৫ এর উত্তর অবশ্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সমস্ত কিছুরই উদ্ভব এক আদি বস্তু থেকে, এবং সেই আদি বস্তু, বিশ্বসৃষ্টির আদি উপাদান জল ছাড়া কিছুই নয়, যে কথা গ্রীক দার্শনিক থালেসও বলেছিলেন। আদি উপাদান হিসাবে ঋগ্বেদে জলের ধারণা এত ব্যাপক যে সৃষ্টি সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নেই তা অনিবার্যভাবেই উপস্থিত হয়েছে। একস্থানে বলা হয়েছে আদিম জলরাশি থেকেই উৎপন্ন হয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ যিনি পূর্ব হতেই অস্তিত্ববান উপকরণসমূহের সাহায্যে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছিলেন।৬ কিন্তু যে উপাদানসমূহ কারো হাতে বিশ্বচরাচরের রূপ পেল, সেগুলি কোথা থেকে এসেছে, কি করে এসেছে, সে বিষয়ে ঋগ্বেদ নীরব। এক স্থলে বলা হয়েছে উত্তাপের থেকে ঋত ও সত্যের উদ্ভব, তারপর ধারাবাহিক ভাবে উৎপন্ন হয়েছে রাত্রি, সমুদ্র ও সম্বৎসর।৭ একস্থলে বলা হয়েছে অবস্তু হতে বস্তুর উৎপত্তি৮ যা প্রাচীন ভাববাদী প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ। ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ সূক্তে৯ সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারটাকে একটা যজ্ঞ ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে, যেখানে আদি উপাদান হিসাবে বিরাট সর্বব্যাপী পুরুষকে (সম্ভবত দৃশ্যমান জগতের প্রতীক) যজ্ঞে দেবতাগণ কর্তৃক খন্ড বিখন্ড করার রূপকের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির বিবর্তনকে বোঝাবার একটা প্রয়াস করা হয়েছে, যদিও সমগ্র অধ্যায় বা সূক্তটির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা অসম্ভব। সামগ্রিক ভাবে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে

১। ১, ২৫, ৫; ১০, ১০৭, ২।
২। ১০, ১৫, ২; ১০, ৮৮, ১৫।
৩। ১০, ৫৪, ২।
৪। ১০, ৩১, ৭।
৫। ১, ১৬৪, ৪।
৬। ১০, ১২১।
৭। ১০, ১৯০।
৮। ১০, ৭২, ২।
৯। ১০, ৯০।

ঋগ্বেদের যুগের ধারণা কি ছিল তা জানা যায় বিখ্যাত নাসদীয় সূক্ত থেকে[১] যার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করছি রমেশচন্দ্র দত্তের তর্জমা থেকে।

তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনা-পূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ্ব দিকে রহিলেন। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে? এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।[২]

৮। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে প্রতিফলিত ধর্মবিশ্বাস

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে যে সকল ধর্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত ধর্মব্যবস্থার গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদের অনেকটা অংশই জুড়ে আছে জাদুবিশ্বাস। ভিণ্টারনিৎস লিখেছেন[৩]

Many of these magic songs, like the magic rites pertaining to them, belonging to a sphere of conceptions which spread over the whole earth, even recur with the most surprising similarity in the most varying peoples of all countries. Among the Indians of North America, among the Negro races of Africa, among Malayas and Mongols, among the ancient Greeks and Romans, and frequently still among the peasantry of the present day Europe, we find again exactly the same views, the same strange leaps of thought in the magic songs and magic rites, as have come down to us in the *Atharvaveda* of ancient India.

১। ১০, ১২৯।

২। সৃষ্টি সংক্রান্ত ভারতীয় মতবাদসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য মৎরচিত *History of Indian Cosmogonical Ideas* (1971)।

There are then numerous verses in the *Atharvaveda*, which according to their character and often also their contents, differ just as little from the magic formulas of the American-Indian medicine-men and Tartar Shamans as from the Merseburg magic maxims, which belongs to the sparse remains of the oldest German poetry. ১

অথর্ববেদ যেমন জাদুবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, অপরাপর সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি তেমনি জাদুবিশ্বাস থেকে উপজাত যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ দিয়ে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে বিরাট বিরাট ব্যয়সাধ্য যজ্ঞের কথা আছে যেগুলিকে বলা হয় শ্রৌতযজ্ঞ, যেমন অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি। চার শ্রেণীতে বিভক্ত একটি পুরোহিত বাহিনী এই সকল যজ্ঞ পরিচালনা করেন যাঁরা হচ্ছেন হোতৃ, উদ্গাতৃ, ব্রহ্মা ও অধ্বর্যু। এইসব যাগযজ্ঞের ব্যাপারে পণ্ডিতেরা কয়েকটি সরল ধারণা পোষণ করেন। অথর্ববেদের জাদুবিশ্বাসমূলক মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য হল যে এগুলি তথাকথিত অসভ্য অনার্যদের জিনিস যা বেদে ঢুকে গেছে, আর যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের যাগযজ্ঞের ব্যাপারে তাঁদের মত হল যে এগুলি অধঃপতিত পুরোহিততন্ত্রের জবরদস্তি। বটকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন ঃ

It is clear that the intellect and mentality revealed by the extensive Brahmana texts was the monopoly of the cabalistic priests of the later Vedic age, and not a characteristic of the enlightened sections of the peoples. As literature, the Brahmanas, digressive portions apart, may prove to be of interest only to the students of abnormal psychology. At the risk of a little exaggeration it may perhaps be maintained that all that is noble and beautiful in Hinduism was foreshadowed already by the *Rgveda* and all that is filthy and repulsive in it, by the Brahmanas. ২

এটি শুধু বটকৃষ্ণ ঘোষের নিজস্ব মত নয়, বৈদিক সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কাজকর্ম করেছেন প্রায় সকল মহামহোপাধ্যায়েরই এই ধারণা। অথচ, উপনিষদ্, যাতেও যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ বড় কম নেই, তাঁদের মতে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সুবর্ণময় ফসল। আমরা পরে দেখব যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আধুনিক ধারণাগুলি অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট।

এরপর অপরাপর বিষয়ে আসা যাক্। অথর্ববেদে ইন্দ্র, অগ্নি প্রমুখ ঋগ্বেদের দেবতারা রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চরিত্রের আমূল বদল হয়েছে। তাঁরা নিছকই দৈত্যবধকারী। তাঁদের পিছনকার প্রাকৃতিক ভিত্তি একেবারে লুপ্ত হয়েছে। অথর্ববেদে কিছু নূতন দেবতার আবির্ভাব দেখা যায় যাঁদের চরিত্রে একেশ্বরবাদী প্রবণতা রয়েছে। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য প্রজাপতি, যিনি বিশ্বচরাচরের

১। M. Winternitz, *History of Indian Literature* (1927), I. 128.
২। B. K. Ghosh in *The Vedic Age* (1971 rep.), 422.

স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা হিসাবে কল্পিত। রুদ্র-শিবও অথর্ববেদে নূতন আমদানী, যিনি ঋগ্বেদের রুদ্রের থেকে পৃথক্, এবং যাঁর কল্পনা পরবর্তীকালের শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শিবকল্পনার সূচনা করে। একটি সূক্তে পৃথিবী-দেবী বন্দিত হয়েছেন,১ অপর একটি সূক্তে সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ধারণার আভাস আছে।২ সৃষ্টির প্রথম কারণ হিসাবে অথর্ববেদের বিভিন্ন স্থানে কাল,৩ প্রাণ৪ ও কামের৫ ধারণা পাওয়া যায়। রোহিত সূক্তসমূহে৬ সূর্যকেই সৃষ্টির মূল কারণ বলা হয়েছে। সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে ব্রহ্মের ধারণাও অথর্ববেদে উপস্থিত।৭

ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহেও ঋগ্বেদের দেবতাদের চরিত্রের পরিবর্তন এবং অনেক ক্ষেত্রে অবলুপ্তিও লক্ষ্য করা যায়। নূতন দেবতাদের মধ্যে প্রজাপতি ও রুদ্রের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রজাপতি শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি যজ্ঞেরও প্রতীক, মর্ত্যলোকের রাজার চরিত্রের কিছুটা প্রতিচ্ছবি। রুদ্রের এখানে একটি নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভূতপতি হিসাবে প্রজাপতিকে শাস্তি দিয়েছিলেন নিজ কন্যার সঙ্গে উপগত হবার অপরাধে। তিনি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছেদে নিজেকে আবৃত করে যজ্ঞস্থলে আসেন ও যজ্ঞে নিহত পশুকে দাবি করেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে বিষ্ণুও যথেষ্ট প্রাধান্য অর্জন করেছেন। তাঁকেও যজ্ঞের সঙ্গে সমীকরণ করা হয়েছে। একেশ্বরবাদী প্রবণতা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্ম শব্দটিও এখানে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই শব্দটি ঋগ্বেদে মন্ত্র, প্রার্থনা, যাদু, কৌশল, পুরোহিত প্রভৃতির প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে এই শব্দটির দ্বারা বুঝিয়েছে সৃষ্টিমূলক আদর্শ, অস্তিত্বের মূল কারণ। সৃষ্টি সংক্রান্ত অনেক কাহিনীই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পাওয়া যায় যেগুলি আপাত অবোধ্য যজ্ঞমূলক পরিভাষায় ভরপুর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রজাপতি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যিনি তপ ও আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একথাও বলা হয়েছে যে প্রজাপতিও সৃষ্ট জীব যিনি আদিম জলরাশি থেকে অথবা ব্রহ্ম থেকে অথবা অবিদ্যমান সত্তা থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। অস্তিত্বের মূলে আছে কাম যা সকল সৃষ্টির পিছনকার চালিকা শক্তি। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের কিছু পূর্বাভাস ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে মৃত্যু ও পরলোক সংক্রান্ত চিন্তাসমূহের নানা দিক, পরবর্তী কালের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তর তত্ত্বের সূচনা করে। এখানে বলা হয়েছে কর্তব্য পালনই পুণ্য, যার ফলাফল মৃত্যুর পর ভোগ করা যায়। কর্তব্যগুলি নির্দিষ্ট। দেবঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতি কতকগুলি ঋণ নিয়েই মানুষ জন্মায়, যা জীবনভোর পরিশোধ করতে হবে দেবপূজা, বেদপাঠ, শ্রাদ্ধ, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করে। এর ফল স্বর্গ, যেখানে মানুষ যাত্রা করবে মরুৎগণের ঘাড়ে চেপে, এবং তাদের প্রদত্ত শীতল বাতাসে নূতন দেহ লাভ করে পিতৃগণের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করবে এবং যমলোকের পাকাপাকি বাসিন্দা হবে। তার বংশধরেরা তার উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ করবে যমলোকে তাতেই তার পুষ্টি ঘটবে। অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে নরকেরও বর্ণনা আছে। দেবযান ও পিতৃযানের ধারণাও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বর্তমান। জন্মান্তর ও কর্মফলবাদের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যখন বলা হয় যে মৃত্যুর যন্ত্রণা মানুষকে শুধু একবারই ভোগ করতে হয় না, বারবার বিভিন্ন

১। ১২, ১। ২। ৪, ১৬। ৩। ১৯, ৫৩, ৫-৬।
৪। ৯, ৪। ৫। ৯, ২। ৬। ১৩, ১-৪। ৭। ১১, ৮।

জন্মে ভোগ করতে হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে[১] বলা হয়েছে যে, এই জগতে মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করবে প্রতিদানে সেই খাদ্য তাকে গ্রহণ করবে অন্য জগতে। এর মধ্যে কর্মফল তত্ত্বের পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে।

ভারতীয় পরলোক তত্ত্বের বিবর্তনের কাঠামোটা নিম্নরূপঃ ঋগ্বেদে একটি স্বর্গের ধারণা আছে, মৃতের বিভিন্ন গতিপথ এবং বিভিন্ন লোক-এর (দেবলোক, পিতৃলোক, যমলোক প্রভৃতির) অস্পষ্ট ধারণা আছে যেগুলির সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের পাপ পুণ্যকে যোগ করার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই বিষয়গুলি অনেক সুস্পষ্ট হয়েছে পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে, যেখানে ওই সকল ধারণার সঙ্গে বাড়তি যুক্ত হয়েছে একটি অস্পষ্ট জন্মান্তর ও কর্মফলের ধারণা, যার ভিত্তি কৃষি নির্ভর জীবনচর্যা, যেমন বপন করবে তেমন ফসল তুলবে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বর্ণনা থেকে একই মানুষের জীবনে পরপর জন্ম মৃত্যুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে পরবর্তীকালে সংসারচক্রের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এরই তাত্ত্বিক পরিণতি মোক্ষের ধারণা, যা হচ্ছে বার বার জন্ম মৃত্যুর দায় থেকে পাকাপাকি মুক্তিলাভ, এই আবর্ত থেকে বরাবরের মুক্তি, যা পরবর্তীকালে অধিকাংশ ভারতীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।

৯। যজ্ঞ কথা

বৈদিক ধর্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যজ্ঞ। ঋগ্বেদে মোটামুটি দু'ধরনের যজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত যজ্ঞ-সমূহকে বলা হয় গৃহ্যকর্মাণি যেখানে গৃহকর্তা পরিবার-পরিজনসহ কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দেবতাকে নিজ বশবর্তী করার অভিপ্রায়ে অগ্নিতে নানা ধরনের সামগ্রী, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘৃত, আহুতি দেন। সমষ্টিগত যজ্ঞ একটা বৃহৎ ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে যা সোমযাগ নামেও পরিচিত, যেখানে যজমান বা মূল যজ্ঞকারীকে বেশ কিছু ব্যয় করতে হয়, বহু লোক অংশগ্রহণ করে, পেশাদার পুরোহিতেরা দক্ষিণার বিনিময়ে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে, এবং সমারোহ করে লোক খাওয়ানো হয়, এই উদ্দেশ্যে অনেক পশুবলি দেওয়া হয়, সোমরস ও সুরার প্লাবন ঘটে। অবশ্য এরকম এলাহী কাণ্ডের পরিচয় ঋগ্বেদে ততটা পাওয়া যায় না, যতটা পাওয়া যায় পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির যুগে। ঋগ্বেদের সমষ্টিগত যজ্ঞের ব্যাপারটা আরও একটু সরল, কেন না তখন সামাজিক ভেদাভেদ গড়ে উঠলেও তা খুব তীব্র হয়নি। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঋগ্বেদের দুটি সূক্তে[২] অশ্বমেধের উল্লেখ আছে যার সঙ্গে পরবর্তীকালের বিরাট ও পল্লবিত অশ্বমেধের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে বলা হয়েছে কেন এবং কি করে অশ্বটিকে নিহত করতে হবে। প্রথমে অশ্বটিকে আদিত্য, ত্রিত ও যমের সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করা হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে ভক্ষিত হবার পর অশ্বটি সোজা স্বর্গে যাবে। তারপর অশ্বটিকে স্বরু দ্বারা অভিষিক্ত করা হয় এবং তার চারিদিকে একটি জ্বলন্ত মশাল তিনবার ঘোরানো হয়। তারপর অশ্বটিকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়, তার পাঁজরের হাড়গুলিকে পৃথক্ করা হয়। উখা নামক একটি পাত্রে সেই মাংস রান্না করা হয়। তার একটি টুকরো অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়,

---

১। ১২, ৯, ১, ১।　　২। ১, ১৬২-৬৩।

এবং তারপর সকলে মিলে উচ্চকণ্ঠে আঘু, যাজ্যা, বষট্‌কারা ধ্বনি সহযোগে তা ভক্ষণ করে।

উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানটি থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ঋগ্বেদের পশুপালক মানুষদের একটি শিকারজীবী অতীত ছিল, যে যুগের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পশুপালক পর্যায়ের নূতন ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে এসেও তারা ছাড়তে পারেনি। আমরা আগেই বলেছি, শিকারজীবী মানুষদের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে ভক্ষ্য পশুগুলির ভূমিকা থাকে। নিহত পশুগুলির উপর এক ধরনের পবিত্রতা আরোপ করা হয়, তারপর সকলের নানা প্রকার ধ্বনি ও নৃত্যের মাধ্যমে তাকে ভক্ষণ করা হয়। ঋগ্বেদের উপরি-উক্ত অশ্বমেধ একটি Collective eating ritual, আর এই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিই বলিদান-প্রথার মূল প্রেরণা। ঋগ্বেদের দেবকল্পনায় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ বিরাজ করলেও তাদের সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে তাদের শিকারজীবী পর্যায়ের ঐতিহ্য অর্থাৎ বলিদান প্রথা তারা পরিত্যাগ করেনি। বরং পরবর্তীকালে যজ্ঞ-প্রথা আরও জটিল ও পল্লবিত হয়ে ওঠায় বলিদানেরও ব্যাপকতা আরও বেড়েছিল। পরবর্তীকালে যজ্ঞপ্রথা সুবিধাভোগী শ্রেণীর করতলগত হলেও, এবং তা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হলেও, যজমানকে পুরাতন সমষ্টিবাদী ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করতে হত, সেখানে বহু মানুষের সমাগম ঘটানো হত এবং তাদের ভক্ষ্য ও পেয় দ্বারা সন্তুষ্ট করা হত। এক অশ্বমেধ যজ্ঞেই এই উদ্দেশ্যে প্রায় হাজারখানেক পশুবলি দেওয়া হত। এই একত্র পান ভোজন নিঃসন্দেহে অতীত যুগের সমবেত জীবনযাত্রার স্মারক। যা এককালে ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার, পরবর্তী যুগে সেই জীবনচর্যা, দু'চার দিনের জন্য হলেও, অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হত। এ যুগের ঐতিহাসিকদের চোখে সে যুগের যজ্ঞকার্যে ব্যাপক পশুহত্যার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি। তাঁরা একালের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়েছেন যে কারণে পশুবলির আসল উদ্দেশ্যটাই তাঁদের নজর এড়িয়ে গেছে। পশুবলির নিষ্ঠুরতার দিকটাই তাঁদের চোখে পড়েছে, যেটাকে তাঁরা ধর্মের গ্লানি ও পুরোহিতদের বদমায়েশী বলে ঘোষণা করেছেন, শুধু এটুকু খেয়াল করেননি যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিদের কিছু খেতে দিতে হবে, আর তার জনাই পশুবলির প্রয়োজন। যত বড় যজ্ঞ, যত বেশি লোক, তত বেশি পশুবলি দরকার। আজকের দিনে সমষ্টিগত ভোজন উঠে গেলেও দুর্গাপূজা, ঈদ বা বড়দিন উপলক্ষে পরিবার-পরিজন-বন্ধু-বান্ধবসহ ভোজনের জন্য যে আন্দাজ পশুবধ করা হয় তার তুলনায় বৈদিক যুগের যজ্ঞে নিহত পশুর সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর।

বৈদিক যজ্ঞ আদিতে জাদু অনুষ্ঠানই ছিল, যা সম্পাদিত হত সমবেতভাবে। জাদু-অনুষ্ঠানের মূল কথা হচ্ছে, আমরা যা আগেই বলেছি, নানা ধরনের কাল্পনিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে প্রকৃতিকে সরাসরি বশ করার প্রচেষ্টা—বাস্তব কলাকৌশলের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক কাল্পনিক কলাকৌশল। একমাত্র আদিম যৌথ জীবনের পটভূমিতেই জাদুর আসল তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। আদিম জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের মূলসূত্রগুলির সাদৃশ্য এত বেশি যে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রথমটির প্রভাব কোন দায়িত্বশীল বেদবিদ্‌ই অস্বীকার করেন নি। অবশ্য যজ্ঞের আদিরূপ ও উত্তররূপ এক নয়। ভিণ্টারনিৎস বলেছেন:

The majority of the sacrificial ceremonies, as also the Yajus formula do not aim at 'worshipping' the gods but at

influencing them, at compelling them to fulfil the wishes of the sacrificer.১

কীথের মত বেদবিদ্‌কেও স্বীকার করতে হয়েছে যাগযজ্ঞের সঙ্গে প্রাচীন জাদু-বিশ্বাসের সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

In the vast majority or these cases the nature of the ritual can be solved at once by the application of the concept of sympathetic magic, and this is one of the most obvious 'and undeniable facts in the whole of the Vedic sacrifice: it is from the beginning to end full of magic elements.২

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বাস্তব কলাকৌশলের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক কাল্পনিক কলাকৌশল হিসাবে আদিম যুগের জাদুবিশ্বাস একটা অর্থনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করত। যেহেতু সেই সুপ্রাচীন যুগে উৎপাদনের হাতিয়ার ছিল নগণ্য ও অপর্যাপ্ত, সমবেত জাদু-অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া উদ্দীপনার মূল হাতিয়ার হিসাবে বড় কম ছিল না। প্রতিটি জাদু-অনুষ্ঠানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্যসংগ্রহ বা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্যার জেমস ফ্রেজারের মত পণ্ডিত-কুলশ্রেষ্ঠের চোখেও এই সহজ ব্যাপারটা ধরা পড়েনি। বৈদিক যজ্ঞেরও মূল প্রেরণা ওই খাদ্য। বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে প্রাচীনতর যজ্ঞসমূহ সত্র নামে অভিহিত হত। এইরকম একটি সত্রের নাম মহাব্রত যার অর্থ অন্ন।৩ একটি প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞের নাম বাজপেয় যার অর্থ 'খাদ্য ও পানীয়'। যদিও পরবর্তীকালে এই যজ্ঞের উদ্দেশ্যের বদল হয়েছিল, তথাপি কীথ যথার্থভাবেই ধরতে পেরেছিলেন যে পূর্বে এটি একটি কৃষিসংক্রান্ত অনুষ্ঠান ছিল।৪

যজ্ঞকার্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে সঙ্গীত বা সামগান, যা পাঁচ ভাগে বিভক্ত—হিংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার ও নিধন। শুধু সঙ্গীতই নয়, যজ্ঞের ক্ষেত্রে নৃত্য ও অভিনয়ের (কোন ঘটনা বা কাহিনীর অনুকরণ, জাদুবিশ্বাসের যা অন্যতম পদ্ধতি) বিশেষ ভূমিকা ছিল। বলা যেতে পারে যে সঙ্গীত, নৃত্য এবং অভিনয়, একই শিল্পকলার বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যা কোন অবসর বিনোদনের শিল্পকলা নয়, জীবনযাত্রার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, জীবনসংগ্রামের একটি মূল্যবান হাতিয়ার। কাজের তাল থেকেই মানুষের ভাষায় ছন্দের জন্ম হয়েছে, তা থেকে সঙ্গীত ও নৃত্য; নৃত্য থেকেই চিত্র, অর্থাৎ অঙ্কন ও ভাস্কর্য, যা প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রকারেরা সঠিকভাবে বলেছেন। শ্রমের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যের এই সম্পর্কটিকে আজও খুঁজে পাওয়া যায় ধান কাটার গানের মধ্যে, ছাদ পেটাবার গানের মধ্যে, নৌকা বাওয়ার গানের মধ্যে, ভারি জিনিস বহন করার গানের মধ্যে, যেখানে স্বয়ং

১। M. Winternitz, *op. cit.* I. 181.

২। A. B. Keith *Religion and Philosophy of the Veda* (HOS, 21, 1225) 258-59.

৩। শতপথ ব্রাহ্মণ ৪, ৬, ৪, ২; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৪, ১০, ২; P. V. Kane, *History of Dharmasastra* (1941), II. 1243.

৪। A. B. Keith, *The Veda of the Black Yajus School* (1914), cx-cxi.

দলের সর্দার সঙ্গীতের দায়িত্ব নেয়। পরবর্তীকালের টীকা ভাষ্যসমূহে বলা হয়েছে যে বৈদিক সংহিতার প্রতিটি মন্ত্রেরই কোন না কোন যজ্ঞে প্রয়োগ বা বিনিয়োগ ছিল। সামগান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রীয় নির্দেশ হল ওই গান গাইবার সময় পুরোহিতদের নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে হাত ও আঙুল নাড়াতে হবে এবং বিভিন্ন ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করতে হবে। আমরা আগেই বলেছি যে আদিম সমাজে গান বলতে আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ কণ্ঠসঙ্গীত বোঝায় না, তার সঙ্গে নৃত্য ও অভিনয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চোখে পড়ে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে অনায়াসেই আসা যায় যে ঋগ্বেদের অন্তর্গত এই সামগানগুলির মধ্যে আদিম যুগের জাদু বিশ্বাসসমূহের নিদর্শন টিঁকে আছে।

অভিনয় ও নাটকের মূলও জাদুবিশ্বাসের মধ্যে, যার আদি উদ্দেশ্য অনুকরণ-মূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছানুবর্তী করা। ঋগ্বেদের বহুস্থলে সংলাপমূলক সূক্ত আছে।১ এই জাতীয় প্রাচীন সংলাপসমূহ আদি ভারতীয় নাটকের নিদর্শন, বিভিন্ন যজ্ঞে বা আচার অনুষ্ঠানে যেগুলির আবৃত্তি বা অভিনয় বাধ্যতামূলক ছিল। উর্বশী ও পুরূরবার সংলাপ থেকে জানা যায় যে সুপ্রাচীন-কালে পুরূরবাকে কোন যজ্ঞে বলি দেওয়া হয়েছিল, যে ঘটনার অভিনয় পরবর্তী-কালের বলিদানমূলক যজ্ঞসমূহের বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে পুরোহিত ও রাজমহিষীদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের সংলাপ বিনিময় অত্যাবশ্যক ছিল। ওই সংলাপগুলি থেকে একটি অধিকতর পুরাতন যুগের রীতি খুঁজে পাওয়া যায়, যে রীতি অনুযায়ী মহিষীর সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক যৌনসংসর্গের পরে পুরোহিতকে নিহত হতে হত। পরবর্তীকালে এই প্রথা উঠে গিয়েছিল, এবং পুরোহিতের স্থলে বলি দেওয়া হত একটি অশ্বকে, যার সঙ্গে মিলিত হবার ভান মহিষীকে করতে হত আর তখনই পুরাতন আমলের ঘটনাটির অনুকরণ বা অভিনয় করা হত। অনুরূপভাবে রাজসূয় যজ্ঞে শুনঃশেপের কাহিনীর অভিনয় করা হত।

অবশ্য একথা একশোবার স্বীকার করতে হবে যে যজ্ঞের আদিরূপ ও পল্লবিত রূপ এক নয়। ঋগ্বেদোত্তর যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করেছিল, এমন কি সেগুলির আদি উদ্দেশ্যও বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছিল। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির যুগে একটি পুরোদস্তুর পুরোহিততন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং চার শ্রেণীর পুরোহিতের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সূত্র সাহিত্যের যুগে একটা সাধারণ ধরনের যজ্ঞেই সতেরজন পুরোহিতের প্রয়োজন হত। শ্রৌতসূত্রসমূহে আমরা হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্যু ছাড়াও পোতৃ, নেষ্টৃ, অগ্নীধ, উপবক্তৃ, প্রশাস্তৃ, প্রতিহোতৃ প্রভৃতি নানা ধরনের পুরোহিতের সাক্ষাৎ পাই। রাজসূয় বা অশ্বমেধের মত বৃহৎ যজ্ঞ ছাড়াও আরও নানা ধরনের ছোট বড় যজ্ঞের চলন ছিল, যেগুলির কোন কোনটির অতীত সন্ধান করলে পাওয়া যায়। যেমন ইষ্টি ধরনের যজ্ঞগুলি প্রাচীনতর যুগের অমাবস্যা-পূর্ণিমার অনুষ্ঠান-সমূহের পল্লবিত রূপ, যেগুলিতে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশ্যে পশুবলি দেওয়া হত। সোমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি থেকে পরবর্তীকালের বলিদান-মূলক বহু যজ্ঞের উদ্ভব হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রধান। এগুলি ছাড়াও গৃহ্য বা ঘরোয়া যজ্ঞের প্রচলন ছিল। পূর্বোল্লিখিত শ্রৌত যজ্ঞসমূহের

১। ১, ১৬৫; ১, ১৭৯; ৩, ৩৩; ৪, ১৮; ১০, ১০; ১০, ১৪; ১০, ৯৫; ১০, ১০৮; ১০, ১৩৫।

সঙ্গে গৃহ্য যজ্ঞসমূহের পার্থক্য ছিল নিছক পরিমাণগত। শস্য, পশু ও ঘৃত দিয়ে আহুতি উভয় প্রকার যজ্ঞেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং অগ্নিই ছিল এই আহুতি প্রদানের মাধ্যম। যজ্ঞাগ্নি তিন ধরনের—গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণা।

প্রাক্-বিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণী সমাজে উত্তরণ যজ্ঞপ্রথার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই দেখা যেতে পারে। শ্রৌত ও গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের যে পল্লবিত রূপ আমরা দেখি তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যজমানের স্বার্থরক্ষার্থেই যার আয়োজন, যদিও শ্রৌত যজ্ঞগুলির ক্ষেত্রে পুরাতন সমষ্টিবাদী জীবনের স্মারক খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন সত্রযাগসমূহ একেবারেই সমষ্টি নির্ভর, যেখানে যজমান একাধিক এবং তারাই পুরোহিত।১ যজমান শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে মনিয়ের উইলিয়মস্ লিখেছেনঃ

The person paying the cost of a sacrifice, the institutor of sacrifice (who, to perform it, employs a priest or priests, who are often hereditary functionaries in a family) any patron, host, rich man, head of a family or tribe.২

উত্তরকালে অবশ্য যজমান বলতে উক্ত সংজ্ঞাই বুঝিয়েছে। কিন্তু আদিতে বোঝাত কিছুটা ভিন্ন ব্যাপার। যজমান যজ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যার সঙ্গে শানচ্ প্রত্যয় যোগ হয়েছে। পাণিনির মতে৩ যখন কোন ব্যক্তি কোন নিজকৃত কাজের ফলভোগী হচ্ছে এই রকম ইঙ্গিত পাওয়া যাবে তখনই ধাতুর সঙ্গে শানচ্ প্রত্যয় যোগ করতে হবে। এদিক থেকে দেখলে যজমান বলতে বোঝায় যে নিজ স্বার্থে যজ্ঞ করে। পরবর্তী যুগেও যজমান যজ্ঞের ফলভোগী, যদিও সে যজ্ঞ নিজে করে না, পুরোহিতেরা তার হয়ে করে এবং বিনিময়ে প্রচুর দক্ষিণা পায়। কিন্তু একদা যে যজমান নিজেই পুরোহিত ছিল, শুধু তাই নয়, বহু যজমান সমবেত ভাবে নিজেরা যজ্ঞ করত, অর্থাৎ শব্দটি যে তার প্রকৃত শব্দগত অর্থেই প্রযুক্ত হত তার বিস্তৃত পরিচয় ঋগ্বেদ থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঋগ্বেদে এমন নিদর্শন প্রচুর আছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে যজমানেরা একত্রে নিজেরাই পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নিয়ে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করত।৪ সত্রযাগ যে প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজের সমষ্টিবাদী জীবনচর্যাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা ওল্ডেনবার্গ ও কীথের মত বিদ্বানদের দৃষ্টি এড়ায়নি।৫ গঙ্গানাথ ঝা তো সত্রযাগকে পরিষ্কার communistic sacrifice বলে উল্লেখ করেছেন।৬

পরবর্তীকালে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের সমবেত জীবনচর্যার অবসান ঘটে। যজমানরা এখন কোন সমষ্টিগত সত্তা নয়। তারা অর্থবান ব্যক্তি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়। যজ্ঞক্রিয়াও এখন তাদের কাজ নয়।

১। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১, ৬, ১৪; জৈমিনি-সূত্র ৬, ২, ১; ৬, ৬, ১৬, ২৩; ১০, ২, ৩৪-৩৮; ১০, ৬, ৪৫-৫৯ শবরভাষ্যসহ দ্রষ্টব্য।

২। M. Monier-Williams, *Sanskrit-English Dictionary* (1899), 839.

৩। ১, ৩, ৭২।

৪। ঋগ্বেদ ১, ২৭, ১১; ১, ৫১, ৮; ১, ৮১, ২; ১, ৮৩, ৩; ১, ৯২, ৩; ১, ১২৭, ২; ১, ১৩৮, ৪; ৪, ১৭, ১৫; ১০, ১৭, ১৯; ১০, ৪৫, ১১; ১০, ১২২, ৮; ১০, ১৫১, ৪।

৫। A. B. Keith, *Religion and Philosophy of the Veda*, 290.

৬। G. Jha, *Purvamimamsa and Its Sources* (1942), 318f:

ওটা পেশাদার পুরোহিত শ্রেণীর। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনী থেকে জানা যায় যজ্ঞ একদা দেবগণকে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তখন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণরা তাঁকে অনুসরণ করেন ফিরিয়ে আনার জন্য। শাসক শক্তির প্রতীক ক্ষত্রিয়েরা অস্ত্রবলে তাঁর নাগাল পেল না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা পেল, কেন না যজ্ঞ তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে তাদের মধ্যেই নিজের শক্তিকে দেখলেন। কাজেই তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে ফিরতে রাজি হলেন এবং এও বললেন যে তিনি ক্ষত্রিয়দের সঙ্গেও থাকবেন যদি তারা ব্রাহ্মণদের নির্ভর করে।[১]

কাহিনীটির তাৎপর্য অসাধারণ। যজ্ঞ কিভাবে প্রাক্-বিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে চরিত্র বদল করে উঠে এল, কিভাবে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর আঁতাত ঘটল, তার চমৎকার নিদর্শন এখানে রয়েছে। নিম্নে মূলের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল।

যজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল; ব্রহ্ম ও ক্ষত্র যজ্ঞের অনুগমন করিয়াছিলেন।...যজ্ঞের যে সকল আয়ুধ তাহাই ব্রহ্মের আয়ুধ; আর অশ্বযুক্ত রথ, কবচ ও বাণযুক্ত ধনু ইহাই ক্ষত্রের আয়ুধ।...ক্ষত্র তাহাকে ধরিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্ম তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন...এইরূপে। [পথ] রুদ্ধ হইলে যজ্ঞ দাঁড়াইল ও ব্রহ্মের নিকট আপনারই আয়ুধসকল দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেই হেতু অদ্যাপি যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তখন ক্ষত্র সেই ব্রহ্মের অনুগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর। ব্রহ্ম বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি আপনার আয়ুধ-সকল ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ লইয়া...যজ্ঞের নিকটে উপস্থিত হও।...সেই হেতু অদ্যাপি ক্ষত্রিয় যজমান আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট গমন করেন।[২]

১০। ঋতের অবলুপ্তি ও বরুণের বিপর্যয়

ঋগ্বেদের দেবতাদের কথা বলতে গিয়ে আমরা ঋত নামক একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছি। ভিণ্টারনিৎসের মতে ঋত order of the universe,[৩] ম্যাকডোনেলের মতে physical and moral order।[৪] রাধাকৃষ্ণ লিখেছেন:

Ṛta literally means 'the course of things'. It stands for law in general and the immanence of justice. This conception must have originally been suggested by the regularity of the movement of the sun, moon and stars, the alternations of day and night, of the seasons. Ṛta denotes the order of the world. Everything that is ordered in the universe has Ṛta for its principles. It corresponds to the *Universals* of Plato. The world of experience

---

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ১৯।
২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ৫৯৯-৬০০।
৩। M. Winternitz, *op. cit.* 154.
৪। A. Macdonell, *History of Sanskrit Literature* (1905) 75.

is a shadow or reflection of the Ṛta, the permanent reality which remains unchanged in all welter of mutation.১

কিন্তু ব্যাখ্যাটি একপেশে, কেননা ঋত বলতে আরও কিছু বোঝাত, যেদিকে পণ্ডিতেরা হয়ত ইচ্ছা করেই নজর দেননি। ঋত প্রসঙ্গে যেটা সর্বাগ্রে লক্ষণীয় তা হচ্ছে বৈদিক কবিরা ঋতের অবলুপ্তির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, এবং সেই ঋতের শাসন যাতে আবার ফিরে আসে তার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করছেন। ঋত যদি নিছকই নিয়মশাসিত প্রকৃতির প্রতীক হয়, তাহলে তা অবলুপ্তই বা হবে কেন, সেই অবলুপ্তির জন্য বিলাপই বা করা হবে কেন, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রার্থনাই বা করা হবে কেন? তাহলে নিশ্চয়ই আরও কিছু ওই ঋত শব্দটির দ্বারা বোঝাত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

The Ṛta assured the poets their cows, their water, their food, and in fact everything they considered as constituting material wealth. Being these intimately connected with the essentially practical considerations, the concept of Ṛta was yet to acquire any spiritual significance. Ṛta, the order of nature, was also understood by the poets and their kinsmen as the most potent force assuring them of their means of subsistence.২

বক্তব্যটি যে কত সত্য পাদটীকায় উল্লিখিত ঋগ্বেদের শ্লোকগুলি দেখলেই প্রমাণিত হবে,৩ যেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে ঋত মানুষকে অন্ন, গোধন ও জীবনের অপরাপর প্রয়োজন উপকরণ নিশ্চিত করে, ঋতই সব কিছুর পরিচালক। তাই মনে হয় ঋত এমন একটা জিনিস, এঙ্গেলসের ভাষায় যাকে বলা যায় simple moral grandeur of ancient gentile society, সোজা কথায় প্রাচীন ট্রাইবাল সমাজের ন্যায়নীতির অনুশাসন, যার অবলুপ্তির বেদনা বৈদিক কবিরা বোধ করেছিলেন।

ঋতের রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বরুণ, যিনি মহান দেবতা, মহান দাতা, সত্যনিষ্ঠ, কিন্তু অন্যায়কারীর প্রতি কঠোর। তিনি ধৃতব্রত, ন্যায়ের রক্ষক। ম্যাকডোনেল লিখেছেন :

His wrath is roused by sin, the infringement of his ordinances, which he severely punishes (*RV*. VII. 86. 3-4). The fetters (*pasah*) with which he binds sinners are often mentioned (1.24.15. etc.). They are cast sevenfold or threefold, ensnaring the man who tells lies, passing by him who speaks truth (*AV*, IV. 16.6.)...On the other hand, Varuna is gracious to the penitent. He unites like a rope and removes sin (II. 28.5; V. 85. 7-8). He releases not only from sins which men themselves commit, but from

---

১। S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy* (1927) I. 78-79.

২। D. Chattopadhyaya, *Lokayata*, 622.

৩। ১, ১৩২, ৩; ১, ১৪১, ১; ১, ১৫১, ৩-৮; ২, ২৭, ১২; ৩, ১, ১১; ৩, ২০, ৪; ৩, ৫৪, ৪; ৩, ৫৬, ২; ৩, ৬১, ৬; ৪, ২, ১৬; ৪, ২৩, ৮-১০; ৪, ৫১, ৭-৮; ৪, ৫২, ২; ৫, ৮, ১; ৫, ৪১, ১; ৭, ৬৬, ১৩ ইত্যাদি।

those committed by their fathers (VII. 86.5)...Varunas ordinances are constantly said to be fixed, the epithet Dhrtavrata being pre-eminently applicable to him...the gods themselves follow Varuna's ordinance.১

একমাত্র সুপ্রাচীন অবিভক্ত সমাজের পটভূমিকাতেই বরুণের চরিত্র ব্যাখ্যা করা যায়, যিনি ঋতের রক্ষক, সামাজিক ন্যায়নীতির অনুশাসনগুলিকে যিনি কার্যকর করেন, যাঁর চরিত্রের কঠোরতা শুধু সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার খাতিরেই। কিন্তু শ্রেণী-বিভাগ যখন প্রতিষ্ঠিত হল, যে সমাজের মূলমন্ত্র এঙ্গেলসের ভাষায় base greed, brutal sensuality, sordid avarice, selfish plunder of common possessions,২ বরুণ চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হল, আর তা হবার পর যা বাকি রইল তা হল নিছকই নিষ্ঠুরতা। যিনি ছিলেন মহান দাতা তিনি হলেন নাছোড়বান্দা পাওনাদার। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপ উপাখ্যানে দেখা যায় যে হরিশ্চন্দ্র তাঁর পুত্র রোহিতকে বরুণের কাছে বলি দেবেন বলে মানত করে তাঁকে বারবার ফাঁকি দিয়েছিলেন। আর বরুণও পাওনাদার হয়ে তাঁর সঙ্গে লেগে ছিলেন বছরের পর বছর, এবং রোহিতের বিকল্প হিসাবে শুনঃশেপকে না পাওয়া পর্যন্ত তাগাদায় ক্ষান্তি দেন নি। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বরুণ সত্যই এক দুঃস্বপ্ন। কীথ যথার্থই লিখেছেন ঃ

The figure of Varuna does not increase in moral value in the course of the development of the Vedic religion...Varuna is remembered as the god who has fetters and becomes in the Brahmanas a dreaded god whose ritual in some measure is assimilated to that of the demons and the dead. After the performance of the bath, which ends the Agnistoma sacrifice, the performer turns away and does not look back to escape from Varuna's notice, and in the ceremony of that bath when performed after the horse-sacrifice, a man of peculiar appearance is driven into the water and an offering made on his head, as being representative of Varuna. This form of the expulsion of evils shows Varuna reduced to a somewhat humble level, and degraded from his Ṛgvedic eminence.৩

এ বরুণ ঋগ্বেদের বরুণের প্রেত ছাড়া আর কিছুই নয়। সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রের শোচনীয় রূপান্তর ঘটেছে। যে অধঃপতিত সমাজে বরুণের এই দশা হয়েছিল তার নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায় শুনঃশেপের পূর্বোল্লিখিত কাহিনীতে,৪ যে সমাজে পিতা মাত্র একশোটি গাভীর বিনিময়ে নিজ পুত্রকে বিক্রয় করে, আরও একশো গাভীর বিনিময়ে তাকে বন্ধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, আরও

১। A. Macdonell, *Vedic Mythology*, 26.
২। F. Engels, *Origin of Family, Private Property and State* (1952), 163.
৩। A. B. Keith, *op. cit.* 247-48.
৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭, ১৩ প।

একশো গাভীর বিনিময়ে তাকে হত্যা করতে রাজি থাকে। শুনঃশেপ একটা যজ্ঞের বলি নয়। নির্মম সমাজব্যবস্থার বলি। এই অবস্থাকেই বৈদিক কবিরা বলেছেন ঋতের বিনাশ, নির্ঋতি, যে দুর্গতিকারী শক্তির মত্ততায় অস্থির হয়ে বৈদিক কবি বলছেন: আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, হে যজ্ঞ, অতীতের সেই ঋত কোথায় গেল? নূতন কে তা ধারণ করছে? তোমাদের ঋত কোথায়? হে দেবতাগণ, ঋতের বন্ধন কোথায়? কোথায় গেল বরুণের সেই অতন্দ্র প্রহরা?১

১১। বৈদিক যজ্ঞ ও যৌনাচারসমূহ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা কৃষিজীবীদের মাতৃপ্রাধান্যমূলক ধর্মে যৌনাচার-সমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি। ঋগ্বেদের যুগের শেষ দিকে বৈদিক ট্রাইবরা উচ্চতর পশুপালনজীবীর পর্যায়ে পেঁছে গিয়েছিল যে পর্যায়ে পশুপালনের সঙ্গে কৃষিকাজের সংযুক্তি ঘটে। স্বাভাবিক নিয়মেই কৃষির উপর গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবী সমাজের মাতৃদেবী এবং তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌনাচারসমূহ বৈদিক ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়। বাজপেয় নামক যে বিখ্যাত বৈদিক যজ্ঞ বর্তমান, যার আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে খাদ্য ও পানীয়, যেখানে মাতৃদেবী ও যৌন অনুষ্ঠানসমহের বিশেষ ভূমিকা আছে। ঋগ্বেদ-পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অনেক নূতন মাতৃদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা সম্ভবত প্রাক্-বৈদিক দেবী ছিলেন এবং ধীরে ধীরে বৈদিকধর্মে স্থান করে নিয়েছিলেন। এইসব দেবীদের মধ্যে অম্বিকা, যিনি বাজসনেয়ী সংহিতায়২ রুদ্রের ভগিনী ও প্রণয়িনীরূপে উল্লিখিতা, দুর্গা, কাত্যায়ণী, কন্যাকুমারী, যাঁরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে৩ বর্তমান, কালী, করালী, ভদ্রকালী, শ্রী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদের দেবীদের তুলনায় এঁরা অনেক স্পষ্ট এবং পরবর্তী ভারতীয় ধর্মসমূহে এঁদের প্রভাব প্রচণ্ড।

ঋগ্বেদে উর্বশী ও পুরূরবার যে কথোপকথনের উল্লেখ আছে৪ তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে উর্বশীর সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক যৌন সংসর্গের পর পুরূরবাকে যজ্ঞে বলি দেওয়া হয়েছিল। ওই কাহিনীটির ব্যাখ্য প্রাসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে পুরূরবা নিজেকে যজ্ঞাগ্নির অরণিতে পরিণত করে গন্ধর্ব হয়েছিলেন।৫ সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, যে দুই অরণির ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় তারাই উর্বশী ও পুরূরবা এবং ওই ঘর্ষণ তাঁদের আনুষ্ঠানিক যৌনমিলনের প্রতীক।৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও অরণির সাহায্যে অগ্নি উৎপাদনের পদ্ধতির সঙ্গে যৌন-মিলনকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।৭

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে একটি কাহিনী পাওয়া যায় যা অনুযায়ী একটি আনুষ্ঠানিক যৌনমিলন কারনোর পর প্রজাপতিকে হত্যা করা হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের বক্তব্য হচ্ছে, প্রজাপতি তাঁর নিজ কন্যায় উপগত হন, যা দেবতাদের চোখে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সেই কারণে রুদ্র তাঁকে তীরবিদ্ধ করে নিহত করেন।৮ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে প্রজাপতি ঋষ্যের রূপ ধরে এবং তৎকন্যা রোহিত

১। ঋগ্বেদ ১, ১০৫, ৪-৬। ২। ৩, ৫৭। ৩। ১০, ১।
৪। ১০, ৯৫। ৫। ১১, ৫, ১ প। ৬। ৩, ৪, ১, ২২।
৭। ৬, ৪, ২২।
৮। ১, ৭, ৪, ১-৮; ২, ১, ২, ৯ (মাধ্য); ১, ১, ২, ৫-৬; ২, ৭, ২, ১-৮ (কান্ব)।

রূপ ধরে মিলিত হয়েছিলেন, যা দেখে দেবতারা তাঁদের সত্তার ভয়াবহ দিক্সমূহ থেকে ভূতবৎ বা রুদ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতিকে শাস্তি দেবার জন্য।১ এই কাহিনী পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়।২ উপরিউক্ত কাহিনীটির দুটি ভাষ্য থেকে যেটুকু বোঝা গেল তা হচ্ছে এই যে অগম্যাগমনের জন্য প্রজাপতি শাস্তি পেয়েছিলেন। এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা, যা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে করা হয়েছে, অন্তত আকারগত দিক্ থেকে সামঞ্জস্যহীন নয়। কিন্তু ব্যাপারটিকে অত সহজে ছাড়া যাচ্ছে না। রুদ্র যখন প্রজাপতিকে তীরবিদ্ধ করেন তখন তাঁর (প্রজাপতির) রেতঃ মাটিতে পড়ে যায়। এ-কথা কেন? ওই রেতঃ ভগ দর্শন করেন এবং তিনি তন্দণ্ডে অন্ধ হয়ে যান। পূষণ ওই রেতঃ আস্বাদন করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর দন্তগুলি হারান। ভগ দেখলেনই বা কেন, আর পূষণ চাখলেনই বা কেন? আর প্রজাপতির অপরাধে তাঁরাই বা শাস্তি পেলেন কেন? ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বক্তব্য অনুযায়ী পিতার সঙ্গে সঙ্গমের পূর্বে কন্যা রোহিতের (হরিণী) আকৃতি গ্রহণ করেছিল। সায়ণের মতে রোহিত শব্দের অর্থ ঋতুমতী : রোহিতং লোহিতঃ ভূত্বা প্রাপ্তা ঋতুমতী জাতেত্যার্থঃ। ব্যাপারটা আবার পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আচরিত মেয়েদের ঋতু-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।৩ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিষয়টি খুবই গোলমেলে, যার মূল তাৎপর্য এমন কি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির যুগেও হারিয়ে গিয়েছিল।

অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, ওই একই কাহিনী একটু ভিন্নরূপে ঋগ্বেদে বর্তমান, যেখানে প্রজাপতি ও তাঁর কন্যার ভূমিকা নিয়েছেন রুদ্র এবং উষা, এবং ব্যাপারটি মোটেই কুকার্য বলে বিবেচিত হয়নি।৪

রমেশচন্দ্র দত্তের তর্জমা থেকে আমরা প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছিঃ

যে শুক্র বীরপুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া নির্গত হইতে উন্মুখ হইল। তখন তিনি মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তাহা নিষেক করিয়া ত্যাগ করিলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই শুক্র সেক করিলেন।

যখন পিতা যুবতি কন্যার উপর (পিতা রুদ্র, কন্যা উষা—সায়ণ) পূর্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হইলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হইল, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর শুক্র সেক করিলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হইল।

যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইয়া শুক্র সেক করিলেন। সুচারু ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতারা তাহা হইতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোষ্পতিকে নির্মাণ করিলেন।

এদিক থেকে দেখলে ঋগ্বেদোক্ত যম ও যমীর কথোপকথন,৫ আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় যেন ভগ্নী ভ্রাতাকে যৌনমিলনে আহ্বান করছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থবহ, যার সঠিক তাৎপর্য আমাদের মত সেযুগের লোকেদেরও বুদ্ধির অগম্য ছিল। এগুলির নিশ্চয়ই কোন সুপ্রাচীন আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ছিল, নতুবা বৈদিক সাহিত্যে এগুলি স্থান পেত না। বৈদিক সাহিত্যের তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলি নিয়ে

১। ৩, ৩৩-৩৪। ২। ৮, ২, ১০।
৩। N. N. Bhattacharyya, *Indian Puberty Rites* (1968) 5 ff.
৪। ১০, ৬১, ৫-৭। ৫। ১০, ১০।

আমাদের আগের যুগের টীকাকাররাও যেমন সমস্যায় পড়েছিলেন, একালের পণ্ডিতেরাও কম সমস্যায় পড়েনি। আগের যুগের টীকাকাররা এগুলিকে নিয়ে কি করবেন বুঝে উঠতে না পেরে সোজা ফতোয়া দিয়েছিলেন, এগুলি যে পাঠ করবে তার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে। এ-যুগের পণ্ডিতরা বললেন, নির্ঘাৎ ওই অংশগুলি কোন লম্পট লিখে বেদের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল। স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ একথা বলেছেন।

বাজসনেয়ী সংহিতার১ সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রাচীনতম পর্যায়ে রাজমহিষীকে পুরোহিতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যৌন সঙ্গম করতে হত, এবং সম্ভবত ওই আনুষ্ঠানিক যৌন সঙ্গমের পর পুরোহিতকে নিহত হতে হত, পরবর্তী-কালের অশ্বমেধ যজ্ঞে যে ঘটনার অনুকরণ বা অভিনয় করা হত। অনুষ্ঠানটি হত একদল লোকের সামনে। কয়েকজন মিলে রাজমহিষীকে (বাবাতা) ঊর্ধ্বে তুলে ধরত, কয়েকজন মিলে পুরোহিতকে (উদ্গাতা)। ওই অবস্থায় তারা রমণ করত। পরবর্তীকালে, পুরোহিতের বদলে একটি অশ্বকে নিয়োগ করা হত, এবং পূর্ববর্তী যুগের রীতি অনুসারে অশ্বটি নিহত হবার পর প্রধানা রাজমহিষীকে অশ্বটিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে হত, এবং অপরাপর মহিষী ও পুরোহিতেরা তার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তী যুগের পুরোহিত ও রাজমহিষীর যৌন-মিলনের দৃশ্যটি মুখে মুখে আবৃত্তি করত।২ অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপারটাই হচ্ছে কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস, যা কীথ এবং ওলডেনবার্গ পরিষ্কার দেখিয়েছেন। ওই যৌন অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার উবট খোলাখুলিভাবেই কৃষিকাজের কথা বলছেন : যথা কৃষিবলঃ ধান্যং বাতে শুদ্ধং কুর্বন গ্রহণমক্ষো ঝটিতি করোতি।৩ শুধু অশ্বমেধই নয়, রাজসূয় বা বাজপেয় যজ্ঞেও যৌনাচারের ভূমিকা খুবই ব্যাপক ছিল।

আমরা আগেই বলেছি সামবেদের স্তবক বা ঋকগুলিকে যোনি বলা হয়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যজ্ঞবেদীকে যোনি আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং যজ্ঞাগ্নির উৎপাদনকে যৌনক্রিয়া বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞবেদীকে যোষা বা নারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।৪ ওই গ্রন্থের অসংখ্য স্থানে যৌনক্রিয়াকে যজ্ঞকার্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।৫ শুধু শতপথ ব্রাহ্মণেই নয় ঐতরেয় ও অপরাপর ব্রাহ্মণেও যৌনাচারের অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, কোন নারীকে আহ্বান করা হিংকার; তাকে অনুরোধ করা, প্রস্তাব; তার সঙ্গে শয়ন করা, উদ্গীথ; তার উপরে শয়ন করা, প্রতিহার; মৈথুন শেষ হয়ে আসা, বিধান; মৈথুন শেষ করা, নিধান। এই হচ্ছে বামদেব্য সামন যা মিথুনে প্রতিষ্ঠিত। যে এই বামদেব্য সামন মিথুনে প্রতিষ্ঠিত জেনে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, প্রতিটি মৈথুন থেকেই সে নিজেকে সৃষ্টি করে, দীর্ঘায়ু হয়, সন্তান এবং পশু সম্পদে ধনী হয়, যশস্বী হয়। নারী থেকে কখনও বিরত হবেনা, এটাই নিয়ম।৬ উপনিষদ্‌সমূহের অনেক স্থলেই৭ নারীকে যজ্ঞাগ্নি, তার নিম্নাঙ্গকে অরণি, যৌনাঙ্গকে অগ্নিশিখা,

১। ২২-২৩ অধ্যায়।
২। N. N. Bhattacharyya, *Ancient Indian Rituals*, 1-24.
৩। বাজসনেয়ী ২৩, ২৬-২৭-এর উপর উবটের টীকা।
৪। ১, ২, ৫, ১৫-১৬।
৫। ১, ৯, ২, ৭; ৬, ৪, ৩, ৭; ৬, ৬, ২, ৮ ইত্যাদি।
৬। ২, ১, ৩।
৭। যেমন বৃহদারণ্যক ৬, ২, ১৩; ছান্দোগ্য ৫, ৮, ১-২।

এবং মৈথুনকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে১ বলা হয়েছে নারীর নিম্নদেশ (উপস্থ) যজ্ঞবেদী, যৌনকেশসমূহ (লোমানি) যজ্ঞকুশ, বাইরের ত্বক (বহিশ্চর্মন) সোম-পেষণের ভূমি (অধিষবন) এবং মুষ্কদ্বয় অভ্যন্তরস্থ অগ্নি। একথা যে জেনে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয় সে বাজপেয় যজ্ঞের ফলভোগী হয়। ওই গ্রন্থে এতদূর চাওয়া হয়েছে যে বলা হয়েছে, কোন নারী যৌনমিলন প্রত্যাখ্যান করলে জোর করে তাকে বাধ্য করা উচিত।২

মহাব্রত নামক যজ্ঞে৩ গণিকার সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী ও একজন মগধবাসী যথাক্রমে যজ্ঞবেদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রমণ করত। ওই প্রসঙ্গে কাঠক সংহিতা ও ঐতরেয় আরণ্যকে গণমৈথুনের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রায় সর্বত্রই যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে মৈথুন-প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। দু'একটি নমুনাঃ

[প্রথম ঋকে] প্রথম দুই চরণের মধ্যে বিচ্ছেদ (বিরাম) দিবে। সেই জন্য [পুংসঙ্গমকালে] স্ত্রীলোক উরুদ্বয় বিচ্ছিন্ন করে। [সেই প্রথম ঋকে] শেষ দুই চরণ সংযুক্ত করিবে। সেই জন্য [স্ত্রীসঙ্গকালে] পুরুষে উরুদ্বয় যুক্ত করে। তাহারা (উভয়ে মিলিয়া) মিথুন হয়। এইজন্য উক্থের (আজ্যশস্ত্রের) আরম্ভে এইরূপ মিথুন করা হয়। ইহাতে যজমানের জনন (উৎপত্তি) ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] উৎপন্ন হয়।

নাভানেদিষ্ট সূক্ত পাঠ করিবে। নাভানেদিষ্ট রেতঃস্বরূপ; এতদ্বারা রেতঃসেক করা হয়। ঐ সূক্তের দেবতা অনিরুক্ত (অনির্দিষ্ট); রেতঃপদার্থও অনিরুক্ত (অলক্ষিত) ভাবে গুপ্ত যোনিতে সিক্ত হইয়া থাকে। যজমান এইরূপে রেতোমিশ্রিত হইয়া থাকেন। 'ক্ষ্ময়া রেতঃ সংজগ্মানো নিষিঞ্চৎ'—ক্ষ্মা (ভূমি) কর্তৃক সঙ্গত হইয়া [প্রজাপতি] রেতঃসেক করিয়াছিলেন।৪

১২। পূর্ব মীমাংসা

বৈদিক যুগের ধর্মপ্রসঙ্গে যজ্ঞের কথাটাই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। ভারতীয় ধর্ম নিয়ে যাঁরাই লেখালেখি করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছেন যে ঋগ্বেদের যুগের ধর্ম ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। সে যুগের প্রাকৃতিক শক্তি-গুলিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হত। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ পশুবলি ইত্যাদির বৃদ্ধির জন্য বৈদিক ধর্মের অধঃপতন ঘটে, এবং তারই প্রতিবাদে গড়ে ওঠে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি ভক্তিমূলক ধর্মসমূহ। কিন্তু সত্যই কি ব্যাপারটা এইরকম ঘটেছিল?

উনিশ শতকের লেখকেরা প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে সে যুগের সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদেশী লেখকেরা

১। ৬, ২, ১৩। ২। ৬, ৪, ৬, ৭।

৩। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭, ৫, ৯; কাঠক সংহিতা ৩৪, ৫; ঐতরেয় আরণ্যক ৫, ১, ৫; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২, ১০৪ প; আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২১, ১৭-১৮; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৭, ৬, ২।

৪। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বঙ্গানুবাদ ২০৯, ৫০৬।

সকলেই প্রায় একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন, ভারতীয় লেখকেরাও যুগ প্রভাবে একেশ্বরবাদের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং সেই হিসাবে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতিকে খুব একটা সুনজরে দেখেননি। তাঁরা তাই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন হিন্দুধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী। তাঁদের যুক্তির ধারাটা ছিল নিম্নরূপ। ঋগ্বেদের দেবতারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। কালক্রমে বৈদিক মানুষদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উৎস এক, এবং সেই চিরন্তন এক-ই হচ্ছেন ব্রহ্ম, যিনি উপনিষদে বিরাজমান। এই ব্রহ্মই সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির প্রধান দেবতা, যেমন বৈষ্ণবধর্মের বিষ্ণু, শৈব ধর্মের শিব। এই যুক্তির ধারাটা আজও পর্যন্ত বজায় আছে।

কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে সামগ্রিকভাবে দেখলে বৈদিক সাহিত্যের চোদ্দ আনাই যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপমূলক, অর্বাচীন ও সাম্প্রদায়িক উপনিষদগুলিকে বাদ দিলে, আসল এবং প্রাচীনতম যে উপনিষদগুলি টি'কে থাকে, যেমন বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য, যজ্ঞকথায় ভরপুর। যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া কলাপের এই বিরাট ব্যাপারটাকে কিভাবে এড়ানো যায়? এগুলি ব্রাহ্মণদের কারসাজি বা degraded aspects of Hinduism বললেই ঝামেলা মিটে গেল? মক্ষমূলর থেকে রাধাকৃষ্ণণ সকলেই এই তথাকথিত অপ্রীতিকর ও বদহজমী জিনিসটিকে এড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কি, এই ভারতবর্ষেই একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দর্শনের উদ্ভব হয়েছে যা অনুযায়ী যজ্ঞই একমাত্র সত্য, ঈশ্বর মিথ্যা। এই দর্শনের নাম পূর্ব মীমাংসা। যাঁরা এই দর্শনের প্রবক্তা তাঁরা হলেন জৈমিনি, কুমারিল, প্রভাকর। এ'রা কেউই হেলাফেলার লোক নন। এ'দের বুদ্ধি ও যুক্তির তীক্ষ্মতা আজকের মানুষদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

সত্যই মীমাংসা দর্শন বড় বেয়াড়া কথা বলে। এই দর্শন অনুযায়ী স্রষ্টা হিসাবে কোন ঈশ্বর থাকতে পারেন না। শুধু তাই নয় ঈশ্বরের ধারণাকে যেভাবে মীমাংসকেরা কচুকাটা করেছেন তার তুলনা নেই। মীমাংসকেরা ভাববাদেরও (যা অনুযায়ী বস্তুজগৎ মিথ্যা) গোড়া ঘে'সে কোপ মেরেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, মীমাংসকেরা বেদ মানেন, আর তাঁদের মূল বক্তব্য, বেদ একথাই প্রমাণ করে যে যজ্ঞই একমাত্র সত্য, দেবতারা ফালতু। যজ্ঞই সবকিছুর প্রথম ও শেষ কথা। বলাই বাহুল্য এইরকম একটা বেয়াড়া দর্শন পণ্ডিতদের ভাবিয়ে তুলবেই এবং তুলেওছে। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেছেন মীমাংসা একটি প্রহেলিকা।

মীমাংসকেরা কিভাবে ঈশ্বরের ধারণাকে নস্যাৎ করেছেন তার কিছু নিদর্শন কুমারিল ভট্টের রচনা থেকে দেওয়া যাক।১ যদি কেউ বলেন, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর বিরাজমান ছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ঈশ্বর কোথায় ছিলেন, কিভাবে ছিলেন, কেন ছিলেন এবং কেমন ছিলেন? তিনি বিদেহী ছিলেন, না দেহ সম্পন্ন ছিলেন? যদি তাঁর দেহই না থেকে থাকে, তাঁর মধ্যে তো কোন ইচ্ছার উদ্ভব হতে পারে না, সৃষ্টির ইচ্ছাও নয়। আর যদি তিনি দেহ সম্পন্ন হন, সেই দেহ, আর যে কেউ করে থাকুক, তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেননি। তাঁকে সৃষ্টির জন্য তাহলে আরও একজন ঈশ্বর লেগেছিল, তাঁর জন্য আরও একজন, এবং অনন্ত ঈশ্বর আমদানী করলেও এ সমস্যা মেটে না। এর পর আসে উপাদানের প্রশ্ন।

১। শ্লোকবার্তিক ৪৩-১১৩।

কোন্ উপাদান থেকে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন? সেই উপাদানগুলি কি সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল? থাকলে সেগুলি কোথা থেকে এল? তাদের স্রষ্টা কে? সেই স্রষ্টার স্রষ্টা কে? যদি বলা হয় ঈশ্বর তাঁর নিজের দেহ থেকেই উপাদান তৈরী করে নিয়েছেন, যেমন, মাকড়সা নিজ দেহ থেকেই তন্তু বিস্তার করে, তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই দেহবিশিষ্ট ছিলেন। সেই দেহ কোথা থেকে এল? এক্ষেত্রেও অনন্ত ঈশ্বরের আমদানী করেও সমস্যা মেটে না। এর পরের প্রশ্ন, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করবেন কেন? এই দোষ-ত্রুটি যুক্ত জগৎ তৈরী করে তাঁর কি লাভ? তাঁর উদ্দেশ্য কি? যদি বলা যায় তিনি করুণার দ্বারা চালিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে প্রশ্ন, করুণা কেন? কার জন্য করুণা? তখন তো জগৎ ও জীবনের সৃষ্টি হয়নি। যদি তিনি প্রেম ও করুণার দ্বারাই চালিত হন, জগৎ এত অসুখী ও অকরুণ কেন? যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না নিয়ে তিনি সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে তিনি নির্বোধেরও অধম, কেননা নির্বোধেরা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে না। এবং যদি তিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় তিনি পূর্ণ নন, কেননা যে কোন উদ্দেশ্যই অভাববোধ দ্বারা চালিত। যদি তিনি লীলার উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যা দিতে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরবাদের মূল ভিত্তিটাই মীমাংসকেরা ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁরা খণ্ডন করেছেন ভাববাদকে, যে দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী, বস্তুর ধারণাটাই সত্য, বস্তু মিথ্যা। ভারতীয় দর্শনে এই ভাববাদের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায় বৌদ্ধ মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনে এবং শংকর কথিত অদ্বৈত বেদান্তে, যেখানে বলা হয়েছে বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। কুমারিল বলেন, ভাববাদীদের যুক্তির ধরনটা এইরকম: স্তম্ভ প্রভৃতির দৃশ্যমানতা মিথ্যা, কেননা তা প্রত্যক্ষ, এবং যা কিছু প্রত্যক্ষ তাই মিথ্যা, যেমন স্বপ্ন। স্বপ্নে যা দেখা যায় তা মিথ্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা তো বুঝতে হয় জেগে উঠে। অর্থাৎ স্বপ্ন প্রত্যক্ষণের মিথ্যাত্ব একমাত্র জাগ্রত অবস্থার প্রত্যক্ষতা দিয়েই প্রতিপাদন করা যায়। অপর কথায় স্বপ্নকে মিথ্যা দর্শন প্রমাণ করবার জন্যই জাগ্রত অবস্থার চোখের দেখাকে সত্য বলে মানতে হবে। ভাববাদীদের যুক্তিকে তাঁদেরই অস্ত্রে কুমারিল এভাবে খণ্ডন করেছেন: বাহ্য বস্তু সম্পর্কে সকল জ্ঞানই সত্য কেননা অন্য কোন জ্ঞান নেই যা তাকে নস্যাৎ করতে পারে, যেমন জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা, যা স্বপ্নাবস্থার অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করে, পুরোপুরি সত্য।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে যে অদ্বৈত বেদান্তে, কুমারিল ও তাঁর সম্প্রদায় সেখানেও আঘাত হেনেছেন। এক্ষেত্রে মীমাংসকদের বক্তব্যের সারাংশ কীথ[১] নিবেদন করেছেন এইভাবে:

Kumarila, however, does not content himself with refuting the Nyaya-Vaisesika doctrine; he attacks equally the Vedanta on the simple ground that if the absolute is, as it is asserted to be, absolutely pure, the world itself should be absolutely pure. [In Kumarila's own way of putting the point, an impure world cannot be viewed as the outcome of the pure *brahman.*] Moreover, there could be no creation, for nescience (*avidya* or

১। A. B. Keith, *The Karma Mimamsa,* 1921, 63-64.

maya) is impossible in such an absolute. If, however, we assume that some other cause starts nescience to activity, then the unity of the absolute disappears. Again, if nescience is natural it is impossible to remove it, for that would be accomplished only by knowledge of the self which, on the theory of the natural character of the nescience, is out of the question.

ঈশ্বর খণ্ডনের ব্যাপারে কুমারিল ও মীমাংসকগণ মূল প্রতিপক্ষ হিসাবে খাড়া করিয়েছিলেন ন্যায়-বৈশেষিকদের, কেননা সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র ন্যায়-বৈশেষিকরাই যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। অথচ ন্যায়-বৈশেষিকদের পারমাণবিক তত্ত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। বেদান্তের ব্রহ্মকে তাঁরা নাকচ করেছিলেন এই যুক্তিতে যে একটি জড়, অপূর্ণ, অনিত্য জগৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ চিরন্তন ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। এটা বৈদান্তিকেরাও বুঝতেন, কাজেই জড় জগতের উদ্ভব ব্যাখ্যা করার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তাঁরা মায়াবাদের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎটা মিথ্যা, মায়া, ভ্রম। এই মিথ্যা জগতের উৎপত্তির কারণটাও অতএব একটি মিথ্যা জড় প্রকৃতি যা মায়া নামে পরিচিত (বেদান্তে অন্তত বত্রিশ রকম অর্থে মায়া শব্দটির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে)। মানুষের অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা এই মায়াকে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করে। এই অবিদ্যার জন্যই, যেমন একজন রজ্জুতে ভুল করে সর্প দর্শন করে, মানুষ ব্রহ্মে জগৎ অবলোকন করে। এই অজ্ঞানতা যেমন একদিকে ব্রহ্মের স্বরূপকে আবরণ করে রাখে, অপরদিকে তেমনই একটি মিথ্যা জগতকে তার উপর স্থাপন করে। বাস্তবে কিন্তু মায়ায় সৃষ্ট এই জগৎ রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পের ন্যায়ই মিথ্যা। কুমারিলের মতে এই যুক্তি অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের যে ধারণা, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই, সেখানে মায়ার কোন স্থান থাকতে পারে না। যদি অন্য কোন কারণ মায়াকে কার্যকরী করে থাকে সেক্ষেত্রে একমাত্র অস্তিত্ববান্ চৈতন্যময় সত্তা হিসাবে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না।

যেভাবে মীমাংসকগণ ঈশ্বর ও ভাববাদ খণ্ডন করেছেন, তারপর একেশ্বরবাদ প্রভৃতির যথার্থতা নিয়ে আর কোন কথা বলা চলে না, আর খোদ ঈশ্বরই যখন ভেসে গেলেন তখন দেবতারা কোন্ ছার। কাজেই, একেশ্বরবাদ বা ভক্তিমূলক ধর্মকে উন্নততর চেতনার পরিচায়ক বলে যখন যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের নিন্দা একালের পণ্ডিতেরা করে থাকেন, তাঁরা খেয়াল করেন না যে তাঁদের একালের বিশ্বাসের ভিত্তি সেকালেই ধ্বসে গেছে, মীমাংসকেরা তা ভাল করেই ধ্বসিয়েছেন। অথচ এত ক্ষুরধার যুক্তি, এতখানি বিজ্ঞানমস্কতা সত্ত্বেও মীমাংসকেরা যাগযজ্ঞের এতবড় সমর্থক হয়ে উঠলেন কেন? এর উত্তরে মক্ষমূলর থেকে শুরু করে রাধাকৃষ্ণণ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে বললেন, এই কারণেই মীমাংসা একটি প্রহেলিকা, ভুলেও কিন্তু বললেন না যাগযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁদের বোঝাপড়াটাই ভুল। অর্থাৎ যাগযজ্ঞ বলতে আমরা, অর্থাৎ আধুনিক মানুষেরা যা বুঝি, সে আমলের লোকেরা, বিশেষ করে মীমাংসকেরা, তা বুঝতেন না।

যাগযজ্ঞ বলতে আমরা একালে কি বুঝি? আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, এর মূলে আছে give and take policy, আমি দেবতাকে আমার প্রিয়বস্তু দিলাম, দেবতা বিনিময়ে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। দেবতার প্রীতি উৎপাদন

অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের দ্বারাও হতে পারে, তাঁর উদ্দেশ্যে পশুবলি দিয়েও হতে পারে, অপরাপর প্রিয় বস্তুও তাঁর প্রতি উৎসর্গ করা যেতে পারে। বাইবেলে আছে আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে তাঁর নিজ পুত্রকেই বলি দিতে চেয়েছিলেন। এটা শুধু আমাদের এ যুগেরই ধারণা নয়, প্রাচীন ভারতীয়েরাও বহু ক্ষেত্রে যজ্ঞের আসল তাৎপর্য বুঝতে না পেরে এই রকম ধারণা করেছিলেন। প্রতিপক্ষদের মত উদ্ধৃত করে মীমাংসকেরা বলছেন যে, তাঁদের প্রতিপক্ষরা বিশ্বাস করেন যে, দেবতাই প্রধান এবং দেবতার জন্যই যজ্ঞ। তাঁরা বিশ্বাস করেন, যজ্ঞ হচ্ছে দেবতাকে উপাসনা করার পদ্ধতি। যজ্ঞে যে খাদ্য অর্পণ করা হয় তা দেবতারই উদ্দেশে। মীমাংসকেরা বলেন এইসব ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কেননা বেদ এটাই প্রমাণ করে যে, যজ্ঞই আসল, দেবতারা কিছুই নয়।

সকল রহস্যের মূল এখানে। যজ্ঞ যজ্ঞেরই জন্য, ঈশ্বর বা দেবতাদের জন্য নয়। মীমাংসকেরা বলেছেন, যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে অনুষ্ঠান, যা করলে অপূর্ব-এর উৎপাদন হয়। অপূর্ব-এর অর্থ 'যা পূর্বে ছিল না'। যা পূর্বে ছিল না, অনুষ্ঠানের দ্বারা তা উৎপন্ন হয়, ওই অনুষ্ঠান-ক্রিয়ারই ফল হিসাবে। অর্থাৎ যা আমাদের নেই অথচ যা আমরা পেতে চাই সেটা পাওয়া যাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে। শবর বলেছেন, বেদ অনুযায়ী ফল উৎপাদনের কারণ যজ্ঞ, দেবতারা নয়, কেননা ফল হচ্ছে পুরুষার্থ, যা মানুষের চেষ্টায় হয়, দেবতার নয়। যদি বলা হয়, যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশেই প্রদত্ত, তাহলে সে দেবতার একটা আকার থাকতে হবে, এবং যজ্ঞে প্রদত্ত খাদ্য তাঁকে খেতে হবে। দেবতাদের মনুষ্যাকৃতি সম্ভবপর নয়, খাদ্য গ্রহণ তো আরও দূর স্থান। যদি বলা হয় যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশেই প্রদত্ত, কেননা দেবতা খুশি হয়ে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করবেন, এ যুক্তিও দাঁড়ায় না কেননা দেবতা যে সকল বস্তুর মালিক তার প্রমাণ কোথায়? কি করে তিনি আমাদের প্রার্থিত সামগ্রী দিতে পারেন, যেগুলির উপর তাঁর নিজস্ব মালিকানা স্থিরনিশ্চয় নয়? তাহলে দেখা যাচ্ছে, মীমাংসকদের বক্তব্য, যজ্ঞ স্বয়ংফলপ্রদ, যে ফল অনুষ্ঠানের দ্বারাই পাওয়া যায়। দেবতারা এখানে কিছুই নন, কেননা তাঁদের কোন মনুষ্যাকার নেই এবং যজ্ঞে প্রদত্ত বস্তুকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। জাগতিক বস্তুসমূহের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব নেই, সুতরাং তাঁদের তুষ্ট করার কথাই ওঠে না।[১] সোজা কথায় যাগযজ্ঞ কোন প্রার্থনা বা সন্তুষ্টিবিধান নয়, পার্থিব কামনা পূরণের জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান, যেগুলি স্বয়ংফলপ্রদ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মীমাংসকেরা যজ্ঞের যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তার মূল সূত্রগুলি সুপ্রাচীনকালের জাদুবিশ্বাসমূলক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গেই খাপ খায়। আমরা একথা বার বার বলেছি একমাত্র আদিম যৌথ জীবনের পটভূমিতেই জাদুর আসল তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, যখন এদেশের দার্শনিক বিচার-পদ্ধতি যথেষ্ট মার্জিত ও সূক্ষ্মতাসম্পন্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, স্বয়ং মীমাংসকেরাও যার নিদর্শন রেখেছিলেন, তখন মীমাংসকেরা ঈশ্বর, দেবতাবৃন্দ ও ভাববাদের প্রতি খড়্গহস্ত হওয়া সত্ত্বেও, আদিম যুগের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফিরে যেতে চাইলেন কেন?

১। মীমাংসাসূত্র ২, ১, ৫; ৬, ১, ২; ৭, ১, ৩৪; ৯, ১, ৬-১০; ১০, ৪, ২৩; শবরভাষ্যসহ।

এর উত্তরে বলা যায়, যে কোন চিন্তাধারার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে। যুগের কোন বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্যই সেগুলির সৃষ্টি। পূর্ব মীমাংসা দর্শন যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা মোটামুটি প্রাক্-বিভক্ত জীবন-ধারাকে বহু দূর পিছনে ফেলে পুরোদস্তুর শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রূপ নিয়েছে, এবং তার কুশ্রী দিক্‌গুলি সমাজজীবনের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে। যজ্ঞেরও উদ্দেশ্য বদলে গেছে। যে দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞের কোন সম্পর্কই নেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দেখা গেছে সেই দেবতারাই যজ্ঞের মাথায় উঠে বসেছেন, শাসকবর্গের মতই। মীমাংসকদের রচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তৎকালীন বহু সম্প্রদায়ই ভাবতে শুরু করেছিলেন যে দেবতারাই মুখ্য যাঁদের সন্তুষ্টির জন্যই যজ্ঞ। তাঁদের সেই ভুল ভাঙাবার জন্যই মীমাংসকদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়তে হয়েছিল, দেখাতে হয়েছিল যজ্ঞের ক্ষেত্রের দেবতাদের কোন ভূমিকাই নেই, যজ্ঞ স্বয়ংফলপ্রদ।

আমরা পরে দেখব গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর তাঁদের সমকালীন সামাজিক সমস্যা-সমূহের সমাধানের জন্য অতীত যুগের প্রাক্-বিভক্ত সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ-সমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মীমাংসকেরা কি চেয়েছিলেন সেই প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজে প্রত্যাবর্তন করতে, অতীতের সেই সমবেত জীবনচর্চার মধ্যে ফিরে যেতে, যেখানে যজ্ঞ তার নিজের কার্যকারিতার উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পাবে?

৩

রূপান্তরের যুগ

১। আরণ্যক ও উপনিষদ্

আমরা আগেই বলেছি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থগুলির মধ্যকার সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। আরণ্যক নামটির শব্দার্থবিচারের ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এগুলি অরণ্যে রচিত। শাস্ত্রীয় বিভাগরীতি অনুযায়ী প্রতিটি সংহিতার সঙ্গে কয়েকটি করে ব্রাহ্মণ, কয়েকটি করে আরণ্যক ও কয়েকটি করে উপনিষদ্ সংযুক্ত। প্রসিদ্ধ আরণ্যকগুলির মধ্যে ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটি আরণ্যকের নাম জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ আবার একটি উপনিষদের নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। আরণ্যকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই যদিও সেখানে উপনিষদের কোন কোন অংশের বক্তব্যের পূর্বাভাষ মেলে।

উপনিষদ্ নামক গ্রন্থগুলিকে একটি নূতন চিন্তার ধারক হিসাবে, এবং সেই কারণে বৈদিক সাহিত্যের অপরাপর অংশের থেকে গুণগতভাবে পৃথক্ হিসাবে, পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাঁরা মনে করেন যে পূর্ববর্তী যুগের যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপমূলক পুরোহিত প্রধান ব্রাহ্মণ্যশাসিত ধর্মের বিরুদ্ধে উপনিষদ্ একটি বিরাট বিদ্রোহ। তাঁরা বলেন ধীমান ব্যক্তিরা, বিশেষ করে বানপ্রস্থী ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ, প্রচলিত ধর্মব্যবস্থায় অসম্পূর্ণতা ও কদাচার দর্শনে বিরক্ত হয়ে, গভীর ধ্যান ও চিন্তার সাহায্যে চরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন, যা ব্যাখ্যাত হয়েছে উপনিষদে। এই কথাটা প্রমাণ করার অতি আগ্রহে তাঁরা ঘোষণা করেন যে উপনিষদ-সমূহের একমাত্র বক্তব্যই হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা যার মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার সমীকরণ। বিশ্বচরাচর ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নয়, আর সেই ব্রহ্ম নিহিত আত্মায়। ডয়সেন লিখেছেন ঃ

> The *brahman*, the power which presents itself to us materialized in all existing things, which creates, sustains, preserves and receives back into itself again all worlds, this eternal infinite, divine power is identical with the *atman*, with that which, after stripping off everything external, we discover in ourselves as our realmost essential being, our individual self, the soul. ১

বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে ব্যক্তি-আত্মা বা জীবাত্মার অভিন্নত্ব ছান্দোগ্য উপনিষদে২ শাণ্ডিল্য কর্তৃক যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ভিণ্টারনিৎসের তর্জমায় তা নিম্নরূপ ঃ

১। P. Deussen, *Philosophy of the Upanisads,* Eng. tr. 1919, 39.

২। ৩, ১৪।

This my *atman* in my inmost heart is smaller than a grain of rice, or a barley corn, or a mustard seed, or a millet grain ....This my *atman* in my inmost heart is greater than the earth, greater than the sky, greater than the heavens, greater than all spheres. In him are all actions, all wishes, all smells, all tastes; he holds this *all* enclosed within himself; he speaks not, he troubles about nothing. This my *atman* in my inmost heart is this *brahman*. With him, when I depart out of this life, shall I be united. ১

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদের কিছু কিছু অংশে ব্যাখ্যাত হয়েছে মাত্র, অধিকাংশই জুড়ে আছে অন্য জিনিস যেগুলিকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদের অচ্ছেদ্য অংশ কিনা তা নিয়েও সংশয় আছে। উপনিষদের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপ। ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চার মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কথিত রাজা জনককে বিরাট যজ্ঞ করতে দেখা যাচ্ছে যেখানে তিনি দুহাত ভরে পুরোহিতদের দক্ষিণা দিচ্ছেন। প্রধান দুই উপনিষদ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য, যজ্ঞ কথায় ভরপুর। কৌষীতকি উপনিষদে কি নেই—যাগযজ্ঞ থেকে শুরু করে প্রেমে সাফল্যের তুক্‌তাক্, শত্রুনিধনের পন্থা, মৃত্যু ও রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থাপত্র—সবই সেখানে আছে। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেও উপনিষদ্ কোন একটি অখণ্ড তত্ত্বকে তুলে ধরে না। অনেক পরিশ্রম করে বেণীমাধব বড়ুয়া দেখিয়েছেন যে উপনিষদ্‌গুলিতে এক ডজন দার্শনিকের বক্তব্য স্থান পেয়েছে, যাঁদের একের সঙ্গে অপরের বক্তব্যের আকাশপাতাল পার্থক্য। এই দার্শনিকরা হলেন মহীদাস ঐতরেয়, গার্গ্যায়ন, প্রতর্দন, উদ্দালক, বালাকি, অজাতশত্রু, যাজ্ঞবল্ক্য, সুরবীর-শাকল্য, মাণ্ডুকেয়-কৌণ্ঠরব্য, রৈক্ব, বাধ্ব, শাণ্ডিল্য, সত্যকাম, জবাল এবং জৈবলী।২

জর্জ থিব যথার্থই বলেছেনঃ

If anything is evident, even a cursory review of the Upanisads—and the impression so created is only strengthened by a more careful investigation—it is that they do not constitute a single whole...Not only are the doctrines expounded in the different Upanisads ascribed to different teachers, but even the separate sections of one and the same Upanisad are assigned to different authorities. ৩

আরও বলিষ্ঠভাবে গেডেন বলেছেনঃ

The various strands of thought are almost inextricably interwoven, and the teaching presented is with difficulty reduced

১। M. Winternitz, *op. cit.* I. 250.

২। B. M. Barua, *History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy,* 1921, 51-187.

৩। G. Thibaut in *Sacred Books of the East,* XXXIV intro. ciii.

to self-consistency...The abrupt changes of subject, the absence of any logical method or arrangement, the universal employment of metaphor are constant stumbling blocks in the way of classification or orderly analysis.১

২। উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও ভাববাদ

পল ডয়সেনের মত বিরাট পণ্ডিত, যিনি নিজ মাতৃভাষার মতই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারতেন, যখন সব কিছুকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন যে উপনিষদের মোদ্দা কথাই হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা, এবং তাঁর সেই কথার যখন প্রতিধ্বনি তোলেন বড় বড় বিদ্বানেরা, তখন আমাদের ভাবতে হয় কেন এঁরা এরকম কথা বলছেন। তাঁরা একটিমাত্র কারণেই একথা বলেছেন এবং তা হচ্ছে সুপ্রাচীনকাল থেকেই উপনিষদ্‌কে একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বের আলোকেই দেখার প্রচেষ্টা হয়েছে, এবং এই ঐতিহ্যকে একালের পণ্ডিতেরা অস্বীকার করতে পারেননি।

আমরা আগেই বলেছি, বর্তমান পণ্ডিতদের বক্তব্য অনুযায়ী উপনিষদের বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার সমীকরণ। ব্রহ্ম এবং আত্মা দুটি শব্দেরই অতীত ইতিহাস আছে, অবশ্য শব্দার্থগত। ব্রহ্ম বলতে অতীতে অন্ন, পুরোহিত, যজ্ঞোপকরণ, অনেক কিছুই বুঝিয়েছে। সে সবের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। উপনিষদে ব্রহ্ম বলতে বোঝায় চরম সত্তা যিনি আত্মার (ব্যক্তির) সঙ্গে অভিন্ন (অহং ব্রহ্ম অস্মি, তৎ ত্বম্ অসি, প্রভৃতি বাক্যগুলি স্মর্তব্য)। উপনিষদের সর্বত্রই আত্মা শব্দটি অবশ্য একরকম অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তবে মোটের উপর এই শব্দটির দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞাতা এবং কালক্রমে বিশুদ্ধ চৈতন্য বুঝিয়েছে। এই হিসাবে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ব্রহ্ম বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। এই যে বক্তব্যটি উপনিষদে ধীরে ধীরে স্থিতিলাভ করেছে, তার মূল তাৎপর্য একটিই দাঁড়ায়, যা হচ্ছে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুজগতের সত্যকার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এইটাই হচ্ছে ভাববাদের মূল কথা, যা পরবর্তীকালে অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে।

অবশ্য ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হয়নি। ভাববাদী প্রবণতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সচেতন ভাবে এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা হয়। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্রে (রচনাকাল ২০০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে ভিত্তি করে একটি পুরোদস্তুর ভাববাদী দর্শন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। বাদরায়ণের রচনায় ঔড়ুলোমি, কাশকৃৎস্ন, বাদরি, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি, আশ্মরথ্য প্রভৃতি পূর্বসূরীদের উল্লেখ আছে। হয়ত তাঁর আগে এঁরা এই ধরনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। সে যাই হোক এই বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রই পরবর্তী বৈদান্তিকদের সকল প্রেরণার মূল হয়েছে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখেছেন নিজেদের নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শংকরাচার্যকৃত ভাষ্য, যা শারীরক-ভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। শংকর, তৎপূর্ববর্তী মাণ্ডুক্যকারিকার লেখক গৌড়পাদ, এবং শংকরোত্তর বাচস্পতি মিশ্র, পদ্মপাদ, সুরেশ্বর প্রভৃতিরা বেদান্তের

১। A. S. Geden in *Encyclopaedia of Religion and Ethics* XII, 541-42.

যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা অদ্বৈত বেদান্ত নামে খ্যাত এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদের চরম অভিব্যক্তি, যেখানে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব সত্য হিসাবে স্বীকৃত নয়।

বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনও অদ্বৈত বেদান্তের মতই চূড়ান্ত ধরনের ভাববাদী দর্শন যার অপর নাম শূন্যবাদ এবং যার মূলকথা সকল কিছুই বন্ধ্যা নারীর কন্যার সৌন্দর্যের মতই অলীক। বৌদ্ধ যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে শংকর কথিত অদ্বৈতবাদের কার্যত কোন প্রভেদ নেই, এবং এটা অসম্ভব নয় যে ব্রহ্মসূত্রের চূড়ান্ত ভাববাদী ভাষ্য রচনায় শংকর বৌদ্ধ দর্শনের এই দুই শাখার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। মধ্ব তো তাঁর রচনায় বলেই ফেলেছেন শূন্যবাদীদের শূন্য আর মায়াবাদীদের (শংকর কথিত অদ্বৈত বেদান্ত) ব্রহ্ম একই বস্তু (যৎশূন্যবাদিনঃ শূন্যম্ তদেব ব্রহ্ম মায়িনঃ)।১

৩। ভাববাদের সামাজিক ভিত্তি

তাহলে দেখা যাচ্ছে উপনিষদ্ এমন একটি দার্শনিক মতবাদের সূচনা করেছে যার মূল কথাই হচ্ছে জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে 'বিশুদ্ধ যুক্তি' বা 'বিশুদ্ধ জ্ঞানকে' অবলম্বন করা। এই 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের' ক্ষেত্রে কর্মের কোন স্থান নেই। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন সমাজের একটা শ্রেণী অপরের উৎপাদিত উদ্বৃত্তে জীবনধারণ করার সুযোগ পায়। দৈহিক শ্রমের দায়িত্ব না থাকার দরুন বাস্তব জগতের 'স্থূল' দিক্‌গুলির প্রতি তাদের কোন মানসিক বাধ্যবাধকতা থাকে না, কেননা শ্রম ও কর্মের দ্বারাই একমাত্র জগতকে বাস্তব বলে চেনা যায়। উপনিষদের একটি কাহিনীতে২ দেখানো হয়েছে যে শ্বেতকেতু অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা উদ্দালক তাঁকে কয়েকদিন না খেতে দিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে অন্নই হচ্ছে ব্রহ্ম, সকল জ্ঞানের মূল। কিন্তু এই চেতনা উপনিষদে বহাল থাকেনি, কেননা উপনিষদের যুগেই অন্ন-উৎপাদনের ব্যাপারটা, শুধু অন্ন-উৎপাদনেরই নয়, দৈহিক শ্রমের যাবতীয় ব্যাপারটাই, ছোটলোকদের কাজ বলে বিবেচিত হত। উপনিষদের অন্য একটি কাহিনীতে৩ দেখানো হয়েছে যে ভৃগু ভালমানুষের মতই বুঝে ফেলেছিলেন যে অন্নই ব্রহ্ম, কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে তিনি প্রকাণ্ড ভুল করেছেন, আসলে আনন্দই হচ্ছেন ব্রহ্ম। সত্যই শ্রম না করে অপরের শ্রমফলভোগী হতে পারলে জীবনে আনন্দই সত্য হয়ে ওঠে, তুচ্ছ জাগতিক বিষয়গুলি হয়ে ওঠে অপ্রয়োজনীয়, সেই সকল বিষয়ের জ্ঞানও হয়ে ওঠে অজ্ঞান বা অবিদ্যা, বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্করহিত 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' 'বিশুদ্ধ তত্ত্ব' 'বিশুদ্ধ চৈতন্য'-ই হয়ে ওঠে সকল চিন্তার উপজীব্য।

১। ব্রহ্মসূত্রের মধ্বকৃত ভাষ্য ২, ১, ২৯। অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পর্কের বিষয় বিশেষভাবে জানার জন্য দ্রষ্টব্য V. Bhattacharya in *Indian Historical Quarterly*. X. 1-11; H. Jacobi in *Journal of American Oriental Society*, XXXIII, 31ff, L. de la Valle Poussin in *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1910, 128ff; T. Stcherbatsky, *Conception of Buddhist Nirvana*, 1927, 36ff; S. N. Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, 1922, I. 423ff.

২। ছান্দোগ্য ৬, ৭।

৩। তৈত্তিরীয় ৩, ১-৭।

উপনিষদ্‌কে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট ফসল বলা হয়। কিন্তু এই উপনিষদের সামাজিক আদর্শ কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদে১ বলা হয়েছে ব্রহ্ম উন্নততর মানুষ হিসাবে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম, এই তুমি-আমির মধ্যে কিন্তু শ্রমকারী মানুষেরা পড়েন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে২ চণ্ডালকে কুকুর ও শূকরের সমগোত্রীয় বলা হয়েছে। শংকরাচার্য, যাঁর মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জাতিপ্রথাকে কিন্তু মিথ্যা বলেননি। শূদ্রদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার যে সব উৎকট ব্যবস্থাপত্র মনু দিয়েছেন সেগুলির সবকটিই শংকর অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছেন, শূদ্ররা তাঁর চোখে রজ্জুতে সর্পবৎ ভ্রম নয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে৩ বলা হয়েছে বেদ (জ্ঞান) ও কৃষি পরস্পরের শত্রু। মনু তো পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কৃষিকাজ নিষিদ্ধ৪ শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা কোন শ্রম ও উৎপাদনমূলক কাজেও (বৃদ্ধি) যোগ দিতে পারবে না।৫

ঋগ্বেদের যুগের গোড়ার দিকে যখন সামাজিক শ্রেণীভেদ এত তীব্র ছিল না, দৈহিক শ্রম ও মানসিক শ্রমের বিভেদটাও এত স্পষ্ট হয়নি। তাই নিঘণ্টুতে৬ প্রজ্ঞা, ধী এবং কর্ম, কর্ম ক্রতু এবং প্রজ্ঞা, শচী, কর্ম এবং প্রজ্ঞা সমার্থ বাচক। কিন্তু পরবর্তী যুগে অবস্থার রীতিমত বদল হয়েছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রাজা জনক ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না। যাজ্ঞবল্ক্যকেই তিনি দান করেছিলেন দশ হাজার গরু, যাদের শিং সোনা দিয়ে বাঁধানো। কতখানি সামাজিক সম্পদের মালিকানা ব্যক্তিবিশেষের হাতে এলে এটা সম্ভব তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। এই বিপুল উদ্বৃত্তের সৃষ্টি অর্থনৈতিক নিয়ম অনুসারে দু'ভাবে হওয়া সম্ভব, উৎপাদনের কলাকৌশলের ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন, অথবা শ্রমশক্তির প্রচণ্ডতম শোষণ।

খেটে-খাওয়া মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জাগতিক জ্ঞান একেবারেই মূল্যহীন, একমাত্র খাঁটি জিনিস হচ্ছে তাদেরই শ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অন্বেষণ। এই প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উপনিষদের সবচেয়ে বড় স্বীকৃত আধুনিক ভাষ্যকার পল ডয়সেন বলেছেন:

Very soon, however, it came to be realised that this knowledge of *brahman* was essentially of a different nature from that which we call 'knowledge' in ordinary life. For it would be possible, like Narada in *Chandogya*, to be familiar with all conceivable branches of knowledge and empirical science, and yet to find oneself in a condition of ignorance (*avidya*) as regards the *brahman*...It was negative in so far as no experimental knowledge led to a knowledge of *brahman*; and it was positive in so far as the consciousness was aroused that the knowledge of empirical reality was an actual hindrance to the knowledge of *brahman*.....The experimental knowledge which reveals to us

১। ১, ৪, ১১। ২। ৫, ১০, ৮। ৩। ১, ৫, ১০১।
৪। ১০, ৮৩-৮৪। ৫। ১০, ১১৬-১৭। ৬। ২, ১; ৩, ৯।

a world of plurality, where in reality only *brahman* exists and a body where in reality there is only the soul, must be a mistaken knowledge, a delusion, a *maya*.....It is the same which Parmenides and Plato took when they affirmed that the knowledge of the world of sense was mere deception, which Kant took, when he showed that the entire reality of experience is only apparition and not reality.১

ডয়সেন হক কথাই বলেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে জাগতিক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু তাই নয় অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরিপন্থী। তিনি সঙ্গতভাবেই এই প্রসঙ্গে প্লেটো, কাণ্ট প্রভৃতির কথা এনেছেন। কিন্তু এতবড় পণ্ডিতের চোখ যে বিষয়টাকে এড়িয়ে গেছে তা হচ্ছে, এটা কাদের দর্শন? অভিজ্ঞতার জগৎকে কারা অস্বীকার করতে পারে? তারা সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোক? একথার জবাব আমরা আগেই দিয়েছি। এ দর্শন শুধু শ্রমফলভোগী উচ্চবর্ণের, শ্রমপ্রদানকারী শূদ্রের নয়। সমাজের পরগাছা হয়েই বিমূর্ত চিন্তা করা সম্ভব। ডয়সেন প্লেটোর কথা বলেছেন। একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক্ সুপ্রাচীনকালের এই মহাজ্ঞানী ভদ্রলোকটি কি বলেন। ফ্যারিংটন লিখেছেন:

In his *Laws* Plato organises society on the basis of slavery and having done so, puts a momentous question: 'We have now made excellent arrangements to free our citizens from the necessity of manual works; the business of the arts and crafts has been passed on to others; agriculture has been handed over to slaves on condition of their granting us sufficient return to live in a fit and seemly fashion; how now shall we organise our lives? A still more pertinent question would have been: 'How will our new way of life reorganise our thoughts?'২

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের শূদ্রদের মত গ্রীকভূমিতে দৈহিক শ্রমের যাবতীয় কাজ ন্যস্ত হয়েছিল দাসদের হাতে, আর সেই কারণেই তাদেরই শ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে, কুলীন গ্রীকেরা আমাদের উপনিষদের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের মতই জাগতিক জ্ঞানকে অস্বীকার করে 'বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায়' আত্মনিয়োগ করেছিল, যে জ্ঞানের মূল কথা, বস্তুর ধারণাটাই সত্য, বস্তু মিথ্যা। আশা করি, নিম্নের উদ্ধৃতিটিই পর্যাপ্ত হবে:

For Plato, wisdom meant a knowlege not of nature, but of super-nature constituted by ideas....As for art—that power to control nature, the slow acquisition of which by man Democritus regarded as identical with his self-differentiation from the animals —it was relegated by Plato to a kind of limbo. It belonged to

১। P. Deussen, *op. cit.* 74-75.

২। B. Farrington, *Greek Science*, 1944, I. 105-06.

the sphere of opinion, *the bastard knowledge of the slave*, not the truth of the philosopher.১

৪। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর

প্রাচীন উপনিষদ্গুলির রচনার কাল আনুমানিক ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে রাষ্ট্রশক্তির প্রচলন হতে শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। তবে এটা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজতন্ত্রের বিকাশের সূচনাকাল। বৌদ্ধ গ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায় ও জৈন গ্রন্থ ভগবতীসূত্র থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের সময় উত্তর ভারতে ষোলটি মহাজনপদ ছিল। জনপদ বলতে বোঝায় Tribal Settlement, তাই মহাজনপদগুলিকে অমারা ঠিক রাষ্ট্র বলতে পারি না, বরং এগুলিকে বলা যেতে পারে Potential State, যেগুলিতে রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল, যদিও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ বুদ্ধের আগের যুগে সর্বত্র ঘটেনি।

অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে বর্ণিত ষোলটি মহাজনপদের নাম হল অঙ্গ, কাশি, কোশল, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গন্ধার, কম্বোজ, মগধ। এগুলির মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। আমরা আগে দেখেছি যে, ট্রাইবাল ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইবাল সমাজ ধ্বংস হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি কার্যকর হবার সুযোগ পায় না। বাইরের রাষ্ট্রশক্তির আঘাতেও ট্রাইবাল সমাজের ধ্বংস হতে পারে এবং ভারতের ইতিহাসে এটাই ঘটেছে বার বার। সে যাই হোক, রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব, অর্থাৎ অধিকাংশকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয়ের, এবং কালক্রমে এক ব্যক্তির, চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই অহিংস উপায়ে হয়নি, আর তা বজায় রাখতেও হিংস্রতম পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর হাতে নিহত হয়েছিলেন; অজাতশত্রু ও তাঁর বংশধরদের কপালেও ওই একই অবস্থা ঘটেছিল। ওঁদের গোটা বংশটাই ছিল পিতৃহন্তার বংশ। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ নিজ পুত্র বিড়ূড়ভের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন, এবং নিজ ভাগ্যে মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায় এসে রাজগৃহ নগরে প্রবেশের পথে অবসাদ ও ক্লান্তিতে মারা যান। বিড়ূড়ভ রাজা হয়ে শাক্যদের নির্মূল করেন, আর এই ঘটনা ঘটেছিল বুদ্ধের জীবনকালেই।

বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে এমন কোন সূত্র আমাদের হাতে আজও আসেনি। তবে পরবর্তী-কালে রচিত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থসমূহ থেকে কিছুটা আভাস মেলে। যেহেতু এদেশে সামাজিক পরিবর্তনের গতি খুব মন্থর, আমরা এটুকু বলতে পারি যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের সূত্র দিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার একটা আন্দাজী হিসাব নেওয়া যায়, কেননা একশো-দুশো বছরে যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা নিছকই পরিমাণগত, গুণগত নয়। তাছাড়া সূত্র যে একেবারে নেই তা নয়। বেশ কয়েকটি উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্যের অন্তর্গত

১। Idem in *Philosophy for the Future*, 1949, 5.

গ্রন্থ বুদ্ধের সমকালীন। উপনিষদ থেকে অন্তত দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়—সামাজিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ব্যক্তির হাতে আসা এবং সামাজিক শ্রেণীভেদ। পরবর্তীকালের মনু প্রভৃতি রচিত ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিধানের সঙ্গে পূর্বরতীকালে রচিত ধর্মসূত্রগুলির বিধানের খুব একটা মৌলিক পার্থক্য নেই, বরং ধর্মসূত্র প্রবর্তিত ঐতিহ্যকেই মনু প্রভৃতিরা স্পষ্টতর করেছেন।

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বুদ্ধের যুগে পশুই ছিল প্রধান বিনিময়যোগ্য সম্পদ, যদিও তখন থেকেই মুদ্রা-অর্থনীতির বিকাশ হতে শুরু করেছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে মুদ্রাকে কহাপন (কার্ষাপণ, কাহন) বলা হয়েছে, সুবর্ণ মুদ্রাকে বলা হয়েছে নিক্‌খ (নিষ্ক) ও সুবন্ন (সুবর্ণ)। ব্রোঞ্জ ও তাম্রমুদ্রাকে বলা হয়েছে কাংস, পাদ, মাসক এবং কার্কণিকা। অবশ্য এগুলির আপেক্ষিক মূল্য সব সময় এক ছিল না। ব্যবসার প্রয়োজনে অর্থ ঋণ হিসাবে দেবার প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। ঋণের নাম ছিল বৃদ্ধি। বণিক ও কারিগরশ্রেণী অনেক ক্ষেত্রেই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করত। এই সংঘের নাম ছিল শ্রেণী। বড় বড় ব্যবসায়ীরা শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত হতেন। বুদ্ধের সমকালীন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন একজন মহাশ্রেষ্ঠী যাঁর অধীনে অনেক অনুশ্রেষ্ঠী ছিল।

বস্তুতই বুদ্ধের যুগে একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছিল, যা ছিল বণিকশ্রেণী। এরাই ছিল সে যুগের সামাজিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ উদ্ভূত emergent class। পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য তথা বৈদিক ঐতিহ্যে এই শ্রেণীটিকে খুব সুনজরে দেখা হয়নি, বৈশ্যদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, শ্রমকারী মানুষদের সঙ্গে এদের সম্পর্কের জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের চোখে এরা ছিল হেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বুদ্ধ ও মহাবীর এই নূতন শ্রেণীর স্বার্থ দেখেছেন। বৌদ্ধ সুত্তনিপাত গ্রন্থে একটি নিষেধের তালিকা আছে যাতে কিন্তু নাগরিক জীবন, সাধারণ পানভোজনশালার ব্যবহার, গণিকাবৃত্তি, সুদ নেওয়া, ক্রীতদাস প্রথা প্রভৃতি বণিক-সমাজের মুখ্য প্রয়োজনগুলি নিন্দিত হয়নি। বরং পাওনাদারকে প্রাপ্য না দেওয়া, সুদ ফাঁকি দেওয়া, দাসত্ব থেকে পলায়ন প্রভৃতি বিষয় অন্যায় বলে ঘোষিত হয়েছে। বণিক শ্রেণীর স্বার্থই নগর ও বাজার গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। পণ্য নিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রা করত বণিকরা, তাদের নেতাকে বলা হত সার্থবহ। অনেক বড় বড় বাণিজ্যপথেরও উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকে পাওয়া গেছে, একটি ছিল শ্রাবস্তী থেকে রাজগৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত, আর একটি ছিল শ্রাবস্তী থেকে প্রতিষ্ঠান নগর বা পৈঠান পর্যন্ত, আর একটি ছিল শ্রাবস্তী থেকে সিন্ধু পর্যন্ত। মহাবীর নিজেই পদব্রজে সিন্ধু পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আরও একটি বড় রাস্তা গিয়েছিল রাজগৃহ থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত। সম্ভবত এই পথটিরই উল্লেখ মেগাস্থনেস করেছেন ১,১৫৬ মাইল দীর্ঘ বলে। এছাড়া জল পথে বাণিজ্যেরও উল্লেখ আছে।

এই নূতন বণিক শ্রেণী ছাড়াও অপরাপর অর্থনৈতিক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। পালি গ্রন্থসমূহে 'হীনজাতির' কথা আছে, যাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'হীনশিল্পের' উপর নির্ভরশীল হিসাবে। বলাই বাহুল্য সমাজ কাঠামোর তলার দিকে পড়ে থাকা মানুষরাই ছিল উচ্চতর শ্রেণীগুলির উৎপীড়নের শিকার, তারাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে শূদ্র বলে ঘোষিত, বৌদ্ধ গ্রন্থে চণ্ডাল, বেন, নেসাদ, রথকার, পুক্কুস প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার নামে পরিচিত। চণ্ডালকে দেখে শ্রেষ্ঠী কন্যার গোলাপ জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলার কাহিনী বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্তমান। সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শ্রেণী ছিল নিশ্চয়ই কৃষকেরা, কিন্তু তারা ছাড়াও অপর যে সকল বৃত্তিজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায় তারা হচ্ছে কুট্টক (ছুতোর মিস্ত্রী), কর্মার, অয়স্কার, (কামার), কুম্ভকার, নাপিত, রজক, মোদক (মাটি খননকার), রজ্জুবর্তক (দড়ি প্রস্তুতকারী) অনীকস্থ (হস্তিপালক) অশ্বদমক প্রভৃতি।

রাষ্ট্র গ্রাম থেকে সম্পদ সংগ্রহ করত চার ভাবে—উৎপন্ন ফসলের উপর কর, বাধ্যতামূলক শ্রম, রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ ফসল সংগ্রহ, মাঝে মাঝে রাষ্ট্রকে অবশ্য দেয় কর। এই কর আদায় ব্যাপারটা ছিল নির্মম, রীতিমত উৎপীড়নমূলক, পুরোদস্তুর রাজার স্বেচ্ছাচারের উপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধ জাতকসমূহ অনুশীলন করে এই প্রসঙ্গে রিচার্ড ফিক লিখেছেন ঃ

If the king wanted—as seemed often to happen according to the instances narrated (in the Jatakas)...to harass the people by enhancing the taxes, he sent his officials who had to use force in filling the coffers of the king. These tax-collectors (*balipatig-gahakas, niggahakas, balisadhakas*), according to the Jatakas, did not play an unimportant part in public life...Oppressed with taxes (*balipitila*) inhabitants lived in the forest like beasts with their wives and children; where there was once a village, there no village stood any more. The men could not, for fear of the king's people, live in their houses; they surrounded their houses with hedges and went after sunrise to the forest. In the day the king's people (*rajapurusa*) plundered, at night the thieves....১

৫। বুদ্ধ, মহাবীর ও সমসাময়িক সমাজ

কর আদায়ের যে পদ্ধতির কথা উপরে বলা হল, তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে এদেশে রাষ্ট্রশক্তি কি ভয়াবহ চেহারা নিয়েই না লোকের সামনে হাজির হয়েছিল। এঙ্গেলসের ভাষায় ঃ

From an organisation of tribes for the free administration of their own affairs it became an organisation for plundering and oppressing their neighbours; and correspondingly, its organs were transformed from instruments of the will of the people into independent organs for ruling and oppressing their own people. ২

আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে কোশলের রাষ্ট্রশক্তি বুদ্ধের চোখের সামনেই তাঁর জাতি-পরিজনদের হত্যা করেছিল, শাক্যদের নির্মূল করেছিল, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দেয়নি। তাঁর চোখের সামনেই মগধরাজ অজাতশত্রু বৃজি

১। R. Fick, *Social Organisation in North-East India in Buddha's Time*, Eng.-tr, 1920, 120-21.

২। F. Engels, *op. cit.* 168.

সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন। বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও বৃজি এই চারটি ট্রাইব সমবায়ে গঠিত ছিল বৃজি সাধারণতন্ত্র, যার সভাপতি ছিলেন মহাবীরের মাতুল চেটক বা চেদগ, যিনি পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন। সেই ভয়াবহ হত্যা ও রক্তপাতের দুর্যোগময় দিনগুলিতে বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক আরও অনেক দার্শনিক হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, যা দেখে পূরণ কস্সপ বলেছিলেন পাপপুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের সনাতন ধারণা মিথ্যা; পকুধ কচ্চায়ন বলেছিলেন, হত্যা যেন এক উপাদানকে আর এক উপাদানে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই নয়; অজিত কেশম্বলী বলেছিলেন, যা দেখা যাচ্ছে শ্মশান ভিন্ন মানুষের আর কোন গতি নেই; সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত বলেছিলেন, ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করা মানুষের সাধ্যাতীত; আর গোশাল মংখলিপুত্ত উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল অজাতশত্রু কর্তৃক বৃজি দেশ আক্রমণের দুঃস্বপ্নের মধ্যে, তাঁর অন্তিম প্রলাপেও অজাতশত্রু-ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম শোনা গিয়েছিল। এই অবস্থারই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুত্তে বুদ্ধ বলেছিলেনঃ

I behold the rich in this world, of goods which they have acquired, in their folly they give nothing to others; they eagerly heap riches together and further and still further they go in their pursuit of enjoyment. The king, although he may have conquered the kingdoms of the earth, although he may be ruler of all land this side the sea, up to the ocean's shore would still insatiate, covet that which is beyond the sea...The princes, who rule kingdoms, rich in treasures and wealth, turn their greed against one another, pandering insatiably their desires. If these acts thus restlessly, swimming in the stream of impermanence, carried along by greed and carnal desire, who then can walk on earth in peace. ১

বুদ্ধ ও মহাবীর অবশ্য একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যাননি। তাঁরা জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সংঘে যোগদানের জন্য যেখানে তাঁরা তাদের দিতে চেয়েছিলেন একটি হারিয়ে যাওয়া বাস্তবের কাল্পনিক বিকল্প, হারিয়ে যাওয়া ট্রাইবাল সাম্যের আস্বাদ, যদিও তাঁরা জানতেন ইতিহাসের অনিবার্য গতিকে রোধ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

বুদ্ধ দুঃখ বলতে জাগতিক দুঃখকেই বুঝেছিলেন, এবং তার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যই সংঘের সৃষ্টি করেছিলেন। রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে।২ ধন বৈষম্যের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাসমূহ, দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, ধনী শ্রেণীর সীমাহীন লোভ—সমস্ত বিষয়ের উপরেই বুদ্ধের সুচিন্তিত বক্তব্য আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা অধিকাংশই এ বিষয়ে নীরব থেকেছেন। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই ট্রাইবাল-গণতান্ত্রিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১। H. Oldenberg, *Buddha*, 1927 ed, 64.

২। মহাবস্তু অবদান ১, ৩৩৯-৩৪৯, রাধাগোবিন্দ বসাকের বঙ্গানুবাদ (১৯৬৩), ৪৪১-৪৫; দ্রষ্টব্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, ১৪২।

বৌদ্ধ সংঘগুলির ভিতরকার নিয়মাবলী ছিল পুরোদস্তুর গণতান্ত্রিক, একেবারে ট্রাইবাল নিয়মসমূহ বসানো, এবং সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান ছিল না। হারিয়ে যাওয়া সাম্যাশ্রয়ী জীবনের আদর্শ সংঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেই বুদ্ধ ক্ষান্ত হননি, তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন যাতে সংঘবাসী ভিক্ষুরা বাইরের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী থেকে নিজেদের নির্লিপ্ত করে রাখে। মহাবীরও অনুরূপ পথ নিয়েছিলেন। জৈন সংঘের নেতাদের উপাধি ছিল গণধর, গণি প্রভৃতি, যার একমাত্র ইংরাজী অনুবাদ হয় Tribal Chief। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন ঃ

At a critical stage of Indian history, while the free tribes of the times were being ruthlessly exterminated and within the orbits of the expanding state-powers people were experiencing the rise of new values on the ruins of tribal equality, the Buddha was modelling his *samghas* on the basic principles of the tribal society and was advising the brethren of his order to mould their lives according to these principles. This point is crucial. In building up his own *samghas*, the Búddha could provide the people of his times with the illusion of a lost reality, of the dying tribal collective. And it was only the great genius of the Buddha which could have built this complete and coherent illusion. Not only did he suuccessfully build up his *samghas* on the model of pre-class society, but he took great care to see that the members therein—the *bhikkhus* within the *samghas*—lived perfectly detached life, i.e. detached from the great historic transformation going on in the society at large, whose course was obviously beyond his power to change.১

কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধের ভক্তদের মধ্যে তৎকালীন বহু অভিজাত ব্যক্তিরাও ছিলেন, বহু শ্রেষ্ঠীও তাঁর ভক্ত ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম বণিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশেষ সদয়। ঋণদান, সুদ গ্রহণ, দাস রাখা বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। বুদ্ধ বারবার বলেছেন ঋণগ্রহীতা ও দাসদের প্রভুর কাছে বাধ্যবাধকতা ত্যাগ করা অন্যায়। কর প্রদানের যোগ্যতাকে গুণ বলে গণ্য করা হয়েছে। নগরজীবন, সাধারণ ভোজন স্থানে ভোজন, গৃহছাড়া ও ভ্রাম্যমান বণিকশ্রেণীর চিত্ত বিনোদনের জন্য সাধারণী মহিলাদের প্রয়োজনীয়তা, কোন কিছুকেই বৌদ্ধধর্ম অস্বীকার করেনি। পশুবধ বিরোধী প্রচার বণিকশ্রেণীর ধনার্জনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, কেননা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও পশুই ছিল প্রধান ধন। এই নূতন সামাজিক শ্রেণীর, পূর্ববর্তী যুগে যারা ছিল অপাঙক্তেয়, বুদ্ধ এবং মহাবীর কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হবার কারণ একটিই ছিল। আসলে তাঁদের উভয়কেই কাজ করতে হয়েছিল ইতিহাসের একটি অচেতন যন্ত্র হিসাবে। হারানো দিনের সাম্যাবস্থাকে বাস্তবে

১। D. Chattopadhyaya, *op. cit.*, 485.

ফিরিয়ে আনা তাঁদের সাধ্যাতীত ছিল। রাষ্ট্র ও শ্রেণীসমাজের অনিবার্যতা বোধ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এবং এই অবস্থায় তাঁরা যা করতে পারতেন, এবং প্রশংসনীয়ভাবে যা করেছিলেন, তা হচ্ছে নূতন গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলিকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করা, এবং হারিয়ে যাওয়া ট্রাইবাল জীবনের কিছু নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটানো।

৬। বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও দার্শনিক ইতিহাসে অসংখ্য মত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ দেখা যায়, যেগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে রচিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, যেখানে পুরোদস্তুর ঈশ্বরবাদের সূচনা পাওয়া যায়, জগৎ ও জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে আটটি প্রচলিত মতবাদ উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলি হল ঈশ্বর, কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূত, যোনি ও পুরুষ।১ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই তালিকাটি, কিছুটা পরিবর্তনসহ, সুশ্রুত-সংহিতায় উল্লিখিত হয়েছে, যার রচনাকাল চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরের আটশো বছর পর, যেখানে জগৎ ও জীবনের কারণস্বরূপ স্বভাব, ঈশ্বর, কাল, যদৃচ্ছা, নিয়তি ও পরিণাম বা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে।২ এখানে শ্বেতাশ্বতরের তালিকায় উল্লিখিত পুরুষ বাদ গেছে এবং ভূত ও যোনি একত্রে সঙ্গত ভাবেই প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায় (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) এবং মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেস (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) তৎকালীন প্রচলিত অসংখ্য ধর্মমতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন আজীবিক, নির্গ্রন্থ, জটিলক, পরিব্রাজক, অবিরুদ্ধক, মুণ্ডশ্রাবক, মাগণ্ডিক, ত্রৈদণ্ডিক, গোতমক, ও দেবধর্মিক এবং তৎসহ হস্তী, অশ্ব, গাভী, কুকুর ও কাক পূজক, বাসুদেব, বলদেব, পূর্ণভদ্র, মণিভদ্র, যক্ষ, নাগ, অসুর, গন্ধর্ব, মহারাজ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্ম, দেব, দিক্ প্রভৃতির উপাসকবর্গ।

বৌদ্ধ দীঘ ও মজ্‌ঝিম নিকায়, জৈন সূয়গড ও উত্তরাধ্যয়ন সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালীন দার্শনিক মতবাদসমূহ ও ধর্মগুরুদের কথা বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে ৬২ রকম মতবাদ উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পূর্বান্ত ও অপরান্ত কল্পিত। জৈন গ্রন্থসমূহে তিনশোরও অধিক দার্শনিক মতবাদ বর্ণিত হয়েছে যেগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদ। বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালীন ধর্ম-গুরু বা চিন্তানায়কদের মধ্যে আমরা পাঁচজনের পরিচয় পাই, যাঁরা হচ্ছেন পূরণ কস্সপ, পকুধ কচ্চায়ন, অজিত কেশকম্বলী, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত এবং গোশাল মংখলিপুত্ত।

উপরি-উক্ত তালিকাগুলিতে উল্লিখিত কয়েকটি ধর্মমত কালক্রমে রীতিমত প্রাধান্য পেয়েছিল যেগুলি আমরা অপরাপর অধ্যায়ে আলোচনা করব। এমন কয়েকটি ধর্মমতের উল্লেখ রয়েছে যেগুলির নাম ভিন্ন আর কিছুই জানা যায় না,

---

১। শ্বেতাশ্বতর ১, ১-২।

২। সুশ্রুত, শারীরস্থান ১, ১১।

এবং সেই হিসাবে সেগ্লি সম্পর্কে কিছ্ই বলা যাবে না। অবশিষ্টগ্লি বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৭। ঈশ্বরবাদ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রদত্ত তালিকায় জগৎ জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে অনেক মতবাদের উল্লেখ থাকলেও ওই উপনিষদের লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করা, ব্রহ্মকে প্রোদস্তুর ঈশ্বরে পরিণত করা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মতে সেই সর্বশক্তিমান একেশ্বর হচ্ছেন র্দ্র বা শিব যিনি প্রকাশিত বা ব্যক্ত ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছ্ই নন।

ঈশ্বর বা একেশ্বরবাদের ম্ল কথা পরমেশ্বর এক, অন্যান্য দেবতারা তাঁরই প্রকাশ, অথবা তাঁর থেকে উপজাত, অথবা তাঁর অধীন। তাঁকে পাওয়া যায় নিছক ভক্তির দ্বারা। তিনি যে জগতের স্রষ্টা বা কর্তা তা শ্রুতিসিদ্ধ, অতএব সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা সংশয়ের অবকাশ নেই। একেশ্বরবাদ শিব ছাড়াও বিষ্ণ্ প্রভৃতি দেবতাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যা আমরা পরে দেখব। হিন্দ্ পঞ্চোপাসনা মোটাম্টি পাঁচটি একেশ্বরবাদী ধর্মমতের সমাহার। পরবর্তীকালে এই একেশ্বর-বাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠারও প্রচেষ্টা হয়েছে ঈশ্বরবাদী বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়-গ্লির দ্বারা।

ঈশ্বরবাদ নানা কারণে এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই মতবাদ সর্বাধিক প্রেরণা পেয়েছিল ভগবদ্গীতা থেকে। কিন্তু চিন্তাশীল মান্ষেরা এই আদর্শকে মেনে নিতে পারেননি, কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই, এবং ঈশ্বর কর্তৃক জগতস্ষ্টির ব্যাপারটা কোন রকম য্ক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে মীমাংসকদের বক্তব্য এবং কুমারিলের ঈশ্বরখণ্ডনের য্ক্তিসম্হ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সাংখ্যদর্শনও ঈশ্বরবাদ বিরোধী, কারণ প্রমাণাভাব। বৌদ্ধ ও জৈনরাও ঈশ্বরবাদ বিরোধী, নাস্তিক চার্বাকরা তো বটেই।

এখানে একমাত্র ন্যায়-বৈশেষিকরাই য্ক্তির দ্বারা ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও ওই দর্শনের প্রবক্তা গোতম ও কণাদ এ প্রসঙ্গে উদাসীন ছিলেন। পরবর্তী ন্যায়-বৈশেষিকরা ঈশ্বরের আমদানী করেছিলেন তাঁদের পরমাণ্ তত্ত্বকে য্ক্তিসহ করার জন্য। অচেতন পরমাণ্সম্হ কিভাবে একত্রিত হয়ে বস্তুর স্ষ্টি করবে, এই প্রশ্নের সম্ম্খীন হয়ে পরবর্তী ন্যায়-বৈশেষিকরা একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, যেমন একজন কুম্ভকার ম্ত্তিকার্প উপাদান দিয়ে কলস তৈরী করে, ঠিক সেইভাবেই একটি চৈতন্যময় কারণ, যিনি ঈশ্বর, পরমাণ্সম্হকে একত্র তাঁর নিজ ইচ্ছার দ্বারা চালিত করনে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকদের এই ঈশ্বর একটি বড় মাপের কুম্ভকার ছাড়া আর কিছ্ই নন (ব্রহ্মাণ্ড কৌলাল), যিনি দেহ, ইচ্ছা ও কর্মের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ তাঁর দেহ থাকা চাই, তাঁর স্ষ্টি করার ইচ্ছা থাকা চাই এবং স্ষ্টিকর্মের ক্ষমতা থাকা চাই, আর এইগ্লিই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের বিরোধী। দেহবিশিষ্ট হলে তাঁর নিজেরই স্রষ্টার প্রয়োজন, ইচ্ছা তাঁর পূর্ণতার বিরোধী, আর দেহবিশিষ্ট হয়ে তিনি যে কর্ম করছেন তা তাঁর সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করছে। মীমাংসক, বৌদ্ধ, জৈন, এমন কি শংকরের মত বেদান্তবাদীরাও ন্যায় বৈশেষিকদের এই য্ক্তির ধারা মেনে নিতে পারেননি। ন্যায়-বৈশেষিকদের

ঈশ্বরতত্ত্ব খণ্ডন তাঁরা সকলেই করেছেন, চূড়ান্ত আঘাত হেনেছেন জৈন দার্শনিক গুণরত্ন।১

৮। কাল ও নিয়তি

ভারতীয় দর্শনে কাল বা সময়ের ধারণা সুপ্রাচীন। পরবর্তী হিন্দুধর্মের মহাকাল মহাকালী, কালরাত্রি প্রভৃতি দেবতার কল্পনায় কালের ধারণার প্রভাব আছে। অথর্ববেদে২ সর্বপ্রথম কাল বা সময়কে ব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা এবং সকল কিছুর প্রভু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ হিসাবে কালের ধারণা সমালোচিত হয়েছে।৩ মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন 'কাল ইতি দ্রব্যজ্ঞানম্'।৪ বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদে সময় বা কালের কিছু গুরুত্ব আছে। জৈন দর্শনের নয়টি তত্ত্বের একটি হচ্ছে কাল। ন্যায়-বৈশেষিকদের নয়টি দ্রব্যের ও মীমাংসকদের এগারোটির মধ্যে কাল একটি। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের কেউ কেউ কালকে ঈশ্বর বলেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কাল-বাদ খুব বেশি প্রভাবশালী হতে পারেনি।

নিয়তিবাদও ভারতীয় ধর্মে ও দর্শনে খুব প্রভাবশালী নয়। একমাত্র গোশাল মংখলিপুত্তই নিয়তিবাদকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন এবং এই মতবাদের অনুসারী একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি করেছিলেন যা আজীবিক নামে পরিচিত। গোশাল ও আজীবিকদের সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ আমরা এই গ্রন্থের অন্যত্র পাব। নিয়তিবাদের বিবরণ গোম্মটসার নামক একটি প্রাকৃত গ্রন্থে বিদ্যমান। শৈব আগমসমূহে নিয়তি এবং কালকে অশুদ্ধ মায়ার বিবর্তিত অবস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। স্বভাব ও যদৃচ্ছা

স্বভাববাদের মূল কথা হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মেই সব কিছুর সৃষ্টি। বিশ্ব প্রকৃতি কতকগুলি চিরন্তন কার্যকারণভিত্তিক নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা চালিত, যেখানে কোন অতিপ্রাকৃতের স্থান নেই। কণ্টকের তীক্ষ্নতা, মৃগপক্ষিগণের বিচিত্র ভাব, ইক্ষুর মধুরতা, নিম্বের তিক্ততা সমস্ত কিছুই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নিয়মের অভিব্যক্তি—'স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম্'। স্বভাবের নিয়মে 'কাম এব প্রাণিনাম্ কারণম্, শোণিত শুক্রসম্ভবঃ পুরুষো মাতা পিতৃনিমিত্তকঃ।' স্বভাবের নিয়মেই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু এই চারটি মূল উপাদানের সংমিশ্রণেই জগৎ, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলের উৎপত্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বভাববাদের পিছনে একটি সুস্পষ্ট বিজ্ঞানমনস্কতা রয়েছে, এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যুগে যখন এই স্বভাবকেই সব কিছুর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে সেকালে এই মতের সমর্থকদের সংখ্যা বড়

১। তর্করহস্য দীপিকা, ১১৫-২৪।
২। ১৯, ৫৪।
৩। ৬, ৬।
৪। ১২, ২৩২, ২১-এর উপর নীলকণ্ঠের টীকা।

কম ছিল না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আরও একটি মতবাদ উল্লিখিত হয়েছে যদৃচ্ছাবাদ নামে। স্বভাববাদের মত এই মতবাদেও ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃতের কোন স্থান নেই, কিন্তু স্বভাববাদের সঙ্গে যদৃচ্ছাবাদের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে সেখানে সব কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, এবং সেই নিয়মগুলি কার্য-কারণ পরম্পরায় চালিত, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সব কিছুই ঠিক এর উল্টো, প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, সমস্ত ব্যাপারই কাকতালীয়।

দুটি মতবাদের পার্থক্য গুণরত্ন[১] চমৎকার দেখিয়েছেন। তাঁর মতে স্বভাববাদীদের মূল কথা হচ্ছে, বস্তুর রূপান্তর তার নিজস্ব স্বভাবের কারণে। একটি বিশেষ কারণ একটি বিশেষ ধরনের কার্যই উৎপাদন করতে পারে, যেমন মাটি থেকে পাত্রই হয়, কাপড় হয় না, আবার সুতো থেকে কাপড় হয়, পাত্র হয় না। পক্ষান্তরে যদৃচ্ছাবাদে কারণ-কার্যের এই মূল নিয়মটি অনুপস্থিত। পদ্মফুল পঙ্ক থেকেও উৎপন্ন হয় গোবর থেকেও উৎপন্ন হয়, ডুমুর গাছ ডুমুর গাছের শিকড় থেকেও উৎপন্ন হয় আবার ডুমুর ফল থেকেও উৎপন্ন হয়। কাজেই কোথাও কোন নির্দিষ্ট কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। সব কিছুরই উদ্ভব আকস্মিক। হিরিয়ানা লিখেছেন:

Both the doctrines are at one in rejecting the idea that nature revels a divine power working behind it or indeed any transcendental being which controls it or is implicated in it. Nor does either school seek for its views any supernatural sanction... While the one maintains that the world is a chaos and ascribes whatever order is seen in it to mere chance, the other recognises that things are as their nature makes them. While the former denies causation altogether, the latter acknowledges its universality, but only traces all changes to the thing itself to which they belong... Hence according to Svabhavavada, it is not a lawless world in which we live; only there is no external principle governing it. It is self-determined, not undermined.[২]

দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ধর্মীয় ও দার্শনিক সাহিত্যে স্বভাববাদকে অত্যন্ত বিকৃতভাবে পূর্বপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। স্বভাববাদীদের পুঁথিপত্র বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাঁদের শত্রুপক্ষদের বক্তব্য থেকে বিষয়টিকে অনুমান করতে হয়। সে যাই হোক স্বভাববাদীদের বিশ্ববীক্ষার কিছু কিছু নিদর্শন বৌদ্ধ লংকাবতার সূত্র[৩], অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত[৪] এবং মহাভারত[৫] থেকে পাওয়া যায়। মহাভারত থেকে দুটি মূল্যবান খবর পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে, স্বভাববাদীরা কয়েকটি নৈতিক অনুশাসন মানত, অর্থাৎ তাদের একটি নির্দিষ্ট নীতিশাস্ত্র ছিল, অপরটি হচ্ছে, চিন্তাধারার দিক থেকে তারা ছিল বস্তুবাদী, স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ।

ভারতীয় ঐতিহ্যে স্বভাববাদীদের সঙ্গে বার্হস্পত্য, চার্বাক, লোকায়তিক

১। তর্করহস্য দীপিকা ১৩-১৫।
২। M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy,* 1956, 103-04.
৩। Kyoto ed, 1923, 184.
৪। ৯, ৫২।
৫। ১২, ১৭৯, ২২২, ২২৪, ২৩২ ইত্যাদি।

প্রভৃতিদের সমীকরণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত কোন কোন সম্প্রদায়কেও স্বভাববাদী বলা যায়। লোকায়ত ও চার্বাকদের নিয়ে আলোচনার সময় আমরা এই বিষয়ে আরও এক ধাপ অগ্রসর হতে পারব।

১০। ভূত ও যোনি, পুরুষ ও প্রকৃতিঃ সাংখ্য

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তালিকায় ভূত, যোনি ও পুরুষকে যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ হিসাবে মনে করা হত একথা বলা হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় পুরুষ বাদ গেছে এবং ভূত ও যোনির পরিবর্তে প্রকৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আসলে এই চারটি ধারণাই সাংখ্যদর্শনের বিকাশের কয়েকটি পর্যায় সূচিত করে। আদি সাংখ্যের কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। যোনিতত্ত্ব নিয়েও বিশদ আলোচনার অবকাশ হয়েছে। যোনি পূজা ও যৌন অনুষ্ঠানের বেশ কিছু নিদর্শন দিয়ে আমরা বোঝাতে চেয়েছি যে প্রাচীনকালে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে মানবীমাতার গর্ভধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ, সৃষ্টির মূলে নারীশক্তি (Female Principle) বা প্রকৃতির কার্যকারিতার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কালক্রমে প্রজননের ব্যাপারে পুরুষের গুরুত্বের ধারণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির পাশাপাশি পুরুষের ধারণাও গড়ে ওঠে, যদিও সাংখ্যের এই পুরুষ তখনও পর্যন্ত উদাসীন, অক্ষম ও নিষ্ক্রিয় দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাংখ্যদর্শন মূলত প্রকৃতির দর্শন, যদিও সেখানে পুরুষের একটা ভূমিকা আছে, যে ভূমিকা অবশ্যই গৌণ। সাংখ্যদর্শন বস্তুবাদী দর্শন যার মূল কথা জড় প্রকৃতির বিবর্তনের ফলেই সব কিছুর উদ্ভব হয়েছে। এ কালের বিখ্যাত পণ্ডিতেরা, যাঁরা ভারতবর্ষের মত 'আধ্যাত্মিক' দেশে বস্তুবাদ বা জড়বাদের অস্তিত্ব দেখতে নারাজ, সাংখ্যদর্শনকে নিয়ে যে মুস্কিলে পড়বেন সে কথা বলাই বাহুল্য, এবং সত্যই সে অবস্থা ঘটেছে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত ঢোঁক গিলে স্বীকার করেছেন যে সাংখ্যদর্শন মূলত বস্তুবাদী, তবে ওই পুরুষ উপাদানটি তাঁদের কিছু ভরসা জুগিয়েছে। ওই পুরুষের ভরসাতেই তাঁরা বলছেন, প্রকৃতি না হয় বস্তুই হল, কিন্তু ওই পুরুষটি চৈতন্য না হয়ে যায় না। এ চেষ্টা আগের যুগেও হয়েছিল। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি টীকাকারেরা পুরুষকে চৈতন্যময় সত্তা হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষকে বেদান্তের ব্রহ্মে দাঁড় করাতে গেলে পুরুষের বহুত্বকে অস্বীকার করতে হয়, আর সাংখ্যের পুরুষ এক নয়, একাধিক। সেই কারণেই তাঁদের বলতে হয়েছে যে ওই বহুত্বটাই মিথ্যা, আসলে পুরুষ এক, আর তা করতে গিয়ে সাংখ্যকেই বিকৃত করা হয়েছে।

সাংখ্য বস্তুবাদী দর্শন, যার ভিত্তি পরিণামবাদ বা সৎকার্যবাদ, যার মূল কথা কার্য-কারণ সম্পর্ক, যা কার্যে ব্যক্ত তা কারণে অব্যক্ত কিন্তু বিদ্যমান। আর সেই হিসাবে সাংখ্যের সঙ্গে পূর্বোক্ত স্বভাববাদের সম্পর্ক সুনিবিড়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত স্বভাববাদকে হিউম খোলাখুলিভাবেই সাংখ্যের সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন।[১] প্রাচীন কালের মনস্বীদের চোখে এই সম্পর্ক এড়িয়ে যায়নি।

১। R. E. Hume, *Thirteen Principal Upanisads,* 1921, 8.

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ১ পরিষ্কার বলেছেন : স্বভাব ইতি পরিণামবাদিনাং সাংখ্যানাম্। গৌড়পাদ বলেছেন : সাংখ্যানাং স্বভাবো নাম কশ্চিৎ কারণমস্তি।২ শংকরাচার্যও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন সাংখ্য স্বভাববাদেরই নামান্তর।৩ তাই সাংখ্য স্বাভাবিকভাবেই নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যমতে ঈশ্বরের ধারণাটাই অসিদ্ধ, কারণ প্রমাণাভাব।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে ভূতবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে তার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে চারটি বা পাঁচটি ভূত বা বাস্তব উপাদানের সমবায়ে সব কিছুর উদ্ভব হয়েছে যেগুলি হচ্ছে ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ)। সাংখ্যে এদেরই বলা হয়েছে পঞ্চ মহাভূত। এই উপাদান বা ভূততত্ত্ব ভারতবর্ষের সকল দর্শনকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। ঋগ্বেদে অবশ্য একটিমাত্র মৌলিক উপাদানকে স্বীকার করা হয়েছে যা হচ্ছে জল, যা গ্রীক দার্শনিক থালেসের মতবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিকে গণ্য করা হয়েছে, যার নিদর্শন পাওয়া যায় উপনিষদে। স্বভাববাদীরা চারটি মৌলিক উপাদানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা ব্যোম বা আকাশকে মৌলিক উপাদান হিসাবে গণ্য করে না। সাংখ্যে পাঁচটি উপাদানকেই প্রকৃতির বিবর্তিত অবস্থা বলা হয়েছে। উপাদান তত্ত্ব ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনেও স্বীকৃত। প্রথম চারটি উপাদানের রং এবং স্পর্শতা বিদ্যমান, পঞ্চম উপাদানটি, অর্থাৎ আকাশ, শব্দের আশ্রয় স্থল। বৈশেষিক সূত্রে৪ বলা হয়েছে যে প্রতিটি উপাদানই স্বভাবত কারণ হিসাবে কার্যের উৎপাদন করতে পারে, আর এই কার্যের উৎপাদন শর্তাধীন, যেমন জল বাষ্পও উৎপন্ন করতে পারে, বরফও। স্বভাবতই মৃত্তিকা কঠিন, কিন্তু কয়েকটি শর্তাধীনে তা পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। মাটি ও জলের বেগ ও গুরুত্ব আছে, কিন্তু শেষোক্ত গুণটি বায়ু ও অগ্নিতে অনুপস্থিত। ব্যাপকতর পরিধির পদার্থই ক্ষুদ্রতর পরিধির পদার্থকে ধারণ করতে পারে, যা সর্বব্যাপক তা সকলকে ধারণ করে, আর তা হচ্ছে আকাশ।

আসলে এইসব ধারণা প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিফলন, যা স্বভাববাদ ও সাংখ্যের উপজীব্য হয়েছিল এবং অপরাপর চিন্তাধারার মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। নানা ঐতিহাসিক কারণে প্রাচীন বস্তুবাদ চাপা পড়ে গেলেও ভাববাদী দর্শনের কাঠামো থেকে এগুলিকে একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভবপর হয়নি।

১১। পূর্বান্ত ও অপরান্ত কল্পিক

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বুদ্ধের সমকালীন দুটি দার্শনিক গোষ্ঠী উল্লিখিত হয়েছে পূর্বান্ত কল্পিক ও অপরান্ত কল্পিক।৫

পূর্বান্ত কল্পিক গোষ্ঠী চার ধরনের শাশ্বতবাদ, চার ধরনের আংশিক শাশ্বতবাদ, চার ধরনের অন্তানন্তিক, চার ধরনের অমরাবিক্ষেপিক এবং দু' ধরনের অধীত্যসমুৎপন্নিক নিয়ে গঠিত। শাশ্বতবাদীদের মতে জগৎ ও আত্মা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

১। ১২, ২৩২, ২১-এর উপর নীলকণ্ঠের টীকা।
২। সাংখ্যকারিকা ২৭-এর উপর গৌড়পাদের টীকা।
৩। ব্রহ্মসূত্র ২, ২, ৩-৫ এর শঙ্করভাষ্য।
৪। ২, ১, ৬-৭; ৫, ১, ১৭-১৮; ৫, ২, ১৩ ইত্যাদি।
৫। দীঘ নিকায়, ব্রহ্মজাল সুত্ত।

আত্মা হচ্ছে ভাল এবং মন্দ কর্মের দ্রষ্টা, বক্তা ও ফলভোগী, তা নিত্য, ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয় (অবিপরিণামধম্ম)।১ এই মত বৌদ্ধধর্মের বিরোধী কেননা বৌদ্ধ-ধর্ম ক্ষণিকবাদে বিশ্বাসী এবং ধ্রুব আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। আংশিক শাশ্বত-বাদীদের মতে মন ও চৈতন্য শাশ্বত, যদিও দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অনিত্য। মৈত্রী উপনিষদের২ একস্থানে বলা হয়েছে আত্মা শুদ্ধ, শান্ত এবং শাশ্বত, কিন্তু দেহ ঠিক ওইগুলির বিপরীত। আংশিক শাশ্বতবাদীদের সঙ্গে এই বক্তব্য মেলে। অন্তানন্তিকরা মূলত বিশ্বতত্ত্ব নিয়েই মাথা ঘামিয়েছিলেন। তাঁদের মতে (১) জগৎ সীমাবদ্ধ এবং গোলাকার, (২) জগৎ অনন্ত ও অসীম (৩) জগৎ উত্তর-দক্ষিণে সীমাবদ্ধ কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে অসীম এবং (৪) জগৎ সসীমও নয় অসীমও নয়। অমরাবিক্ষেপিকদের মতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট কথা বলা যায় না কেন না মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। জৈন গ্রন্থে বর্ণিত অজ্ঞানবাদ ও দার্শনিক সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তের মতবাদ এই রকম। অধীত্যসমুৎপন্নিকদের সঙ্গে পূর্বোক্ত স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদের সাদৃশ্য আছে। পরবর্তীকালের লোকায়ত, বার্হস্পত্য, চার্বাক প্রভৃতি মতবাদ ও দার্শনিক অজিত কেশকম্বলীর বক্তব্যসমূহ এই মত অনুসারী।

অপরান্ত কল্পিক ষোল ধরনের সংজ্ঞীবাদ, আট ধরনের অসংজ্ঞীবাদ, আট ধরনের নৈবসংজ্ঞীনাসংজ্ঞীবাদ, সাত ধরনের উচ্ছেদবাদ এবং পাঁচ ধরনের দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ নিয়ে গঠিত। সংজ্ঞীবাদ অসংজ্ঞীবাদ এবং নৈবসংজ্ঞীনাসংজ্ঞীবাদ মূলত বস্তু ও চৈতন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, সসীমত্ব ও অসীমত্ব, একত্ব ও বহুত্ব, আত্মার প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এদের এক একটি সম্প্রদায়ের এক একটি মত, কারো মতে আত্মা বস্তু, কারো মতে আত্মা অবস্তু, কারো মতে আত্মা অচেতন, কারো মতে সচেতন ইত্যাদি। উচ্ছেদবাদ ও দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ একটু ভিন্ন ধরনের। প্রথমটির মতে আত্মার দেহাতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব নেই, দেহের বিনাশের সঙ্গেই তার বিনাশ। দ্বিতীয়টিরও বক্তব্য এক, কিন্তু সেখানে সেই সঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছে যে দেহের তৃপ্তিতেই আত্মার তৃপ্তি, সুখসম্ভোগই পুরুষার্থ এবং সেখানেই মোক্ষ নিহিত।

১২। ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ

জৈন গ্রন্থসমূহে মহাবীরের সমকালীন ৩৬৩টি দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ আছে যেগুলি চারটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত—ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদ।

ক্রিয়াবাদ ১৮০ রকম। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জৈন সূয়গড়ে৩ বলা হয়েছে যে এই মতাবলম্বীরা মনে করে যে দুঃখ ব্যক্তির নিজের সৃষ্ট, সেখানে বাইরের কোন শক্তির ভূমিকা নেই। জ্ঞান ও সদাচরণের দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় (বিজ্জা-চরণং পমোক্খম্)। মূর্খেরা অসদ্-কর্মের সংক্রমণ ঠেকাতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞ লোক কুকর্ম না করে তা পারে (ন কম্মনা কম্ম খবেংতি বালা, অকম্মনা কম্ম খবেংতি ধীরো)। অক্রিয়াবাদ ৮৪ রকম, এবং তা ক্রিয়াবাদের বিরোধী। তারা মনে করে

১। মজ্‌ঝিম নিকায় ১, ৮; পপঞ্চসূদনি ১, ৭১।
২। ২, ৩৪।
৩। ১, ১২, ১১-১২।

কর্মের কোন ফল নেই, যাবতীয় মানবিক প্রচেষ্টাই নিষ্ফল।১ জৈন ঠানাঙ্গ গ্রন্থে২ আট প্রকারের অক্রিয়াবাদের উল্লেখ আছে—এক্কবাদ (অদ্বৈতপন্থী), অনিক্কবাদ (বহুত্ব-বাদী), মিতবাদ ও নিম্মিতবাদ (বিশ্বতাত্ত্বিক), সায়বাদ (সম্ভোগবাদী), সমুচ্ছেদবাদ (বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত উচ্ছেদবাদ যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) এবং ন-সন্তি-পরলোকবাদ (যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না)। শীলাঙ্ক তাঁর আচারঙ্গটীকায়৩ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্-উল্লিখিত কাল, ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি, স্বভাব ও যদৃচ্ছাবাদীদের অক্রিয়া-বাদী বলেছেন। জৈনগ্রন্থে উল্লিখিত অজ্ঞানবাদীরা৪ বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত অমরা-বিক্ষেপিকদের সঙ্গে অভিন্ন। তারা কোন প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকত, বেয়াড়া উত্তর দিত (অন্নানিয়া তে কুসলাবি সংতা, অসংথুন্যা নো বিতিগিচ্ছতিন্না, অকোবিয়া আহু অকোবিয়েহিম্, অননুবি-ইত্তু মুসং বয়ংতি)।৫ ৬৭ ধরনের অজ্ঞানবাদের উল্লেখ জৈনগ্রন্থসমূহে বর্তমান। বিনয়বাদ ৩২ রকম। জৈনদের মতে৬ এই মতাবলম্বীরা কয়েকটি নৈতিক অনুশাসন মেনে চলত, যদিও সেগুলির তাৎপর্য বুঝত না।

বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক যেসব দার্শনিক মতবাদের আমরা উল্লেখ করলাম তা থেকে তিন ধরনের খবর পাওয়া যায়। (১) বেশিরভাগ দর্শনই অক্রিয়াবাদী, যার মূল কথা কোন ক্রিয়ার কোন ফল নেই, সকল মানবিক প্রচেষ্টাই মূল্যহীন। (২) কয়েকটি দর্শনের মূল কথা দেহ ও আত্মা এক, পরলোক নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, হেসে নাও দুদিন বই তো নয়। (৩) প্রত্যেকটি চিন্তার ক্ষেত্রেই জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে মৃত্যুর প্রসঙ্গ রয়েছে। দেহের উচ্ছেদই সব শেষ হয় কিনা, আত্মা আছে কিনা, তার গতি মৃত্যুর পর কি হবে, আত্মা কর্মফল বহন করে কিনা—এই জাতীয় মৃত্যুকেন্দ্রিক কোন প্রতিজ্ঞাকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। সকলের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু নেতিমূলক। সকলেই এক ধরনের বিভ্রান্তি ও হতাশার শিকার। এর কারণ সে যুগের সামাজিক পটভূমিকাতেই আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

১৩। পূরণ কস্সপ

বস্তুতই যে যুগের ভয়াবহ রক্তপাত, জনজীবনের উপর অযৌক্তিক উৎপীড়ন, মহাবীর ও বুদ্ধের বয়োজ্যেষ্ঠ সমকালীন অক্রিয়াবাদী দার্শনিক পূরণ কস্সপকে বলাতে বাধ্য করেছিলঃ

মহারাজ, যে করে এবং করায়, যে ছেদন করে ও ছেদন করায়, যে অঙ্গহীন করে এবং অঙ্গহীন করায়, যে শোক ও নির্যাতনের কারণ হয়, যে কম্পিত হয় এবং যে কম্পিত করায়, যে প্রাণনাশ করে, যে সন্ধি ছিন্ন করে; যে অদত্ত গ্রহণ করে, যে লুণ্ঠন করে, যে চৌর্যে প্রবৃত্ত হয়, গুপ্ত স্থান হইতে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, যে পরদার গমন করে, মিথ্যা ভাষণ করে, তাহারা এইসকল কর্ম করিয়া পাপ করে না। যদি কেহ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংস-খলে,

---

১। সূয় ১, ১২, ৪। ২। ৪, ৪। ৩। ধনপতি সং ১৪।
৪। সূয় ১, ৬, ২৭; ১, ১২, ১-২; ২, ২, ৭৯; উত্তরাধ্যয়ন ১৮, ৩।
৫। সূয় ১, ১২, ২।
৬। সূয় ১, ১২, ৩-৪; উত্তর ১৮, ২৩।

এক মাংস-পুঞ্জে পরিণত করে, তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, পাপের আগম হয় না। যদি ওই ব্যক্তি আঘাত করিতে করিতে, হত্যা করিতে করিতে, ছেদন করিতে করিতে, ছেদন করাইতে করাইতে, অঙ্গহীন করিতে করিতে, অঙ্গহীন করাইতে করাইতে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পাপ হইবে না, পাপের আগম হইবে না। যদি ওই ব্যক্তি দান করিতে করিতে, দান করাইতে করাইতে, যজ্ঞ করিতে করিতে, যজ্ঞ করাইতে করাইতে, গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পুণ্য হইবে না, পুণ্যের আগম হইবে না। দান হইতে, দম হইতে, সংযম হইতে, সত্য বাক্য হইতে পুণ্যের উদ্ভব হয় না, পুণ্যের আগম হয় না।১

সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূরণের এই অক্রিয়াবাদকে মোটেই অসঙ্গত বলে মনে হয় না। অন্যায় করে লোকে বহাল তবিয়তে রয়েছে, অথচ ন্যায়পথে থেকে লাভ হয় না এই বাস্তব সত্যকে পূরণ ভুলতে পারেন নি, তাঁর অপরাপর সমকালীনদের মতই। পূরণের উল্লেখ জৈন ভগবতীসূত্র২ এবং সূয়গড়ে৩ বর্তমান। বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়ের৪ একস্থানে গোশালের মতবাদের কিয়দংশ পূরণের উপর আরোপিত হয়েছে। এর সমর্থন বৌদ্ধ দিব্যাবদান, তামিল কাব্য নীলকেশী এবং গুণরত্নের তর্করহস্যদীপিকায় পাওয়া যায়, যা থেকে অধ্যাপক ব্যাশাম অনুমান করেছেন যে আসলে পূরণ ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষক যিনি গোশালের পূর্বসূরী।৫ পূরণ আত্মহত্যা করেছিলেন, যার উল্লেখ ধম্মপদের টীকায় ও দিব্যাবদানে বর্তমান। সম্ভবত যুগের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি।

১৪। পকুধ কচ্চায়ন

পকুধ কচ্চায়নও ছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালীন। দীঘ নিকায়ের সামঞঞফল সুত্তের চৈনিক ভাষ্যে তাঁকে নির্ধারণবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে৬ বৌদ্ধ মজ্ঝিম নিকায় গ্রন্থে৭ গোশালের নিয়তিবাদী মতবাদকে পকুধের উপর আরোপিত করা হয়েছে যা থেকে ব্যাশাম অনুমান করেন যে পূরণের মত পকুধও আজীবিক সম্প্রদায়ের একজন গুরু ছিলেন।৮ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে প্রশ্ন উপনিষদের কবন্ধী বা ককুধ কাত্যায়নের সঙ্গে পকুধ অভিন্ন।৯ জৈন সূয়গড়ে১০ পকুধের যে মতবাদ উল্লিখিত হয়েছে, টীকাকার শীলাংকের মতে তা সাংখ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। দীঘ নিকায়ের সামঞঞফল সুত্তে পকুধের যে মতবাদ উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। দীঘ নিকায়; ভিক্ষু শীলভদ্রের বঙ্গানুবাদ (১৯৪৭) ৫৭-৫৮।
২। ৩, ১৪১। ৩। ১, ১, ১, ১৩। ৪। ৩, ৩৮৩ ই।
৫। A. L. Basham, *History and Doctrine of the Ajivikas*, 1951, 80 ff.
৬। W. W. Rockhill, *Life of Buddha*, 1884, 255 ff.
৭। ১, ৫১৩ ই।
৮। A. L. Basham, *op. cit.*, 91-92.
৯। B. M. Barua, *A History of the Pre-Buddhistic Indian Philosophy*, 1921, 281 ff.
১০। ১, ১, ১৫-১৬।

মহারাজ, এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, উৎপাদিকা শক্তিহীন, কূটস্থ, অচল, স্তম্ভ সদৃশ। তাহারা গতিহীন, বিকারহীন; তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে, পরস্পর পরস্পরের সুখ অথবা দুঃখ অথবা সুখ-দুঃখ বিধানে পর্যাপ্ত নহে। এই সাত বস্তু কি কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম বস্তু জীব। এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল, স্তম্ভ সদৃশ।...এইরূপে হন্তা নাই, ঘাতয়িতা নাই; শ্রাবক নাই, শ্রাবয়িতা নাই, বিজ্ঞাতা নাই, বিজ্ঞাপয়িতা নাই। যে তীক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা শীর্ষ ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা তাহারও জীবননাশ করে না, কেবল মাত্র সপ্ত বস্তুর মধ্যস্থ বিবরে অস্ত্র নিপতিত হইয়াছে।১

১৫। সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত

বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত অমরাবিক্ষেপিক এবং জৈনগ্রন্থে উল্লিখিত অজ্ঞানবাদ সঞ্জয়ের দর্শনের বিষয়বস্তু। তাঁর মতে পরম সত্য কোন দিনই জানা যাবে না, এমনকি কোন বিশেষ প্রসঙ্গেও সুনির্দিষ্ট মত দেওয়া যায় না। সঞ্জয়ের মতবাদকে ইংরাজীতে কেউ কেউ scepticism, কেউ কেউ agnosticism বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় তা একটা মানসিক বিপর্যয়ের দর্শন। পূরণ কস্‌সপ যখন বলেন ন্যায় অন্যায় মিথ্যা, পকুধ কচ্চায়ন যখন বলেন 'কেউ কারো মাথা কেটে ফেললে হত্যা করা হয় না, একটা উপাদানকে অপর একটা উপাদানে পরিবর্তিত করা হয় মাত্র', এই বিপর্যয়কর মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সঞ্জয়ের বিচার করতে হবে, যখন তিনি বলেন—

যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর 'পরলোক আছে কি?' তাহা হইলে যদি আমি মনে করি উহা আছে, তা হইলে 'পরলোক আছে' আমি এই রূপই প্রকাশ করিব। কিন্তু আমি তাহা কহি না। উহা যে ওই প্রকার আমি তাহাও কহি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। উহা আছে আমি তাহাও কহি না, নাই তাহাও কহি না...।২

১৬। অজিত কেশকম্বলী

অজিতকে কেউ কেউ ভারতীয় বস্তুতন্ত্রবাদের জনক বলে থাকেন, কিন্তু তিনিও তাঁর সমকালীনদের মত অক্রিয়াবাদী, ব্যর্থতা ও হতাশার প্রতীক। মানুষ সম্পর্কে তিনি নিস্পৃহ। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া অজিতের দর্শনকে গ্রীক এপিকুরোসের দর্শনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।৩ কিন্তু তাঁকে 'কবরখানার দার্শনিক' বললেই শোভন হয়, কেননা তাঁর মতেঃ

মহারাজ, দান নাই, যজ্ঞ নাই, হোম নাই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল বিপাক নাই, ইহলোক পরলোক নাই, মাতা পিতা নাই, উপপাতিক জীব নাই, পূর্ণ জ্ঞান

১। শীলভদ্রের অনুবাদ ৬২।
২। *ibid.* ৬৪।
৩। B. M. Barua, *op. cit.*, 289.

লব্ধ সর্বোচ্চ মার্গস্থ এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া ওই জ্ঞান প্রচার করেন। মনুষ্য চতুর্মহাভূত হইতে উৎপন্ন। যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবী ধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্বক উহাতেই লীন হয়, অপ্ ধাতু জলে, তেজ ধাতু অগ্নিতে এবং বায়ু ধাতু বায়ুতে লীন হয়, এবং তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। মৃতদেহ শবযানে বাহিত হয়। দাহস্থান পর্যন্ত প্রশংসা কীর্তিত হয়; অস্থিসমূহ কপোত বর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং সমস্তই ভস্মে পরিণত হয়। এই যে দান ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানের ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।১

১৭। গোশাল মংখলিপুত্ত ও আজীবিক সম্প্রদায়

বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালীনবর্গের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোশাল মংখলি-পুত্ত, যিনি আজীবিক নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও প্রধানতম ধর্মগুরু। গোশালের পূর্ববর্তী দুজন আজীবিক গুরুর নাম নন্দ বচ্চ ও কিস সংকিচ্চ। এছাড়া পূর্বোক্ত পূরণ ও পকুধ সম্ভবত এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে আজীবিকরা বৌদ্ধ ও জৈনদের পাশাপাশি বহুকাল টিঁকে ছিলেন। সম্রাট অশোকের পৌত্র দশরথ এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

গোশাল সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় জৈন সুয়গড়,২ ভগবতী সূত্র,৩ ও ঔপপাতিক সূত্রে৪ এবং বৌদ্ধ দীঘ নিকায় (সামঞ্ঞফলসুত্ত), সংযুক্ত নিকায়৫ (যেখানে গোশালের মতবাদ নত্থি হেতু, নত্থি পচ্চয়ো প্রভৃতি পূরণের উপর আরোপিত), অঙ্গুত্তর নিকায়৬ (যেখানে গোশালের মতবাদের সঙ্গে অজিত কেশকম্বলীর মতবাদ গুলিয়ে ফেলা হয়েছে), মহসচ্চকে সুত্ত,৭ সামঞ্ঞফল সুত্তের তিব্বতী ও চৈনিক ভাষ্য, মিলিন্দ-পঞ্ঞহো, মহাবোধি জাতক প্রভৃতি গ্রন্থে।

পালি গ্রন্থে গোশাল মক্খলি গোশাল নামে পরিচিত। তিনি দরিদ্র ঘরের সন্তান। জৈনগ্রন্থ অনুযায়ী গোশালায় তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই তাঁর নাম গোশাল। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মংখ, অর্থাৎ চারণ কবি ও চিত্রকর। গোশালও এই পেশা অবলম্বন করেছিলেন। বুদ্ধঘোষের মতে তিনি ছিলেন পলাতক ক্রীতদাস। কেন তিনি গৃহত্যাগীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন বলার কোন উপায় নেই। জৈন গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় মহাবীর তাঁর সন্ন্যাস জীবনের তৃতীয় বর্ষে গোশালের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর সাহচর্যে ছয় বছর কাটান। কিন্তু তারপর উভয়ের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ দেখা যায়। গোশাল মহাবীরকে পরিত্যাগ করেন এবং নিজেকে তীর্থংকর বলে ঘোষণা করেন। শ্রাবস্তীতে হালাহালা নামক এক কুম্ভকারণীর

১। শীলভদ্রের অনুবাদ ৬১।

২। ১, ২, ১-১৪; ১, ১, ৪, ৭-৯; ২, ১, ১৯; ২, ৬ শীলাংকের টীকাসহ।

৩। ১৫, ১ অভয়দেবের টীকাসহ।

৪। ১১৮, ১২০। ৫। ৩, ৬৯। ৬। ১, ২৮৬।

৭। মজ্ঝিম ১, ২৩১।

গৃহ তাঁর প্রচারের কেন্দ্র হয়। তিনি বহুস্থানে ভ্রমণ করেন এবং তাঁর বহু অনুগামী হয়।

ষোল বছর পর মহাবীরের সঙ্গে গোশালের পুনরায় সাক্ষাৎকার হয়, এবং উভয় উভয়কে গালিগালাজ করেন এবং অভিসম্পাত দেন। জৈন গ্রন্থ অনুযায়ী গোশাল ছিলেন মহাবীরের বিপথগামী শিষ্য; কিন্তু এর উল্টোটাই হওয়া সম্ভব। মহাবীর তাঁর সন্ন্যাসজীবনের তৃতীয় বছরে গোশালের সঙ্গে পরিচিত হন, যখন গোশাল এ পথে অনেক দূর এগিয়েছেন এবং নিজেকে তীর্থংকর বলে ঘোষণা করতে চেয়েছেন। মহাবীরের মত মানুষের পক্ষে এক গুরু ছাড়া কারো সঙ্গে ছয় বছরের মত দীর্ঘ সময় ব্যয় করা সম্ভব নয়। বস্তুত জৈন ধর্মের অনেক ধারণাই মহাবীর গোশালের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে বহু স্থলেই নির্গ্রন্থ এবং আজীবিকদের গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। মহাবীর গোশালের কাছ থেকেই নগ্ন হয়ে থাকার অভ্যাস করেন, যা কালক্রমে দিগম্বর জৈনদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে গোশালকে অচেলক-পরিব্রাজক নামক একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আজীবিকদের ছয় প্রকার 'অভিজাতির' ধারণা জৈন 'লেশ্যার' ধারণাকে এবং জীবের শ্রেণী বিভাগের বিষয়টিকে প্রভাবিত করেছে। সব্বে সত্তা সব্বে পানা সব্বে ভূতা সব্বে জীবা—এই রকম বাক্য বা বাক্যাংশ জৈন ও আজীবিক উভয়ের ক্ষেত্রেই সাধারণ। আজীবিকদের ব্যবহৃত নিম্নলিখিত ধারণাগুলি জৈনরা গ্রহণ করেছিলেন, যেমন যোনি-অমুখ (গর্ভ অথবা জন্ম), কর্ম, তাদের সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ, পটিপদা (পথ, মার্গ), অন্তর কল্প (জগতের যুগসমূহ), অভিজাতি (মানুষের শ্রেণী বিভাগ), পুরিষভূমি (মানব অস্তিত্বের স্তরসমূহ), অজীব (অচেতন পদার্থ) প্রভৃতি।

তাহলে মহাবীরের সঙ্গে গোশালের বিচ্ছেদের মূল কারণটা কি? কারণ একটি মাত্রই, তা হচ্ছে গোশালের অক্রিয়াবাদ ও নিয়তিবাদ। মহাবীরের মতে মানুষ তার নিজ ভাগ্য নিজেই গঠন করতে সক্ষম। তিনি ক্রিয়াবাদী। পক্ষান্তরে গোশালের মতে মানুষ অবস্থার দাস, তার কোন ক্রিয়ার কোন ফল নেই, সে নিয়তিতাড়িত। বৌদ্ধ মজ্ঝিম নিকায়ে১ গোশাল অহৈতুকতা (কারণকে অস্বীকার) ও অক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন বলা হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে২ বলা হয়েছে গোশালের মতবাদ কর্ম, ক্রিয়া এবং বীর্যের ফলকে অস্বীকার করে। দীঘ নিকায়ের সামঞ্ঞফল সুত্তে গোশালের মতবাদ তাঁর নিজের জবানিতে এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

মহারাজ, সত্ত্বগণের সংক্লেশের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই। হেতু ও প্রত্যয় বিনা সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের শুদ্ধির হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই। হেতু ও প্রত্যয় বিনা তাহাদের শুদ্ধি হয়। আত্ম-কার নাই, পর-কার নাই, পুরুষ-কার নাই, বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষ-স্থান নাই, পুরুষ পরাক্রম নাই। সর্ব সত্ত্ব, সর্ব প্রাণী, সর্বভূত, সর্ব জীব অবশ, অবল, নির্বীর্য। তাহারা নিয়তি ও সংযোগ পরিচালিত এবং ষড়্‌বিধ জাতিভুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখদুঃখ অনুভব করে।...কেহ কেহ মনে করিতে পারেন 'আমি এই শীল, এই ব্রত, এই তপ, অথবা এই ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ব কর্মের পক্বতা সাধন করিব, অথবা পরিপক্ব কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্ত করিব', কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য হইবেন না। সংসারে দ্রোণ-

১। ১, ৪০৯; ২, ১২১। ২। ১, ২৮৭।

তুলিত সুখদুঃখের পরিবর্তন হয় না। উহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষ নাই, অপকর্ষও নাই, যেরূপ সূত্র-গুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার গতি বেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে।১

গোশালের এই উৎকট নিয়তিবাদের কারণ নিঃসন্দেহে তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা। মানুষের উপর তিনি ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সম্ভবত তিনি তাঁর যুগের প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। তিনি বৃথাই ভেবেছিলেন অতীতের সেই প্রাক্-বিভক্ত সমাজ আবার ফিরে আসবে। শেষ স্বাধীন ট্রাইব বৃজিদের যখন অজাতশত্রু ধ্বংস করার উদ্যোগ নিলেন, তারই মধ্যে গোশাল দেখেছিলেন তাঁর প্রত্যাশার বিনাশ। তাঁর অন্তিম প্রলাপের মধ্যেও অজাতশত্রুর-যুদ্ধাভিযানের দুঃস্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে—চরিমে পোক্খল সংবত্তে মহামেহে (শেষ বিশাল ঝড়ের মেঘ), চরিমে সেয়নায়ে গন্ধহত্থি (একটি সুগন্ধ যুক্ত হাতীকে দখল করার নাম করেই অজাতশত্রু বৃজিদের আক্রমণ করেছিলেন), চরিমে মহাশিলাকণ্টকে (ওই যুদ্ধে মহাশিলাকণ্টক নামক একটি অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল যার উল্লেখ এই বাক্যে আছে)। যাই হোক এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে এই যুদ্ধই তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার বিলোপ ঘটাবে, তাই তিনি বিকারের ঘোরে শেষ পান (চরিমে পানে), শেষ গান (চরিমে গেয়ে), শেষ নৃত্য (চরিমে নট্টে), শেষ সম্ভাষণের (চরিমে অঞ্জলিকম্মে) কথা বলেছিলেন, পুরাতন সমবেত জীবনের যেগুলি ছিল স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। বাস্তবিকই তখন তিনি প্রবল জ্বরবিকারের ঘোরে নৃত্য করছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর এক শিষ্য তাঁর কাছে যথাকর্তব্য জানতে চেয়েছিলেন। গোশাল জবাব দিয়েছিলেন "বীণা বাজাও, বুড়ো খোকা, বীণা বাজাও।"

১৮। নিরীশ্বরবাদ ও নাস্তিক্য

আমরা আগেই দেখেছি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা মূলত নিরীশ্বরবাদী। মীমাংসকদের নিরীশ্বরবাদ এবং তার স্বপক্ষে কুমারিলের যুক্তিসমূহের উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। সাংখ্য দর্শনও নিরীশ্বরবাদী যার মতে প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের ধারণা অসিদ্ধ। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধ ও জৈন তাত্ত্বিকেরা অসংখ্য যুক্তি প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা খণ্ডন করেছেন। একমাত্র গোতম ও কণাদোত্তর ন্যায়-বৈশেষিকরাই ঈশ্বরকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যে নাস্তিক্য বলতে নিরীশ্বরবাদ বোঝায় না। একমাত্র বেদ বিরোধীদেরই নাস্তিক বলা হয়। মীমাংসা ও সাংখ্য ঈশ্বর মানে না, কিন্তু বেদ মানে, কাজেই তারা নাস্তিক নয়। বৌদ্ধ ও জৈনেরা বেদ মানেন না, কাজেই তাঁরা নাস্তিক। চার্বাক দর্শনের প্রবক্তারাও বেদ মানেন না, তাই তাঁরাও নাস্তিক। মনু বলেছেন, নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।২ পাণিনির৩ মতে 'আছে' এই মতি যার সেই

১। শীলভদ্রের অনুবাদ ৫৯-৬৬।
২। ২, ১১। ৩। ৪, ৪, ৬০।

আস্তিক, 'নেই' এই মতি যার সে নাস্তিক—অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ। পরবর্তী-কালে বলা হয়েছে যে ওই অস্তিনাস্তি বোধটা পরলোক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। ভট্টোজির মতে অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ। আরও পরবর্তী কালে নাস্তিক শব্দটি পারস্পরিক কাদা ছোড়াছ‌ুড়ির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন শৈবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে লিঙ্গার্চন পরাঃ শৈবা নাস্তিকাঃ পরিকীর্তিতাঃ, অর্থাৎ লিঙ্গপ‌ূজক শৈবরা নাস্তিক।

বেদ বিরোধীরা নাস্তিক ছাড়াও পাষণ্ড বা পাখণ্ড নামেও পরিচিত। পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্মঃ পা শব্দেন নিগদ্যতে। তং ষণ্ডন্তি তে যস্মাৎ পাষণ্ডাস্তেন হেতুনা। অর্থাৎ পা বলতে বোঝায় বেদধর্ম, তাকে যে খণ্ডন করে সেই পাষণ্ড। চার্বাক বা লোকায়তগণ পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদের প্রামাণ্য কিছ‌ুই স্বীকার করে না, তাই তারা পাষণ্ড। বেদ বিরোধিতার জন্য বৌদ্ধ ও জৈনগণও পাষণ্ড। বৌদ্ধ এবং জৈনরা আবার তাঁদের বির‌ুদ্ধবাদীদের পাষণ্ড বলেছেন। অর্থাৎ কালক্রমে পাষণ্ড শব্দটি দ্বারা 'বিধর্মী' ব‌ুঝিয়েছে।

১৯। চার্বাক দর্শন

ভারতীয় ঐতিহ্যে লোকায়ত ও চার্বাক এই দ‌ুটি শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। চার্বাক দর্শনের ম‌ূল কথা হল (১) ভূতবাদ, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, প্রভৃতি চতুর্ভূতই চরম সত্য; (২) দেহাত্ম-বাদ, অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা একান্তই অলীক; (৩) প্রত্যক্ষ প্রাধান্যবাদ, অর্থাৎ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অন‌ুমান অবান্তর; (৪) স্বভাববাদ, অর্থাৎ স্বভাবই জগৎ-বৈচিত্র্যের কারণ, এবং জগৎ স্রষ্টা বা ঈশ্বর একান্তই অলীক; এবং (৫) পরলোক বিলোপবাদ, অর্থাৎ পরলোকগামী আত্মার অভাবে পরলোকের পরিকল্পনাও অবান্তর।

চার্বাক দর্শনের উদ্গাতা হিসাবে জনৈক ব‌ৃহস্পতির নাম করা হয়, এবং এই হিসাবে চার্বাক দর্শনকে বার্হস্পত্য দর্শন বলেও উল্লেখ করা হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে ব‌ৃহস্পতির সংখ্যা অনেক। ঋগ্বেদে তিনজন ব‌ৃহস্পতি আছেন—আঙ্গিরস, লৌক্য এবং আরও একজন যাঁর উপাধি গণানাং গণপতিঃ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে একজন ব‌ৃহস্পতি আছেন যিনি গায়ত্রী দেবীর মস্তক চ‌ূর্ণ করেছিলেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদে[১] এক ব‌ৃহস্পতি আছেন যিনি নৈরাত্ম্যবাদ প্রচার করেছিলেন। এছাড়া ধর্মশাস্ত্রকার ও অর্থশাস্ত্রকার ব‌ৃহস্পতি আছেন। এঁদের মধ্যে কে চার্বাক দর্শনের প্রবক্তা তা বলা অসম্ভব। সে যাই হোক, মাধবাচার্য চার্বাককে 'ব‌ৃহস্পতি-মতান‌ুসারী' বলেছেন, এবং চার্বাক দর্শন আলোচনার পর 'তদেতৎ সর্বং ব‌ৃহস্পতিনা-প্যুক্তং' বলে এগারোটি শ্লোকও উদ্ধ‌ৃত করেছেন। কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বাচস্পতি নামটি ব্যবহার করেছেন—বাচস্পতিনা প্রণীয় চার্বাকায় সমর্পিতম্। তেন চ শিষ্যোপশিষ্য দারেণ বহ‌ুলীকৃতং তন্ত্রম্।

চার্বাক মতের অন‌ুর‌ূপ দার্শনিক মতসম‌ূহের বিকাশ স‌ুপ্রাচীন য‌ুগ থেকে হয়েছিল। জৈন গ্রন্থে বর্ণিত অক্রিয়াবাদীদের অনেকগ‌ুলি সম্প্রদায়, যেমন সায়বাদ,

---

১। ৭, ৯।

সমুচ্ছেদবাদ, ন-সন্তি পরলোকবাদ প্রভৃতি, এবং বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত অধীত্য সমুৎপন্নিক, উচ্ছেদবাদ, দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ প্রভৃতি বহুলাংশে চার্বাক দর্শনের অনুরূপ মত পোষণ করে। অজিত কেশকম্বলীর মতবাদের মধ্যে চার্বাক দর্শনের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে চার্বাক (বহুক্ষেত্রে লোকায়তের সঙ্গে অভিন্নকৃত) দর্শন হরিভদ্র সূরির ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে, শান্ত রক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে, কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে, সদানন্দ যতির অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে, সর্বমতসংগ্রহে, এবং মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় চার্বাক সম্প্রদায়ের কোন পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহে চার্বাক মত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা ওই মতকে পূর্ব পক্ষ হিসাবে রেখে। ভারতীয় দার্শনিকদের রীতি হচ্ছে, নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অন্য মত খণ্ডন করতে হয়। যে মতটিকে খণ্ডন করা হয় তার বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় পূর্বপক্ষ হিসাবে। বলাই বাহুল্য বিপক্ষের মতকে চূড়ান্ত বিকৃত করেই উপস্থাপিত করা হয়। চার্বাক মতও এই বিকৃতির শিকার হয়েছে, কারণ যাঁরাই চার্বাক মত উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ওই মতকে খণ্ডন করার জন্যই উল্লেখ করেছেন।[১]

আমরা এখানে মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করছি। মাধবাচার্য চতুর্দশ শতকের মানুষ হলেও তিনি প্রাচীনতর ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেই প্রচলিত দার্শনিক মতসমূহের পরিচয় দিয়েছেন।

...চার্বাকের মত খণ্ডন করা দুঃসাধ্য।...চার্বাকমতে পৃথিবী আদি চারটি ভূতই তত্ত্ব। দেহাকারে পরিণত ভূত চতুষ্টয় হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। সুরাসমুৎপাদক দ্রব্যসমূহের মিশ্রণ থেকে যেমন সুরাশক্তির উৎপত্তি হয়, ভূতচতুষ্টয়ের মিশ্রণ হতে সেইরূপ চৈতন্যের উৎপত্তি।...যেহেতু প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ নয়, সেই কারণেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব।...সুখই পুরুষার্থ। ...অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড, ভস্মাবরণ...এই সকল বুদ্ধি পৌরুষহীনগণের জীবিকা মাত্র।...অনুমান প্রমাণ নয়।...ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে অনুমান হয় না।...বাহ্য-প্রত্যক্ষ...(ও) মানস প্রত্যক্ষ দ্বারাও এইরূপ (ব্যাপ্তি) জ্ঞান সম্ভব নয়।...ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি স্বয়ং নিশ্চয় করে পর্বতাদিতে ধূম দেখে বহ্নি বিষয়ে যে অনুমান তাকে স্বার্থানুমান বলে। স্বার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব, হেত্বাভাস, উপাধি কিছুরই অবতারণা হয় না।...ব্যাপ্তি জ্ঞানের অভাব হলে ধূমাদির দ্বারা অগ্ন্যাদির অনুমান হতে পারে না। সুতরাং স্বার্থানুমান অসম্ভব। আবার পঞ্চাবয়ব বাক্যের প্রয়োগ অসম্ভব বলে পরার্থানুমানও হয় না। উপমানাদি ব্যাপ্তি জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। ...অনুপলব্ধিও ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় নয়।...অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানের দুর্বোধ্যতা হেতু অনুমানাদি প্রমাণের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

কাজেই অনুমান অসিদ্ধ হওয়ায় অনুমাননির্ভর সকল জ্ঞানই—ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, সব কিছুই অসিদ্ধ। চার্বাক সম্প্রদায়ের আক্রমণাত্মক বক্তব্যগুলি, যা মাধবাচার্য সংকলন করেছেন, নিম্নরূপঃ

১। চার্বাক দর্শন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর চার্বাকষষ্টি (১৯২৮), *Short History of Indian Materialism*, 1930, এবং চার্বাকদর্শন (১৯৫৯)।

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপিজন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েচ্ছিখাম্॥
গচ্ছতামিহজন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথিতৃপ্তিরবারিতা॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্রদানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরি স্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধু স্নেহ সমাকুলঃ॥
ততশ্চজীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেত কার্যানি নত্বন্যদ্ বিদ্যতে ক্কচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ।
জর্ভরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ কুতঃ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নন্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সমীরিতম্॥

বঙ্গানুবাদঃ স্বর্গ, অপবর্গ, বা পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়া ফলদায়ক নয়। অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মগুণ্ঠন বুদ্ধি পৌরুষহীনদের ধাতানির্দিষ্ট জীবিকা। জ্যোতিষ্ঠোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে গমন করে তবে যজমান কেন নিজের পিতাকে সেখানে নিহত করে না? শ্রাদ্ধে মৃতদের যদি তৃপ্তি হয়, তাহলে নিভে যাওয়া প্রদীপের শিখাকে শুধু তেলের দ্বারাই সংবর্ধিত করা যাবে। গৃহে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেই পর্যটকদের পথে ভোজন করার তৃপ্তি মিলবে, তাদের পাথেয়ের প্রয়োজন নেই। ভূতলস্থ দানে যদি স্বর্গ-বাসীর তৃপ্তি হয়, তাহলে প্রাসাদের উপরে স্থিত ব্যক্তির তৃপ্তির জন্য ভূতলে কেন অন্ন দেওয়া হয় না? যতদিন জীবিত থাকবে সুখে জীবনধারণ কর, ঋণ করেও ঘৃত পান কর। ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথা থেকে সম্ভব? যদি দেহ থেকে নির্গত হয়ে কেউ পরলোকে গমন করতে পারে তাহলে বন্ধু স্নেহে আকুল হয়ে সে কেন ফিরে আসতে পারবে না? সুতরাং মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রেত-কার্যাদির অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণদের জীবনোপায় ছাড়া কিছুই নয়। তিন বেদের কর্তা ধূর্ত, ভণ্ড, নিশাচর। জর্ভরী তুর্ফরী প্রভৃতিকে পণ্ডিতদের বচন বলা হয়। অশ্বমেধে পত্নী (মহিষী) অশ্বের শিশ্নধারণ করবেন, এই রকম নিয়ম কীর্তিত আছে। (যজ্ঞাদিতে) মাংস ভক্ষণের বিধান নিশাচরগণ দিয়েছে।

২০। লোকায়ত ও তন্ত্র

যদিও প্রাচীন লেখকেরা অনেকেই চার্বাক ও লোকায়তকে সমার্থবাচক করেছেন, প্রাচীন বহু গ্রন্থে চার্বাকমত লোকায়ত মত হিসাবে উল্লিখিত ও বর্ণিত হয়েছে, লোকায়তের বিষয় অনেক ব্যাপক। বরং বলা যায় চার্বাকদর্শন বৃহত্তর লোকায়ত জীবন চর্যার একটি বিশিষ্ট দিক। লোকায়ত দর্শন প্রসঙ্গে বর্তমান কালের একজন মনীষীর নাম অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে যিনি হচ্ছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। লোকায়ত দর্শনের উপর তাঁর গবেষণা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে। তাঁর রচিত পুস্তক পাঠের পর এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখার প্রয়োজন।১

দেবীপ্রসাদের মতে সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের নানা শাখায়, চার্বাক দর্শন ছাড়া, লোকায়ত সংক্রান্ত আর এক জাতীয় সাক্ষ্য বর্তমান। সেই সাক্ষ্য অনুসারে, লোকায়ত বলতে পরবর্তীকালের অর্থে কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক মত বোঝায় না। পক্ষান্তরে নামটি সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত কোন এক প্রকার সাধন পদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেয়। পরবর্তীকালে মূলত আমরা সেই সাধন পদ্ধতিকেই আউল-বাউল সহজিয়া কাপালিক-তান্ত্রিক প্রভৃতি নামে উল্লেখ করতে অভ্যস্ত, যদিও বলাই বাহুল্য, পরবর্তীকালে প্রচলিত এই নামের সাধন পদ্ধতিগুলির মধ্যে সুপ্রাচীনকালের সাধন পদ্ধতিটির স্বরূপ সর্বাংশে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব নয়।

এই জাতীয় সাক্ষ্যগুলির প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল যার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে লোকায়ত আজও আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। সহজিয়া, কাপালিক প্রভৃতি নামের আড়ালে তা আজও টিঁকে আছে। তাহলে লোকায়ত বলতে ঠিক কি বোঝা হবে? কোন একটি বিশুদ্ধ দার্শনিক মত, না কোন একপ্রকার সুপ্রাচীন সাধন পদ্ধতি? উভয় সম্ভাবনার পক্ষেই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান। লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনা বর্তমান থাকলে লোকায়ত সংক্রান্ত আধুনিক গবেষকের সমস্যা অবশ্যই সহজ হত, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব রচনা সমস্তই বিলুপ্ত হয়েছে।

দেবীপ্রসাদের মতে, পরবর্তীকালে যে সাধন পদ্ধতিকে সাধারণত আউল-বাউল সহজিয়া-কাপালিক-তান্ত্রিক প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়, তার আদিরূপ ও আধুনিক রূপের মধ্যে তাদাত্ম্য-কল্পনা স্পষ্টতই অবান্তর। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য সুপ্রাচীন সাধনপদ্ধতিটিকে কোন একটি নির্দিষ্ট নামে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এবং 'লোকায়ত' নামটিতে কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ থাকার জন্য ওই সাধনপদ্ধতি ও জীবনচর্যাকে 'তন্ত্র' আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। 'তন্ত্র' বলতে

১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলায় রচিত লোকায়ত-দর্শন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৯ সালে বইটির ইংরেজী সংস্করণ (নূতনভাবে লেখা) *Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism* নামে প্রকাশিত হয়। পুনরায় নূতনভাবে লেখা বাংলা লোকায়ত-দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এ।

প্রচলিত হিন্দু বা বৌদ্ধ তন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে না। আমরা আগেই দেখেছি তন্ত্র অতি প্রাচীন, যা অবলম্বন করে পরবর্তীকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে সুবিশাল তন্ত্র সাহিত্য রচিত হয়েছিল সে-সাহিত্যে উক্ত আদিম সাধন পদ্ধতির নানা বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলেও তারই সঙ্গে অনিবার্যভাবে তুলনায় অর্বাচীন নানা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণও ঘটেছিল। অতএব সুবিশাল তন্ত্র সাহিত্যের গুরুত্ব অস্বীকার না করেও স্বীকার করা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র এ-জাতীয় লিখিত সাহিত্য অবলম্বন করেই তন্ত্রসাধনার উৎস ও আদিরূপ সনাক্ত করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন আছে।

বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং দেখেছি উর্বরতামূলক আদিম জাদু অনুষ্ঠানসমূহ কিরূপে তন্ত্রের উৎস হয়েছিল। উক্ত আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস এই যে মানবীয় প্রজনন ও প্রাকৃতিক উৎপাদন একই সূত্রে বাঁধা, অতএব একটির সংস্পর্শে বা অনুকরণে অপরটিও আয়ত্তাধীন হয়। এই কারণেই আদিম তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানে জননাঙ্গ ও প্রজনন পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। দেবীপ্রসাদের মতে এই পর্যায়ের ধ্যান ধারণায় দেহাতিরিক্ত আত্মার কোন কল্পনা একান্তভাবেই অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানব-দেহের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পিত। অতএব তন্ত্র সাধনায় 'দেহতত্ত্ব' ও কায়সাধনার অপরিসীম গুরুত্ব। তন্ত্রমতে, 'যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। অর্থাৎ দেহরহস্যের মধ্যেই বিশ্বরহস্যের পরিচয় বা মূল সূত্র অনুমেয়। এই পর্যায়ের বিশ্বাসে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থান নেই বলেই পুরুষার্থ হিসাবে আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ উল্লিখিত নয়।

এখন তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দেহাত্মবাদী যে দর্শন চার্বাক দর্শন নামে পরিচিত, যে দর্শন অনুযায়ী দেহই সব, দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা একান্তই অলীক, তার মূল উৎস সুপ্রাচীনকালের লৌকিক দেহতত্ত্ব ও কায়সাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেই হিসাবে উক্ত প্রাচীন সাধনপদ্ধতি বা জীবনচর্যা যেমন লোকায়ত, দেহাত্মবাদী বিভিন্ন দার্শনিক মতও লোকায়ত। পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিন্তাশীলেরা—বিশেষত আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদীরা—এই লোকায়তকে অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচনা করেছিলেন। অতএব তাঁরা নিজেদের দার্শনিক বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করেই এই দেহবাদ বা দেহতত্ত্ব খণ্ডনের প্রয়াস করেন। কিন্তু, প্রশ্ন হল এই প্রয়াস কতখানি সার্থক বলে স্বীকারযোগ্য? দেহাত্ম-বাদ-বিরোধীরা দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেছেন তার সাহায্যে দেহাত্মবাদ কি বাস্তবিকই সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ হয়? দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁরা যে প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন তার সাহায্যে কি আত্মার অস্তিত্ব অবধারিত ভাবেই প্রমাণ হয়? দেবীপ্রসাদের গবেষণা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণ করেছে যে দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও বস্তুতপক্ষে বিরোধী দার্শনিকেরা দেহাত্মবাদ নস্যাৎ করতে পারেননি। পক্ষান্তরে এই দেহাত্মবাদের মধ্যেই পরবর্তী-কালের উন্নততর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়, যে জ্ঞান-লাভের পথে দেহাত্মবাদ-বিরোধীরা বস্তুতপক্ষে বহুবিধ কঠিন অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আত্মাবাদীরা যত প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রমাণাভাসমাত্র, প্রমাণ নয়। অর্থাৎ সেগুলির সাহায্যে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

৪

বৌদ্ধ ধর্ম

১। কয়েকটি মৌলিক সমস্যা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তু থেকে একটি ধারণা খুবই স্পষ্ট হয় যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন থেকে বহুমুখী ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব ও বিবর্তন শুরু হয়েছিল। এই যুগের চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি দুজন—গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধমান। তাঁদের সমসাময়িক আরও অনেক চিন্তানায়ক বর্তমান ছিলেন যাঁদের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এ'দের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গোশাল মংখলিপুত্ত।

উনিশ শতকের কোন কোন পণ্ডিত মনে করতেন যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম আসলে এক। পরে এই ধারণার অবসান ঘটে এবং দুটি ধর্মের পার্থক্য স্বীকৃত হয়। তদবধি এই দুই ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা হয়েছে অনেক বেশি।

আমাদের বক্তব্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, তৎসহ গোশাল প্রবর্তিত আজীবিক, পূরণ, পকুধ, অজিত, সঞ্জয় প্রভৃতির মতবাদ আসলে একটি প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি, একটি বিশেষ চিন্তাধারার এ'রা ব্যাখ্যাকার, যদিও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যাখ্যার কিছু ভেদ হয়েছে। প্রত্যেক যুগেই, সে-যুগের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যুগোপযোগী চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়, এবং সেই যুগের মনস্বীরা সেই চিন্তাধারার শরিক হতে বাধ্য হন, জ্ঞাতে এমন কি অজ্ঞাতে। এটাই ঐতিহাসিক নিয়ম। বুদ্ধ, মহাবীর ও তাঁদের সমকালীনবর্গ একই চিন্তাধারার শরিক ছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে বলা যায় এ'দের ব্যবহৃত ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিভাষা এক, আচার-অনুষ্ঠান প্রায় একই রকম, এবং এ'দের অনুগামীদের জীবনচর্যাও এক ধরনের। এই সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা এই কথা বলেই একমাত্র করা যেতে পারে যে একই ভিত্তির উপর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধ, জৈন, প্রতিটি ধর্মের চর্চার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে সেগুলি সমাধানের অতীত হয়ে দাঁড়ায়, অথচ সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা সেগুলি সমাধানের অনেক সূত্র খুঁজে পেতে পারি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে বুদ্ধের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা যায় না। তিনি আসলে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন সেখানেও সমস্যা আছে, কেননা বৌদ্ধ শাস্ত্র নামে আমরা যা পাই তার সবটাই অশোক-পরবর্তী যুগের, যার সঙ্গে বুদ্ধের যুগের ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর। ফলে কোন কোন পণ্ডিত বলেন (যেমন রীজ ডেভিডস্, ওল্ডেনবার্গ, কার্ণ) যে, পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে যা লেখা আছে, সেটাই আসল বৌদ্ধধর্ম। প্রতিপক্ষরা বলেন (যেমন শেরবার্টস্কি, ভ্যালে পুঁসা), তাহলে সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রই বা কি দোষ করল? পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রই যে প্রামাণ্য তার প্রমাণ কি? তাঁরা অভিধর্মকোশ ঘেঁটে কয়েকটি বিষয় বার করে বললেন যে ওইগুলিই হচ্ছে আদি বৌদ্ধধর্মের মূল কথা। আর এক দল বললেন যে পালি ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্রই একটি তৃতীয় মাগধী ভাষায় রচিত লুপ্ত হয়ে যাওয়া শাস্ত্র থেকে গৃহীত,

এবং সেই কল্পিত লুপ্ত হয়ে যাওয়া শাস্ত্রটিকে উদ্ধার করার জন্য তাঁরা পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্রের বক্তব্যের সাদৃশ্যমূলক দিক্গুলিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। হীনযান ও মহাযান উভয় ঐতিহ্যের মধ্যেই এই সন্ধান চলেছে এবং আজও চলছে। শুধু তাই নয় উভয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যেমন সর্বাস্তি-বাদ, মহাসংঘিক প্রভৃতির নিজস্ব রচনা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা হচ্ছে এগুলি থেকে বুদ্ধের আসল শিক্ষার কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা।১

এই জাতীয় কাজের নিশ্চয়ই মূল্য আছে। কিন্তু যদি বুদ্ধের সমকালীন অপরাপর ধর্ম ও দার্শনিক মতবাদসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধের আসল শিক্ষার অনুসন্ধান করা হত, তা অনেক বেশি ফলপ্রদ হত। প্রশ্ন উঠতে পারে, জৈন শাস্ত্র-সমূহও মহাবীরের মৃত্যুর বেশ কয় শতাব্দী পরে সঙ্কলিত হয়েছে। সেগুলিরই বা নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু? এর উত্তরে বলা যায়, জৈন ধর্মের ইতিহাস থেকে অন্তত একটি বিষয় পরিষ্কার যে জৈন ধর্মের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটেছে যৎসামান্য। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রূপান্তরের ইতিহাস। আদি বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হয়েছিল হীনযানে, হীনযান রূপান্তরিত হয়েছিল মহাযানে, মহাযান রূপান্তরিত হয়েছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে, তার পরবর্তী রূপান্তর এমনই ঘটেছিল যে বৌদ্ধ নামটিই এ দেশ থেকে হারিয়ে গেল। পক্ষান্তরে জৈন ঐতিহ্য বরাবর প্রায় একই ধরনের থাকার দরুন, জৈন শাস্ত্রে মহাবীরের সুনির্দিষ্ট পূর্বসূরী পার্শ্বনাথের মতামত রক্ষিত হবার দরুন, এবং বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে বুদ্ধ ও মহাবীরের সমকালীন দার্শনিকদের মতবাদ উল্লিখিত থাকার দরুন, সবগুলিকে একটি বিশেষ ধরনের চিন্তার বহুমুখী প্রকাশ হিসাবে গণ্য করলে বুদ্ধের মূল শিক্ষা কি ছিল তার একটা সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তৃতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধের মূল শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ আমাদের হয়েছে, বর্তমান অধ্যায়ে আরও কিছু বলার চেষ্টা করা যাবে।

২। বৌদ্ধ সাহিত্য

বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের সামগ্রিক নাম ত্রিপিটক, যা বিনয়, সুত্ত এবং অভিধম্ম এই তিন জাতীয় রচনার সমাহার।

বিনয়পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির বিভাগ এইরূপঃ সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক, পরিবার। সুক্তবিভঙ্গের দুটি ভাগ—মহাবিভঙ্গ ও ভিক্খুনী-বিভঙ্গ। খন্ধকের দুটি ভাগ—মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ।২

সুত্তপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং ক্ষুদ্দক নিকায়। ক্ষুদ্দক নিকায়ের পনেরটি উপবিভাগ—

১। সমস্যাটির জন্য মৎরচিত A Note on the Historical Biography of the Buddha, *Journal of Indian History*, 1, II, 1-12, এবং *The Origin of Buddhism*: A Survey of the Important Views, Proceedings of the *International Seminar on Buddhism and Jainism*, Cuttack, 1976, 208-215 দ্রষ্টব্য।

২। বিনয় পিটকের ইংরাজী অনুবাদঃ T. W. Rhys Davids এবং H. Oldenberg, *SBE*, 1881-85। সামগ্রিকভাবে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে পালি সাহিত্যের প্রতিটি গ্রন্থের সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন Pali Text Society। এই প্রতিষ্ঠান ১৮৮১ থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

ক্ষুদ্দক-পাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসংভিদা, অপদান, বুদ্ধবংস ও চরিয়া পিটক।১

অভিধম্ম পিটকের সাতটি গ্রন্থঃ ধম্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্ঠান।২

পালি ত্রিপিটক বলতে এই গ্রন্থগুলি বোঝায়। এছাড়া পালি ধর্মীয় সাহিত্যে আরও কয়েকটি গ্রন্থ আছে, যথা মিলিন্দ-পঞ্হো, নেত্তিপকরণ, বুদ্ধঘোষ, ধর্মপাল প্রভৃতি রচিত ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থাবলীর টীকাসমূহ, সিংহলী ইতিবৃত্ত মহাবংস ও চুলবংস, বুদ্ধ ঘোষের বিসুদ্ধিমগ্গ প্রভৃতি।৩

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের অধিকাংশই এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। তবে সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের পালি নিকায়ের অনুরূপ সংস্কৃত অগম-শাস্ত্র ছিল এবং অভিধর্মের সাতটি গ্রন্থ ছিল এটা সুনিশ্চিত। মূল-সর্বাস্তিবাদীদের বিনয় পিটকের অনেকটা অংশ গিলগিট পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে।

বিশুদ্ধ অথবা মিশ্রিত সংস্কৃতে রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য : মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, জাতকমালা ও অবদান। মহাযান সূত্র-সমূহের মধ্যে নয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর, লংকাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, গণ্ডব্যূহ, তথাগত-গুহ্যক, সমাধিরাজ এবং দশভূমীশ্বর। এগুলি ছাড়া নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনা সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।৪

১। দীঘনিকায়ঃ ইং অনুবাদ T. W. Rhys Davids, 1899, 1910, 1921, মজ্ঝিমঃ ইং অনুবাদ R. Chalmers, 1926-27; সংযুক্তঃ ইং অনুবাদ C. A. F. Rhys Davids এবং F. L. Woodward, 1917-30, অঙ্গুত্তরঃ ইং অনুবাদ E. R. T. Gooneratne, 1913; A. D. Jayasundara, 1925, F. L. Woodward এবং E. M. Hare, 1932-36, ক্ষুদ্দকপাঠঃ সম্পাদনা ও ইং অনুবাদ R. C. Childers, *JRAS*, 1870, ধম্মপদঃ F. Max Muller, *SBE*, 1895, C. A. F. Rhys Davids, 1931, উদান D. M. Strong, 1902, F. L. Woodward, 1935, ইতিবুত্তকঃ J. H. Moore, 1908, F. L. Woodward, 1935, সুত্তনিপাতঃ V. Fausball, *SBE*, 1898, R. Chalmers, 1932, বিমানবত্থুঃ সং E. R. Gooneratne, 1886, পেতবত্থুঃ সং J. Minayeff, 1888, থেরগাথা ও থেরীগাথাঃ ইং অনুবাদ C. A. F. Rhys Davids, 1909, 1913, জাতকঃ সং V. Fausball, 1877-97, ইং অনুবাদ E. B. Cowell, 1895-1913, বঙ্গানুবাদ, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, মহানিদ্দেসঃ সং L. de la Vallee Poussin এবং E. J. Thomas, 1916-17, চুল্লনিদ্দেসঃ সং W. Stede, 1918, পটিসংভিদা সং A. C. Taylor, 1905-07, অপদানঃ সং Mary E. Lilley, 1925-27, বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটকঃ ইং অনুবাদ B. C. Law, 1938। নিকায়গুলির বঙ্গানুবাদ বর্তমান।

২। ধর্মসঙ্গনিঃ ইং অনুবাদ C. A. F. Rhys Davids, 1923, বিভঙ্গঃ সং পূর্বোক্ত জন, 1904, ধাতুকথাঃ সং E. R. Gooneratne, 1892, পুগ্গল-পঞ্ঞত্তিঃ ইং অনুবাদ, B. C. Law, 1923, কথাবত্থুঃ ইং অনুবাদ C. A. F. Rhys Davids এবং S. J. Aung, 1925, যমক ও পট্ঠানঃ সং C. A. F. Rhys Davids, 1911-13, 1921-23.

৩। মিলিন্দঃ ইং অনুবাদ T. W. Rhys Davids, *SBE*, 1890-94, নেত্তিপকরণ ও পেতকোপদেসঃ সং E. Hardy, 1901, 1902, মহাবংসঃ সং ও অনুবাদ W. Geiger, 1908, 1912, দীপবংসঃ H. Oldenberg, 1879, চুলবংসঃ W. Geiger, 1925-27, বিসুদ্ধিমগ্গঃ সং C. A. F. Rhys Davids, 1920-21, মনোরথপূরণীঃ সং M. Walleser, 1924, পপঞ্চসূদনীঃ সং J. H. Woods ও D. Kosambi, 1922.

৪। মহাবস্তুঃ সং E. Senart, 1882-97, ইং অনুবাদ J. J. Jones, 1949-52

তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদের একটি বিরাট সংগ্রহ আছে—১,১০৮টি গ্রন্থ নিয়ে কাঞ্জুর এবং ৩,৪৫৮টি নিয়ে তাঞ্জুর। প্রথমটি সাতভাগে বিভক্ত—বিনয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, বুদ্ধাবতংসক, রত্নকূট, সূত্র, নির্বাণ ও তন্ত্র। দ্বিতীয়টি দুভাগে বিভক্ত—তন্ত্র ও সূত্র।১ চৈনিক ভাষাতেও অনুরূপ অজস্র অনূদিত গ্রন্থ বর্তমান, যেগুলিকে নানজিও চারভাগে ভাগ করেছেন—সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম ও বিবিধ।২ আরও একটি তালিকা, যা হোবোগিরিন নামে কথিত, ২,১৮৪টি গ্রন্থের উল্লেখ করে। এগুলি ৫৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে (তাইশো সংস্করণ) এবং চীন ও জাপানে রচিত আরও বহু গ্রন্থ ২৫টি অতিরিক্ত খণ্ডে স্থান পেয়েছে। জাপানে সমগ্র চৈনিক ত্রিপিটকের তিনটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বর্তমান, তাইশো সংস্করণের অতিরিক্ত ২৫ খণ্ডসহ। মাঞ্চুরীয় ভাষাতেও চৈনিক ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আছে। তিব্বতী তাঞ্জুরের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আছে মঙ্গোলীয় ভাষায়।৩

মধ্য এশিয়ার খোটান এবং তুরফান থেকে অনেক বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপির অংশ পাওয়া গেছে যেগুলির মধ্যে অশ্বঘোষের সারিপুত্রপ্রকরণ, কুমারলাতের কল্পনা-মণ্ডিতিকা, ধর্মত্রাতের উদানবর্গ, মাতৃচেটের স্তোত্রাবলী, সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ছাড়াও মধ্য এশিয়ার কুচীয়, খোটানী, সোগ্‌ডীয় ও উইগুর ভাষায় রচিত ও অনূদিত অজস্র বৌদ্ধ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এখনও যাচ্ছে।৪

৩। গৌতম বুদ্ধ

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ থেকে বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তার প্রায় সবটুকুই কাল্পনিক কাহিনীতে ভরপুর। সেগুলি থেকে যেটুকু খাঁটি বস্তু বার করা যায়, তা হচ্ছে তিনি শাক্য ট্রাইবের নেতা শুদ্ধোদনের ঔরসে কোলিয় ট্রাইবের মায়াদেবী বা মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন কপিলবাস্তুর অনতিদূরবর্তী লুম্বিনী

বঙ্গানুবাদ রাধাগোবিন্দ বসাক; ললিতবিস্তরঃ সং ও ইং অনুবাদ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র 1877, 1881-86, ফরাসী অনুবাদ P. E. Foucaux, 1884, 1892; বুদ্ধচরিতঃ সং ও ইং অনুবাদ E. B. Cowell, 1893; সৌন্দরানন্দঃ সং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 1910; জাতকমালাঃ সং H. Kern, 1891, ইং অনুবাদ J. S. Speyer, 1895; অবদানশতকঃ সং J. S. Speyer, 1902-9, দিব্যাবদানঃ সং E. B. Cowell and R. A. Neil, 1886, অবদান কল্পলতাঃ শরৎচন্দ্র দাস ও হরিমোহন বিদ্যাভূষণ, 1888; অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতাঃ সং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 1888; সদ্ধর্মপুণ্ডরিকঃ সং ও ইং অনুবাদ H. Kern, 1908-12, 1884; লংকাবতারঃ সং B. Nanjio, 1923, ইং অনুবাদ D. T. Suzuki, 1932: সমাধিরাজ, Gilgit Mss II, Chs. 1-16, সং K. Regamey, 1939।

১। P. Cordier, *Catalogue du fonds tibetain de la Bibliotheque Nationale, II eme et III eme parties*: *Index du bsTan-' Gyur,* 1909-15; M. Lalou, *Repertoire du Tanjur d'apres le Catalogue de P. Cordier,* 1933; Alaka Chattopadhyaya, *Catalogue of Kanjur and Tanjur,* 1972.

২। B. Nanjio, *Catalogue of the Chinese Tripitaka,* 1883.

৩। Chou Hsing Kuang, Indo-Chinese Relations: *A History of Chinese Buddhism,* 203, 205.

৪। A. F. R. Hoernle, *Manuscript Remains of Buddhist Literature,* 1916; M. Winternitz, *History of Indian Literature,* II 231 ff.

নামক স্থানে আনুমানিক ৫৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর জন্মের সাতদিন পরে তাঁর মা মারা যান এবং তিনি তাঁর বিমাতা এবং মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর নিকট মানুষ হন। ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত হওয়া সত্ত্বেও, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুরূপ দুঃখচেতনায় তিনি বরাবর আচ্ছন্ন থাকতেন। যথাসময়ে তাঁর বিবাহ হয় এবং রাহুল নামে তাঁর একটি পুত্রসন্তানও জন্মায়। কিন্তু সাংসারিক বন্ধন তাঁকে সুখী করতে পারে না, ফলে একদিন গভীর রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

প্রথমে তিনি পরিব্রাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং আড়ার কালাম ও উদ্রক রামপুত্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানে তিনি তৃপ্ত হন না। এরপর তিনি কঠোর আত্মনিগ্রহের পথ বেছে নেন এবং নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময় তাঁর পাঁচজন সঙ্গীও জুটে যায়। ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যে এই আত্মনিগ্রহের বিশেষ একটি স্থান আছে, যার মূল কথা হল জাগতিক সকল সুখ থেকে নিজেকে কঠোর ভাবে বঞ্চিত করতে পারলে পরম জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। এই রকম আত্মনিগ্রহকারী পরিব্রাজকের উল্লেখ প্রাচীন বহু রচনায় পাওয়া যায় যাঁরা বৃক্ষ থেকে পতিত ফল, স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর মাংস প্রভৃতির দ্বারা কোনক্রমে জীবনধারণ করতেন প্রাণটুকুকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যই। এই বিষয়টিকে নিয়ে খুব বেশি চর্চা হয়নি, তবে মনে হয় এটা অতি-প্রাচীন ট্রাইবজীবনের উত্তরাধিকার, যখন মানুষ একান্তই প্রকৃতিনির্ভর ছিল, যখন তাদের মধ্যে কোন উৎপাদন মনস্কতা জন্মলাভ করেনি।

সে যাই হোক, আত্মনিগ্রহের দ্বারা তাঁর কোন লাভ হল না, মাঝখান থেকে শরীরটা গেল; কার্যত তিনি একটি কঙ্কালে পরিণত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এভাবে চললে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই তিনি স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তা দেখে ঘৃণাভরে তাঁকে পরিত্যাগ করে গেল। একটু সবল হবার পর একদিন দ্বিপ্রহরে নিরঞ্জনা নদীর তীরে একটি শালবনে বহুক্ষণ অতিবাহিত করলেন। সন্ধ্যার মুখে তিনি একটি বটবৃক্ষের তলায় এলেন যা বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বোধিবৃক্ষ নামে পরিচিত। একজন ঘেসেড়া ওই বৃক্ষমূলে এক বোঝা ঘাস রেখে গিয়েছিল। তিনি তার উপর পা ছড়িয়ে উপবেশন করলেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে গেলেন, আর এরই ফলে ক্রমশ তাঁর সত্যোপলব্ধি ঘটল। তাঁর মনে হল জগৎ ও জীবনের রহস্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

আকস্মিক উপলব্ধির পর তিনি কয়েকদিন কিছুটা বিহ্বলতার মধ্যে কাটালেন। তারপর তিনি স্থির করলেন তাঁর উপলব্ধির কথা তিনি প্রচার করবেন। এই সময় দুজন বণিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল যাঁদের নাম তপুস্স ও ভল্লিক। তাঁরাই তাঁর প্রথম গৃহী শিষ্য হলেন। এরপর তিনি তাঁর প্রাক্তন দুই শিক্ষকের কথা স্মরণ করলেন, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে তাঁরা মারা গেছেন। তখন তাঁর মনে হল সেই পাঁচজন সঙ্গীর কথা যাঁরা তাঁকে আত্মনিগ্রহ থেকে বিচ্যুত দেখে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তাঁদের খোঁজে তিনি গেলেন কাশীর নিকট ঋষিপতন (সারনাথ) নামক স্থানে। তাঁদের সামনে তিনি তাঁর প্রথম ভাষণ দিলেন যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে খ্যাত। এই পাঁচজনই হলেন প্রথম বৌদ্ধমতে দীক্ষিত সন্ন্যাসী যাঁদের নিয়ে সূচনা হল বৌদ্ধ সংঘের।

এরপর সংঘে যোগদান করলেন উরুবেলার কাশ্যপ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ। তাঁদের নিয়ে বুদ্ধ চললেন গয়াশীর্ষে, সেখান থেকে মগধের রাজধানী রাজগৃহে,

যেখানে রাজা বিম্বিসার তাঁকে সংঘের জন্য একটি বিরাট বাঁশবন উপহার দিলেন। মগধে তাঁর বহু শিষ্য হল, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন যাঁরা আগে সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তের শিষ্য ছিলেন। পর বৎসর তিনি নিজ দেশ কপিলবাস্তুতে গেলেন। সেখানে তাঁর পত্নী পুত্র রাহুলকে তাঁর সামনে এনে পিতার উত্তরাধিকার প্রার্থনা করালেন। পুত্রকে বুদ্ধ শ্রমণ হিসাবে সংঘে গ্রহণ করলেন। শাক্য প্রধানরা দলে দলে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁদের গোষ্ঠীর নাপিত উপালিও দীক্ষিত হলেন। শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তাঁর গৃহীশিষ্য হলেন, এবং রাজকুমার জেতের কাছ থেকে বিরাট জেতবন ক্রয় করে সংঘকে উপহার দিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ, ধনী মহিলা বিশাখা, প্রভৃতি অনেকে তাঁর গৃহী ভক্ত হলেন। রাজগৃহে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবক কুমারভৃত্যের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন। পরে জীবক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তিন বছর পর শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধে বুদ্ধ মধ্যস্থতা করেন। তাঁর পিতা মারা গেলে তাঁর বিমাতা গৌতমী সংঘের সদস্যা হন এবং অতঃপর মেয়েরাও সংঘে যোগদানের অধিকারিণী হয়। এরপর বুদ্ধ অবশিষ্ট জীবন ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন এবং নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। যখন তাঁর বয়স বাহাত্তর, মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন। বুদ্ধের জ্ঞাতি ভাই দেবদত্ত, অজাতশত্রু যাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সংঘে ভেদ আনার ব্যর্থ চেষ্টা করেন এবং ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান। অজাতশত্রু বুদ্ধের জীবন-কালেই বৃজি সংযুক্ত রাষ্ট্র ধ্বংসের পরিকল্পনা করেন। সেই সময় বুদ্ধ একটি তাৎপর্যকর উক্তি করেনঃ যতদিন বৃজিরা তাদের পুরাতন গণবন্ধন বজায় রাখবে ততদিন তাদের কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।

তাঁর মৃত্যুর দু বছর আগে কোসলরাজ বিড়ূড়ভ শাক্যদের নির্মূল করেন। এই সংবাদ বুদ্ধের কাছে রীতিমত শোকাবহ ছিল। তথাপি তিনি কর্তব্যের ডাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিজের বাণী প্রচার করে চলেন। বৈশালীর বিখ্যাত গণিকা আম্রপালী তাঁর বিরাট আম্রকুঞ্জ সংঘকে দান করেন। বুদ্ধের এই শেষ দানগ্রহণ। আশী বছর বয়সে তিনি উপলব্ধি করেন যে তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। শাক্যদের ধ্বংস তাঁর মন ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর দুই প্রিয়শিষ্য শারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন মারা গিয়েছিলেন। অপর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে তিনি সংঘ ও ধর্ম সম্পর্কে শেষ নির্দেশ দিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পাবা নামক স্থানে চুন্দ নামক কর্মকারের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এই চুন্দই তাঁর শেষ দীক্ষিত শিষ্য। চুন্দের গৃহে তৎপ্রদত্ত শূকরমাংস গ্রহণ করে তিনি আমাশয়ে আক্রান্ত হলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি কুশীনগর যাত্রা করলেন। পথে মৃত্যু আসন্ন উপলব্ধি করে তিনি আনন্দকে দুটি শালবৃক্ষের মাঝখানে একটি কাপড় বিছিয়ে দিতে বললেন এবং তার উপর ডান দিকে পাশ ফিরে শয়ন করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।[১]

১। বুদ্ধের জীবনীর উপাদান নিম্নলিখিত রচনাগুলি থেকে পাওয়া যায়ঃ মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিত, নিদানকথা, অভিনিষ্ক্রমণসূত্র এবং বিনয় ও নিকায়সমূহের অংশবিশেষে যেমন মহাপদান-সুত্ত, অরিয়-পরিয়েসন-সুত্ত, মহাপরি-নিব্বাণ-সুত্ত প্রভৃতি। এছাড়া, সুত্তনিপাত, অপদান ও মহাবংসেও বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্তমান।

৪। বুদ্ধের আদি উপদেশসমূহ ও সেগুলির বিবর্তন

খোলাখুলি বলতে গেলে পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা রীতিমত জটিল ও পল্লবিত, যা থেকে সত্যই বুদ্ধ কি শিক্ষা দিয়েছিলেন তা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এই জটিল ও যান্ত্রিক বিষয়সমূহের কথা আমরা বৌদ্ধ সম্মেলন ও সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনাকালে কিছু কিছু জানতে পারব।

তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা যে কথা বলার চেষ্টা করেছি তা হচ্ছে এই যে একটা নিদারুণ ও নিষ্ঠুর সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের যুগে বুদ্ধ ও তাঁর সমকালীনবর্গ পুরাতন যুগের কয়েকটি অবদমিত নৈতিক মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধার করার এবং পরিবর্তিত সমাজের কয়েকটি কল্যাণমূলক বৈশিষ্ট্যকে উৎসাহ দানের কথা বলেছিলেন। বৃহত্তর সমাজকে ইচ্ছামত চালিত করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না, তাই বুদ্ধ ও মহাবীর তাঁদের কল্পিত সমাজের নিদর্শন হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন সংঘের, যেখানে একমাত্র বৃহত্তর সমাজত্যাগী দীক্ষিতদেরই প্রবেশাধিকার। অবশ্য সংঘের জীবনযাত্রা কোন মনগড়া আদর্শ নয়, তা প্রাক্-বিভক্ত সমাজের অতি বাস্তব সমবেত জীবনচর্যা, হারিয়ে যাওয়া বাস্তবের একটি আদর্শমূলক বিকল্প, যা আমরা পরে দেখব।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব, এবং তার জন্য সঠিক পথ জানা চাই। এটা কোন মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুঃখবিলাস নয়, বাস্তব দুঃখ। পরবর্তীকালের বৌদ্ধ রচনায় অজস্র ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিভাষায় দুঃখকে মুড়ে দেওয়া হলেও একটি শব্দ রয়ে গেছে, তা হচ্ছে জরামরণ। কী ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মূল্যে মানুষকে তার জন্মগ্রহণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, আশী বছরের সুদীর্ঘ জীবনে বুদ্ধ তা দেখেছেন। কোশল ও মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অনেক রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে হয়েছিল। বুদ্ধের চোখের সামনে তাঁর নিজ কুল ধ্বংস হয়েছিল। বৃজিদের বিরুদ্ধে মগধের রাজশক্তির প্রলয়ংকর অভিযানের তিনি ছিলেন দ্রষ্টা। কাজেই বুদ্ধ যখন দুঃখের কথা বলেন তখন সেটা জাগতিক দুঃখ না হয়ে যায় না।

দুঃখ সম্পর্কে বুদ্ধের যে ধারণা তা চরকসংহিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যা হচ্ছে রোগ আছে, রোগের কারণ আছে, রোগের নিবৃত্তি সম্ভব। চরকসংহিতা অনেক পরবর্তীকালে রচনা, কিন্তু সেখানে ধরে রাখা ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার আপ্তবাক্যগুলি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যলব্ধ। এই ঐতিহ্যকে বুদ্ধও আশ্রয় করেছিলেন, চিকিৎসকের নির্মোহ দৃষ্টি নিয়েই তিনি দুঃখকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার কারণ বার করার চেষ্টা করেছেন। কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতি বুদ্ধের নির্ভরতা সম্ভবত তাঁর গুরু আড়ার কালামের নিকট সাংখ্যদর্শন পাঠের ফল, যার মূল কথা একই বস্তু কার্যে ও কারণে বিদ্যমান, কার্যে যা ব্যক্ত তা কারণে অব্যক্ত। বুদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদ তত্ত্বের এইটাই হচ্ছে ভিত্তি।

নিজের জীবন দিয়েই বুদ্ধ বুঝেছিলেন যে মধ্যপথ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। গৃহবাস-কালে তিনি প্রচুর ভোগের মধ্যে কাল কাটিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি তৃপ্তি পাননি। পরিব্রাজকরূপে তিনি অশেষ কৃচ্ছ্রতা ও আত্মনিগ্রহ করেছেন, তাতেও তাঁর কোন উপকার হয়নি। দুঃখের কারণ হিসাবে দুটি বৌদ্ধ ধারণার আমরা পরিচয় পাই—তন্‌হা বা তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা। মনে হয় শেষোক্ত ধারণাটি পরবর্তী-কালে গড়ে উঠেছিল। তৃষ্ণা বলতে বুদ্ধ ঠিক কি বুঝেছিলেন বলা শক্ত, তবে

মনে হয় বিষয়তৃষ্ণা। অন্তত তাঁর সমকালীন মহাবীর বিষয়তৃষ্ণাই বুঝেছিলেন, যাঁর মতে লোভই হচ্ছে সকল দুঃখের হেতু। স্বার্থপরতা ও বিষয়তৃষ্ণাই মানুষকে অমানুষ, নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী করে তোলে, আর তা দমন করার জন্যই বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

একটা কথা এখানে বলা দরকার। বুদ্ধের দুঃখবাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক নেই। তিনি কোথাও বলেননি যে ব্রাহ্মণ্যবাদই দুঃখের কারণ। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাত উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী কিছু কিছু কথাবার্তা বৌদ্ধগ্রন্থে স্থান পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু একালের পণ্ডিতেরা যেরকম বলেন ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব—এ কথার কোন প্রমাণ বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়ই ছিলেন ট্রাইবজাত, এবং সেই হিসাবে তৎকালীন মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণদের চোখে নীচজাতীয়। বুদ্ধকেও মাঝে মাঝে পালি গ্রন্থে বৃষল বা নীচজাতীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে উচ্চবর্ণের মানুষেরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে বুদ্ধকে জাতে ওঠানো হয়। তিনি ক্ষত্রিয় বলে ঘোষিত হন এবং তাঁকে সার্বভৌম রাজা বা চক্রবর্তী হিসাবে দেখানো হয়। এর পরের পর্যায়ে তিনি দেবত্বে উন্নীত হন।

হীনযান বৌদ্ধধর্মে, যা আদি বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর, দুঃখের কারণ হিসাবে দায়ী করা হয়েছে অবিদ্যাকে১ এবং তার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ২ অনুসরণের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে সেটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, দৈহিক (শীল), মানসিক (চিত্ত বা সমাধি) এবং বৌদ্ধিক (প্রজ্ঞা)।৩ ভাববাদী প্রবণতার সূত্রপাত হীনযান বৌদ্ধধর্মে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রের থেকে পৃথক নয়, অথচ অবোধ মানুষ কয়েকটি হেতু-প্রত্যয়ের (কারণ এবং শর্ত) বশবর্তী হয়ে পৃথক্ দেখে, সেই রকম দৃশ্যমান জগতেরও কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। এই প্রবণতা চরম ব্যাপ্তিলাভ করেছে মহাযান বৌদ্ধধর্মে। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হচ্ছে নির্বাণ। এই নির্বাণের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে বলা হয়েছে যে তা অব্যাকৃত অজর (জরামুক্ত), অব্যাধি (ব্যাধিমুক্ত) অমৃত (মৃত্যুমুক্ত), অশোক (শোকমুক্ত), অসংক্লিষ্ট (অশুদ্ধতামুক্ত), অনুত্তর (তুলনা-

---

১। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ ইত্যাদি। এই বারোটি কারণ পরম্পরাকে বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ। অবিদ্যা অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং সংস্কার বা মানসগত ধারণাসমূহ জন্মান্তরে চৈতন্য (বিজ্ঞান), মানসিক ও দৈহিক উপাদানসমূহ (নাম-রূপ), ছয়টি ইন্দ্রিয় (ষড়ায়তন), সংযোগ (স্পর্শ), অনুভূতি (বেদনা) ও আকাঙ্ক্ষার (তৃষ্ণা) কারণ হয় যেগুলি আবার পুনরস্তিত্বের (ভব), তীব্র ইচ্ছার (উপাদান) উদ্ভব ঘটিয়ে জন্ম (জাতি) ও দুঃখের (জরামরণ ইত্যাদি) কারণ হয়। এই স্বীকৃত ব্যাখ্যাটি কিন্তু পল্লবিত।

২। সম্মা বাচা (সদ্বাক্য), সম্মা কম্মন্ত (সৎ কর্ম), সম্মা আজীবা (সৎ জীবিকা), সম্মা বায়াম (যথার্থ শ্রম), সম্মা সতি (যথার্থ মনন), সম্মা সমাধি (যথার্থ ধ্যান), সম্মা সংকপ্প (যথার্থ সংকল্প), সম্মা দিট্ঠি (যথার্থ দৃষ্টি)।

৩। শীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুত্তি চ অনুত্তরা।
অনুবুদ্ধা ইমে ধম্ম গোতমেন যসসিসনা॥
দীঘ নিকায় ২।১২৩॥

রহিত) এবং যোগক্ষেম (সর্বোচ্চ লক্ষ্য)। যে পাঁচটি স্কন্ধ বা উপাদান[১] কোন সত্তাকে গঠন করে সেগুলি আত্মাবিহীন (অনাত্ম), অচিরস্থায়ী (অনিত্য) এবং অ-কাম্য (দুঃখ)। যিনি উপাদান সমূহের মধ্যে আত্মার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করেন, তিনি জানেন যে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, এবং সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে তাঁর চারপাশে বস্তুনিচয়ের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব। কাজেই জগতে এমন কিছুই নেই যা তাঁকে আনন্দিত অথবা দুঃখিত করতে পারে, এবং সেই কারণেই তিনি বিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ (অর্হৎ)। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা থেকেই তৃষ্ণা বা আসক্তির উৎপত্তি, এই তৃষ্ণাই কর্মের স্রষ্টা, আর কর্মই মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এই জন্মান্তরের শৃংখল তখনই ভেঙে যায় যখনই জগতের অনিত্যতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটে, তখনই এই বোধ জাগে যে অস্তিত্ব মানেই ক্ষণিক অস্তিত্ব।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে দুঃখের সংজ্ঞা একেবারেই বদলে গেছে। গৌতম বুদ্ধ নামে যে একজন মানুষ ছিলেন যিনি দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন তা এখানে খোলাখুলি অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁকে দেবতায় পরিণত করা হয়েছে এবং স্বর্গে তাঁর বাসস্থান নির্ধারিত হয়েছে। হীনযান বৌদ্ধ ধর্মে জগতের একটা বাস্তব অস্তিত্ব মোটের উপর স্বীকৃত ছিল, যদিও তা অনিত্য ও ক্ষণিক। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মে জগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে, অস্তিত্বের অর্থ বাস্তব ক্ষণিক অস্তিত্ব নয়, শূন্য অস্তিত্ব। মহাযানীদের মতে এই শূন্যতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটলেই জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হবে, আর জগৎ মিথ্যা হলেই জাগতিক দুঃখও মিথ্যা হয়ে যাবে। কাজেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য দুঃখের অস্তিত্বটাকেই শূন্য অস্তিত্ব হিসাবে গণ্য করা উচিত।

তাহলে আমরা দেখছি, আদি বৌদ্ধ ধর্মে দুঃখ বলতে জাগতিক দুঃখ বুঝিয়েছে, যার কারণ হিসাবে বুদ্ধ বিষয়তৃষ্ণা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা, অপরের উপর প্রভুত্ব করার মনোবৃত্তি, ইত্যাদিকেই বুঝিয়েছেন (যেগুলিকে এককথায় তৃষ্ণা নামে অভিহিত করা হয়েছে), সেগুলি দমন করলেই দুঃখের বিনাশ ঘটানো যাবে একথা বলা হয়েছে এবং সেগুলি দমন করার জন্যই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে অনুসরণ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। হীনযান বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের দরুনই দুঃখের উৎপত্তি, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের ধারণা অবিদ্যাপ্রসূত, তার অনিত্যতা ও ক্ষণিকতা উপলব্ধি করতে পারলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটবে। মহাযানে আরও একধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে শুধু দৃশ্যমান বাহ্যবস্তুই মিথ্য নয়, যে দ্রষ্টা সেও মিথ্যা কাজেই দুঃখের কোন কথাই কার্যত উঠতে পারে না।

৫। বৌদ্ধ সংঘ

সংঘের অর্থ সমূহ, অর্থাৎ গণ, অর্থাৎ ট্রাইব। আমরা আগে বলেছি সংঘের জীবনযাত্রা প্রাক্-বিভক্ত সমাজের অতি বাস্তব সমবেত জীবনচর্যা, হারিয়ে যাওয়া বাস্তবের একটি আদর্শমূলক বিকল্প, যা বুদ্ধ ও মহাবীর জনসমক্ষে তুলে ধরে-

---

১। রূপ (বস্তুগত উপাদান), বেদনা (অনুভূতিগর্ত), সংজ্ঞা (অভিজ্ঞতালব্ধ), সংস্কার (মানসিক) এবং বিজ্ঞান (চৈতন্যময়)।

ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সংঘ প্রায় একই ধরনের। সংঘের নিয়মাবলী প্রণয়নে বুদ্ধ খোলাখুলি তাঁর যুগের ট্রাইবাল সমাজের নিয়মগুলি অনুসরণ করেছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে এর ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে।

কত গভীরভাবে যে বুদ্ধ ট্রাইবাল অনুশাসনগুলিকে সংঘের অনুশাসন রচনায় ব্যবহার করেছেন তা তিনটি বিষয়ের দ্বারা বোঝা যায়—দীক্ষা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিচালনা।

দীক্ষাক্ষেত্রে পুরোদস্তুর উপজাতীয় নিয়ম। ট্রাইবাল সমাজে দুভাবে অধিগ্রহণ কার্য হয়। যেহেতু ট্রাইব জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠন, তার কোন সদস্য সাবালক হলে তাকে কতকগুলি বয়ঃসন্ধিকালীন অনুষ্ঠানের মারফত সমাজের পূর্ণ সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাইরের কোন লোক যদি কোন ট্রাইবের সদস্য হতে চায় সেটা নির্ভর করবে সকলের সম্মতির উপর। এরূপ ক্ষেত্রে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তির নাম, পরিচয় ও গুণাবলী ঘোষণা করা হয়, এবং অন্যূন তিনবার জিজ্ঞাসা করা হয় অন্য সকলের এতে আপত্তি আছে কিনা। কেউ আপত্তি না করলে তাকে ট্রাইবের সদস্য করে নেওয়া হয়। বৌদ্ধসংঘে প্রবেশাধিকারের নিয়মও এই। সংঘে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তির নাম, পরিচয়, যে গুরুর অধীনে সে থাকতে চায়, সব কিছু ঘোষণা করে অপর সকলের সম্মতি চাওয়া হয়, এবং তা পাওয়া গেলেই তবে তাকে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক দীক্ষার নাম প্রব্রজ্যা। দীক্ষাগ্রহণকারীর বয়স অন্তত ১৫ হতে হবে, তার পিতামাতার সম্মতি প্রয়োজন, তার অতীত ইতিহাস কলুষমুক্ত হওয়া চাই। ২০ বছর বয়সে সে যোগ্য বিবেচিত হলে তাকে উচ্চতর দীক্ষা দেওয়া হবে যার নাম উপসম্পদা। তখন সে পাতিমোক্ষের নিয়মাবলী অনুসরণের অধিকারী হবে।

ট্রাইব-জীবনের নিম্নপর্যায়ে যেমন সম্পত্তির স্থান নেই, বৌদ্ধ ও জৈন সংঘে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান নেই। ব্যবহার্য সকল বস্তুই সংঘের কোন ব্যক্তির নয়। গোড়ার দিকে নিয়ম ছিল ভিক্ষুরা তাদের পরিধেয় বসন মৃতের পরিত্যক্ত বস্ত্র থেকে সংগ্রহ করবে। তারা দিনে একবারের বেশি দুবার খাবে না, কেননা এতে সঞ্চয় হয়। কোন বিশেষ খাদ্যসম্পর্কে ভিক্ষুরা কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবে না। তাদের পরিচ্ছেদ (চীবর) হবে মাত্র তিন টুকরো কাপড়, হলদে রঙে ছোপানো। তবে ঔষধ সঙ্গে রাখার ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ ছিল না (এটাও লক্ষ্যণীয় যে চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে বৌদ্ধদের একটা বরাবরের সম্পর্ক ছিল)। ঘরবাড়ি আসবাবপত্র সবই সংঘের। একটি এলাকার মধ্যে বসবাসকারী প্রতিটি ভিক্ষুকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে একত্র হতে হবে। সভাপতি বা সংঘের নির্বাচনের পর, পাতিমোক্ষের নিয়মাবলী আবৃত্তি করা হবে, এবং যদি কারো কোন বিচ্যুতি ঘটে থাকে তা সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে। বর্ষার তিনমাস, যাকে বলা হয় বস্‌সাবাস, স্বাভাবিক ভাবে ভিক্ষুরা বাইরে কারো না কারো আশ্রয়ে থাকবে, এবং এই সময়টা তাদের কারো দেখা সাক্ষাৎ হবে না। তিন মাস পর তাদের সমবেত হতে হবে, এবং যদি কোন বিচ্যুতি ইতিমধ্যে কারো ঘটে থাকে, তা তাকে সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে। এই সম্মেলনটির নাম পবারণা।

সংঘের পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরোদস্তুর গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন অনুসৃত হবে। কোন প্রধান কাউকে উত্তরাধিকারী করতে পারবে না। বুদ্ধ নিজেও তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেননি। একটি এলাকার (সীমা) ভিক্ষুরা সমবেত হয়ে সংঘ প্রধানকে (সংঘথের বা সংঘপরিণায়ক) নির্বাচিত করবে। প্রস্তাবসমূহ (নত্তি-

জ্ঞপ্তি) সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলেই ভাল, নতুবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বহাল থাকবে। ভোটপ্রথাও বর্তমান ছিল। চিহ্নজ্ঞাপক কাঠের টুকরো (শলাকা) ব্যবহৃত হত। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ই সর্বসমক্ষে আলোচিত হবে, তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য কমিটি গঠন করা যাবে। কিন্তু তা-ও নির্বাচনভিত্তিক। বুদ্ধ দুটি বিষয়ের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন—সমবেত জীবনচর্যা ও গণতন্ত্র, বৃহত্তর জনজীবনে যে দুটি আদর্শের অবলুপ্তি তাঁর চোখের সামনে ঘটেছিল।

৬। সঙ্গীতি বা সম্মেলনসমূহ ও সম্প্রদায়ভেদ

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অল্প কিছুকাল পরেই রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মহাকস্সপের সভাপতিত্বে। চুল্লবগ্গের একাদশতম খন্ধকে উল্লিখিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে বুদ্ধের মৃত্যুর পর সংঘের নিয়ম শৃংখলা কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণেই বুদ্ধের উপদেশসমূহ সঠিকভাবে সঙ্কলিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছিল। এই সম্মেলনে সুত্ত এবং বিনয় সঙ্কলিত হয়। ধর্মের উপর বুদ্ধের নির্দেশসমূহ আনন্দ আবৃত্তি করেন, আর উপালি আবৃত্তি করেন বুদ্ধকথিত নিয়ম শৃংখলার বিষয়গুলি। উপস্থিত ভিক্ষুরা সেগুলি মুখস্ত করে নেন। এছাড়া আনন্দের বিরুদ্ধে এই সম্মেলনে কয়েকটি বিচ্যুতির অভিযোগ আনা হয় এবং আনন্দের কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে ছন্ন (ছন্দক) নামক এক ভিক্ষুকে শাস্তি দেওয়া হয়। বুদ্ধ যখন গৃহত্যাগ করেন তখন ইনি ছিলেন তাঁর রথের সারথি, এবং সেই সুবাদে তিনি সকলের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতেন। শাস্তিলাভের পর তিনি অনুতপ্ত হন, এবং পাপমুক্ত হয়ে অচিরেই অর্হৎ হয়ে যান। প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের কথা সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিনয়েই উল্লিখিত। সিংহলী মহাবংস ও দীপবংস, মহাবস্তু, বুদ্ধঘোষের সমন্তপাসাদিকা, তিব্বতী দুল-ব এবং হিউয়েন সাং-এর রচনাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধের মৃত্যুর একশো বছর পর বৈশালীতে, যেখানে পূর্বদেশীয় (বৈশালী ও পাটলীপুত্রের অধিবাসী, এদের অনেকেই পূর্বতন বৃজিদের এলাকার লোক বলে বজ্জিপুত্তক নামেও পরিচিত) ভিক্ষুদের সঙ্গে পশ্চিমদেশীয় (কৌশাম্বী, পাঠেয্য ও অবন্তীর অধিবাসী) ভিক্ষুদের মত বিরোধ দেখা যায়। পূর্বদেশীয় ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে দশটি বেআইনী কর্মের অভিযোগ ছিল, চুল্লবগ্গের বর্ণনা অনুযায়ী সেগুলি হচ্ছে (১) সিঙ্গিলোণকপ্প বা শৃঙ্গের মধ্যে লবণ পরিবহণ, (২) দ্বঙ্গুলকপ্প বা যখন দুটি অঙ্গুলির ছায়া পড়ে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর ভোজন, (৩) গামন্তরকপ্প বা একই দিনে বাড়তি ভোজনের উদ্দেশ্যে অন্য গ্রামে গমন, (৪) আবাসকপ্প বা একই সীমার মধ্যে একাধিক উপোসথ অনুষ্ঠান, (৫) অনুমতিকপ্প বা কোন কাজ করার পর তার অনুমোদন আদায়, (৬) আচিণ্ণকপ্প বা কোন ঘটে যাওয়া ব্যাপারকে নজীর হিসাবে গ্রহণ করা, (৭) অমথিতকপ্প বা ভোজনের পর ঘোল সেবন করা, (৮) জলোগিম্-পাতুম্ বা তাড়ি পান করা, (৯) অদসকম্-নিসিদনম্ বা পাড়বিহীন কম্বল ব্যবহার করা এবং (১০) জাতরুপরজতম্ বা স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা। যশের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন ওই দশটি কাজকেই বেআইনি এবং সংঘবিরোধী বলে ঘোষণা করে। তখন বজ্জিপুত্তক বা পূর্বদেশীয় ভিক্ষুরা পৃথক একটি মহাসঙ্গীতি আহ্বান করে ওই

দর্শটি বিষয়কেই নিয়মসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থও রচনা করে নেন। এই বিভেদপন্থীরাই পরে পরিচিত হন মহাসংঘিক হিসাবে।

এইভাবে সংঘের বিভেদ একবার শুরু হবার পর তার সংখ্যাবৃদ্ধি হতে শুরু করে। প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল দলটি স্থবিরবাদী বা থেরবাদী নামে পরিচিত হয়, এবং কালক্রমে এ'রা এগারোটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিরুদ্ধবাদী মহাসংঘিকরা সাতটি উপদলে ভাগ হয়ে যায়। এই আঠারোটি সম্প্রদায়ই কিন্তু মূলত হীনযান-পন্থী ছিলেন, কিন্তু মহাসংঘিক ও তাঁদের অনুগামীরা ধীরে ধীরে মহাযান মতের দিকে এগিয়ে যান যা আমরা পরে দেখব।

তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায়, সভাপতি ছিলেন মোগ্গলিপুত্ত তিসস্। এটি ছিল কার্যত স্থবির বা থেরবাদীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে নয় মাস পরিশ্রমে স্থবিরবাদী ত্রিপিটক রচিত হয়। এছাড়া দেশ বিদেশে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠানোরও ব্যবস্থা হয়। বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির ইতিহাসে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীর অথবা জালন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় সম্মেলন যেমন ছিল স্থবিরবাদীদের, চতুর্থ সম্মেলন ছিল মূলত সর্বাস্তিবাদীদের। হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা অনুযায়ী বৌদ্ধদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার মানসেই কণিষ্ক এই সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন সুত্তপিটকের টীকা, বিনয়, বিভাষা ও অভিধর্ম-বিভাষা রচনা করে। শেষোক্ত রচনাটির উপর নির্ভর করেই বসুবন্ধু তাঁর বিখ্যাত অভিধর্মকোশ রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই চতুর্থ সম্মেলনে পালিভাষা উপেক্ষিত হয় এবং তার স্থান গ্রহণ করে সংস্কৃত।

সংঘভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ বুদ্ধের মৃত্যুর পর থেকেই দেখা গিয়েছিল। পুরাণ নামক একজন ভিক্ষু, তিব্বতীসূত্র অনুযায়ী গবাম্পতি, প্রথম সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে মানতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় সম্মেলনে ভিক্ষুদের জীবন চর্যার বিচ্যুতি ছাড়াও তত্ত্বগত মতভেদও ছিল। বসুমিত্রের রচনার তিব্বতী ও চৈনিক অনুবাদ থেকে জানা যায় দ্বিতীয় সম্মেলনে মহাদেব নামে এক ভিক্ষু পাঁচটি নূতন তত্ত্ব চালাবার চেষ্টা করেন (১) অজ্ঞাতে প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে কোন অর্হৎ পাপ করতে পারেন, (২) নিজ অজ্ঞাতেই কেউ অর্হৎ হয়ে উঠতে পারেন, (৩) মতাদর্শের ক্ষেত্রে কোন অর্হৎ সন্দেহবাদী হতে পারেন, (৪) শিক্ষক ব্যতিরেকে কেউ অর্হৎ হতে পারেন না এবং (৫) 'অহো, অহো', অর্থাৎ 'কী দুঃখের, কী দুঃখের' এইরকম আক্ষেপ সহকারে প্রার্থনা ও ধ্যান চলতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ সম্মেলন কার্যত সাম্প্রদায়িক সম্মেলন। বুদ্ধের মৃত্যুর চারশো বছরের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম অজস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখানে কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায়ের কথা আমরা উল্লেখ করব।

৭। স্থবিরবাদ বা থেরবাদ

থেরবাদকে হীনযান বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতম রূপ হিসাবে দাবি করা হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধ মানুষ ছিলেন, যদিও অতিমানবিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। মানবিক দুর্বলতা তাঁর ছিল, যেমন অসহিষ্ণুতা,[১] রোগকাতরতা[২]

১। চাতুমা-সুত্ত, মজ্‌ঝিম ৬৭। ২। সেখ-সুত্ত, মজ্‌ঝিম ৫৩।

প্রভৃতি। থেরবাদীদের বক্তব্য, বুদ্ধ শীল (চরিত্রগঠন), সমাধি (মানসিক স্থৈর্য) এবং প্রজ্ঞার (অন্তর্দৃষ্টির চর্চা) অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন; যার দ্বারা চারটি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদের উপলব্ধি ঘটবে। জাগতিক সব কিছুই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, তারা দুটি উপাদানে প্রস্তুত—বস্তুগত (রূপ) এবং অবস্তুগত (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান)। এই উপাদানগুলিকে আবার দ্বাদশটি আয়তন এবং অষ্টাদশটি ধাতুতে বিভক্ত করা যায়। আয়তন বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়। অনুমান করা যেতে পারে পূর্ববর্তী কল্পনার ষড়ায়তন (চক্ষুকর্ণাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়) দ্বাদশায়তনে পল্লবিত হয়েছে। ধাতু বলতে বোঝায় বস্তুর মূল সত্তা। 'অভিধম্মথ-সংগ্রহ'-নামক পরবর্তীকালের একটি রচনায় সকল জাগতিক বিষয়কেই চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—চৈতন্যময় (চিত্ত), মনোময় (চৈতসিক) বস্তুগত (রূপ) এবং নির্বাণ। প্রথমটি ৮৯ ধরনের, দ্বিতীয়টি ৫২ ধরনের এবং তৃতীয়টি ২৮ ধরনের। মানুষ যখন সকল আসক্তি থেকে মুক্ত হবে, অর্থাৎ নির্বাণের পর্যায়ে পৌঁছোবে, তখনই সে অর্হৎ হবে। সেটা এমন একটা জীবন যেখানে ভবিষ্যৎ জন্মের সম্ভাবনা নেই, যেখানে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। স্থবিরবাদীদের প্রভাব ভারতের সর্বত্র থাকলেও এই সম্প্রদায়ের প্রধানতম ক্ষেত্র সিংহল। সেখানকার মহাবিহারবাসী এবং অভয়গিরিবাসীদের মতবাদ স্থবির মতবাদের অনুরূপ।

৮। মহীশাসক, ধর্মগুপ্তিক, কাশ্যপীয়, সংক্রান্তিবাদী

মহীশাসক নামের দুটি সম্প্রদায় দুটি ভিন্ন ভিন্ন যুগে বর্তমান ছিল। পালি সূত্র অনুযায়ী মহীশাসকেরা বজ্জিপুত্তদের সঙ্গে স্থবিরবাদ থেকে বেরিয়ে আসে এবং সর্বাস্তিবাদের উদ্ভবের কারণ হয়। পক্ষান্তরে বসুমিত্র বলেন যে মহীশাসকেরা সর্বাস্তিবাদীদের থেকে উদ্ভূত। মহীশাসকেরা অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বুদ্ধকে মানুষ হিসাবেই তারা গণ্য করে। অর্হৎদের বিষয়ে তাদের বক্তব্য স্রোতাপন্নদের (যারা অর্হত্বের প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত) পতন হতে পারে, কিন্তু পুরো অর্হৎদের নয়। মহীশাসকদের মতে নয়টি অসংস্কৃত ধর্ম বর্তমান। অস্তিত্বের কোন মধ্যবর্তী অবস্থা (অন্তরাভব) নেই। এমন কিছুই নেই যা এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে সঞ্চারিত হতে পারে। কোন অবিশ্বাসী অতিলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে না। সৎকর্ম অস্তিত্বের কারণ হতে পারে না। চারটি আর্যসত্য এক সঙ্গেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে সদ্বাক্য, সৎকর্ম এবং সৎ জীবিকা মানসিক ক্রিয়া নয়। মহীশাসকদের প্রভাব ছিল কৌশাম্বী, ভারুকচ্ছ, অবন্তী, মহিষমণ্ডল ও সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তারা খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তী মহীশাসকগণ সর্বাস্তিবাদীদের মত অতীত ও ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। তাদের মতে স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তন সূক্ষ্মাবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে। অনুশয় বা অতি আবেগমূলক ভাবসমূহের ক্ষেত্রেও ওই এক কথা। অন্তরাভব বা দুই অস্তিত্বের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাস সর্বাস্তিবাদীদের মত পরবর্তী মহীশাসকদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল।

ধর্মগুপ্তকেরা মহীশাসকদের থেকেই গড়ে উঠেছিল। অভিধর্মকোশের[১] বক্তব্য

১। ৪, ৩৯।

অনুযায়ী ধর্মগুপ্তিকেরা সর্বাস্তিবাদীদের প্রাতিমোক্ষ নিয়মগুলি অসিদ্ধ বলে মনে করে কেন না তাদের মতে বুদ্ধের আসল শিক্ষা বিলুপ্ত হয়েছে। চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায় তাদের নিজস্ব বিনয় ছিল। তাদের মতবাদ সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে সংঘকে দান বুদ্ধের উদ্দেশে দানের চেয়ে মহৎ (বিপরীত মত মহীশাসকেরা পোষণ করে)। স্তূপের উদ্দেশে দানও উত্তম। শ্রাবকযান ও বুদ্ধযানের বিমুক্তি একই (মহীশাসকদেরও এই অভিমত)। অবিশ্বাসীরা অতিলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে না। অর্হৎদের দেহ সর্বদাই পবিত্র (অনাস্রব)। সত্যোপলব্ধি একই সময়ে হয়। মধ্য এশিয়া ও চীনে ধর্মগুপ্তিকদের প্রভাব ছিল।

কাশ্যপীয়রা স্থাবিরীয়, সদ্ধর্মবর্ষক, সুবর্ষক প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব সর্বাস্তিবাদীদের থেকে হলেও মতাদর্শের দিক থেকে এরা স্থবিরবাদীদের অনুরূপ ধারণাসমূহ পোষণ করে। বসুমিত্রের মতে কাশ্যপীয়দের মতবাদ অনুযায়ী অর্হৎদের ক্ষয়জ্ঞান এবং অনুৎপাদজ্ঞান আছে এবং তাঁরা কোনপ্রকার মোহেরই বশবর্তী নন। সংস্কারসমূহ প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতীত ও ভবিষ্যতের কিছু অংশ এবং বর্তমানের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

সংক্রান্তিবাদীদের অপর নাম সৌত্রান্তিক। পালি সূত্র অনুযায়ী এরা কাশ্যপীয়দের থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই সম্প্রদায় সংক্রান্তি, অর্থাৎ একবস্তুর অন্যতে সংক্রমণের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। যে পাঁচটি স্কন্ধের সহযোগে সত্তার উৎপত্তি, সেগুলির একটির মাত্র সূক্ষ্মাবস্থা আছে যা এক জন্ম থেকে অপর জন্মে সংক্রমিত হয়। এই সূক্ষ্ম স্কন্ধই হচ্ছে আসল পুদ্গল। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশে[১] সংক্রান্তিবাদী বা সৌত্রান্তিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাদের মতে অসংস্কৃত ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই। চিত্ত-বিপ্রযুক্ত এখানে অস্বীকৃত, যার অর্থ সংস্কারসমূহের সঙ্গে মনের কোন সংযোগ নেই। অতীত ও ভবিষ্যতের কোন অস্তিত্ব নেই। একটি সূক্ষ্ম চিত্ত, বা বীজ বা বাসনা বর্তমান, যা দিয়ে কার্যকারণের ব্যাখ্যা সম্ভব। ক্ষণিকবাদই একমাত্র সত্য, বিন্দুমাত্র স্থিতিও কোন কিছুর হতে পারে না। সৌত্রান্তিকদের মতবাদের চিত্ত বা মানসিক ক্রিয়ার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং বস্তুজগৎকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা এদের মধ্যে দেখা যায়। সৌত্রান্তিক দর্শন নিয়ে আলোচনাকালে আরও একটু বিশদ ভাবে এই বিষয়ে জানবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

৯। বাৎসিপুত্রীয়, হৈমবত, উত্তরাপথক ও অন্যান্য

বাৎসিপুত্রীয় বা সাম্মিতীয়রা একমাত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায় যারা এক ধরনের আত্মায় (পুদ্গল) বিশ্বাসী। তাদের মতে পুদ্গল ব্যতিরেকে জন্মান্তর সম্ভব নয়। যেহেতু বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধকে (অস্তিত্বের পাঁচটি উপাদান) অনাত্ম বলে ঘোষণা করেছেন সেই হেতু এই মতবাদ বসুবন্ধু, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ তাত্ত্বিক কর্তৃক খণ্ডিত হয়েছে। বাৎসিপুত্রীয়দের মতে পুদ্গল স্কন্ধগুলির সঙ্গে অভিন্ন নয়, এবং পৃথকও নয়। এই সম্প্রদায় অবন্তী অঞ্চলে শক্তিমান ছিল এবং হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রী এদের

১। ১, ৩; ২, ৩৫, ৩৬, ৫০, ৫৫, ৫, ২৫ ইত্যাদি; ভ্যালে পুঁসার ফরাসী অনুবাদ দ্রঃ।

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ এই সম্প্রদায়ের পনেরটি পুঁথি নিয়ে গিয়েছিলেন। ই-সিং এদের পৃথক্ বিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।১

বসুমিত্র হৈমবতদের স্থবিরবাদীদের উত্তরাধিকারী বলেছেন, ভব্য ও বিনীতদের এঁদের মহাসংঘিকদের শাখা বলেছেন। এঁদের বিষয় সামান্যই জানা যায়। এদের প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল হিমালয় অঞ্চল। উত্তরাপথকদের উল্লেখ একমাত্র কথাবত্থু-অট্ঠকথাতে পাওয়া যায় যাদের মতবাদ মহাসংঘিক ও স্থবিরবাদের মাঝামাঝি ছিল। বসুমিত্রের রচনায় আলোচনা-ব্যতিরেকে ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানীয় এবং ছন্নগরিকদের উল্লেখ আছে। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে এদের মতবাদ অনেকটা বাৎসিপুত্র-সাম্মিতীয়দের অনুরূপ ছিল। ভব্য ও বিনীত-দের বিভজ্যবাদীদের উল্লেখ করেছেন সর্বাস্তিবাদীদের একটি শাখা হিসাবে। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা-সিদ্ধি গ্রন্থের চৈনিক টীকায় বিভাজ্যবাদীদের প্রজ্ঞপ্তিবাদীদের (মহাযান-ঘেঁসা) সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে সিংহলী মহাবংস থেকে জানা যায় যে স্থবিরবাদীরাও সময় সময় নিজেদের বিভজ্যবাদী বলতেন।

১০। সর্বাস্তিবাদ

স্থবিরবাদ ছাড়া হীনযানী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সর্বাস্তিবাদ। সর্বাস্তিবাদীদের শাস্ত্রগ্রন্থ মূলত সংস্কৃতে লেখা। অভিধর্মকোশের লেখক বসুবন্ধু এই সম্প্রদায়ের একজন বড় তাত্ত্বিক ছিলেন। সম্রাট কণিষ্ক এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হীনযান বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রধান দর্শন, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক, সর্বাস্তিবাদের দান। সর্বাস্তিবাদের প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল কাশ্মীর ও গন্ধারসহ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মধ্য এশিয়া।

সর্বাস্তিবাদীদের মূল কথা 'সর্বম্ অস্তি'। শুধু বর্তমানকালের বিষয়গুলির অস্তিত্বই যে নিশ্চিত তা নয়, অতীত ও ভবিষ্যতেরও। সর্বাস্তিবাদীরা বস্তুজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের অর্হৎরা স্খলন-পতনের অধীন। বুদ্ধ কোন লোকোত্তর সত্তা নন। মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা সমাধি সম্ভব। অন্তরাভব, অর্থাৎ দুই জন্মের মধ্যবর্তী একটি পর্যায় সম্ভব। সকল বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব থাকলেও আত্মাধরনের কোন চিরন্তন সারপদার্থ নেই। জগৎ-গঠনকারী উপাদানসমূহ ৭৫টি, তন্মধ্যে ৭২টি সংস্কৃত অর্থাৎ যৌগিক এবং ৩টি অসংস্কৃত বা মৌলিক। ৭২টি সংস্কৃত ধর্ম যেগুলির মধ্যে ১১ ধরনের রূপ বা বস্তু, ৪৬ ধরনের মানসিক বা চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্ম এবং ১৪ ধরনের অমানসিক বা চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম বর্তমান। অবশিষ্ট একটি শেষ দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী। এই ৭৫টি উপাদান কার্যকারণ সম্পর্কে গ্রথিত যে সম্পর্ক প্রধান (হেতু) ও অপ্রধান (প্রত্যয়) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্বাস্তিবাদের বহু শাখা প্রশাখা আছে।

১১। মহাসংঘিক

মহাসংঘিক ও তার অনুরূপ সম্প্রদায়গুলি হীনযান-পন্থী হলেও এদেরই মধ্যে মহাযানের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা আগেই দেখেছি মহাসংঘিকদের উদ্ভব

১। T. Watters, *On Yuan Chewang's Travels in India*, 1904, I, 20-21; J. Takakusu, *Records of the Buddhist Religion*, 1896, 7, 66, 140.

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন থেকে। তারা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে স্থবিরবাদবিরোধী আচরিয়বাদী রূপে। মহাসংঘিকদের নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থ বিদ্যমান। লেখমালার সাক্ষ্যে জানা যায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই তারা প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।

স্থবিরবাদীদের মত মহাসংঘিকেরাও চারটি আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নৈরাত্মবাদ কর্মতত্ত্ব, প্রতীত্যসমুৎপাদ, সাঁইত্রিশটি বোধিপক্ষীয় ধর্ম প্রভৃতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের মতবাদসমূহ মৌলিক ভাবে পৃথক। যথা—(১) বুদ্ধেরা লোকোত্তর। তাঁরা সকল মলিন উপাদান (সাস্রব ধর্ম)-মুক্ত। তাঁরা নিদ্রা বা স্বপ্নের বশবর্তী নন, সদা-সমাধিস্থ, মুহূর্তেই সকল কিছু উপলব্ধি করেন। (২) বোধিসত্ত্বগণও লোকোত্তর। তাঁরা চারটি গর্ভাবস্থার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেন না, শ্বেতহস্তীরূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন। তাঁরা কাম, অহিত (ব্যাপাদ) এবং হিংসা (বিহিংসা) রহিত। সকল শ্রেণীর প্রাণীর মঙ্গলের জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন। (৩) জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণলাভ এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা জাগতিক বিষয়ে আসক্তি (সরাগ) এবং বৈরাগ্য (বিরাগ) দুইই আনতে পারে। রূপেন্দ্রিয়সকল (চক্ষুকর্ণাদি) নিছকই মাংসনির্মিত এবং সেই হিসাবে পরম জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। (৪) কোন কিছুই অব্যাকৃত নয়, অর্থাৎ বস্তুসমূহের প্রকৃতি হয় ভাল নয় মন্দ; ভালও নয়, মন্দও নয় এমন হতে পারে না। মনের আসল প্রকৃতি শুদ্ধ। উপক্লেশ বা মোহের দ্বারা এবং আগন্তুক রজঃ, অর্থাৎ যে মালিন্য আকস্মিক এসে পড়ে, তারই প্রভাবে মন সংক্রমিত হয়।

মহাসংঘিক সম্প্রদায় ভেঙে কয়েকটি মহাযান-ঘেঁসা উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধান দুটি বিভাগ গোকুলিক (কুক্কুলিক) এবং একব্যবহারিক (লোকোত্তরবাদী)। প্রথমটি থেকে গড়ে উঠেছিল চৈত্যক, বহুশ্রুতীয় ও প্রজ্ঞপ্তি-বাদী। চৈত্যক থেকে গড়ে উঠেছিল পূর্বশৈল, অপরশৈল, রাজগিরিক ও সিদ্ধার্থিক। এই উপসম্প্রদায়গুলি কাগজে কলমে হীনযানপন্থী হলেও কার্যত মহাযানবাদের ভিত্তি রচনা করেছিল।

১২। বহুশ্রুতীয়, চৈত্যক ও অন্যান্য

অমরাবতী এবং নাগার্জুনিকোণ্ড থেকে প্রাপ্ত লেখমালায় বহুশ্রুতীয়দের উল্লেখ আছে। তাদের মতে অনিত্যতা, দুঃখ, শূন্য, অনাত্ম এবং নির্বাণবিষয়ক বুদ্ধের উপদেশসমূহ লোকোত্তর কারণ সেগুলি মুক্তির দ্যোতক। বুদ্ধের অবশিষ্ট শিক্ষা-সমূহ লৌকিক। পরমার্থের মতে বহুশ্রুতীয়রা শ্রাবকযান ও মহাযানের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ। হরিবর্মনের সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র এই সম্প্রদায়ের একটি মুখ্য গ্রন্থ। বহুশ্রুতীয়রা আত্মনৈরাত্ম ও ধর্মনৈরাত্ম (ব্যক্তি ও বস্তুর আত্মহীনতায়) বিশ্বাসী। তাদের মতে সত্য দুই প্রকার, ব্যবহারিক (সংবৃতি) ও পরমার্থিক। ব্যবহারিক সত্যের দৃষ্টিকোণে ৮৪টি উপাদানে বিশ্বজগৎ অস্তিত্ববান, কিন্তু পরমার্থিক সত্যের দৃষ্টিতে তা শূন্য। বুদ্ধের ত্রিকায়তত্ত্বের পূর্বাভাষ বহুশ্রুতীয়দের মধ্যে পাওয়া যায়।

চৈত্যকদের উল্লেখও অমরাবতী ও নাগার্জুনিকোণ্ড থেকে প্রাপ্ত লেখমালায় বর্তমান। মহাসংঘিকদের সঙ্গে চৈত্যকদের মতের খুব বেশি পার্থক্য নেই। তবে চৈত্য প্রদক্ষিণ, চৈত্যে উপহার দান প্রভৃতির উপর কিছুটা গুরুত্ব এই সম্প্রদায় দিয়ে থাকে। এখানে বুদ্ধদের কল্পনা করা হয়েছে জিতরাগ-দোষ-মোহ হিসাবে। তাঁরা

সূক্ষ্ম উপাদানে (ধাতুবর-পরিগহিত) গঠিত, এবং দশটি বিশেষ শক্তির (বল) অধিকারী। সম্যক্-দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বেষমুক্ত নাও হতে পারেন। নির্বাণ একটি ধনাত্মক ত্রুটিহীন অবস্থা (অমতধাতু)।

কথাবত্থুর টীকায় আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে যেমন রাজগিরিক, সিদ্ধত্থক (সিদ্ধার্থিক), পুব্বসেলিয় (পূর্বশৈল), অপরসেলিয় (অপরশৈল), বাজিরিয়, বেতুল্যক প্রভৃতি। প্রথম চারটিকে একত্রে অন্ধক বলা হয়। বেতুল্যকদের অপর নাম মহাশূন্যতাবাদী। এদের বক্তব্য অনুযায়ী বুদ্ধ ও সংঘের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, এগুলি বিমূর্ত ধারণা।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের লেখমালায় উপরি-উক্ত সম্প্রদায়সমূহের অনেকগুলিরই উল্লেখ পাওয়া গেছে। চৈনিক পরিব্রাজকদের বৃত্তান্তেও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব পুঁথি ও শাস্ত্রগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকগুলির তিব্বতী ও চৈনিক অনুবাদও পাওয়া গেছে। এছাড়া তিব্বতী ও চৈনিক বিভিন্ন বৌদ্ধ রচনায় উক্ত সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।[১]

১৩। মহাযানের উদ্ভবঃ ভাববাদী প্রেরণা

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মহাযান একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এই পরিবর্তন গুণগত। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের যদিও বা কিছুটা হীনযান বৌদ্ধধর্মে বজায় ছিল, মহাযান বৌদ্ধধর্মে তা কার্যত একেবারেই অনুপস্থিত। হীনযান বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মতে গৌতম বুদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন যিনি দুঃখ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং দুঃখনিরোধের জন্য কতিপয় ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন। মহাযান ধর্মে বুদ্ধের মনুষ্যত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁকে প্রথমে লোকোত্তর, পরে দেবতা, অবশেষে সর্বোচ্চ দেবতার পদ দেওয়া হয়েছে যিনি স্বর্গে বাস করেন এবং এক দঙ্গল দেবদেবীর উপর প্রভুত্ব করেন। যে-দুঃখকে নিয়ে বুদ্ধের যাত্রা শুরু, মহাযান বৌদ্ধধর্মে সেই দুঃখকে অস্বীকার করা হয়েছে জগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে; বলা হয়েছে, জগতের অস্তিত্ব শূন্য অস্তিত্ব এই বোধ এলেই দুঃখের অস্তিত্ব শূন্য অস্তিত্ব হিসাবে প্রমাণিত হবে, আর এই শূন্যতার উপলব্ধিই হচ্ছে নির্বাণ। হীনযান বৌদ্ধধর্মে অর্হৎ-এর ধারণা আছে। অর্হৎ হল আদর্শ মানুষ, সকল প্রকার জাগতিক মোহ থেকে সে মুক্ত। অর্হত্বের সাধনা, চরিত্রের সাধনা যা একান্তই ব্যক্তিনির্ভর। মুক্তিকামী যে কোন মানুষ স্বেচ্ছায় এবং নিজদায়িত্বে এই মার্গ নেবে। এই অর্হত্বের আদর্শ মহাযানে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

১। বৌদ্ধ সম্প্রদায়সমূহের উপর বিশিষ্ট রচনাসমূহঃ V. Vasilev, *Der Buddhismus,* 1860; H. Kern, *Manual of Indian Buddhism,* 1884, I. P. Minayeff, *Buddhizm,* 1884; L. de la Valee Poussin in *Encyclopaedia of Religion and Ethics* IV, 179-184; Idem in *Le Museon,* VI, 30-37: O. Francke in *Journal of the Pali Text Society,* 1908; P. Demieville in *Melanges Chinois Buddhiques,* I: M. Hofinger in *Le Museon* XX, 1946; A. Bareau, *Les Sectes Buddhiques du Petit Vehicule,* 1955, R. Kimura in *Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volume*: N. Dutt, *Buddhist Sects in India,* 1970.

বিকল্প হিসাবে বোধিসত্ত্ব-নামক একটি ধারণার আমদানী করা হয়েছে। এই বোধি-সত্ত্ব দেবতা হতে পারেন, গৃহী হতে পারেন, সন্ন্যাসী হতে পারেন, এমন কি, মানুষ নাও হতে পারেন। এঁদের কাজ হচ্ছে মানুষকে মুক্তিলাভে সাহায্য করা, এমনকি সে সাহায্য না চাইলেও বা তার মুক্তিলাভের বাসনা না থাকলেও। সুকঠোর অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, কয়েকটি সৎকর্ম করলেই (পারমিতা) কাজ হবে। মহাযানীদের উদ্দেশ্য ব্যক্তির মুক্তি নয় গণমুক্তি, এবং এই কারণেই তারা নিজেদের মহা বা মহৎ বলে দাবি করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মহাযানের মোটামুটি তিনটি বড় বৈশিষ্ট্য বর্তমান—বুদ্ধের দেবত্ব, শূন্যবাদ এবং বোধিসত্ত্বত্ব। এখন আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন, বৌদ্ধধর্মের এই রূপান্তর কবে হল, এবং কেন হল। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর মোটামুটি সহজ। মহাযানের উদ্ভব হয়েছে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক নাগাদ। এই বিষয়ে সাহিত্যগত প্রমাণ বর্তমান। কোন্ পুঁথি মহাযানপন্থী তা বোঝা যাবে যদি সেখানে ধর্ম-শূন্যতা (জাগতিক বস্তুর অনস্তিত্ব) ও পুদ্গলশূন্যতার (আত্মার অনস্তিত্ব) শিক্ষা থাকে, যদি সেখানে অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উল্লেখ থাকে, যদি সেখানে দেব-দেবীর পূজার বিধান থাকে, এবং যদি সেখানে মুক্তির উপায় হিসাবে মন্ত্রের ব্যবহার অনুমোদিত হয়। এই রকম সর্বপ্রাচীন একটি পুঁথি হচ্ছে প্রজ্ঞাপারমিতা। এর চৈনিক অনুবাদ করেছিলেন লোকরক্ষ ১৪৮ খৃষ্টাব্দে। তাহলে মূল পুঁথিটি ওই সময়ের পূর্ববর্তী। প্রখ্যাত মহাযানী দার্শনিক নাগার্জুনের তারিখ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ফেলা হয়েছে। এছাড়া লেখমালার সাক্ষ্যেও খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকই মহাযানের উদ্ভবের কাল অনুমিত হয়।

কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের কারণ কি? এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তাঁরা বলেন, বৌদ্ধধর্মকে জনমুখী করার প্রচেষ্টার ফলই হচ্ছে মহাযান। গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেখানে গৃহী মানুষদের কার্যত কোন স্থান ছিল না। বৌদ্ধধর্ম মূলত সংসার-ত্যাগীদের ধর্ম। এর মূল কথাই হচ্ছে জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে সংঘের আশ্রয় নিতে হবে। গৌতম বুদ্ধের বিরুদ্ধে তৎকালীন অনেকেরই অভিযোগ ছিল যে শ্রমণ গৌতম পত্নীদের পতিহারা করছেন, মাতাকে সন্তানহারা করছেন, প্রতিটি গৃহকেই নিরানন্দ করে তুলছেন, কেননা অসংখ্য মানুষ পারিবারিক সুখনীড় ত্যাগ করে উন্মত্তের মত সংঘে যোগদান করছে। বস্তুতই মুক্তিকামী মানুষ ছাড়া সাধারণ সাংসারিক মানুষদের জন্য বুদ্ধ কোন ব্যবস্থাপত্রই দেন নি। সাধারণ মানুষেরা বড় জোড় ত্রিশরণ নিতে পারত (অর্থাৎ মুখে বলতে পারত বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি), বড় জোর স্তূপে চৈত্যে ফুল-বাতি দিতে পারত, বড় জোর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দিতে পারত, কিন্তু তাদের কোন জীবন-চর্যা বুদ্ধ নির্দিষ্ট করেননি, যা করেছিলেন মহাবীর।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা সাধারণ গৃহী মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। কাজেই মহাযানীরা তাদের সামনে পারমিতা নামক কয়েকটি আদর্শ হাজির করলেন। পারমিতার সংখ্যা গোড়ায় ছিল ছয়টি, পরে তা দশটিতে দাঁড়ায়, যেগুলির অনুশীলন গৃহী মানুষদের পক্ষে করা সম্ভব, যথা—দান, শীল (ন্যায়পরায়ণতা), ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায়কৌশল্য, প্রণিধান (সংকল্প), বল ও জ্ঞান। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মে ভক্তি ও পূজার স্থান ছিল। কোন মনোভাব, ভালই হোক মন্দই হোক, সমাজের একাংশে জাগলে অপর অংশও তার দ্বারা প্রভাবিত

হয়। কাজেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সাধারণ মানুষদের এই বিশেষ আবেগটির কথা স্মরণে রেখেই বুদ্ধকে দেবতা করা হল, তাঁর পূজার প্রচলন ঘটানো হল, বুদ্ধমূর্তি নিয়ে মিছিল বার করা ইত্যাদি চালু হল। সকল ধর্মেই মানুষ ও ঈশ্বর বা দেবতাদের মাঝখানে একটা মধ্যবর্তী শ্রেণী থাকে। বোধিসত্ত্বরা সেই শ্রেণীর। এ-ছাড়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, লৌকিক বা ট্রাইবাল দেবদেবী প্রভৃতির সঙ্গেও একটা আপোষ করতে হয়। ইউরোপে যখন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হচ্ছিল তখন সবচেয়ে বড় বাধা এসেছিল স্থানীয় প্যাগান ধর্মমতসমূহ এবং সেগুলির দেবতাদের অনুগামীদের কাছ থেকে। বাধ্য হয়ে খ্রীষ্টধর্মকেও একটা আপোষ করতে হয়েছিল, প্যাগান দেবদেবীদের সেণ্ট বানিয়ে। অনুরূপ ভাবে মহাযানীদের জনসংযোগের দরুন স্থানীয় দেবদেবীরা মহাযান দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। আর এসব পদ্ধতি শুরু হলে তা চক্রাকারে বর্ধিত হয়। মহাযানের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে।

উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে, কিন্তু এটাই সব কথা নয়। আসলে মহাযান বৌদ্ধধর্মে দুরকম চিন্তাধারার সংমিশ্রণ হয়েছে। একটি লৌকিক উপাদান যার সঙ্গে বৃহত্তর জনসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অপরটি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, বরং বলা যায় বেশ চরম ধরনের ভাববাদ, যা-অনুযায়ী বস্তু-জগৎ মিথ্যা, তার অস্তিত্ব শূন্যঅস্তিত্ব। এই ভাববাদের বিকাশটিকে সমসাময়িক অপরাপর ভাববাদী দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

আমরা আগেই দেখেছি যে জগতের সর্বত্রই শ্রেণীসমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাববাদের বিকাশ হয়েছে। বঞ্চিত মানুষদের ঠাণ্ডা রাখার জন্য তাদের জগৎ-বিমুখ করা দরকার, আর এই কারণেই ভাববাদী দর্শনের প্রয়োজন। সাধারণ ভারতবাসীর জীবনবিমুখতা পরীক্ষিত সত্য, এমনকি একালের ক্ষেত্রেও। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অদ্বৈত বেদান্তে ভাববাদের প্রকাশ ঘটেছে। বেদান্তকে অবলম্বন করে যেসব বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, সেই সব ধর্মে কিন্তু বস্তুজগৎটা একেবারে মিথ্যা একথা বলা হয়নি। পক্ষান্তরে মহাযান বৌদ্ধধর্মে ভাববাদ অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু মহাযানের এই উপাদানের সঙ্গে অপর উপাদানটির, অর্থাৎ লৌকিক উপাদানটির, মিশ্রণ হয়েছে অনেকটা তেলের সঙ্গে জলের মিশ্রণের মত। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির যুগে তাই দেখা গেছে বাইরে থেকে পরিপুষ্টির যোগানের অভাবে যখন ভাববাদী ধ্যানধারণাসমূহ বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল, লৌকিক উপাদানগুলি লৌকিক হয়েই রইল, তাদের আর আলাদা করে বৌদ্ধ বলার প্রয়োজন রইল না।

১৪। মহাযানের বিভিন্ন দিক্‌

শূন্য বা অনাত্মা বলতে যেখানে হীনযানে পুদ্গলশূন্যতা বোঝায়, অর্থাৎ আত্মা বা ওই ধরনের কোন পদার্থের অনস্তিত্ব বোঝায়, মহাযানে সেখানে শূন্য বলতে পুদ্গলশূন্যতা ছাড়াও ধর্মশূন্যতা বোঝায় যার অর্থ বস্তুরও অস্তিত্বহীনতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হীনযানে একটি মাটির পাত্রের কোন অন্তর্নিহিত সারবস্তু এবং তজ্জন্য তার আত্মত্ব বা স্বকীয়ত্ব অস্বীকৃত, কেননা মাটির পাত্রকে মাটির ঘোড়ায় রূপদান করা সম্ভব। কিন্তু সেখানে মূল বস্তুটি, অর্থাৎ যে মাটি দিয়ে পাত্র বা ঘোড়া তৈরী হয়, অস্বীকৃত নয়। কিন্তু মহাযানে মাটির অস্তিত্বও অস্বীকৃত।

মাটির পাত্রত্ব এবং অশ্বত্ব যেমন মিথ্যা, ওই মাটিও তেমনই মিথ্যা। প্রথমটি পুদ্গলশূন্যতা, দ্বিতীয়টি ধর্মশূন্যতা। মহাযানীদের মতে দুটি আবরণ সত্যকে আড়াল করে রাখে—ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণ। পুদ্গলশূন্যতার উপলব্ধির দ্বারা প্রথমটির অপসারণ হয় এবং হীনযানীরা, মহাযানীদের কাছে যারা মাঝারি ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন, এতেই খুশি,—কিন্তু মহাযানীদের মতে সত্যের উপলব্ধি তখনই সম্ভব যখন ধর্মশূন্যতার উপলব্ধি ঘটবে। মহাযানী শিক্ষার সারবস্তু হচ্ছে জাগতিক ব্যক্তি একটি ভুল ধারণার জগতে বিচরণ করে, যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় ছয়টি অপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা, আর তার নির্বাণ তখনই ঘটে যখন সে বুঝতে পারে সব কিছুই শূন্য, স্বপ্নবৎ মিথ্যা।

মহাযানীদের চোখে বুদ্ধ সর্বোচ্চ দেবতা, যিনি অনন্ত, উৎপত্তি ও বিলয়বিহীন, পরম সত্য, সকল প্রকার বর্ণনার অতীত। বুদ্ধের তিনটি কায় বা দেহ বর্তমান—ধর্ম-কায়, সম্ভোগ-কায় এবং রূপকায় বা নির্মাণ-কায়। ধর্ম-কায় হচ্ছে বুদ্ধের আসল দেহ যা বিশ্বচরাচরব্যাপী, আকারবিহীন, অনন্ত, চিরন্তন। তবে উচ্চমার্গের ভক্তদের জন্য এই বুদ্ধ দেবতার আকারে মহাপুরুষদের চিহ্নসহ দেখা দেন। এটি বুদ্ধের সম্ভোগ-কায় যা দর্শনের জন্য জন্মান্তরের সাধনা প্রয়োজন। সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য বুদ্ধ মাঝে মাঝে মানবরূপ ধারণ করেন, যে-রূপ মানবীয় জন্ম-মৃত্যুর অধীন। এটি বুদ্ধের রূপ-কায় (বস্তুগত দেহ) বা নির্মাণ-কায় (সৃষ্ট দেহ)। মহাযানীদের মতে গৌতম বুদ্ধ আসল বুদ্ধের নির্মাণ-কায়। অসংখ্য জগতে অসংখ্য নির্মাণ-কায়ের বুদ্ধ মানবহিতায় জন্মগ্রহণ করেন, যেমন গৌতম বুদ্ধ আমাদের এই জগতে (সহা-লোকধাতু) জন্মগ্রহণ করেছেন।

কালক্রমে এই ত্রিকায় ধারণার পাশাপাশি নির্মাণ-কায়ের বুদ্ধদের জন্মান্তর স্বীকৃত হয়, যার মূল কথা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় বুদ্ধ জন্মেছেন, জন্মাচ্ছেন, জন্মাবেন। ফলে অসংখ্য বুদ্ধের কল্পনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। এক একটি কাল্পনিক বুদ্ধের পিছনে তাঁর কীর্তিকাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির গোড়ার দিকে পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের কল্পনা করা হয়—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি—যাঁরা এক আদি বুদ্ধ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। এই প্রত্যেকটি বুদ্ধের সঙ্গে একজন করে বোধসত্ত্ব এবং তারা নামক একজন করে দেবী সংযুক্ত।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বোধিসত্ত্বের কল্পনা। যিনি বোধি-চিত্তের বিকাশ ঘটান তিনিই বোধিসত্ত্ব, অর্থাৎ যিনি বোধি লাভ করে ভবিষ্যতে বুদ্ধ হবেন। তত্ত্বের দিক থেকে প্রতিটি মহাযানীই সম্ভাবনাময় বোধিসত্ত্ব, হীনযানীদের যেমন শ্রাবক। কিন্তু শ্রাবকদের লক্ষ্য যেখানে অর্হত্ব লাভ, সেখানে বোধিসত্ত্বদের লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ।

যদিও গোড়ার দিকে বোধিসত্ত্বের ধারণা ব্যক্তিনির্ভর ছিল, অর্থাৎ ব্যক্তি-মাত্রেরই লক্ষ্য যেখানে হওয়া উচিত বোধিসত্ত্ব অর্জন, কালক্রমে বোধিসত্ত্ব নামক এক ধরনের দেবতার সৃষ্টি হল যাঁরা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং যাঁদের আরাধনা করলে প্রার্থিত ফল মেলে। এইরকম আরাধ্য বোধিসত্ত্বদের অগ্রগণ্য হলেন অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, আকাশগর্ভ, মহাস্থানপ্রাপ্ত, ভৈষজ্যরাজ এবং মৈত্রেয়। এ'রা আধ্যাত্মিক দিকে রীতিমত অগ্রসর, ইচ্ছা করলেই বুদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সে ইচ্ছা করেন না। এ'দের মধ্যে আবার অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী প্রধান। অবলোকিতেশ্বর করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁর সঙ্গিনী তারা প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি, যিনি দুঃখময় জগৎ অতিক্রম করতে মানুষকে সাহায্য করেন।

মঞ্জুশ্রী চিরনবীন। তিনিও জ্ঞানের দেবতা যিনি মানুষকে ধর্মশিক্ষা দেন এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের শিক্ষক। এই বোধিসত্ত্ব ও তাঁদের সঙ্গিনীদের পূজা ভারতে ও বহির্ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৫। বৌদ্ধ দর্শনের সূত্রপাতঃ কারণ, উপাদান, ঈশ্বর

বুদ্ধ নিজে দর্শনের নামে বিমূর্তচিন্তার বিরোধী ছিলেন। বিশ্বজগতের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোরও পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাঁর মাথাব্যথা ছিল দুঃখকে নিয়ে। তা সত্ত্বেও পালি গ্রন্থসমূহে যে-সকল বক্তব্য বুদ্ধের উপর আরোপিত হয়েছে, তা থেকে কিছু কিছু দার্শনিক উপাদানের ইঙ্গিত মেলে। একটি হচ্ছে ক্ষণিকবাদ। পরিবর্তনশীলতা ও ধারাবাহিকতার দ্বারা জগৎ ও জীবন চিহ্নিত, এটাই বোধ করি ক্ষণিকবাদের মূল কথা। এই প্রসঙ্গে দীপশিখার যে উদাহরণটি সচরাচর দেওয়া হয় সেটাই এখানে উদ্ধৃত করছি। একটি দীপশিখার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে আমরা একটি অবিচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা দেখি। একটি দীপ একনাগাড়ে জ্বলে যাচ্ছে, একটি অখণ্ড দীপশিখা বরাবর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে বাহ্যত দীপশিখাকে অখণ্ড ও অপরিবর্তনীয় মনে হলেও ওটি আসলে প্রতিমুহূর্তে সৃষ্ট ও বিলয়প্রাপ্ত অসংখ্য দীপশিখার যোগফল, প্রতিক্ষণে নূতন তেল ও পলতের নূতন অংশ শিখাকে সৃষ্টি করছে এবং তাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ামাত্র ওই শিখাটি ধ্বংস হচ্ছে এবং নূতন একটি শিখা তার স্থান গ্রহণ করছে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটছে যে, ওই মুহূর্তের সৃষ্টি ও বিনাশের ব্যাপারটা আমাদের চোখে পড়ছে না, আমরা ধারাবাহিকতাটুকু দেখেই ব্যাপারটি অখণ্ড এবং অবিভাজ্য মনে করছি।

এর সঙ্গে অবশ্য বুদ্ধের দুঃখবাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। অবশ্য জোর করে বলা যায় এই উদাহরণটির দ্বারা বুদ্ধ বোঝাতে চেয়েছিলেন, সব কিছু অনিত্য ও ক্ষণিক, যা হীনযানীরা বলে থাকেন। কিন্তু এই যুক্তিটি প্রসারিত করতে গেলে বিপদ আছে, তাহলে দুঃখকেও অনিত্য ও ক্ষণিক বলতে হয়, আর সেটা বললে বুদ্ধপ্রদত্ত জীবনচর্যার কোন সার্থকতা থাকে না। বোধ করি এই যুক্তিরই ব্যাপ্তি ঘটিয়ে মহাযানীরা বলছিলেন—সব কিছুই শূন্য, কাজেই দুঃখও শূন্য। এটি যদি সত্যই বুদ্ধবচন হয়, আমাদের মনে হয়, বুদ্ধ এই উদাহরণটি দিয়েছিলেন সাধারণ-ভাবে তাঁর অনুগামীদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যাতে তারা কোন ভাসাভাসা সিদ্ধান্ত না করে সেইজন্য। All things are not what they seem—বোধ হয় বুদ্ধ এটাই শেখাতে চেয়েছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কোন অতি সরলীকৃত ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে গেলে ঠকতে হবে।

আমরা আগে বলেছি বুদ্ধ কার্যকারণতত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, যার প্রমাণ দুঃখের কারণ নির্ণয়ের জন্য তাঁর প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব, যদিও তা অনেক পল্লবিত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। এটি সম্ভবত বুদ্ধের সাংখ্যদর্শন শেখার ফল। বুদ্ধের গুরু আড়ার কালাম যে সাংখ্যের শিক্ষক ছিলেন তার প্রমাণ যাওয়া যায় অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে১। সাংখ্য অনুযায়ী প্রকৃতির বিবর্তনের প্রথম ফল বুদ্ধি বা মহান্, যা পরবর্তী স্তরে অহংকার বা 'আমি'-জ্ঞানে পর্যবসিত হয়।

১। ১২, ১৭-৪১।

অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চন্মাত্র হতে পঞ্চমহাভূত, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। বৌদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান সাংখ্যের মহান্ বা বুদ্ধির ধারণার অনুরূপ যা নামরূপের (নাম ও রূপ, বিশেষত্ব ও অহংত্বের দ্যোতক) কারণ। নামরূপ থেকে ষড়ায়তন বা ছয়টি ইন্দ্রিয়। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ ধারণায় যেগুলিকে ধর্ম বলা হয়েছে সাংখ্যের পূর্বোক্ত পঞ্চমহাভূতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৌদ্ধ মতে অনাত্ম জগতের উদ্ভব পাঁচ ধরনের উপাদান বা স্কন্ধের সহযোগে। আনন্দকে বুদ্ধ বলেছেন, পৃথিবী জলের দ্বারা বেষ্টিত, জল বায়ুর দ্বারা, বায়ু আকাশের দ্বারা।১ অন্যত্র তিনি বলেছেন, আকাশ আশ্রয়বিহীন।২ জাগতিক উপাদানসমূহের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধ রূপ ও ধাতু এই দুটি শব্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রূপ বলতে বোঝায় বস্তু এবং ধাতু বলতে বোঝায় বস্তুর মূল সত্তা, যদিও শেষোক্ত শব্দটি নানা অর্থে, বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন এই ধাতুকে সংস্কৃত (পালি সংঘট, অর্থাৎ গঠনকারী, যৌগিক অথবা মিশ্র) হিসাবে দেখা হয়, তা বোঝায় এই যে অস্তিত্বের তিনটি ক্ষেত্র—কাম, রূপ এবং অরূপ—তাদের দ্বারা গঠিত। এই সংস্কৃত-ধাতুই চার মহাভূতের—অর্থাৎ মাটি, জল, বায়ু ও অগ্নির—গঠনকারী। ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের অভিজ্ঞতার নিয়মাবলী, বস্তু এবং অবস্তু, প্রাণযুক্ত এবং প্রাণহীন সত্তাসমূহ সব কিছুই এই সংস্কৃত ধাতুতে প্রস্তুত।৩

সংস্কৃত বা মিশ্র ধাতুসমূহের দ্বারা সৃষ্ট সব কিছুকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—নাম ও রূপ। প্রথমটি কোন সত্তার মানসিক ব্যাপার এবং দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ বস্তুগত। নাম চার প্রকার—বেদনা (অনুভূতিগত), সংজ্ঞা (অভিজ্ঞতালব্ধ), সংস্কার (মানসিক) এবং বিজ্ঞান (চৈতন্যময়)। এগুলির সঙ্গে রূপ বা বস্তু যুক্ত হয়ে পঞ্চস্কন্ধের (অস্তিত্বের পঞ্চ সমাহার) সৃষ্টি হয়। রূপস্কন্ধ বলতে মাটি জল ইত্যাদি চারটি মহাভূতকে বোঝায়।৪ এই মহাভূতগুলির মধ্যে যে প্রাথমিক বস্তু-গত উপাদান থাকে যাকে ভূতরূপ বলা হয়, এবং সূক্ষ্ম ও উৎপন্ন উপাদানগুলিকে বলা হয় ভৌতিক রূপম্ ও উপাদায় রূপম্।

পালি গ্রন্থসমূহে যা পাওয়া যায়, বুদ্ধ সর্বত্রই ঈশ্বরসম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। বৌদ্ধধর্মের কাঠামোয় ঈশ্বরের স্থান থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে দুঃখের স্রষ্টা হতে হয় ঈশ্বরকে এবং তাহলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির চাবিকাঠিটি ঈশ্বরের হাতেই তুলে দিতে হয়। কাজেই অশ্বঘোষ যখন বুদ্ধকে পরিপূর্ণ নিরীশ্বরবাদী বলে বর্ণনা করেন, তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। অশ্ব-ঘোষের বুদ্ধচরিতে৫ বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদী যুক্তিগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, খোদ রাধাকৃষ্ণণের বই থেকেই তা এখানে তুলে দিচ্ছি:

If the world had been made by Isvara, there should be no change or destruction, there should be no such thing as sorrow

১। দীঘ নিকায় ২. ১০৭; মিলিন্দ ৬৮।
২। যশোমিত্রের অভিধর্মকোশ ব্যাখ্যা।
৩। মজ্‌ঝিম নিকায় ৩, ২১৬।
৪। ধম্মসঙ্গণি ৫৮৪।
৫। ১৬, ১৮ ই।

and calamity, as right or wrong, seeing that all things, pure and impure, must come from him.

If sorrow and joy, love and hate, which spring up in all conscious beings, be the work of God, He Himself must be capable of sorrow and joy, love and hatred, and if He has these, how can He be said to be perfect?

If Isvara be the maker, and if all things have to submit silently to their maker's power, what would be the use of practising virtue? The doing of right or wrong would be the same, as all deeds are His making and must be the same with their maker. But if sorrow and suffering are attributed to another cause, then there would be something of which God is not the cause. Why, then, should not all that exists be uncaused too?

Again, if God be the maker, He acts either with or without purpose. If He acts with a purpose, He cannot be said to be all perfect, for a purpose necessarily implies satisfaction of a want. If He acts without a purpose, He must be like a lunatic or suckling babe.

Besides, if God be the maker, why should not people reverentially submit to Him, why should they offer supplications to Him when solely passed by necessity?

And why should people adore more gods than one?

Thus, the idea of God is proved false by rational argument, and all such contradictory assertions should be exposed.[১]

১৬। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক

হীনযানী বৌদ্ধধর্মের সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। সর্বাস্তিবাদ দুটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছিল—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক।

বৈভাষিকদের মতে সাতটি অভিধর্ম গ্রন্থ এবং তাদের টীকা যা বিভাষা নামে পরিচিত বৌদ্ধদর্শনের প্রামাণ্য উৎস। অভিধর্ম স্বয়ং বুদ্ধকথিত। পক্ষান্তরে সৌত্রান্তিকদের মতে বুদ্ধ কোন অভিধর্ম গ্রন্থ স্বয়ং প্রণয়ন করেননি, বা সেমত কোন নির্দেশও দেননি। এই সকল গ্রন্থ এবং তাদের টীকাভাষ্যসমূহ মনুষ্যরচিত এবং সেই হিসাবে অপ্রামাণ্য। তাঁদের মতে বুদ্ধের মূল দার্শনিক শিক্ষা, যা আসল অভিধর্ম, অভিধর্ম পিটকের বাইরে কয়েকটি সূত্র বা সূত্রান্তের মধ্যে বর্তমান। সেই কারণেই এঁদের সৌত্রান্তিক বলা হয়।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতবাদ একই ধরনের, শুধু তফাৎ এই যে সৌত্রান্তিকরা প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। বৈভাষিকেরা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল যার উৎপত্তি বাহ্যবস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ফলে। বাহ্যজগৎ প্রত্যক্ষ। বস্তু-

১। S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, I, 1933 ed, 456n.

সমূহের সত্তার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব আছে। এই চিরস্থায়ী বস্তুসত্তা কোন রূপান্তরের পর্যায় নয়, পক্ষান্তরে তা মৌলিক উপাদানসমূহের দ্বারা গঠিত, যদিও বৈভাষিক দর্শনে উপাদানগুলির অন্তর্নিহিত বাস্তবতা এবং সেগুলির বাহ্য প্রকাশের মধ্যকার সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়নি। বস্তুসমূহ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি ভূত (উপাদানসমূহ) ও ভৌতিকের (অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহ) সমবায়, দ্বিতীয় চিত্ত (মানস) এবং চৈত্তের (মানসলব্ধ বিষয়সমূহ) সমবায়। ভূত চারটি—পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু। আকাশ একটি অসংস্কৃত উপাদান যা অসীম, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। ন্যায় বৈশেষিকদের পারমাণবিক তত্ত্ব বৈভাষিক দর্শনে স্বীকৃত যেখানে বলা হয়েছে পরমাণুর ছয়টি দিক আছে এবং সমষ্টিগত হিসাবে তা দর্শনযোগ্য, যদিও এককভাবে তাদের আমরা দেখতে পাইনা। বসুবন্ধুর মতে পরমাণু হচ্ছে রূপ বা বস্তুর ক্ষুদ্রাতিতম অংশ যা অবিভাজ্য, বিশ্লেষণের অযোগ্য, অস্থির। সকল উপাদানের পরমাণুই এক ধরনের যা মাটি, জল, বায়ু এবং অগ্নির গুণসম্পন্ন। যৌগিক পদার্থগুলি আদি উপাদানসমূহ সহযোগে গঠিত। যদিও সাধারণ পদার্থের মধ্যে চার রকম উপাদানেরই অস্তিত্ব বর্তমান, পদার্থভেদে এক একটি উপাদানের প্রভাব অন্যগুলির চেয়ে প্রবল, যেমন কঠিন বস্তুতে মৃত্তিকা উপাদানের প্রাধান্য, তরল বস্তুতে জলীয় উপাদানের। বিশ্বচরাচরকে দুভাবে ভাগ করা যায়—ভাজনলোক বা প্রাণবিহীন বস্তুর আশ্রয়স্থল, এবং সত্ত্বলোক বা প্রাণযুক্ত বস্তুর আশ্রয়স্থল।

বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। বৈভাষিক মতে যদি জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হত, তাহলে সকল জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি একসঙ্গে, একই সময়ে সম্পূর্ণভাবে হত। কিন্তু যে কোন কার্যেরই উদ্ভব একটি বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে ঘটে। বীজের থেকে অংকুর হয়, অংকুর থেকে পাতা, তারপর গুঁড়ি, তারপর শাখা-প্রশাখা এবং তারপর ফুল ও ফল হয়। দ্বিতীয়ত ঈশ্বর স্রষ্টা বলে গণ্য হতে পারেন না তার কারণ যে কোন কার্যই স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ। বৈভাষিকদের মত সৌত্রান্তিকরাও বাহ্যজগতের বাস্তবতা এবং পারমাণবিক তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। এই সঙ্গে তাঁরা কোন বস্তুর অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। কিন্তু বৈভাষিকদের সঙ্গে তাঁদের মূল প্রভেদ এখানে যে বৈভাষিকরা যেখানে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, সৌত্রান্তিকেরা তা করেন না। তাঁরা অনুমান প্রামাণ্যে বিশ্বাসী। তাঁদের বক্তব্য প্রত্যক্ষ স্থানকাল অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং সেই হিসাবে তার উপর নির্ভর করা যায় না। ঈশ্বর সম্পর্কে সৌত্রান্তিকদের ধারণা বৈভাষিকদের অনুরূপ, যা পাওয়া যায় বসুবন্ধুর অভিধর্ম-কোশের সৌত্রান্তিক ব্যাখ্যাকার যশোমিত্রের রচনায়। সৌত্রান্তিকরা ধর্ম বা অস্তিত্বের মূল সত্তাসমূহের সংখ্যা ৭৫টি থেকে কমিয়ে ৪৩টিতে দাঁড় করিয়েছিলেন।

বৈভাষিক দার্শনিকদের মধ্যে জ্ঞানপ্রস্থান সূত্রের লেখক কাত্যায়নীপুত্র (আ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক), ধর্মোত্তর, ধর্মত্রাত, ঘোষক, বসুমিত্র বুদ্ধদেব, অভিধর্ম-কোশের লেখক বসুবন্ধু (খ্রীঃ পঞ্চম শতক) গুণপ্রভ, প্রভৃতি এবং সৌত্রান্তিকদের মধ্যে কুমারলব্ধ, শ্রীলাভ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১]

১। দ্রষ্টব্য অনন্তকুমার ভট্টাচার্যের বৈভাষিক দর্শন (১৯৫৩)।

১৭। মাধ্যমিক ও যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ)

মাধ্যমিক ও যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ মহাযান বৌদ্ধধর্মের দর্শন। বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিকেরা যেখানে বাহ্যজগতের বাস্তবতাকে স্বীকার করেন, মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেন।

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ মতে চৈতন্য বা বিজ্ঞান স্বয়ং-ক্রিয়াশীল, সর্ব-স্রষ্টা এবং পরম সত্য, যার বাইরে কিছু নেই, বিজ্ঞান বা চৈতন্যব্যতিরেকে কোন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নেই। এই বিজ্ঞানই সকল বিশ্বচরাচর গঠন করে। পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যে অদ্বৈত বেদান্ত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল তার একটি প্রধানতম উৎস এই যোগাচার দর্শন। যোগাচারপন্থীরাও অস্তিত্বের মূল সত্ত্বা-সমূহকে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত এই দুই ভাগে ভাগ করে। এই সত্তাসমূহ রূপ বা বস্তু নয়, চিত্ত বা মানসজাত। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তুর কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, যেহেতু আমরা চৈতন্য ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমই পেতে পারি না যা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের ভেদ করতে পারে। আপাত পরিদৃশ্যমান স্তম্ভ কার্যত একটা মানস রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইভাবে যখন যোগাচার দর্শন সমস্ত বস্তুকেই মানসসঞ্জাত বলে ঘোষণা করে, এবং পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুকেই যখন নিছক ধারণা বলেই উড়িয়ে দেয়, মাধ্যমিক দর্শন আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে বলে ওই চৈতন্যটাও মিথ্যা। নাগার্জুন, যিনি মাধ্যমিক দর্শনের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা, বলেন যে অভিজ্ঞতার জগৎ একটা দৃশ্যাভাস মাত্র, কয়েকটি অবোধ্য সম্পর্কের জালবুনানি। সংস্কৃত তথাকথিত অস্তিত্বের সত্তাসমূহ, যেগুলির সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আছে বলে আমাদের ধারণা আসলে শূন্য, কেননা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কোন সত্তার মধ্যে একই সঙ্গে থাকতে পারে না। অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বকে কোন বস্তুর মূল সত্তা হিসাবে প্রমাণ করা যায় না। একটি বস্তু তার গুণাবলীর দ্বারাই পরিচিত, এবং সেই হিসাবেই আমরা মাটি, জল ইত্যাদি উপাদানগুলিকে বুঝি, কিন্তু গুণাবলী তো স্বয়ং অস্তিত্ববান হতে পারে না। চক্ষু ব্যতিরেকে রং নেই কাজেই গুণাবলীর আপেক্ষিক অস্তিত্ব শূন্য অস্তিত্ব, এবং সেই কারণেই যে সকল বস্তুর মধ্যে সেগুলি অবস্থান করে বলে কল্পিত, সে সকল বস্তুর কোন সত্যকারের অস্তিত্ব নেই। দ্রব্য এবং গুণ পরস্পরনির্ভর এবং দুটির কোনটিকেই বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। পরমার্থিক ভাবে দ্রব্য এবং গুণ দুইই অলীক, কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে মনে হয় যেন তারা বর্তমান। কোন কার্যও নেই, কোন কারণও নেই। একটি বস্তু নিজের থেকে সৃষ্ট হয় না, অপরের থেকেও নয়, আসলে সৃষ্টি বা উৎপাদন ব্যাপারটাই অসম্ভব। জগতের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, বস্তুসমূহ ক্ষণস্থায়ীও নয়, চিরন্তনও নয়, উৎপন্নও হয় না, বিলয়প্রাপ্তও হয় না, একও নয়, পৃথকও নয়। যা ক্রমিক কারণের দ্বারা উদ্ভূত, তা স্ব-উদ্ভূত নয়, কাজেই তার কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। বাহ্যত পরিদৃশ্যমান বস্তু কার্যত অলীক।

মাধ্যমিক দার্শনিকদের মধ্যে নাগার্জুন (খ্রীঃ প্রথম শতক), আর্যদেব, মাতৃচেট, রাহুলভদ্র, সংঘরক্ষিত, কুমারজীব, বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক, চন্দ্রকীর্তি, ধর্মপাল, শান্তিদেব, সর্বজ্ঞমিত্র এবং যোগাচার দার্শনিকদের মধ্যে মৈত্রেয়নাথ, অসঙ্গ, গুণমতি, স্থিরমতি, দিঙ্নাগ, শীলভদ্র, ঈশ্বরসেন, ধর্মকীর্তি, চন্দ্রগোমি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৮। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম

আমরা আগেই দেখেছি যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম নিজেকে জনপ্রিয় করার অভিপ্রায়ে স্থানীয় লৌকিক ধর্মবিশ্বাসসমূহের সঙ্গে আপোষ করেছিল যার ফলে অসংখ্য স্থানীয় দেবদেবী বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হয়েছিল। ভারতের গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজে স্বাভাবিক ভাবে দেবীপ্রাধান্যমূলক ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল যুগ যুগ ধরে। এই দেবীকেন্দ্রিক জীবনচর্যা উত্তর কালে শাক্তধর্মে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মাতৃপ্রাধান্যমূলক এই সুপ্রাচীন বিশ্বাস ও তৎসংশ্লিষ্ট যৌন-আচারসমূহকে আমরা ইতিপূর্বেই আদিম-তন্ত্র আখ্যা দিয়েছি। এই তন্ত্র আসলে হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়, এটি একটি সুপ্রাচীন সাধনপদ্ধতি, একটি অন্তঃস্রোত, যা ভারতবর্ষের সকল ধর্মকেই কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করেছে। কৃষিজীবী সমাজের সুপ্রাচীন মাতৃদেবীর ধারণাই কালক্রমে সকল জাগতিক উপাদানের প্রতিরূপ বা প্রকৃতি এবং সেগুলির কার্যকারিতার মূল প্রেরণা বা শক্তি হিসাবে কল্পিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মে এই শক্তিই বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী বা কৃষ্ণের শক্তি রাধা রূপে কল্পিত হয়েছে, শৈবধর্মে এই শক্তিই শিবের শক্তি দেবী, বৌদ্ধ-ধর্মে এই শক্তিই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের শক্তিস্বরূপা নানা নামের দেবী, দার্শনিক পর্যায়ে যা প্রজ্ঞা বা শূন্যতা।

এইভাবে শক্তির ধারণার অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানসমূহ, যেগুলি প্রকৃতিগতভাবেই যৌনকেন্দ্রিক, যার কারণ উল্লেখ করার সুযোগ আমাদের আগেই হয়েছে, পরবর্তীকালে পঞ্চ-মকারের (মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য ও মৈথুন) একটি পল্লবিত সাধন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন ধর্মে স্থান পেয়েছে। তান্ত্রিক পঞ্চ-মকার শুধু যে শাক্তদেরই ব্যাপার তা নয়। এই বিদ্যায় যে বৈষ্ণবেরাও বিশেষ পারদর্শী ছিল তার প্রমাণ রয়েছে লক্ষ্মীতন্ত্র ও অপরাপর বৈষ্ণব গ্রন্থে। বৌদ্ধরাও এই পঞ্চ-মকারে অভ্যস্ত হয়েছিল। গুহ্য-সমাজতন্ত্রে মুদ্রা, মাংস ও মৈথুনকে সাধনার অঙ্গ বলা হয়েছে। যুগনদ্ধ বা নারীপুরুষের সম্মিলিত মিথুনমূর্তি যার দ্বারা বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণ তাঁদের শক্তিসহ উপস্থাপিত হন, বৌদ্ধধর্মে ব্যাপক যৌনাচারের প্রভাব প্রমাণিত করে। অনঙ্গবজ্রের প্রজ্ঞোপায় বিনিশ্চয়সিদ্ধি১ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মহামুদ্রার অভিজ্ঞতার জন্য সাধককে নির্বিচারে নারীসম্ভোগ করতে হবে। শুধু তাই নয়, আরও বলা হয়েছে যে তত্ত্ব যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাধককে তার মাতা, কন্যা, ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর সঙ্গে উপগত হতে হবে। অনুরূপ নির্দেশ গুহ্যসমাজেও বর্তমান। শক্তিতন্ত্রের কায়সাধনার ধারণাও বৌদ্ধতন্ত্রে বর্তমান।

চন্দ্রকীর্তি, শান্তিদেব, দিঙ্‌নাগ বা ধর্মকীর্তির মত ধুরন্ধর নৈয়ায়িকেরা যখন কূটতম যুক্তিসমূহ উদ্ভাবন করছিলেন বিশ্বনস্যাৎ করার জন্য, অর্থাৎ জাগতিক অস্তিত্বকে শূন্য অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য, তখন কিভাবে খিড়কি দুয়ার দিয়ে তান্ত্রিক ভাবনাসমূহ ঢুকে বৌদ্ধধর্মকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে ইতিহাস অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থে পূর্বসূরী হিসাবে ধারণী নামক একশ্রেণীর রচনা পাওয়া যায় যা মহাযান সূত্রসমূহের অন্তর্গত। এই ধারণী সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে। ধারণীতে মন্ত্র, মুদ্রা (বিভিন্ন

১। *Two Vajrayana Works*, ed. B. T. Bhattacharyya, GOs, 1929.

ভঙ্গী), মণ্ডল (তান্ত্রিক জ্যামিতিক নক্সা), ক্রিয়া (আচার অনুষ্ঠান) ও চর্যার (ধ্যানাদি) উল্লেখ আছে যেগুলির দ্বারা সাধনার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো যায়। প্রাচীনতর ধারণীসমূহে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর স্থান পেয়েছেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত দেবীরা সেখানে আসেন নি। চতুর্থ শতকের কারণ্ডব্যূহে অবলোকিতেশ্বর আছেন, কিন্তু তারাদেবী নেই। কিন্তু এই গ্রন্থেই প্রথম ওঁ মণিপদ্মে হুম্ মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। মণিপদ্মের অর্থ লিঙ্গ-যোনি। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে[১] আমরা প্রথম তারাদেবী এবং তাঁর বিভিন্ন প্রতিরূপের উল্লেখ পাই, যেমন লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা, ভৃকুটী, শ্বেতা, সুতারা প্রভৃতি। এই গ্রন্থে তারাকে বিদ্যারাজ্ঞী বলা হয়েছে, যিনি পরম করুণাময়ী এবং সকলকে উদ্ধার করেন। গুহ্যসমাজতন্ত্রে[২] দেখানো হয়েছে আদি বুদ্ধ বৈরোচন থেকেই শক্তিরূপিণী লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা ও শ্যামতারার উদ্ভব হয়েছে। সর্বোচ্চ দেবী হিসাবে তারাদেবীর প্রতিষ্ঠা মহা-প্রত্যঙ্গিরা-ধারণী গ্রন্থে, যেখানে তাঁকে শ্বেতবর্ণা, বজ্রধারিকা এবং মুকুটে বৈরোচনের মূর্তিবাহিনী হিসাবে দেখানো হয়েছে। অষ্টম শতকের মধ্যেই তারাদেবীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছিল। তাঁর উদ্দেশ্যে অজস্র তারা স্তোত্র এই সময়েই রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কাশ্মিরী কবি সর্বজ্ঞ মিত্রের স্রগ্ধরা স্তোত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দুই উল্লেখযোগ্য আদি গ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলকল্প ও গুহ্যসমাজ বা তথাগত গুহ্যক। দুটি গ্রন্থই আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে রচিত। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে অসংখ্য মুদ্রা, মণ্ডল, মন্ত্র, ক্রিয়া ও চর্যার উল্লেখ আছে, যেখানে গুহ্যসমাজ মূলত যোগ এবং অনুত্তরযোগ নিয়ে আলোচনা করেছে, এবং সেখানে মণ্ডলের কথাও কিছু আছে। উভয় গ্রন্থেরই বক্তব্য মুদ্রা এবং মণ্ডল দেবী ও যোগ-মনস্কা নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই নারীরা যে কোন জাতি থেকেই আসতে পারে। সাধককে বুঝতে হবে যে আমাদের জাগতিক সকল দুঃখের উৎস হিসাবে বিবেচিত নারী বা নারী-অঙ্গ পুরুষ বা পুরুষাঙ্গের মতই একটা সত্যাভাস, সত্য নয়। জাগতিক সৃষ্টির প্রয়োজনেই আদি বুদ্ধ ও তাঁর শক্তির ধারণা, যা থেকে উদ্ভূতা হয়েছেন লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা ও শ্যামতারা, যাঁরা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শ, দ্বেষরতি, মোহরতি, রাগারতি এবং বজ্ররতি, রূপ বা বস্তুর চারটি উপাদান মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি, এবং অবশিষ্ট চারটি স্কন্ধের—বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান—প্রতীক। লোচনা মৃত্তিকা, মামকী জল, পাণ্ডরা অগ্নি এবং তারা বায়ু। এদিকে আবার পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চ স্কন্ধের প্রতীক, যাঁরা সকলেই আদিবুদ্ধ বৈরোচন থেকে উদ্ভূত।

তন্ত্রমতে সৃষ্টিকার্য পুরুষ ও নারী উভয় আদর্শের সংযোগের ফল, তবে গুরুত্বের বিচারে নারীই শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধতন্ত্রে এই দুটি আদর্শ প্রজ্ঞা এবং উপায়, অথবা শূন্যতা এবং করুণা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনই হচ্ছে যুগনদ্ধ বা সমরস, এবং নিজের ক্ষেত্রে যে তা ঘটাতে পারে সে-ই পূর্ণজ্ঞান এবং সুখ লাভ করে, জন্মমৃত্যুর শৃংখল থেকে মুক্ত হয়। এই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধত্ব, এবং এই পন্থা অবলম্বন করেই সব বুদ্ধ হয়েছেন। এই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পেতে গেলে পুরুষ ও নারীকে প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে তারা যথাক্রমে উপায় ও প্রজ্ঞার প্রকাশ, এবং উভয়ের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক মিলনেই সর্বোচ্চ সত্যের

১। গণপতি শাস্ত্রী সং (১৯২০-২৫) ৫০৪, ৬৪৭-৪৮।
২। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সং (১৯৩১) ২।

উপলব্ধি ঘটবে। সেই হিসাবে সকল গুহ্যসাধনা স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত হয়ে করবে। প্রজ্ঞা নারী-আদর্শ, সেই হিসাবে ভগবতী। তিনি বজ্রকন্যা এবং যুবতী হিসাবেও কথিত। সাধনার জন্য সে ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েকে গ্রহণ করা হবে সে প্রজ্ঞা। এছাড়া প্রজ্ঞা বলতে যৌনাঙ্গ বোঝায় যা সকল সুখের আধার। পুরুষ-আদর্শ উপায়ের আর এক নাম বজ্র, যার অর্থ পুরুষাঙ্গ। প্রজ্ঞা ও উপায়, নারী ও পুরুষের সংসর্গে অনন্ত পুলকের উপলব্ধি ঘটে, যাতে সকল মানসিক ক্রিয়া হারিয়ে যায়, চারদিকে জগৎ অবলুপ্ত হয় এক আনন্দদায়ক সর্বব্যাপী একত্বের মধ্যে। এই হচ্ছে মহাসুখ, এই হচ্ছে নির্বাণ, বোধিচিত্তের যথার্থ বিকাশ।[১]

নরনারীর দৈহিক মিলনের উপর এই যে গুরুত্ব বৌদ্ধ তন্ত্রে আরোপ করা হয়েছে এর মূলে কিন্তু সেই পুরাতন বিশ্বাসটি কার্যকর, যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। দেহই সকল সত্যের আবাসস্থল, বিশ্বের যা কিছু রহস্য তা দৈহিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এই প্রাচীন বিশ্বাসই কায়-সাধনার মূল কথা, যা বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় তন্ত্রেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্। শাক্ত তন্ত্রে দেহের মধ্যে ষট্চক্রের বা ছয়টি নার্ভচক্রের কথা আছে যেগুলি হল মূলাধার (পায়ুদেশ ও লিঙ্গমূলের তলদেশের মধ্যবর্তী অংশ), স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলের উপরদিক), মণিপুর (নাভি-অঞ্চল), অনাহত (হৃৎপিণ্ড অঞ্চল), বিশুদ্ধ (সুষুম্নাকাণ্ড এবং গুরু মস্তিষ্কের নিম্নভাগের সংযোগস্থল), এবং আজ্ঞা (দুই ভুরুর মধ্যবর্তী অংশ)। এছাড়া সর্বোচ্চ মস্তিষ্ক অঞ্চলকে বলা হয় সহস্রার। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা সেই শক্তি ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের মাধ্যমে সহস্রার অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারলেই ওই শক্তি তার উৎসে মিলিত হতে পারে। বৌদ্ধতন্ত্রেও অনুরূপ তিনটি নার্ভ-চক্রের কথা আছে যেগুলি বুদ্ধের ধর্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায়ের প্রতীক। এছাড়া আরও একটি চক্র আছে যা উষ্ণীষকমল যা সর্বোচ্চ মস্তিষ্কে অবস্থিত, যা বুদ্ধের বজ্র-কায় বা সহজ-কায়ের প্রতীক। উষ্ণীষকমল হচ্ছে শাক্ততন্ত্রের সহস্রার। তার নীচে গ্রীবা প্রদেশের তলায় সম্ভোগ-চক্র অবস্থিত, আরও নীচে হৃৎপিণ্ড অঞ্চলে ধর্মচক্র, এবং সবচেয়ে নীচে নাভিমূলে নির্মাণ-চক্র। আমরা আগে দেখেছি যে বোধিচিত্ত দুইটি উপাদানে গঠিত—শূন্যতা এবং করুণা অথবা প্রজ্ঞা এবং উপায়। দেহের অসংখ্য নাড়ী বা নার্ভের মধ্যে ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ, তন্মধ্যে তিনটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি যেগুলির মধ্যে সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে দুটি প্রজ্ঞা ও উপায় এবং মধ্যেরটি, যেখানে ওই দুটি এসে মিলেছে, সহজ বা অবধূতী। শাক্ত তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ন্যায় বৌদ্ধ তন্ত্রে একটি অগ্নিময়ী নারী শক্তির কল্পনা আছে, যার বাস নির্মাণ-চক্রে এবং যা চণ্ডালী নামে পরিচিত। এই চণ্ডালী ধর্মচক্র ও সম্ভোগচক্রকে প্রজ্জ্বলিত করে উপর দিকে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উষ্ণীষকমল বা মস্তিষ্ক অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে আবার সেখান থেকে স্বস্থানে নেমে আসে।

১। মহাযান বৌদ্ধধর্মে শূন্যতা এবং করুণা একত্রে সংমিশ্রিত হয়ে মানুষের মধ্যে বোধিচিত্তের বিকাশ ঘটায়, যা তাকে বোধি বা পরম জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। এই বোধিচিত্ত দশটি স্তর বা ভূমি অতিক্রম করে। শেষ স্তরের নাম ধর্মমেঘ যেখানে পৌঁছালে মানুষ বোধিসত্ত্ব হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই বোধিচিত্তের সংজ্ঞা বদলেছে, যার কাজ নর ও নারীর পারস্পরিক সংসর্গের ফলে মহাসুখ বা নির্বাণ উৎপন্ন করা।

১৯। বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান

মহাযান ধর্মে তান্ত্রিক অনুপ্রবেশের ফলে ওই ধর্মে যে গুণগত রূপান্তর হয় তার ফলে দুটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতির উদ্ভব হয়—মন্ত্রযান ও পারমিতাযান। মন্ত্রযান হচ্ছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক স্তর, যেখানে মন্ত্র, ধারণী, মুদ্রা, মণ্ডল, অভিষেক প্রভৃতির প্রচলন ঘটে। বজ্রযান মন্ত্রযানেরই বিবর্তিত রূপ যেখানে শূন্যতার স্থানে বজ্র-শব্দটির ব্যবহার হয়। বজ্র বলতে তাই বোঝায় আত্ম এবং ধর্মসমূহের, অর্থাৎ অস্তিত্বের মূল সত্তাসমূহের, অপরিবর্তনীয় শূন্য প্রকৃতি, যা উপলব্ধির পন্থাই হচ্ছে বজ্রযান। বজ্রযানে পরম সত্য হিসাবে যাঁকে কল্পনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন বজ্রসত্ত্ব, কখনও কখনও যিনি বজ্রধর নামেও পরিচিত। এই বজ্রসত্ত্ব শুধু শূন্যতারই প্রতীক নন, তিনি শূন্যতা ও করুণার অদ্বয় অবস্থারও প্রতীক, এবং সেই হিসাবে তিনি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণার উৎস। এই কারণে তাঁকে কখনও কখনও বোধিচিত্তের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। যিনি এই বজ্রসত্ত্বকে উপলব্ধি করেন, অর্থাৎ যিনি সমস্ত কিছুরই মূল প্রকৃতি শূন্য অস্তিত্ব হিসাবে বোধ করেন, তিনি স্বয়ং বজ্রসত্ত্ব হন।

বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে অসংখ্য দেবদেবীর ধারণাও বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে গড়ে ওঠে। বজ্রসত্ত্ব, পুরাতন হিসাব অনুযায়ী, আদিবুদ্ধ যিনি পাঁচ প্রকার জ্ঞানের অধিকারী যা তাঁর পাঁচটি গুণ হিসাবে কল্পিত এবং যা থেকে পাঁচটি ধ্যান ও সেগুলি থেকে পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে, যাঁরা হলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ পাঁচটি স্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান) উপর প্রভুত্ব করেন, এবং এঁদের প্রত্যেকেরই সঙ্গিনী হিসাবে একজন করে শক্তি আছেন যাঁরা হলেন বজ্রধাত্বীশ্বরী, লোচনা, মামকা, পাণ্ডরা ও আর্য-তারা। প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধের আবার পুত্র হিসাবে একজন করে বোধিসত্ত্ব এবং একজন করে মানুষী বুদ্ধ আছেন। বজ্রসত্ত্বের সঙ্গিনী হচ্ছেন বজ্র-সত্ত্বাত্মিকা, যিনি বজ্রবারাহী, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই দেবতাকে পূজা ও ধ্যান করতে হবে তাঁর শক্তি বা প্রজ্ঞার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অথবা যৌনমিলিত অবস্থায়, যা যুগনদ্ধ বা অদ্বয়ের আদর্শের প্রতীক। ভাস্কর্যে বজ্রসত্ত্ব এবং বজ্রযানের অপরাপর দেবতার এই অবস্থার চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে।

আনুমানিক দশম শতকে বজ্রযানের আওতায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আর একটি শাখা গড়ে ওঠে যা কালচক্রযান নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা শ্রীকালচক্র। কাল শব্দটির অর্থ প্রজ্ঞা বা শূন্য অস্তিত্ব, চক্র হচ্ছে জাগতিক পদ্ধতি, ওই দেবতার দেহের দ্বারা যা ব্যক্ত, অপর কথায় যা হচ্ছে উপায়। অতএব কালচক্র প্রজ্ঞা এবং উপায়ের অদ্বয়বস্থা, এবং সেই হিসাবে বোধিচিত্তও বটে। এদিক থেকে বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে কালচক্রের খুব একটা পার্থক্য নেই, উপাসনা পদ্ধতিও উভয়ের ক্ষেত্রে মূলত এক। তফাৎ হচ্ছে এই যে কালচক্রযানে একগাদা ভয়াবহ দেবদেবীর আমদানী হয়েছে, যারা স্বর্গীয় বুদ্ধদের মতই শক্তিমান। দেবীদের মধ্যে ভয়ংকর ভয়ংকর ডাকিনীরাও আছেন। এঁদের তৃপ্ত করতে হয় মন্ত্র, মণ্ডল এবং বলিদানের মারফৎ। এছাড়া কালচক্রযানে কালের একটি স্বতন্ত্র কল্পনা আছে সময় হিসাবে। সময়ের বিভাগ প্রাণবায়ুর দ্বারা হয় যা মানুষের নার্ভচক্রের মধ্যে ছড়ানো থাকে। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই প্রাণবায়ুকে সংযত করতে পারলে, মানুষ সময়ের চক্রকে এড়াতে পারবে, ফলে তার সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। কালচক্রযান বঙ্গদেশ,

মগধ, কাশ্মীর ও নেপালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

সহজযান মূলত বঙ্গদেশের, যার উদ্ভব পাল যুগ থেকে। সহজযানী বৌদ্ধরা বজ্রযানের সকল নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র-মণ্ডল ইত্যাদি বর্জন করেছিল। তাদের মতে সত্যোপলব্ধি একটা অন্তর্দর্শনের ব্যাপার, কোন কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক উপায়ে তা হয় না। এইজন্য সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক পথ গ্রহণ করতে হবে, এবং তা হচ্ছে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির অনুবর্তী হওয়া। যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে, অতএব দেহই সকল সাধনার উৎস, লক্ষ্য ও মাধ্যম। যৌগিক পদ্ধতিতে কায়-সাধনা, নাভিমূলে অবস্থিত নির্মাণ-চক্রে অবস্থানকারী নারী শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, যা আগেই বর্ণিত হয়েছে, প্রভৃতি সহজযানী মার্গ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচিত চর্যাপদ ও দোহাসমূহে তাদের সাধন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। বজ্রযানীদের মত সহজযানীরাও যুগনদ্ধে বিশ্বাসী, একটু বেশি রকমেই। সাধক বুদ্ধ, এবং তার সঙ্গিনী বুদ্ধের শক্তি, উভয়ের যৌন মিলনেই পূর্ণ জ্ঞান ও মহাসুখ। সহজযানের বিকাশ শুধু বৌদ্ধধর্মেই হয়নি, বৈষ্ণবদের মধ্যেও সহজযানের বিকাশ ঘটেছিল। হয়ত আরও অনেক বৃহৎ ধর্মে তা ছিল, যদিও সে বিষয়ে আমাদের হাতে এখনও কোন প্রমাণ আসেনি, কিন্তু লৌকিক ও স্থানীয় ধর্মসমূহে সহজযানের অস্তিত্বের বহু নিদর্শন আছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই বলা যায় যে সহজযান একটি সুপ্রাচীন সাধন পদ্ধতি, এবং সেই শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেই তার বিকাশ হয়েছিল যারা কোন আচার-অনুষ্ঠান বা নিয়মের বন্ধনে না এসে স্বভাবের অনুবর্তী হওয়াটাকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করত। একটা বিশেষ যুগে এই সহজযানীরা বৌদ্ধধর্মের এলাকায় এসে পড়েছিল, এবং নিজেদের ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের একটা ব্যাখ্যা করে নিয়ে, নিজেদের বৌদ্ধ হিসাবেই পরিচয় দিত।

২০। বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়

বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের ইতিহাস অত্যন্ত ভ্রান্তভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এটা ঠিক কথা যে বাংলা-বিহারের পালবংশের পতনের পরেই কার্যত বৌদ্ধ ধর্মের পতন হয়। তারপরেও এখানে অবশ্য বৌদ্ধরা ছিল। ত্রয়োদশ শতকে পট্টিকেরা বা কুমিল্লা অঞ্চলে বৌদ্ধদের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে।১ ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মধুসেন নামক একজন বৌদ্ধ রাজা বঙ্গদেশের কোন কোন অংশে রাজত্ব করেছিলেন।২ একই সময়ে উত্তর প্রদেশের শিবালিক পর্বতাঞ্চলের এক রাজা, যাঁর নাম অশোকবল্ল বা অশোকচল্ল এবং তাঁর সামন্ত কুমায়ুন অঞ্চলের শাসক পুরুষোত্তম সিংহ বোধগয়ায় কিছ কিছু নির্মাণকার্য করেছিলেন।৩ বোধগয়ায় মানতমূলক লিপিসমূহ থেকে দেখা যায় যে পঞ্চদশ শতকেও সেখানে তীর্থযাত্রী জুটত।৪ এছাড়া আরও কিছু সাক্ষ্য আছে যা থেকে অনুমিত হয় যে ত্রয়োদশ শতকে এখানে

১। *Indian Historical Quarterly*, IX, 282.

২। *History of Bengal*, ed. R. C. Majumdar 1943, I, 228.

৩। *Indian Antiquary*, X, 241 ff; A. Cunningham, *Mohabodhi*, 1882, 79-80, B. M. Barua, *Gaya and Buddhagaya*, I. 201-05; *Epigraphia Indica* XII, 29-30.

৪। *Indian Historical Quarterly*, VI, 28; Barua *op. cit.*, 210 ff, II, 72.

ওখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল, এমন কি বৌদ্ধ পুঁথিরও নকল করা হত।১ কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী ষোড়শ শতকেও বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল।২ সপ্তদশ শতকের তিব্বতী তীর্থযাত্রী তথাগতনাথ বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, বিজয়নগর ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব দেখেছিলেন এবং শান্তগুপ্ত, দিনকর, গম্ভীরমতি প্রভৃতি বৌদ্ধ-গুরুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ও উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের অনুগামী বর্তমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় পালযুগের অবসানে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেই এদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব একেবারেই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু যে পালযুগে বৌদ্ধদের এত প্রতিপত্তি, পাল রাজাদের পতনের অনতিকাল পরেই বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটল, এটা কেমন কথা? এতাবৎকাল পন্ডিতেরা একটি অতিসরল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হচ্ছে মুসলমান আক্রমণ। মুসলমানরা নাকি সমস্ত মঠ বিহার ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছিল তাই বৌদ্ধধর্মের পতন হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমানেরা তো হিন্দুমন্দিরও কম ভাঙেনি, জৈন ধর্মস্থানও কম নষ্ট করেনি। কিন্তু তাতে কি হিন্দু বা জৈন ধর্ম লোপ পেয়েছে? যদি তর্কচ্ছলে ধরেও নেওয়া যায় যে মুসলমানরা বৌদ্ধদের উপর খুব অত্যাচার করেছিল, পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে বিধর্মীর উৎপীড়নের ফলে কোন ধর্ম লোপ তো পায়ই না, বরং তা পরোক্ষভাবে শক্তিশালী হয়। যিহুদিরাই তার প্রমাণ। জৈনরা বীরশৈবদের দ্বারা কম অত্যাচারিত হয়নি, কিন্তু তাতে জৈনধর্মের সংহতি নষ্ট হয়নি। তাহলে বৌদ্ধরাই বা এত সহজে বিলুপ্ত হয়ে গেল কেন? এছাড়া এদেশে মুসলমান শাসকেরা জনগণকে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা আছে যেখানে হয়ত মর্যাদার প্রশ্নে কোন রাজা বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, কিন্তু কোন মুসলিম শাসকই সামগ্রিকভাবে জনগণকে ইসলামে দীক্ষিত করার নীতিকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্ণের মানুষেরা উচ্চবর্ণের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি না পেলেও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অবশ্যই বৌদ্ধরাও ছিল, হয়ত সংখ্যায় নেহাৎ কম ছিল না, কিন্তু তারা মুসলমানদের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এ ধারণা হাস্যকর। কয়েকটা মঠমন্দির ভাঙলে, কিছু পুঁথি নষ্ট করলে, কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করলেই একটা ধর্ম লোপ পেয়ে যায়, এটা অবিশ্বাস্য। আর এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করানোর জন্য নানা দিক থেকে চেষ্টার অভাব নেই।

এ তো গেল সাধারণ যুক্তির কথা। এবার একটু খুটিয়ে দেখা যাক মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়েছিল এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য তাঁরা কি ধরনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছেন। যে সাক্ষ্যটির উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা হয় তা হচ্ছে মিনহাজ-উদ্দীনের তবকাৎ-ই-নাসিরী৩ যেখানে মুসলমানগণ কর্তৃক

১। H. Kern, *Manual of Indian Buddhism*, 134; H. P. Sastri, *Catalogue of Sanskrit Mss, ASB*, I. 21; N. Vasu, *Archaeological Survey of Mayurbhanj*, CXVI., etc.

২। *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1895, 57.

৩। Eng. Tr. H. G. Raverty, 1873-97, 551-52.

দন্দণ্ডপুর বিহার ধ্বংসের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য, ওই বইটি কতদূর প্রামাণ্য? ওই বর্ণনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য? আমরা এ প্রশ্ন তুলতাম না, কেননা অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা এরকম প্রশ্ন তুলিনি, বরং এমন গ্রন্থেরও গুরুত্ব স্বীকার করেছি যা মিনহাজ-উদ্দীনের এই বই-এর থেকেও নিরেস। কথাটা তুলছি এই কারণে যে এই বইটি নিয়ে আরও একটা কান্ড হয়েছে। এই বইতেই বেশ ফলাও করে বলা হয়েছে বক্তিয়ার খলজী কর্তৃক সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী। এই কাহিনীটিকে হজম করা আমাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে, এবং তাঁরা, যাঁরা বলেন মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্মের লোপ হয়েছে, তাঁরাই ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক যুক্তি খাড়া করে দেখাতে চান যে মিনহাজ উদ্দীনের সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনীটির মধ্যে কোন সত্যতা নেই, তিনি বাজারী গালগল্পের উপর নির্ভর করে লিখেছেন। একটা বই-এর বক্তব্য এক ক্ষেত্রে সঠিক অন্য ক্ষেত্রে বেঠিক, এটা কি রকম ব্যাপার? উদ্দণ্ডপুর ধ্বংসের ব্যাপারটা খাঁটি আর সপ্তদশ অশ্বারোহী গালগল্প?

আসলে বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ বৌদ্ধধর্মের নিজস্ব প্রকৃতি। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ব্যাপক রূপান্তরের ইতিহাস। আদি বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হয়েছিল হীনযানে, হীনযান রূপান্তরিত হল মহাযানে, মহাযান রূপান্তরিত হল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের যখন রূপান্তর ঘটল তখন তাকে আর বৌদ্ধধর্ম বলে চেনা গেলনা। এখানে আমাদের একটা জিনিস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য, এদেশে বৌদ্ধধর্মের কোন সামাজিক ভূমিকা ছিলনা। এ ধর্ম বৃহত্তর জনসাধারণের কোনও উপকারেই লাগেনি, জনজীবনে এর প্রভাবও বিন্দুমাত্র পড়েনি। এদেশে বৌদ্ধ রাজাদের অভাব হয়নি, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের কোন সামাজিক ভূমিকা না থাকার দরুন কোন বৌদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা কোন বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করেই বৌদ্ধ রাজা ও শাসকদের চলতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণভেদ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মে চতুর্বর্ণের কোন স্থান নেই, কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধধর্মের কোন সামাজিক ভূমিকা ছিল না, বৌদ্ধ রাজাদের বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নির্দেশেই শাসন কার্য চালাতে হত। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, এ দিকে তাঁদের লেখমালায় তাঁরা ঘোষণা করছেন যে তাঁদের শাসনের উদ্দেশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা।

ব্যক্তিগত ভাবে গৌতম বুদ্ধের কিছু সামাজিক আদর্শ ছিল, কিন্তু সেটা প্রচারে তিনি ততটা মন দেননি, যতটা মন দিয়েছিলেন সংঘ তৈরি করার ক্ষেত্রে। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে তাঁর ধর্ম গৃহত্যাগীর ধর্ম। কোন ব্যক্তির পক্ষে সংসার ত্যাগ করে সংঘে এসেই বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন সম্ভবপর ছিল। সাধারণ মানুষদের ধর্মাচরণের কোন রাস্তাই গৌতমবুদ্ধ রাখেন নি, তাদের জন্য কোন বিশিষ্ট জীবনচর্যার নির্দেশও তিনি দেননি, যেখানে মহাবীর গৃহীদের নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন এবং তাদের একটি বিশিষ্ট জীবনচর্যায় অভ্যস্ত করিয়েছেন। বড়জোর ত্রিশরণ উচ্চারণ, বড় জোর স্তূপে ফুল-বাতি দেওয়া (পীরের দরগায় তো হিন্দুরাও বাতি দেয়, তাতেই কি তারা মুসলমান হয়ে গেল?) এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া ভিন্ন আর কোন কর্তব্যই সাধারণ মানুষের ছিল না। অর্থাৎ যে অর্থে আমরা খৃষ্টান, ইসলাম, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি বলতে জনগণের মধ্যে ওই সকল ধর্মের বাঁধা ও বংশানুক্রমিক অনুসরণকারী বুঝি, যাদের সুনির্দিষ্ট 'মার্কা' আছে, সেই অর্থে বৌদ্ধধর্মের কোন বাঁধা অনুসরণকারী ছিল না। হয়ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা

জনগণের সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন, জনসাধারণ হয়ত বৌদ্ধ সংঘে দান ধ্যান করতেন, রাজারাও করতেন, কিন্তু বৌদ্ধ হওয়া অর্থাৎ একটি ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া, বৌদ্ধ-ধর্মের নিজস্ব প্রকৃতির জন্যই তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হর্ষবর্ধনকে নিয়ে হিউয়েন সাং যতই নাচানাচি করুন না কেন, যদিও তিনি বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সংঘে প্রচুর টাকা দিতেন, আসলে পূজা করতেন শিবের, সূর্যের।

কার্যত এখানে বৌদ্ধধর্মের চিত্রটা কি ছিল? শৈব, বৈষ্ণব, জৈনদের মত জনগণের মধ্যে কোন গোঁড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিল না। বৌদ্ধ বলতে বোঝাত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের যাঁরা সংঘে বাস করতেন, বৌদ্ধমতে সাধনা করতেন, এবং জ্ঞান চর্চাও করতেন। সংঘ বলতে বুদ্ধের আমলের পরিত্যক্ত পর্বতগুহা নয়, বিরাট বিরাট প্রাসাদ, অসংখ্য লোকজন। রাজারা, জমিদারেরা, ধনী লোকেরা, সংঘগুলিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন। কোন কোন বৌদ্ধমঠের নিজস্ব কৃষি ভূমিও ছিল। সংঘে শাস্ত্রচর্চা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা সবই চলত। সবটাই একটা বৃহৎ ব্যাপার। নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিহারের খ্যাতি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের বাইরেও তা বিস্তৃত হয়েছিল। তবুও শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা অনস্বীকার্য যে এই গোটা ব্যাপারটাই ছিল পরনির্ভর। সংঘবাসীরা সকলেই ছিলেন পরগাছা, বাইরের অর্থসাহায্যেই এই বৃহৎ কান্ড চলত। কিন্তু সেই সাহায্যের উৎস যদি বন্ধ হয়ে যায়?

ধরা যাক্ পাল আমলের কথা। আসুন, আমরা যে কোন একটি বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করি, সেখানে উপর তলায় দেখা যাবে বড় বড় পন্ডিতদের, দার্শনিকদের, নৈয়ায়িকদের যাঁরা জগৎ ও জীবনের নানাবিধ জটিল প্রশ্নের সমাধান খুঁজছেন, আর জগৎটাকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য কী ভয়ানক সূক্ষ্ম ও জটিল যুক্তিজাল বিস্তার করছেন। একই প্রাসাদের নীচের তলার ঘরগুলিতে চলছে ভিন্ন ভিন্ন নাটক, মহাযান বৌদ্ধধর্মের কৃপায় এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে বৌদ্ধধর্ম বলে যা খুশি চালানো যায়। কোন ঘরে নারী-পুরুষ যুগনদ্ধে সাধনা করছে, কোন ঘরের মেঝেতে তান্ত্রিক মন্ডল এঁকে অলৌকিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা চলছে, কোন ঘরে ডাকিনীর পূজো হচ্ছে, কোন ঘরে তারাদেবীর। অন্নের অভাব নেই, পেটের ভাবনা নেই, পাল রাজারা প্রতি মাসেই সাহায্য পাঠিয়ে থাকেন, এবং তারই সাহায্যে দিনগুলি প্রত্যেকেরই নিজেদের মনের মত কাটে। যে দিন পালদের পতন হল, ওই বিপুল মাসিক বরাদ্দ বন্ধ হল, তখন এই বিহারবাসীরা কি করলেন? একটি মাত্রই পথ খোলা ছিল, তা ছিল পুঁথিপত্র ঝোলাঝুলি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া, এবং জনারণ্যে মিশে যাওয়া। ঠিক তাই হয়েছিল। তাঁদের জন্য শোক করার কেউই ছিল না, কেন না সংঘের বাইরে বৌদ্ধ সমাজ বলে কিছু ছিল না। আর তা ছিল না বলেই তারা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তাটুকুও রাখতে পারলেন না, চিরকালের জন্যই হারিয়ে গেলেন। পালদের পরেও এখানে ওখানে বৌদ্ধধর্ম যে আরও কিছু কাল বজায় ছিল, যার উল্লেখ আমরা আগে করেছি, তার অর্থ, পালদের পরেও এখানে ওখানে দু-চারটি বৌদ্ধ বিহার টিঁকে ছিল যেগুলি কোন কোন রাজা বা সামন্ত রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, এবং যতদিন তারা তা পেয়েছিল, ঠিক ততদিনই তারা টিঁকেছিল।

জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে না পারার জন্যই বৌদ্ধধর্মের পতন হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের এই ত্রুটির দিক্‌টা মহাযানীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা বৌদ্ধধর্মকে একটি গণভিত্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন,

কিন্তু তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতিটি ভ্রান্ত ছিল। চরিত্রের দিক থেকে বৌদ্ধধর্ম একমাত্র চিন্তাশীল এবং যুক্তিকামী ব্যক্তিদের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য ছিল, সকলের পক্ষে নয়। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন ব্যাপকভাবে সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্মকে গণভিত্তি দেবার প্রয়োজনে মহাযানীরা বৌদ্ধধর্মে অজস্র স্থানীয় দেবদেবী ঢোকালেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হলেন। একদিকে চরম ভাববাদ, শূন্য-অস্তিত্বের ধারণা, অপরদিকে অজস্র দেব-দেবী—কেউ নাগরিক, কেউ গ্রাম্য, কেউ বন্য—এবং তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অজস্র আচার অনুষ্ঠান, দুয়ে কখনও মিশ খেতে পারল না, যোগাযোগটা হয়ে রইল তেল এবং জলের মত, যা আমরা আগেই বলেছি। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের আওতায় অবশ্য অনেক লোক এসেছিল। তারা মহাযানতত্ত্ব সম্পর্কে কতদূর উৎসাহী ছিল জানি না, কিন্তু তারা এসেছিল এই কারণেই যে জনশ্রদ্ধেয় মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুদের তারা তাদের নিজেদের লৌকিক ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক মনে করতে পেরেছিল। বৌদ্ধবিহারগুলি শূন্য হয়ে যাবার পর এই অনুগামীদের কিছুই হারাতে হয়নি, তাদের বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান যেমন ছিল তেমনি রইল, সেগুলিকে আলাদা করে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেবার প্রয়োজন রইল না। যেমন দেবী পর্ণশবরী ছিলেন গ্রাম্য মারী দেবতা, মহাযান ধর্মে ইনি গৃহীত হবার পর এঁর সঙ্গে কয়েকটি দার্শনিক বিশেষণ যুক্ত হল, তারপর বৌদ্ধধর্ম উঠে গেলেও, ইনি যেমন ছিলেন তেমনি বজায় রইলেন, সেই আগের মতই ভক্তদের প্রদত্ত বলি খেতে লাগলেন।

কিন্তু এরপরেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম টিঁকে রইল কেন। হীনযান বৌদ্ধধর্ম সিংহলে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের জাতীয় ধর্ম। মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন ধরন চীন, জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বর্তমান, বেশ বহাল তবিয়তেই তারা রয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে বেশ জাঁকিয়ে রয়েছে। এর কারণ কি? এর কারণ একটিই। ওই সব দেশে বৌদ্ধধর্ম জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তার সামাজিক ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আগেও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ব্যবস্থা ছিল, যেগুলিকে অবলম্বন করে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রা, সামাজিক নিয়মকানুন প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। সেই সকল ধর্ম ব্যবস্থা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি বজায় ছিল, তাদেরও শ্রীবৃদ্ধি উত্তরকালে বড় কম হয়নি। আমরা আগেই বলেছি বৌদ্ধধর্ম তার ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা ও সংঘনির্ভরতার আদর্শ দিয়ে, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়মকানুনগুলিকে উল্টে দিতে পারেনি। জাতি ও বর্ণপ্রথা বৌদ্ধধর্মের আদর্শের বিরোধী হলেও সমাজজীবনে ওই প্রথাগুলিকে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে বৌদ্ধধর্ম পারেনি। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে যে সব দেশে বৌদ্ধধর্ম গেছে, সেই সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম গেছে একটি উন্নত ধর্ম হিসাবে, একটা সভ্যতা প্রদানকারী শক্তি হিসাবে। বৌদ্ধধর্ম যাবার আগে সিংহলে আধুনিক অর্থে কোন ধর্মই ছিল না। ওই দেশটি ছিল বেদ্দ প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত, যাদের ধর্ম ছিল আদিম লৌকিক আচার অনুষ্ঠান-সমূহ। সেখানে বৌদ্ধধর্মের সামনে খোলা ময়দান। ভারতে বৌদ্ধধর্ম বর্ণপ্রথার গায়ে আঁচড়টুকু দিতে পারেনি, কিন্তু সিংহলে ওই প্রথার কোন অস্তিত্বই ছিল না। ভারতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিকল্প কোন বৌদ্ধ আদর্শ গড়ে ওঠে নি। অথচ সিংহলে তা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। একথা ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রেও খাটে। ব্যতিক্রম শুধু চীন, যেখানে সুপ্রাচীন যুগ থেকে

বহু ঐতিহ্যের অস্তিত্ব ছিল। কনফুসিয়াসবাদ বা তাওবাদ কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ছিল না। প্রথমটি কয়েকজন ব্যক্তির জগৎ, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বিশিষ্ট চিন্তাভাবনার সমাহার, এবং দ্বিতীয়টি কয়েকটি আদর্শের ভিত্তিতে একটি সমবেত জীবনচর্যা। দুটি ক্ষেত্রই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ যেখানে সাধারণ মানুষের কোন স্থান নেই, অনেকটা হীনযান বৌদ্ধধর্মের মত, বক্তব্যে না হলেও চরিত্রে। আর ছিল লৌকিক দেবদেবী, আচার অনুষ্ঠান। চীনে বৌদ্ধধর্ম গেছে চূড়ান্ত ধরনের একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবে, যে ধর্মের পরমেশ্বর বুদ্ধ, যাঁর অধীনে অসংখ্য বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন দেবতারা বর্তমান। চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সকল চীনতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে চীনে রাজতন্ত্র ও সামন্তপ্রথা প্রতিষ্ঠার মূলে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট অবদান আছে। সম্রাট পরমেশ্বর বুদ্ধের প্রতীক, সামন্তরা বুদ্ধের অধীনস্থ দেবতা। পুরোনো ট্রাইবাল জীবনযাত্রার ধ্বংসস্তূপের উপর যে নূতন সামন্তপ্রথার বিকাশ ঘটছিল তার তাত্ত্বিক ভিত্তি চৈনিক বৌদ্ধধর্ম বরাবর যোগান দিয়েছে। এই কারণেই সম্রাট এবং সামন্তগণের নিকট বৌদ্ধধর্ম এত আদরণীয় ছিল।

২১। বৌদ্ধ এবং হিন্দুতন্ত্র এবং চীনের 'তাও' ধর্ম

চীনে তাংযুগেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 'তাও' ধর্মের যোগাযোগ ঘটে যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাই-ই-চিন্‌-হুয়া-সুং-চি (*Tai-I-Chin-Hua-Tsung-Chih*) বা 'সোনালী ফুলের রহস্য' গ্রন্থে।[১] এই গ্রন্থে লুইইয়েন (Lu-Yen, জন্ম ৭৫৫ খৃীঃ) নামক 'তাও'-পন্থী ধর্মগুরুর শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেহ, মন ও বুদ্ধির যথার্থ সমন্বয়ের জন্য ধ্যানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই ধ্যান আসলে বৌদ্ধপ্রথা, এবং তার স্বপক্ষে বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ থেকে, বিশেষ করে লেঙ্গ-য়েন (*Leng-Yen*) বা লংকাবতার সূত্র থেকে, উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

'তাও' ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নব্য কনফুসি-পন্থী চু-সির (Chu-Hsi ১১৩০-১২০০ খৃীঃ) রচনা থেকে যা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

তাও-পন্থীরা লাও-ৎসু এবং চুয়াং-ৎসুর রচনাবলীর অনুগামী। কিন্তু তারা এগুলিকে অবহেলা করেছে, এবং বৌদ্ধরা তার সুযোগ নিয়ে তাদের বিপথগামী করেছে, যার ফলে তাও পন্থীরা বৌদ্ধধর্মের সূত্রসমূহকে অনুকরণ করছে।...বৌদ্ধদের ত্রিকায় হচ্ছে—(১) বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দেহ (ধর্মকায়), (২) তাঁর আনন্দপূর্ণ দেহ (সম্ভোগকায়) যা তাঁর গুণাবলী ব্যক্ত করে, এবং (৩) তাঁর বাস্তব দেহ (নির্মাণ বা রূপকায়) যা অবলম্বনে তিনি মানুষরূপে এসেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আধুনিক সম্প্রদায়সমূহ এই ত্রিকায়কে তিনটি মূর্তিতে বিভক্ত করেছে এবং সেগুলিকে পাশাপাশি রেখেছে। তারা ত্রিতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্যই বুঝতে পারেনি যা আসলে একের মধ্যে তিনের বিকাশ। তাও পন্থীরা এক্ষেত্রে বৌদ্ধদের অনুকরণ করে লাও-

---

১। ইংরাজী অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য R. Wilhelm, *The Secret of the Golden Flower*, 1931.

ৎস্কে তিনটি পৃথক সত্তা হিসাবে উপাসনা করে, (১) আদি এবং পূজ্য ঈশ্বর, (২) চূড়ান্ত নিয়ন্তা 'তাও' এবং (৩) চূড়ান্ত শাসক লাও-ৎস্। পরম শক্তিমান ঈশ্বর এ'দের তলায় স্থান পেয়েছেন, এবং এটা একটা আক্রোশের বশে অধিকার ভঙ্গের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু প্রথম দুটি কল্পনা লাও-ৎস্র আধ্যাত্মিক ও আনন্দপূর্ণ দেহের প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং এই দুটি মূর্তি তাঁর সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করে না। তৃতীয়টির প্রবর্তন বৌদ্ধদের ভ্রান্তির অনুকরণ ভিন্ন কিছুই নয়।১

বৌদ্ধধর্ম শুধু 'তাও' ধর্মকে প্রভাবিত করেনি, তার বিপরীতটাও ঘটেছিল চূড়ান্তভাবে। বৌদ্ধ এবং হিন্দু তন্ত্র সাধনার কয়েকটি বিশেষ দিক্ প্রত্যক্ষভাবেই তাও-পন্থার প্রভাবে গড়ে উঠেছে, যেমন বামাচার, যা চীনাচার নামেও পরিচিত। বিষয়টিকে একটু খুলেই বলা যাক্।

মহাযানী বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিশেষ করে অবলোকিতেশ্বর এবং তারা হিন্দু-ধর্মেও স্থান করে নিয়েছিলেন, এবং শিব ও শক্তির সঙ্গে পরবর্তীকালে অভিন্নতা অর্জন করেছিলেন। তারাদেবী তিব্বতে ও চীনে তান্ত্রিক বামাচারী অনুষ্ঠান-সমূহের দ্বারা পূজিতা হতেন, এবং এই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তান্ত্রিক পঞ্চমকার নামে যা পরিচিত—মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন—তা চীন-দেশ থেকেই এসেছে। তারাতন্ত্র নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বিখ্যাত তারা ও বশিষ্ঠের যে কাহিনী তন্ত্রগ্রন্থসমূহ থেকে পাওয়া যায়, এই বিষয়ে আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারারহস্য, রুদ্রযামল ও মহাচীনাচারক্রম গ্রন্থত্রয়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে দেবী তারার সঙ্গে সম্পর্কিত বীরাচার বা বামাচার সোজা-সুজি চীনদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন বশিষ্ঠ, যিনি খোদ বুদ্ধের কাছ থেকেই নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং চীনদেশে এগুলির অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে দেখে জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

তন্ত্রের দেহতত্ত্ব অনুযায়ী মানবদেহই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, এবং সেই হিসাবে কায়সাধন এবং সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যৌনাচারসমূহ নারীরূপিণী প্রকৃতি বা শক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় করে বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। যে প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে তান্ত্রিক কায়সাধন ও যৌনাচার সেই তত্ত্ব ইন এবং ইয়াং রূপে 'তাও' ধর্মেও উপস্থিত। তাও-পন্থীদের মত তান্ত্রিকদের লক্ষ্য জীবনমুক্তি, যার অপর নাম অমরত্ব অর্জন এবং এই উদ্দেশ্যে তাও পন্থীদেরই মত তান্ত্রিকরাও রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, দ্রব্যগুণ প্রভৃতির চর্চা করেছিলেন। এই অমরত্ব (*Hsien*) অর্জনের জন্য তাও-পন্থীরা কতকগুলি পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যেগুলি হচ্ছে প্রাণায়াম, হঠযোগ, যৌন-ব্যবহার, রসায়ন ও খাদ্যাখাদ্য বিচার। এই পদ্ধতি তান্ত্রিকদেরও। দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিথুনজাত বীর্যকে নির্গত হতে না দিয়ে ঊর্ধ্বগামী করার যে প্রচেষ্টা তন্ত্র সাধনায় একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি, তা একটি বিশুদ্ধ 'তাও' পদ্ধতি যা *huan ching* নামে পরিচিত।

'তাও' ধর্মের বাইবেল, লাও-ৎস্ রচিত তাও-তে-কিং (*Tao-te-king*) গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ হয়েছিল ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে কামরূপের রাজা ভাস্করের নির্দেশে। তাও-তে-কিং-এর প্রতি ভারতীয় তান্ত্রিকদের আগ্রহ নিশ্চয়ই অহেতুক ছিল

১। Bruce, *Chu Hsi and His Masters*, 237-39.

না। রাজা ভাস্কর লাও-ৎসুর একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রকাশ। আরও আগে ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক সোঙ্গ-য়ুন (Song Yun) উত্তর-পশ্চিম ভারতে উদ্যান দেশে (সোয়াট উপত্যকা) তাও-তে-কিং-এর উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রুদ্রযামল, মহাচীনাচারক্রম প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বশিষ্ঠ মুনি সিদ্ধিলাভের জন্য কামরূপে প্রচণ্ড সাধনা করেও যখন ব্যর্থ হলেন, তখন স্বয়ং তারাদেবী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে চীনদেশে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। চীনদেশে গিয়ে তিনি দেখলেন যে বুদ্ধ অসংখ্য নগ্না নারী পরিবৃত হয়ে রক্ত ও মদ্যপান করছেন। তাঁকে বিস্মিত হতে না বলে বুদ্ধ তাঁকে বামাচারে দীক্ষা দিলেন যার ফলে তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটল।

এতচ্ছ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং সংস্মৃত্বা দেবীং সরস্বতীম্।
মদিরা-সাধনং কর্তুম জগাম কুল-মণ্ডপে॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনং এব চ।
পুনঃ পুনঃ সাধয়িত্বা পূর্ণ-যোগী বভুব সঃ॥

অতঃপর বুদ্ধ বশিষ্ঠকে এই বামাচার বা চীনাচার সর্বত্র প্রচারের আদেশ দিলেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে এই সকল বিষয়কে বিচার করলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে 'তাও'-পন্থী আচার আচরণসমূহ, যেগুলির মূল ভিত্তি নরনারীর আনুষ্ঠানিক মৈথুনের অন্তরালে প্রকৃতি (yin) পুরুষ (yang) তত্ত্বের উপলব্ধি, চৈনিক বৌদ্ধগণ কর্তৃক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ গৃহীত হয়েছিল। অন্যান্য সূত্র থেকে জানা গেছে যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে চীনদেশে শক্তি পূজার, বরং বলা যায় এক ধরনের তান্ত্রিক শক্তিসাধনার, চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। এই সাধনার মূল প্রেরণা হিসাবে যে মহাদেবী গড়ে উঠেছিলেন, তিনি মূলত চারটি ধারার সমন্বয়ঃ (১) প্রাচীন চৈনিক মাতৃদেবী সি-ওয়াঙ্গ-মু (Si-Wang-Mu), (২) 'তাও'-ধর্মোক্ত প্রকৃতি বা শক্তি যা yin নামে পরিচিত, (৩) বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর যিনি চীনদেশের পুরাতন মাতৃকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে দেবতা থেকে দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে কুয়ান-ইন (Kuan-Yin) নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। এবং (৪) বৌদ্ধ-দেবী তারা। এই মহাদেবীর পূজার্চনা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু বামাচারী অনুষ্ঠান চীনদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল।১

১। Joseph Needham, *Science and Civilization in China* II, 1956, 33-164, 425 ff.; S. K. Chatterji in *Journal of the Asiatic Society* I, 1957, 104 ff.; H. P. Sastri, *Notices of Sanskrit Mss.*, Second Series, 1906; B. T. Bhattacharyya, *Buddhist Esoterism*, 1932, H. Goetz in *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, XXXVI, 133-40; S. B. Dasgupta, *Introduction to Tantric Buddhism*, 1950; P. C. Bagchi in *Indian Historical Quarterly*, 1931, 1-16; *India and China*, 1950; N. N. Bhattacharyya, *Indian Mother Goddess*, 1970; *History of the Sakta Religion*, 1974, 95-98.

৫

জৈন ধর্ম

১। জৈন ধর্মের প্রাক্-ইতিহাস

জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী চব্বিশজন তীর্থংকর জৈন ধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছেন, যাঁরা হলেন ঋষভ বা আদিনাথ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দ, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধি, শীতল, শ্রেয়াংশ, বসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম, শান্তি, কুন্থু, অর, মল্লি, মুনিসুব্রত, নমি, নেমি বা অরিষ্টনেমি, পার্শ্ব ও মহাবীর। ঋষভদেব প্রথম তীর্থংকর যিনি পুরুষদের ৭২টি এবং নারীদের ৬৪টি বিদ্যা শিখিয়েছিলেন জীবনধারণের জন্য। পরবর্তী তীর্থংকরেরা নিজেদের যুগের উপযোগী করে জৈন জীবনচর্যার প্রচার করেছিলেন। শেষ দুজন তীর্থংকর, পার্শ্ব ও মহাবীরের হাতে জৈন ধর্মের গুণগত পরিবর্তন হয়।

জৈন গ্রন্থসমূহে পার্শ্ব ও মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থংকরদের সম্পর্কে বড় বেশি অতিরঞ্জিত কথাবার্তা আছে, যা থেকে অনেকেই ধারণা করেন যে তাঁদের অস্তিত্বের কল্পনা নিছকই জৈনদের মনগড়া। কিন্তু জৈন ঐতিহ্যকে এত সহজে অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া খুবই সম্ভব, বিশেষ করে গুরুপরম্পরার আদর্শ যখন এদেশে অজানা নয়। হতে পারে অনেক-পরবর্তীকালের লেখকেরা ভক্তির প্রাবল্যে তাঁদের চরিত্রগুলিকে পৌরাণিক করে তুলেছেন, কিন্তু তাতেই তাঁদের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। পার্শ্ব এবং মহাবীর কখনও দাবি করেননি যে তাঁরা কোন নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমরা আগেই বলেছি যে বুদ্ধ এবং মহাবীর তাঁদের সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক প্রাচীন যুগের মূল্যবোধ ও আচার অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এ বিষয়ে হারমান ইয়াকোবি লিখেছেনঃ

The interest of Jainism to the student of religion consists in the fact that it goes back to a very early period, and to primitive currents of religion and metaphysical speculation which gave rise to the oldest Indian philosophies—Samkhya and Yoga—and to Buddhism. It shares in the theoretical pessimism of these systems and also in their practical ideal—liberation. Life in the world, perpetuated by the transmigration of the soul, is essentially bad and painful ; therefore it must be our aim to put an end to the cycle of births, and this will be accomplished when we come into possession of right knowledge. In this general principle Jainism agrees with Samkhya, Yoga and Buddhism ; but they differ in their modes of realising it.[১]

১। *Encyclopaedia of Religion and Ethics,* VII, 465.

বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও যে দুঃখবাদী, ইয়াকোবির সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে একমত। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, এই দুঃখচেতনা ততটা আধ্যাত্মিক নয়, যতটা জাগতিক। আমরা বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করে বুদ্ধ ও মহাবীরের দুঃখবাদের বাস্তব ভিত্তিটা দেখাবার চেষ্টা করেছি। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সাদৃশ্যসমূহ এবং সেগুলির উৎস সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করেছি। মহাবীরের সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক তথ্য জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তবে তাঁর পূর্ববর্তীদের সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে বিশেষ কোন খবরাখবর জানা যায় না।

২। জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক নাগাদ গুজরাতের বলভী নামক স্থানে শ্বেতাম্বর জৈনেরা দেবর্ধির সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন আহ্বান করে শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। যে ভাষায় শ্বেতাম্বর জৈন শাস্ত্র সংকলিত হয়েছিল তা অর্ধমাগধী প্রাকৃত, তবে তার ঝোঁকটা মহারাষ্ট্রীর দিকে বেশি। অনেকে এই ভাষাকে জৈন-প্রাকৃত বা আর্ষ-প্রাকৃতও বলে থাকেন। মূলত ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব ও সাংঘিক আচরণবিধি জৈন শাস্ত্র গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। তবে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় যে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়। দিগম্বর জৈনেরা অবশ্য এইসব শ্বেতাম্বর শাস্ত্রাদি মানেন না। তাঁদের মতে যেহেতু আদি জৈন শাস্ত্র লুপ্ত হয়েছে, সেই হেতু সেগুলি পুনরুদ্ধারের নামে যা কিছু করা হবে তার সবটাই হবে জাল, কেননা মহাবীরের মৃত্যু আর শ্বেতাম্বরদের শাস্ত্র সংকলনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক।

শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে বারোটি "অঙ্গ"-গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র সংকলন। অবশ্য তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই "অঙ্গ"-গুলির আগে "পূর্ব" নামে চোদ্দটি গ্রন্থ ছিল যা অবলুপ্ত হয়েছে। দ্বাদশটি অঙ্গ গ্রন্থ হল আয়ার (সংস্কৃত=আচার), সূয়গড় (সূত্রকৃত?), ঠান (স্থান), সমবায়, বিয়াহপন্নত্তি (ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি, অন্য নাম ভগবতী সূত্র), নায়াধম্মকহাও (জ্ঞাতধর্ম কথা), উবাসগদশাও (উপাসকদশা), অন্তগড়দশাও (অন্তঃকৃদ্দশা), অনুত্তরোববাইয়দশাও (অনুত্তরোপপাদিকদশা), পণ্হাবাগরণাইম্ (প্রশ্ন-ব্যাকরণানি), বিবাগসুয় (বিপাকশ্রুত) এবং দিট্ঠিবায় (দৃষ্টিবাদ)। শেষোক্ত গ্রন্থটির কোন অস্তিত্ব নেই। কথিত আছে, জৈনদের হারিয়ে যাওয়া চোদ্দটি আদিগ্রন্থ, যেগুলি "পূর্ব" নামে বিখ্যাত, সেগুলির সারমর্ম এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল।[১]

দ্বাদশ অঙ্গ ছাড়াও শ্বেতাম্বর জৈন শাস্ত্র সংগ্রহের মধ্যে উপাঙ্গ নামে কথিত বারোটি গ্রন্থ আছে যেগুলি হল উববাইয় (উপপাদিক), রায়পসেণইজ্জ (রাজপ্রশ্নীয়), জীবাজীবা ভিগম, পন্নবণা (প্রজ্ঞাপনা), সূরপন্নত্তি (সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি), জম্বু-

---

১। সমস্ত অঙ্গগ্রন্থগুলি আগমোদয় সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে (কোন কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগে রচিত টীকাভাষ্যসহ) প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজী অনুবাদ: আয়ার, (H. Jacobi, *Sacred Books of the East*, XXII, 1884); সূয়গড়, (H. Jacobi, *ibid*, XLV), উবাসগদশাও, (A. F. R. Hoernle 1885-88), অন্তগড়দশাও এবং অনুত্তরোববাইয়দশাও, (L. D. Barnett, 1905)।

দ্দীবপন্নত্তি (জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি), চংদপন্নত্তি (চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি) নিরয়াবলিয়াও (নিরয়াবল্য), কপ্পবর্দিংসিয়াও (কল্পাবতংসিকা), পুপ্‌ফচুলাও (পুষ্পচুলা, পুষ্পচুলিকা), পুপ্‌ফিয়াও (পুষ্পিকা) এবং বণ্হিদশাও (বৃষ্ণিদশা)।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ ছাড়া আরও কয়েক শ্রেণীর গ্রন্থ শ্বেতাম্বর জৈন শাস্ত্রের অন্তর্গত হয়েছে—প্রকীর্ণ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র ইত্যাদি। প্রকীর্ণ (প্রাকৃত পইন্ন) কথাটির অর্থই হচ্ছে যা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। এই পর্যায়ের দশটি শাস্ত্রগ্রন্থের নাম যথাক্রমে চৌসরণ (চতুঃশরণ), আউরপচ্চক্‌খান (আতুর প্রত্যাখ্যান), ভত্তপরিন্না (ভক্তপরিজ্ঞা), সংস্থার (সংস্তার), মহাপচ্চক্‌খান (মহাপ্রত্যাখ্যান), চংদাবিজ্জহ (চন্দ্রকবেধ্যকা), গণিবিজ্জা (গণিবিদ্যা), তংদুলবেয়ালিয় (তণ্ডুলবৈচারিক), দেবিং-দত্থয় (দেবেন্দ্র স্তব) এবং বীরত্থয় (বীর স্তব)।

ছেদসূত্র (প্রাকৃত ছেয়সুত্ত) পর্যায়ে ছয়টি গ্রন্থঃ নিসীহ (নিশীথ), মহানিসীহ (মহানিশীথ), ববহার (ব্যবহার), আয়ারদশাও (আচার দশা), কপ্প (কল্প) ও পঞ্চকপ্প (পঞ্চকল্প)। পঞ্চম গ্রন্থটির (অর্থাৎ কপ্প বা কল্পের) লেখক হিসাবে ভদ্রবাহুর নাম উল্লেখ করা হয় এবং ওই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়টি ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র নামে খ্যাত। ষষ্ঠ গ্রন্থটি জিনভদ্র রচিত, যা বর্তমানে পাওয়া যায় না।

মূলসূত্র পর্যায়ের চারটি গ্রন্থ হচ্ছে উত্তরজ্‌ঝায়া (উত্তরাধ্যয়ন), আবস্‌সয় নিজ্জুত্তি (আবশ্যক-নির্যুক্তি), দশবেয়ালিয় (দশ বৈকালিক) ও পিন্দনিজ্জুত্তি (পিণ্ডনির্যুক্তি)। এই চারিটি মূল সূত্র ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রামাণ্য শ্বেতাম্বর শাস্ত্র আছে—নন্দী, অনুওগদারা (অনুযোগদ্বার), ইসিভাসিয়াইম (ঋষিভাষিতানি), অঙ্গচূলিয়া (অঙ্গচূলিকা), বগ্‌চূলিয়া (বর্গচূলিকা), বিহায়চূলিয়া (বিবাহ-চূলিকা) এবং অঙ্গবিজ্জা (অঙ্গবিদ্যা)।

দিগম্বর জৈনগণ শ্বেতাম্বর শাস্ত্রসমূহকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন না, তথাপি তাঁরা নিজেরা কিছু গ্রন্থ রচনা করে নিয়েছেন যেগুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রথমানুযোগ, করণানুযোগ, দ্রব্যানুযোগ এবং চরণানুযোগ। তাঁদের আরও কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হচ্ছে, উমাস্বামী রচিত তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক), বট্টকের রচিত মূলাচার এবং ত্রিবর্ণাচার (প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে) রবিষেণ রচিত পদ্মপুরাণ (সপ্তম শতক), সমন্তভদ্র রচিত আপ্তমীমাংসা ও রত্নকরণ্ড শ্রাবকাচার (অষ্টম শতক), জিনসেন রচিত হরিবংশপুরাণ (অষ্টম শতক) এবং অপর একজন জিনসেন ও তৎশিষ্য বিরচিত ত্রিষষ্ঠিলক্ষণ মহাপুরাণ।

জৈন শাস্ত্রসমূহের টীকাভাষ্য ইত্যাদি রচনার জন্য যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন কুন্দকুন্দ, উমাস্বামী, বট্টকের, কার্তিকেয়স্বামী, পূজ্যপাদ, সিদ্ধসেন-দিবাকর, সমন্তভদ্র, বিদ্যানন্দ, নেমিচন্দ্র, গোম্মট, অমৃতচন্দ্র, দেবসেন, শান্তিসূরী, হেমচন্দ্র, অমিতগতি, আশাধর, মল্লিসেন, দেবেন্দ্র, সফলকীর্তি, শ্রুতসাগর, ধর্মসাগর, বিনয়-বিজয়, যশোবিজয় প্রভৃতি।১

১। উপাঙ্গ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র, প্রকীর্ণ ও অপরাপর গ্রন্থসমূহ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন আগমোদয় সমিতি ও দেবচন্দ লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার সংস্থা। কল্পসূত্রের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেন J. Stevenson, 1848 এবং পরে H. Jacobi, (*SBE*, XXII), বঙ্গানুবাদ করেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। উত্তরাধ্যয়নের ইংরাজী অনুবাদ H. Jacobi, (*SBE*, XLV), বঙ্গানুবাদ পূরণচাঁদ শ্যামসুখা ও অজিত ভট্টাচার্য। দিগম্বর শাস্ত্রসমূহ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন মানিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা সংস্থা।

৩। পার্শ্বনাথ

জৈনদের তেইশতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় প্রমাণ বৌদ্ধ দীঘ নিকায় গ্রন্থের সামঞ্ঞফলসুত্ত যেখানে ভুল করে মহাবীরের মত বলে পার্শ্বের মত উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জৈন গ্রন্থে পার্শ্বের শিষ্যদের সঙ্গে মহাবীরের শিষ্যদের বিতণ্ডার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এমনও ইঙ্গিত সেখানে আছে যা থেকে মনে হয় মহাবীরের পিতামাতা পার্শ্বের ধর্মমতের অনুগামী ছিলেন।

জৈন বিবরণ অনুযায়ী পার্শ্ব আনুমানিক ৮১৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা অশ্বসেন সম্ভবত কোন ট্রাইবের নেতা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল বামা। তাঁর জন্ম ও জীবন সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী-গুলিতে তাঁকে সর্পের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। ভাস্কর্যেও তাঁর প্রতীক সর্প। অনুমান হয় সর্প ছিল তাঁদের কুল-টোটেম। যৌবনে তিনি কলিঙ্গের যবনদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী অযোধ্যা অঞ্চলের কোন ট্রাইবের সর্দারের মেয়ে ছিলেন। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং তিরাশী দিন একনাগাড়ে সাধনার পর পরম জ্ঞানলাভ করেন। তিনি শত বৎসর বেঁচেছিলেন এবং সত্তর বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। সমেত-শিখর পর্বতে (বর্তমান পরেশনাথ) তিনি দেহত্যাগ করেন।

পার্শ্বের মতবাদ সম্পর্কে খুব বেশি কথা আমাদের জানা নেই, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান জৈন ধর্মের, যার প্রচারক মহাবীর, অনেকটাই পার্শ্বের সৃষ্টি। কেশি ও গোয়ামের যে বিতণ্ডার উল্লেখ পাওয়া যায়[১] তা থেকে বোঝা যায় যে মহাবীরের মতের সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও, পার্শ্বের মতকেই মূলত মহাবীর সমৃদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য করেছিলেন। পার্শ্ব পুরাতন আমলের প্রাক্-বিভক্ত জীবনচর্যার প্রচারক ছিলেন। তিনি চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন—কারো জীবননাশ না করা, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচরণ পরিহার করা, অপরহণ না করা, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী না হওয়া। একে বলা হয় চতুর্যাম ব্রত, যার সঙ্গে মহাবীর আরও একটি ব্রত যোগ করেছিলেন যা হচ্ছে দৈহিক ভোগে লিপ্ত না হওয়া।

৪। মহাবীর

মহাবীর, যিনি জৈন ধর্মের চব্বিশতম এবং শেষ তীর্থংকর, বৈশালীর কুণ্ডগ্রামে (বসুকুণ্ড) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞাতৃক ট্রাইবের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন ওই ট্রাইবেরই নেতা। তাঁর মা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবিদের মেয়ে যাঁর ভাই ছিলেন চেটক, বৃজি ট্রাইবমণ্ডলীর প্রধান। জৈন পৌরাণিক কাহিনী

জৈন শাস্ত্রের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য M. Winternitz, *History of Indian Literature* II, 424-595 ; U. N. Barodia, *History and Literature of Jainism,* 1909, H. R. Kapadia, *History of the Canonical Literature of the Jains,* 1947, W. Schubring, *Doctrine of the Jains,* 1972, 10 ff.; N. N. Bhattacharyya, *Jain Philosophy in Historical Outline,* 1976, 8-29.

১। উত্তরাধ্যয়ন ২৩।

অনুযায়ী তাঁর মা গর্ভাবস্থায় চৌদ্দটি অথবা ষোলটি স্বপ্ন দেখেন যা থেকে বোঝা যায় তিনি হয় তীর্থংকর হবেন, না হয় চক্রবর্তী রাজা। আর এক ধরনের কাহিনী অনুযায়ী মহাবীর দেবনন্দা নামক ব্রাহ্মণীর গর্ভে উদ্ভূত হন, পরে সেই ভ্রূণ ত্রিশলার গর্ভে বদল হয়। এই কাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের জন্মকাহিনীর সাদৃশ্য আছে। জৈনদের মতে মহাবীর ৫৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তবে হিসাবপত্র করে দেখা গেছে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দই তাঁর জন্মসময়ের কাছাকাছি।

তাঁর আসল নাম বর্ধমান, এছাড়া তিনি নায় বা নাতপুত্ত, কাসব, বেসালীয়, বেদেহদিন্ন, শাসননায়ক, বুদ্ধ প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন। বালকাবস্থায় তিনি সকলের সেরা ছিলেন। দিগম্বর ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি বাল্যাবস্থা থেকেই তপশ্চর্যায় মন দেন এবং আমৃত্যু সুকঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। শ্বেতাম্বর মতে তিনি কৌণ্ডিণ্য ট্রাইবের যশোদাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে অনুজা বা প্রিয়দর্শনা নামক তাঁর এক কন্যা জন্মায়। এই কন্যার সঙ্গে তাঁর শিষ্য জমালির বিবাহ হয়। এই জমালি পরে সংঘভেদ ঘটিয়েছিলেন। মহাবীরের কন্যার গর্ভে যশোবতী বা শেষবতী নামক একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল।

তিরিশ বছর বয়সে তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর, মহাবীর তাঁর দাদা নন্দিবর্ধনের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যে বিপুল বিত্ত তাঁর অধিকারে ছিল তার সবটাই তিনি বিলিয়ে দিয়ে পরিব্রাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি এক গ্রামে এক রাত্রির বেশি অতিবাহিত করতেন না। তের মাস পরে তিনি বস্ত্র ব্যবহার ছেড়ে দেন। তাঁর এই পরিব্রাজক জীবনে তিনি নানাস্থান থেকে দুর্ব্যবহার পান। পরিব্রাজক জীবনের তৃতীয় বছরে তাঁর সঙ্গে গোশাল মংখলিপুত্তের সাক্ষাৎ হয়, এবং দুজনে একত্রে ছয় বছর কাল অতিবাহিত করেন। তারপর উভয়ের আদর্শগত বিরোধ শুরু হয়, এবং গোশাল নিজেকে তীর্থংকর ঘোষণা করে পৃথক হয়ে যান।

দীর্ঘ বারো বছর মহাবীর একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করেন এবং সুকঠোর তপশ্চর্যার অন্তে ঋজুপালিকা নদীর তীরে জৃম্ভিকাগ্রামে একটি শালবৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট থাকাকালীন পরম জ্ঞানলাভ করেন। তারপর তিনি ধর্মপ্রচারে মন দেন। তাঁর মাতুল, বৃজি-ট্রাইবমণ্ডলীর প্রধান, চেটক তাঁর পৃষ্ঠপোষক হন। মগধরাজ কূণিক (অজাতশত্রু) তাঁকে স্বাগত জানান। কৌশাম্বীতে তিনি রাজা স্থানকের নিকট বিপুল সমাদর পান। তিনি বছরে আটমাস করে পরিভ্রমণ করতেন এবং বর্ষার চারমাস পূর্বভারতের কোন না কোন নগরে অতিবাহিত করতেন। জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি প্রথমে যান অস্থিক গ্রামে, তারপর চম্পা এবং পৃষ্টিচম্পায় তিনটি বর্ষা অবস্থান করেন, বারোটি বর্ষা কাটান বৈশালী এবং তার প্রত্যন্ত বাণিজ্য গ্রামে, চোদ্দটি বর্ষা কাটান রাজগৃহে, ছটি মিথিলায়, দুটি ভদ্রিকায় এবং তাঁর ৪২ বছরের প্রচারক-জীবনের শেষ চারটি বছর কাটান যথাক্রমে আলভিকা, পুণিত-ভূমি, শ্রাবস্তী এবং পাবাপুরীতে।

৭২ বছর বয়সে ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা-পুরীতে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। সেখানকার শাসক হস্তিপালের গৃহে তখন তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি পঞ্চাশটি ভাষণ দেন এবং ছত্রিশটি অজিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করেন। তারপর তাঁর অন্তিমকাল আসন্ন বুঝে তিনি শান্ত সমাহিত ভঙ্গীতে বদ্ধমুষ্টি হয়ে উপবেশন করেন, এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তে নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর উদ্দেশ্যে মল্ল এবং লিচ্ছবিরা একটি দীপাবলী উৎসব পালন করে।

৫। জৈন সংঘের ইতিহাস

While we possess meterials which enable us to construct a fairly clear biography of the prophet, and while we have at least such information concerning the events which preceded and were contemporary with the beginning of the great separation between the Svetambaras and the Digambaras...the following period is almost totally devoid of any historical record. And this is not the only blank in Jain ecclesiastical history. Scarcely more is known concerning the fate of the Jain Church during the early centuries of our era down to the time of the great council of Valabli, in the fifth or at the beginning of the sixth century A. D. when the canon was written down in its present form. ১

জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বস্তুতই সামান্য সংবাদই পাওয়া যায় যা জৈনদের ধর্মীয় ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে সক্ষম। যেটুকু জানা যায় তা হচ্ছে এই যে মহাবীরের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য ইন্দ্রভূতি গৌতম সংঘপ্রধান হন এবং বারো বছর ওই পদে থাকেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন সুধর্মা যাঁরও কার্যকাল ছিল বারো বছর। এই গণধরদের সর্বপ্রাচীন তালিকা পাওয়া যায় ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে২ যা সুধর্মা থেকে আরম্ভ হয়ে তেত্রিশতম গণধর শাণ্ডিল্য বা স্কন্দিলে শেষ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের নাম ও গোত্র ভিন্ন আর কিছু দেওয়া নেই, তবে কল্পসূত্রে একটি বর্ধিত তালিকাও আছে, যেখানে ষষ্ঠ গণধর ভদ্রবাহু থেকে চতুর্দশ বজ্রসেন পর্যন্ত যাঁদের শিষ্যবর্গের কথা এবং যাঁদের থেকে উদ্ভূত গণ, কুল ও শাখাগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী কালের সাম্প্রদায়িক রচনাসমূহে আচার্য পরম্পরার উল্লেখ আছে (গুর্বাবলী, ভট্টাবলী)। সচরাচর এই সকল রচনায় মহাবীর থেকে বিশেষ কোন গচ্ছ বা শাখার প্রবক্তা পর্যন্ত নামের তালিকা দেওয়া হয়, এবং তারপর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয় ওই প্রবক্তা বা শ্রীপূজ্য থেকে আঞ্চলিক সংঘনেতাদের। এইগুলি জৈনধর্মের আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ হতে পারে।

সুধর্মার পর গণধর হন জম্বুস্বামী যাঁর কার্যকাল ছিল চব্বিশ বছর। পরবর্তী গণধরগণ ছিলেন প্রভব, সয়ম্ভব, যশোভদ্র, সম্ভূতবিজয় এবং ভদ্রবাহু। জৈন শাস্ত্র অনুযায়ী এই ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমকালীন ছিলেন। তিনি গণধর থাকাকালীন মগধে একটি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়, যার ফলে তিনি বারো হাজার অনুগামী নিয়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যান। অবশিষ্ট বারো হাজার মগধেই থেকে যান স্থূলভদ্রের অধিনায়কত্বে। স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন, যেখানে এগারোটি অঙ্গশাস্ত্র সংকলিত হয়। দ্বাদশতম অঙ্গ যার মধ্যে সর্বপ্রাচীন জৈনশাস্ত্র "পূর্ব" বজায় ছিল বলে কথিত, সঙ্কলিত করা সম্ভব হয়নি। (ওই সকল গ্রন্থের যা বর্তমান আকার তা কিন্তু তৈরি হয়েছিল অনেক পরবর্তী কালে) এদিকে অনেক

১। *Cambridge History of India,* I, 151.

২। *Sacred Books of the East,* XXII, 286-95.

কাল পরে ভদ্রবাহু দলবল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি পাটলিপুত্র-সম্মেলনে সংকলিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য মানতে অস্বীকার করলেন। স্থূলভদ্রের সম্প্রদায় বস্ত্রব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, ভদ্রবাহু যা নিয়মবিরোধী বলে ঘোষণা করলেন। ফলে জৈন সংঘে বিরোধের সৃষ্টি হল।

স্থূলভদ্রের পর গণধর হলেন যথাক্রমে মহাগিরি, সুহস্তী, সুস্থিত, সুপ্রতিবুদ্ধ, ইন্দ্রদিন্ন, দিন্নসূরি, সিংহগিরি, বজ্রস্বামী ও বজ্রসেন। শেষোক্তের আমলেই শ্বেতাম্বর-দিগম্বর বিভেদ ঘটেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী জৈন ধর্মে মোট আটবার সংঘভেদ হয়েছিল। প্রথম করেছিলেন মহাবীরের জামাতা জমালি, দ্বিতীয়—গোশাল (ইনি কোনদিনই জৈন ছিলেন না) তৃতীয়—আষাঢ় আচার্য, চতুর্থ—অশ্বমিত্র, পঞ্চম—গঙ্গ, ষষ্ঠ—রোহগুপ্ত—গোষ্ঠ। কিন্তু কোনটিই অষ্টম বা শ্বেতাম্বর-দিগম্বর ভেদের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। দিগম্বররা যে কটি কারণে শ্বেতাম্বর বিরোধী ছিল ছিল সেগুলি হচ্ছে, তীর্থংকরদের নগ্ন ও নিমীলিত নেত্ররূপে চিত্রিত করতে হবে, নারীরা মোক্ষলাভের অধিকারিণী নয়, কেবল জ্ঞানীদের কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না, মহাবীর কদাপি বিবাহ করেন নি, সংকলিত শাস্ত্রসমূহ অচল, কেননা তা মনুষ্যসৃষ্ট, জৈন সাধুদের অবশ্যই নগ্ন থাকতে হবে এবং জম্বুস্বামীর পর অন্য কোন আচার্য সমগ্র জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন। জৈনদের দুভাগ হয়ে যাবার প্রত্যক্ষ কারণটা জানা যায় না, তবে এটা নিশ্চিত যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী জীবনচর্যা (জিনকল্প ও স্থবিরকল্প) বরাবরই সংঘে বর্তমান ছিল; এবং কোন একটা সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অকস্মাৎ বিস্ফোরণ হয়। শ্বেতাম্বর-দিগম্বর ভেদ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

পরবর্তী জৈন সংঘের ইতিহাস আসলে আঞ্চলিক জৈন ধর্মের ইতিহাস। একটি মাত্রই বড় ঘটনা ঘটেছিল, তা হচ্ছে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বলভীর দ্বিতীয় জৈন সম্মেলন যা দেবর্ধির-পৌরোহিত্যে ঘটেছিল। এই সম্মেলনে জৈন শাস্ত্রসমূহ সম্ভবত তাদের বর্তমান আকার পেয়েছিল।

৬। জৈন ধর্মের বিস্তৃতি

জৈন ধর্মের ইতিহাস মূলত জৈনধর্মাবলম্বীদের স্থানান্তরগমন ও বসতিস্থাপনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। মহাবীরের ভ্রমণসূচী থেকে দেখা যায় যে আদি জৈনদের ঘাঁটি ছিল মূলত কোসল, বিদেহ, মগধ ও অঙ্গ। জৈন গ্রন্থে আদি জৈন সাধুদের বিচরণ-ক্ষেত্রের সীমানা হিসাবে পূর্বদিকে অঙ্গমগধ, দক্ষিণে কৌশাম্বী, পশ্চিমে স্থূণা এবং উত্তরে কুনালা নির্দিষ্ট হয়েছে।১ জৈন সম্প্রদায়ের প্রথম স্থানান্তরগমন ঘটে কলিঙ্গ দেশে যেখানকার রাজা খারবেল ওই ধর্মের অনুরাগী ছিলেন, এবং ভিক্ষু রাজা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কুমারী পর্বত বা খণ্ডগিরির জৈন গুহাগুলি তাঁর আমলের। তিনি পাভার নামক একটি মঠও তৈরি করেছিলেন। জৈনধর্মের দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল মথুরা যেখান থেকে অনেক লেখমালা, মূর্তি, প্রভৃতি পাওয়া গেছে যেগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের।২ তৃতীয় কেন্দ্র ছিল

১। কল্পসূত্র ১, ৫১-৫২।

২। J. Buhler, *On the Indian Sects of the Jains,* 1904, App. A.; V. A. Smith, *Jain Stupa and other Antiquities of Mathura,* 1901; J. Ph. Vogel, *Mathura Museum Catalogue,* 1910, 41-43, 66-82.

উজ্জয়িনী ও মালব অঞ্চল। কথিত আছে, অশোকের পৌত্র সম্প্রতি জৈনধর্মের অনুগামী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যিনি তাঁর পিতামহের অনুকরণে অন্ধ্র ও দ্রাবিড় দেশে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি লিপিতে, যা জুনাগড় থেকে প্রাপ্ত, ওই অঞ্চলে জৈনধর্মের বিকাশের সাক্ষ্য বহন করছে। দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের বিকাশের সঙ্গে ভদ্রবাহুর দক্ষিণ ভারত গমনের ঐতিহ্য সম্পর্কিত।

গুপ্তযুগের লেখমালায় জৈনধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় মূলত মথুরা, উদয়গিরি ও ককুভ অঞ্চলে। ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পাহাড়পুর তাম্রশাসনসমূহে[১] উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ পশ্চিমে তক্ষশিলা এবং পূর্বে বিপুলে জৈন সাধুদের দেখেছিলেন। কাথিয়াবাড় ও গুজরাতে জৈনধর্মের ব্যাপকতার সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। সপ্তম শতকে দুজন গুর্জর রাজা প্রথম জয়ভট এবং দ্বিতীয় দদ্দ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলনে। অনহিল্লপুরের চাপোৎকট বংশের প্রতিষ্ঠাতা বনরাজ জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন। মহীশূরের গঙ্গ রাজারা জৈন ছিলেন এবং সিংহনন্দী, বিজয়কীর্তি, পূজ্যপাদ প্রভৃতি জৈন শিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৈজয়ন্তী বা বনবাসীর কদম্ব রাজাদের লিপি থেকে জৈন রাজকর্মচারী ও জমিদারদের এবং তৎসহ যাপনীয়, কূর্চক, শ্বেতপট প্রভৃতি আঞ্চলিক জৈন সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাদামীর চালুক্যরাও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তামিল জীবকচিন্তামণি, শিলপ্প-দিকারম, নীলকেশী, যশোধর প্রভৃতি আদি কাব্যের উৎস জৈন। কাঞ্চীর পল্লব শাসকেরাও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জৈন আচার্য কুন্দকুন্দ, লেখক সমন্তভদ্র, সর্বনন্দী প্রভৃতি কাঞ্চীর বাসিন্দা ছিলেন। হিউয়েন সাঙ পাণ্ড্যদেশে জৈনদের অবস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। দক্ষিণের জৈন সমাজ মূলসংঘ নামে কথিত ছিল। ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরায় দ্রাবিড় সংঘ স্থাপিত হয়। মেঘনন্দী, জিনসেন, সিংহ ও দেব নামক চারজন আচার্য দক্ষিণে নন্দিগণ, সেনগণ, সিংহগণ এবং দেবগণ নামক চারটি জৈন উপসম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।

৭০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব ভারতে জৈনদের প্রভাব কমে আসে, কিন্তু পশ্চিম ভারতে তা বেশ দৃঢ় ছিল। গুর্জর-প্রতীহার রাজারা—যেমন বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট, ভোজ—জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরমারদের রাজসভায় ধনেশ্বর, ধনপাল, শান্তিসূরি প্রভৃতি জৈন আচার্যগণ সভাসদ ছিলেন। গঙ্গ রাজারা এবং তাঁদের সামন্তবর্গের অনেকেই জৈন ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষও খুব নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন। কর্ণাটক অঞ্চলে জৈনধর্মের জনপ্রিয়তার নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য লেখমালার উল্লেখ করা যেতে পারে। তামিলভূমিতে কিন্তু শৈব নায়নার ও বৈষ্ণব আড়বারদের সঙ্গে লড়াই-এ জৈনরা পরাজিত হয়। জৈনদের পিছনের জনসমর্থনের একটি বড় কারণ ছিল তাদের চতুর্মহাদান—আহার, অভয়, ভৈষজ্য ও শাস্ত্র। এরই অনুকরণ করে শৈব ও বৈষ্ণবরা, এবং রাজাদের অর্থানুকূল্য তাদের দিকে থাকায়, জৈনরা সেখানে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী যুগে গুজরাত-অঞ্চল জৈনদের দুর্গে পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে চৌলুক্য রাজগণের চেষ্টায়। রাজা সিদ্ধিরাজ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী কুমারপাল, যাঁর রাজত্বে বিখ্যাত জৈন তাত্ত্বিক হেমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল, জৈনধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। চেদির কলচুরি রাজারা এবং মালবের পরমার রাজারাও জৈনদের

১। *Epigraphia Indica* X. 61 ff.

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে আবুপাহাড় শত্রুঞ্জয় ও গির্ণারে জৈন শিল্পকলার চরম বিকাশ ঘটে। পশ্চিমী চালুক্য ও হোয়েসল রাজারাও জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন। পশ্চিমী চালুক্য রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় জয়সিংহ, প্রথম ও দ্বিতীয় সোমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য জৈনধর্মের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হোয়েসল বিষ্ণুবর্ধনের পত্নী জৈন সল্লেখনা পদ্ধতি অনুযায়ী দেহত্যাগ করেন। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের কর্ণাটকের সামন্ত রাজাদের অনেকেই জৈন ছিলেন। পরবর্তী কালে বীরশৈবদের সঙ্গে সংঘাতের দরুন কর্ণাটকে জৈনদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মুসলমান রাজাদের আমলে জৈনরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকত্ব হারিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জৈনধর্ম আজও টিঁকে আছে। ১৯৬০-এর দশকে এদেশে জৈনদের সংখ্যা ছিল ১,৬৫০,০০০। এর ৪০ ভাগ গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে, ২৫ ভাগ রাজস্থানে, ১৫ ভাগ উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে। বাকিটা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণে দিগম্বরপন্থীদের প্রাধান্য, উত্তরে শ্বেতাম্বরদের। দিগম্বররা পাঁচটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত—বীসপন্থী, তেরপন্থী, তারণপন্থী, গুমানপন্থী এবং তোতাপন্থী। শ্বেতাম্বরেরা তিনটিতে—মূর্তিপূজক, স্থানকবাসী এবং তেরপন্থী।

৭। মহাবীরের সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহ ও তাঁর মূল শিক্ষা

বুদ্ধের মত মহাবীরও মানবজীবনের দুঃখময় দিক্‌টাকেই বড় করে দেখেছেন। জৈন সূত্রগুলির উপর একবার চোখ বুলালেই দেখা যাবে যে তাঁর যুগের সামাজিক অবিচারের অভিজ্ঞতা মহাবীরকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। আয়ার (আচারাঙ্গ) গ্রন্থের সূত্রপাতই হয়েছে এই কথা বলে যে, "এই জীবিতের জগৎ সংক্লিষ্ট, দুঃখময়, যেখানে শিক্ষাদান দুঃসাধ্য, বিচারবুদ্ধিশূন্য। এই দুঃখময় জগতে অজ্ঞান ব্যক্তিরা বিভিন্ন কাজের দ্বারা দুঃখ ভোগ করছে ও দুঃখের সৃষ্টি করছে"।১ সম্পদ ও ক্ষমতার তৃষ্ণাপ্রসঙ্গে মহাবীর বলছেনঃ

যে এই সকল গুণ অধিকারের জন্য ব্যাকুল, সে বিরাট দুঃখের শিকার হয়, কেননা সে বিবেচনাহীন। (কারণ সে ভাবে) আমাকে আমার মায়ের জন্য, বাবার জন্য, বোনের জন্য, স্ত্রীর জন্য, পুত্রদের জন্য, পুত্রবধূদের জন্য, কন্যাদের জন্য, বন্ধুদের জন্য, নিকট ও দূরের আত্মীয়দের জন্য, পরিচিতদের জন্য, বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি, মুনাফা, খাদ্য ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করে যেতে হবে। এই সকল বস্তুর প্রত্যাশায় মানুষ বিবেচনাহীন হয়ে পড়ে, দিবারাত্র কষ্টভোগ করে, ঠিক ও বেঠিক সময়ে কাজ করে, ধন ও সম্পদ কামনা করে, আঘাতমূলক ও হিংস্র কার্যে লিপ্ত হয়, এবং এইসব ক্ষতিকর জিনিসের দিকেই মনকে পুনঃপুনঃ চালনা করে।২

ধনসংগ্রহের ফলাফল, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও ভূমিকা, কোন কিছুই মহাবীরের চোখ এড়ায়নি। তাই তিনি বলেছেন :

দ্বিপদ ও চতুষ্পদদের নিয়োগ করে, তিনরকম উপায়ে সম্পদ সৃষ্টি করে, ধনের অধিকারী হয়ে, পরিমাণে তা কমই হোক, আর বেশিই হোক, সে তা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা করবে। তারপর একসময় তার বহুমুখী সঞ্চয় বৃহৎ সম্পদে পরিণত হবে। তারপর একসময় তার উত্তরাধিকারীরা তা ভাগ করবে, অথবা যারা জীবিকা-

---

১। ১, ১, ২, ১। ২। ১, ২, ১, ১।

বিহীন তারা চুরি করবে, অথবা রাজা তা কেড়ে নেবে, অথবা তা কোন না কোন উপায়ে ধ্বংস হবে, অথবা তা গৃহে অগ্নিকাণ্ডের দরুণ বিনষ্ট হবে।

তারপর কিছুকাল পরে সে রোগাক্রান্ত হবে; যাদের সঙ্গে সে বাস করে তারা তার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে, সেও তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু তারা তোমাকে সাহায্য করতে পারে না বা রক্ষা করতে পারে না, তুমিও তাদের সাহায্য করতে বা রক্ষা করতে পার না।[১]

সুয়গড়ে আরও স্পষ্ট করে মোক্ষম কথাটি বলা হয়েছেঃ "যে, এমন কি ছোট সম্পত্তিও ভোগ করে, প্রাণযুক্ত বা প্রাণহীন বস্তুতে, অথবা অপরকে তা ভোগ করতে সম্মতি দেয়, সে কখনও ওই দুঃখ থেকে মুক্ত হবে না।"[২]

শ্রেণীসমাজের শীর্ষে যারা অবস্থান করছে সেই শাসকশ্রেণী কখনও কখনও তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পক্ষে জনগণের কল্যাণ, জাতীয় মর্যাদা প্রভৃতির দোহাই দেয়। উত্তরাধ্যয়ণ সূত্রে[৩] শক্র ও নমির কথোপকথনের মধ্যে শ্রেণীসমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির আদর্শসমূহ কিভাবে ধিক্কৃত হয়েছে দেখুনঃ

শক্রঃ প্রাচীর, ফটক ও ছিদ্রযুক্ত প্রাকার (যার ফাঁক দিয়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করা যাবে) নির্মাণ কর। পরিখা খনন কর। শতঘ্নী (যুদ্ধাস্ত্র) প্রস্তুত কর। তাহলেই তুমি ক্ষত্রিয় হবে।

নমিঃ বিশ্বাসকে তার দুর্গ করে, কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মসংযমকে অর্গল (দরজা) করে, ধৈর্য যার সুদৃঢ় দেওয়াল, এই তিন ভাবে যে রক্ষিত, তাকে ভেদ করা যায় না। আগ্রহকে তার ধনুতে পরিণত করে, যার ছিলা ভ্রমণে সতর্কতা, এবং যার অগ্রভাগ (যেখানে ছিলা পরানো হয়) সন্তোষ, সে সত্যের সঙ্গে (এই ধনুকে) যুক্ত করবে, কৃচ্ছ্রসাধনরূপ তীর দ্বারা সে (শত্রুর) বর্মস্বরূপ কর্মকে ভেদ করবে—(এইভাবেই) একজন সজ্জন যুদ্ধে বিজয়ী হবে, এবং সংসারক্র থেকে রেহাই পাবে।

শক্রঃ প্রাসাদ নির্মাণ কর, চমৎকার গৃহাদি, এবং (অস্ত্র ক্ষেপণের) গম্বুজ। তাহলেই তুমি ক্ষত্রিয় হবে।

নমিঃ যে পথের উপর তার বাড়ি তৈরী করে, সে অবশ্যই ঝঞ্ঝাটে পড়বে। যখনই সে যেতে চাইবে তখনই সেখানে তার বাসস্থান তুলে নেবার দরকার হবে।

শক্রঃ চোর-ডাকাত, গাঁটকাটা ও সিঁধেল চোরদের শাস্তি দিয়ে তুমি জন-নিরাপত্তার বিধান করতে পার। তাহলেই তুমি ক্ষত্রিয় হবে।

নমিঃ মানুষ প্রায়ই ভুল শাস্তি দেয়, নির্দোষ কারারুদ্ধ হয়, আর অপরাধী মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শক্রঃ হে রাজা, যেসব রাজারা তোমার অধীনতা স্বীকার করে না তাদের তুমি অধীন কর। তাহলেই তুমি ক্ষত্রিয় হবে।

নমিঃ কোন মানুষ হাজার হাজার দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিজয়লাভ হবে যদি সে নিজেকে জয় করতে পারে।...

শক্রঃ বড় বড় যজ্ঞ কর, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের ভোজন করাও, নিজে উপভোগ কর, তাহলেই তুমি ক্ষত্রিয় হবে।

১। ১, ২, ৪, ১। ২। ১, ১, ২। ৩। ৯, ১৮-৬২।

নমিঃ কোন মানুষ প্রতি মাসে হাজার হাজার গোদান করতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় যদি সে নিজেকে সংযত করে, যদিও সে ভিক্ষা না দেয়।...

শক্রঃ তোমার সোনা-রূপা, মণি-রত্ন, তাম্রসম্পদ, সুন্দর পরিচ্ছদাদি, গাড়ী-ঘোড়া, ধনসম্পদ বাড়াও। তাহলেই তুমি ক্ষত্রিয় হবে।

নমিঃ কৈলাসতুল্য বৃহৎ সোনারূপার যদি অগণ্য পাহাড় থাকে, তা-ও লোভী মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না, কারণ তার লালসা আকাশের মতই সীমাহীন।

৮। জৈন নীতিশাস্ত্রের সামাজিক ভিত্তি

বৌদ্ধ ও জৈন সংঘ মোটামুটি একই উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি হারিয়ে যাওয়া বাস্তবের কাল্পনিক বিকল্প হিসাবে, যে বিষয়টা নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। জৈন সংঘেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান নেই। পার্শ্ব অপরিগ্রহের কথা বলেছিলেন মহাবীরের মতে শুধু সম্পত্তিই নয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিটি বস্তু থেকেই আসক্তিমুক্ত হতে হবে।[১]

আমি শ্রমণ হবঁ যার কোন বাড়ি থাকবে না, কোন সম্পত্তি থাকবে না, কোন সন্তান থাকবে না, কোন পশু সম্পদ থাকবে না।...প্রভু, যা আমাকে দেওয়া হয়নি তা আমি নিতে অস্বীকার করব।...

আমি সকল জীবকে হত্যা করা থেকে নিরস্ত হব, সূক্ষ্ম বা স্থূল, চলমান বা অচল, যাই হোক না কেন। আমি যতদিন বাঁচব, আমি স্বীকার করব এবং কুফলের দায়িত্ব নেব, অনুতাপ করব, নিজেকে এইসব পাপ থেকে মুক্ত করব, তিনবার তিন রকমে (ক্রিয়া দ্বারা, আদর্শের দ্বারা অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে) মনে, দেহে এবং বাক্যে।

আমি মিথ্যাভাষণজনিত, ক্রোধ বা লোভ বা ভয় বা আনন্দ থেকে উদ্ভূত, সমস্ত পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখব। আমি নিজে কখনও মিথ্যা বলব না কাউকে তা বলাবার কারণ হব না বা মিথ্যা ভাষণে সম্মতি দেব না। আমি যতদিন বাঁচব, আমি স্বীকার করব, ইত্যাদি...।

যা আমাকে প্রদত্ত নয়, গ্রামে অথবা নগরে অথবা বনে, কম অথবা বেশি, ছোট অথবা বড়, জীবনযুক্ত বা জীবনহীন, কোন কিছুই আমি গ্রহণ করব না। যা প্রদত্ত নয়, তা আমি নিজে নেব না, কাউকে নেওয়াবার কারণ হব না, কারো গ্রহণে সম্মতি দেব না। আমি যতদিন বাঁচব, আমি স্বীকার করব, ইত্যাদি...।

আমি সকল রকম ইন্দ্রিয়সুখ থেকে, দেবতা, মানুষ, পশু যার সম্পর্কেই হোক না কেন, বিরত থাকব। আমি নিজে তাতে লিপ্ত হব না, ইত্যাদি...।

আমি সকল আসক্তি, বেশি অথবা কম, ছোট অথবা বড়, জীবিত বা জীবনহীনের প্রতি, থেকে বিরত থাকব। আমি নিজেকে সকল আসক্তি থেকে দূরে রাখব, অপরকে আসক্ত করার কারণ হব না, ইত্যাদি...।[২]

১। আয়ার ২, ১৫, ৫।

২। আয়ার ২, ৭, ১, ১; ২, ১৫, ১, ৫।

এই হচ্ছে মহাবীর কথিত পঞ্চব্রত—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। গৃহত্যাগীদের এগুলি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতে হবে। গৃহীদের জন্যও মহাবীর এই পঞ্চব্রত নির্দিষ্ট করেছেন, কিন্তু সেগুলির তাৎপর্য ভিন্ন, কেননা সন্ন্যাসীর পক্ষে যা সম্ভব তা গৃহীর পক্ষে নয়। তত্ত্বের দিক থেকে তাদের উপরি-উক্ত পাঁচটি মহাব্রত মনে রাখতে হবে, কিন্তু আচরণের দিক থেকে অহিংসা বলতে বোঝাবে কৃষি এবং ব্যবসায়ে ব্যবহৃত পশুদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করা, তাদের প্রহার না করা, তাদের উপর বেশি বোঝা না চাপানো প্রভৃতি; সত্য বলতে বোঝাবে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ না আনা, কাউকে মিথ্যা শাস্তি না দেওয়া, জাল-জোচ্চুরি না করা; অস্তেয় বলতে বোঝাবে চোরাই মাল না রাখা, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে চৌর্য, অবৈধ উপায়, মিথ্যা ওজন ও মাপ, ভেজাল দেওয়া প্রভৃতি থেকে বিরতি; ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় পরস্ত্রীগমন, ব্যভিচার, অবৈধ যৌনসংসর্গ প্রভৃতি থেকে বিরতি এবং অপরিগ্রহ বলতে বোঝায় সোনা-রুপা, পশু-সম্পদ, জায়গা-জমি প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারগুলির ক্ষেত্রে লোভের দ্বারা চালিত না হওয়া।১

গৃহী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পঞ্চ মহাব্রতের এই আচরণগত ব্যাখ্যার সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি শুধু মহাবীরের যুগের ক্ষেত্রেই নয়, আজকের দিনের ক্ষেত্রেও সত্য। শ্রেণী সমাজের নিম্নলিখিত কুফলগুলিকে মহাবীর পাপ আখ্যা দিয়েছেন যেগুলি হল হিংসা, অসত্য, অদত্তদান (চৌর্য) অব্রহ্মচর্য, পরিগ্রহ (আসক্তি), ক্রোধ, মান (অহংবোধ), মায়া (ভণ্ডামি), লোভ, রাগ (ব্যক্তিগত আসক্তি), দ্বেষ, ক্লেশ (বিবাদ-পরায়ণতা), অভ্যাখ্যান (বদনাম করা), পৈশুন্য (পরচর্চা), পরপরিবাদ (অপরের বিষয়ে মন্দ আচরণ করা), রতি-অরতি (যৌনতা), মায়ামৃষ (ভালত্বের আড়ালে পাপ করা) ও মিথ্যাদর্শনশল্য (অসত্যকে সত্য আখ্যা দেওয়া)। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মহাবীর যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হচ্ছে মূলত নৈতিক, যা তাঁর নিজের যুগের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত। জৈন কর্মবাদেরও উদ্ভব এই নৈতিক প্রেরণা থেকে, যা আমরা পরে দেখব।

৯। জৈন নিরীশ্বরবাদ

জৈনরা বিভিন্ন ধরনের দেবতার পূজা করে থাকেন, কিন্তু এই দেবতারা কয়েকটি গুণের প্রতীক মাত্র, কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী নন, তাঁদের কাছ থেকে কিছু নেবার নেই। তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর অধীন, পুণ্যের ক্ষয় হলেই তাঁদের পতন হবে। মানুষের পক্ষেও জন্মান্তরে দেবতা হওয়া সম্ভব, দেবতার পক্ষেও জন্মান্তরে নরকের কীট হওয়া সম্ভব। মানুষের মতই তাঁরা দেহের আবরণযুক্ত আত্মা, তফাৎ শুধু মাত্রার, বস্তুতে নয়।

জৈনধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বরের ধারণাকে জৈন দার্শনিকরা মর্মান্তিকভাবে খণ্ডন করেছেন। স্যাদবাদমঞ্জরী, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা তর্করহস্যদীপিকা প্রভৃতিতে জৈন ঈশ্বরখণ্ডনের যুক্তিগুলি পাওয়া যায়।

১। উবাসগদসাও ১৩ই, ৪৫ই; ঠান ২৯০, সমবায় ১০। এগুলি ছাড়া কয়েকটি অনুব্রত, গুণব্রত ও শিক্ষাব্রতও পালনীয়।

ঈশ্বরখণ্ডনের ব্যাপারে জৈনদের লক্ষ্য ছিলেন ন্যায় বৈশেষিকেরা যাঁরা যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ন্যায় বৈশেষিকদের যুক্তি ছিল নিম্নরূপঃ জগতের সকল যৌগিক বস্তু পরমাণুসমূহের সংযোগে গঠিত। সেগুলির অবশ্যই একটি কারণ আছে, কেননা তারা কার্যের প্রকৃতিসম্পন্ন, একটি পাত্রের মতই, যা অংশসমূহের সমবায়ে নির্মিত এবং যার সীমাবদ্ধ একটি আকার আছে। এই জন্যই একজন বুদ্ধিমান কর্তার প্রয়োজন যাঁর নির্দেশ ব্যতিরেকে বস্তুসমূহ সেই শৃঙ্খলা, সেই নির্দিষ্টতা এবং সেই সমন্বয় পেতে পারে না যা তাদের নির্দিষ্ট কার্য বা ফলস্বরূপ উৎপাদিত হতে সাহায্য করবে। এই নিমিত্তকারণ বা বুদ্ধিমান কর্তাকে (যেমন কুম্ভকার) উপাদান কারণসমূহ (যেমন মৃত্তিকা) সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, সেগুলিকে সংযুক্ত এবং বিভিন্ন আকারে পুনর্গঠিত করার ইচ্ছা তাঁর থাকতে হবে, এবং ওই কাজটা করার মত শক্তি তাঁর থাকতে হবে। কাজেই তাঁকে সর্বজ্ঞ হতে হবে, কেননা একমাত্র সর্বজ্ঞই যিনি হবেন তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব। ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে তাই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। অনুমানটি নিম্বরূপঃ পৃথিবী ইত্যাদির কারণ একজন বুদ্ধিমান্ কর্তা, কেননা এইগুলি কার্য বা ফলের প্রকৃতি সম্পন্ন, যেমন একটি পাত্র।

জৈন তার্কিক গুণরত্ন১ দেখিয়েছেন 'বুদ্ধিমান কারক' ও 'কার্যের প্রকৃতি সম্পন্নতার' মধ্যে কোন ব্যাপ্তি বা সাধারণ সহগামিতা নেই, এবং যুক্তির রীতি অনুযায়ী তা স্থাপন করা অসম্ভব। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা থেকে পাত্রের সৃষ্টি করে তেমনই ঈশ্বর পরমাণুসমূহকে সংযুক্ত করে বস্তুজগৎ সৃষ্টি করেন,- ন্যায় বৈশেষিকদের এই ধারণাকে মানতে গেলে, ঈশ্বরও প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়ান একজন কুম্ভকার। কুম্ভকার স্বয়ং মৃত্তিকার সৃষ্টি করে না, তাকে প্রদত্ত উপাদান নিয়েই কাজ করতে হয়। ঈশ্বরও প্রদত্ত পরমাণুসমূহ নিয়ে কাজ করেন। কুম্ভকারকে তার উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, পাত্র তৈরীর ইচ্ছা এবং তৈরী করার ক্ষমতা তার থাকা চাই, এবং ওই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্ষমতার জন্য তাকে দেহবিশিষ্ট হতে হবে। ওই তিনটি গুণ যখন ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বর্তেছে তাঁকেও দেহ সম্পন্ন হতে হবে, কেননা দেহসীমার বাইরে ওই তিনটি গুণ স্বয়ং ক্রিয়াশীল নয়, কুম্ভকারের ক্ষেত্রে যা প্রমাণিত। অর্থাৎ এই ঈশ্বর হচ্ছেন বন্ধনের অধীনে কর্তা, একান্তই যাঁর হাত-পা বাঁধা! জগৎ যদি কার্য হয়, এই ঈশ্বরও কার্য, যাঁর কারক বর্তমান। অন্য ভাবে, জগৎ কার্য হলে তার কারণ থাকতে বাধা নেই, কিন্তু তা কোন বুদ্ধিমান কারক বা ঈশ্বরকে সূচিত করে না কেন না 'নিছক কার্য হওয়া' এবং তার কোন 'বুদ্ধিমান কারক থাকার' মধ্যে কোন অনিবার্য সাধারণ ব্যাপ্তি বা সহগামিতা নেই। জগতের কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এগিয়ে দেওয়া যে কোন হেতুরূপই ভ্রান্ত হবে কেননা সহযোগী উদাহরণটি (কুম্ভকার) সর্বদাই দেহবিশিষ্ট ও অ-সর্বজ্ঞ কারণের দিকে নির্দেশ করবে। এছাড়া, জগতের কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অনুমানের পক্ষে যে কোন যুক্তিই প্রকরণ-সম বা সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে দুষ্ট হবে, কেননা সেখানে সর্বদাই ওই অনুমানের বিরোধী অনুমান খাড়া করা

১। তর্করহস্যদীপিকা ১১৫ই। D. P. Chattopadhyaya, *Indian Atheism*, 1970, 167-201 ; N. N. Bhattacharyya, *Jain Philosophy in Historical Outline*, 1976, 93-108.

যাবে। যেমন, ঈশ্বর অনন্ত নন কেননা তিনি দেহবিশিষ্ট, তাঁর জ্ঞান অনন্ত নয়, কেননা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা খণ্ডিত; তিনি সর্বজ্ঞ নন কেননা বস্তুজগতের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সর্বজ্ঞতার কোন ব্যাপ্তি বা সাধারণ সমগামিতা নেই।

গুণরত্নের মতে ন্যায় বৈশেষিকদের যুক্তি মানতে হলে এও মানতে হয় যে ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্ষমতা কার্য বা ফল। তবে কি এগুলিরও কোন বুদ্ধিমান কারক আছে, পাত্রের মত? যদি বলা যায় ঈশ্বর নিজেই তাঁর জ্ঞান ইত্যাদির নিমিত্তকারণ, তাহলে এই অনুমানের হেতুরূপটি সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাসে দুষ্ট হয়ে পড়ে। এই দোষকে এড়াতে গিয়ে যদি বলা হয় জ্ঞান ইত্যাদির কারক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কেউ, তাহলে শেষোক্তের জন্য অনন্ত বুদ্ধিমান কারকের প্রয়োজন হবে। বন্য উদ্ভিদাদির ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলি কার্য বা ফল হওয়া সত্ত্বেও কোন বুদ্ধিমান কারক বিহীন, যা প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণিত। এই ক্ষেত্রে যদি এমন যুক্তি দেওয়া যায় যে ঈশ্বর যখন প্রকৃতিগত ভাবেই প্রত্যক্ষের অতীত, তাঁকে বন্য বৃক্ষাদির কারক রূপে দেখার প্রশ্ন ওঠেনা, তাহলে ঈশ্বরের এই তথাকথিত অপ্রত্যক্ষতা প্রমাণ করা দরকার, যা সম্ভব নয়। যে অনুমান দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে তা তাঁর অপ্রত্যক্ষতা প্রমাণ করে না। দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে একই অনুমানের প্রয়োগ চক্রদোষ হেত্বাভাসে দুষ্ট হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে অন্য কোন অনুমানের দ্বারা যদি তাঁর অপ্রত্যক্ষতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়, তা সম্ভব নয় কেননা তাঁর অপ্রত্যক্ষতার যে কোন প্রমাণই তাঁর দৈহিক অস্তিত্বের সূচনা করবে। যদি তর্কচ্ছলে মেনেও নেওয়া যায় ঈশ্বর বাস্তবিকই অপ্রত্যক্ষ, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে তিনি অপ্রত্যক্ষ কেন, যায় কোন উত্তরই যুক্তিসঙ্গত হবে না।

গুণরত্নের মতে এমন কোন বোধগম্য ব্যাখ্যা নেই যা ঈশ্বরের জগৎকারকত্ব প্রমাণ করবে। যদি বলা যায় ঈশ্বর তাঁর নিছক অস্তিত্বের দ্বারাই জগৎ সৃষ্টির কারণ হন, এ যুক্তি দাঁড়ায় না। ঈশ্বর যদি তাঁর জ্ঞানের জন্যই জগৎ-কারক হন, তাহলে যোগীরাও তা হতে পারেন, কেননা তাঁরা জ্ঞানী। যদি তিনি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্ষমতার বলে জগৎ-কারক হন তাহলে ওইগুলির আধার হিসাবে তাঁর একটি দেহের প্রয়োজন। এর পরেও তাঁর উদ্দেশ্যের প্রশ্ন আছে। যদি তিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে জগৎ-সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর একটি অভাব বোধ আছে, যা তাঁর পূর্ণত্বের ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই ঈশ্বর বলে কোন কিছু যুক্তিসঙ্গত ভাবে থাকতে পারে না, এবং এই জগৎ কখনোই সৃষ্ট হয়নি, কেউ তা সৃষ্টি করেনি। জগতের কোন শুরুও নেই কোন শেষও নেই, এবং সেই কারণেই স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের ধারণা অপ্রয়োজনীয়। জৈন নিরীশ্বরবাদের এটাই হচ্ছে মূল কথা।

১০। জৈন ন্যায়শাস্ত্র

যদিও সূচনায় জৈনধর্ম ছিল নিছকই একটি নীতিমূলক ধর্ম, পরবর্তীকালে অপরাপর বিরোধী-ধর্মমতের সঙ্গে তাকে লড়তে হয়েছে, এবং নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষ ধরনের যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে, এবং এই প্রয়োজনে একটি বিশেষ ধরনের ন্যায়শাস্ত্র জৈনদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। জৈন ন্যায়শাস্ত্রের সূচনা করেন ভদ্রবাহু, যিনি তাঁর দশবেয়ালিয় ও সূয়গড়ের ভাষ্যে দশাবয়ব ন্যায় এবং স্যাদ্‌বাদের ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং উমাস্বাতি বা উমাস্বামী যিনি তাঁর

বিখ্যাত তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে১ প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম পূর্ণাঙ্গ জৈন ন্যায়শাস্ত্রের যিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি হচ্ছেন ষষ্ঠ শতকের ন্যায়াবতার২ গ্রন্থের লেখক সিদ্ধসেন দিবাকর। পরবর্তী জৈন নৈয়ায়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সিদ্ধসেন গণি, সমন্তভদ্র, অকলঙ্ক, মাণিক্যনন্দী, বিদ্যানন্দ, প্রভাতচন্দ্র, বৎসনন্দী, মল্লবাদী, অমৃতচন্দ্র সূরি, অভয়দেব সূরি, দেবসেন ভট্টারক, লঘুসমন্ত-ভদ্র, কল্যাণচন্দ্র, অনন্তবীর্য, দেবসূরি, চন্দ্রপ্রভ সূরি, হরিভদ্র সূরি, পার্শ্বদেবগণি শ্রীচন্দ্র, দেবভদ্র, চন্দ্রসেন, রত্নপ্রভ, তিলকাচার্য, মল্লিসেন, রাজশেখর, জ্ঞানচন্দ্র, গুণরত্ন, শ্রুতসাগর, ধর্মভূষণ, বিনয়বিজয়, যশোবিজয় প্রভৃতি।৩

জৈন ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান দুভাগে বিভক্ত—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। ভারতীয় ন্যায়-শাস্ত্রের ধারার সঙ্গে এই জৈন বিভাগ সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও আদি জৈন লেখকেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তার উল্টো বুঝতেন, কিন্তু পরবর্তী জৈন নৈয়ায়িকেরা পূর্বেকার মত বদলে ভারতীয় অন্যান্য নৈয়ায়িকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের ব্যাপারে একমত হয়ে যান। ব্যাপারটাকে একটু পরিষ্কার করে বলা যাক্।

জৈনরা পাঁচ ধরনের জ্ঞানকে স্বীকার করে—(১) মতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান; (২) শ্রুতি অর্থাৎ যে জ্ঞান শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশ থেকে পাওয়া যায়; (৩) অবধি অর্থাৎ যে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি থেকে লব্ধ; (৪) মনঃ পর্যায় অর্থাৎ যে জ্ঞান ভাবধারার যোগাযোগের দ্বারা লব্ধ; এবং (৫) কেবল অর্থাৎ পরম জ্ঞান যা মানুষকে মোক্ষ প্রদান করে। আদি জৈন লেখকেরা, যাঁদের কাছে যুক্তির চেয়ে ধর্মীয় উপলব্ধিটা অনেকটা বড় জিনিস, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবলকে বলতেন প্রত্যক্ষ এবং মতি ও শ্রুতিকে বলতেন পরোক্ষ। পরবর্তীকালে যখন জৈন ধর্মকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হল, তখন দেখা গেল যে পুরাতন বিভাগে অসুবিধা হচ্ছে, কেননা অপর সকল ভারতীয় দর্শন ইন্দ্রিয়োপলব্ধ জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে মানে। তাদের সঙ্গে সমতা রাখতে না পারলে কার্যক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। জৈন নৈয়ায়িকেরা এই কাজটা সম্পাদন করলেন এইভাবেঃ তাঁরা জ্ঞানকে প্রথম দুটি মোটামুটি ভাগে ভাগ করলেন পরমার্থিক এবং ব্যবহারিক। কেবল প্রভৃতি সাধারণ বুদ্ধির অতীত যে জ্ঞান তা হল পরমার্থিক, আর বাকি সব হল ব্যবহারিক যেখানে ইন্দ্রিয়োপলব্ধ জ্ঞানকে বলা হল প্রত্যক্ষ।

প্রমাণ বলতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতই জৈনরা বোঝেন বৈধজ্ঞানের উপায়, যা দুভাগে বিভক্ত—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এখানে পরোক্ষের মধ্যে আছে অনুমান, উপমান, আগম (শাস্ত্র বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্যের প্রামাণ্য), অর্থাপত্তি (প্রাক্-প্রত্যয়), সম্ভব (সম্ভাবনা) এবং অভাব (অনস্তিত্ব)। অনুমান বলতে জৈনদের ধারণা অপরাপর সম্প্রদায়ের থেকে মূলত পৃথক নয়। অনুমান দু ধরনের, স্বার্থ ও পরার্থ। উপর্যুপরি প্রত্যক্ষের দ্বারা যে সাধারণ ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্মায় তা স্বার্থ, এবং সেটির যখন প্রতিবেদন করা হয় তখন তা পরার্থ। অনুমানের ক্ষেত্রে middle term বা হেতুর সর্বাধিক গুরুত্ব জৈনরাও স্বীকার করেন। আদিতে জৈন তার্কিকরা অনুমানের দশটি অঙ্গে বিশ্বাস করতেন (দশাবয়ব বাক্য), যথা প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা-বিভক্তি

১। Eng. tr. J. Jaini, 1920.

২। Ed. and Eng. tr. S. C. Vidyabhusana, 1904.

৩। S. C. Vidyabhusana, *History of Indian Logic*, 1901, 172-220.

(অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা বা প্রমেয় বাক্যটির সীমাবদ্ধতা), হেতু (যুক্তি), হেতু-বিভক্তি (যুক্তির সীমাবদ্ধতা), বিপক্ষ (বিরোধী প্রতিজ্ঞা), বিপক্ষ প্রতিষেধ (বিরোধ প্রতিজ্ঞার বিরোধিতা), দৃষ্টান্ত (উদাহরণ), আশংকা (উদাহরণের যাথার্থ্য), আশংকা-প্রতিষেধ (প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া) এবং নিগমন (সিদ্ধান্ত)। পরবর্তীকালে জৈন তার্কিকরা ন্যায়-বৈশেষিকদের পাঁচটি অবয়ব মেনে নেন যেগুলি হচ্ছে প্রতিজ্ঞা (দেবদত্ত মরণশীল), হেতু (কারণ সে মানুষ), উদাহরণ (যেমন রাম শ্যাম প্রভৃতি মানুষ সকলেই মরণশীল), উপনয় (দেবদত্ত যেহেতু মানুষ), এবং নিগমন (অতএব দেবদত্ত মরণশীল)। নিগমন বা সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে minor term বা পক্ষ এবং বিধেয় হচ্ছে major term বা সাধ্য। হেতু বা middle term সিদ্ধান্ত বা নিগমনে অনুপস্থিত থেকে গোটা অনুমানটিরই সঞ্চালক হয়। যদি এই বাক্যটি নেওয়া যায়ঃ পাহাড়টি (পক্ষ, minor term) অগ্নিযুক্ত (সাধ্য, major term), কারণ ইহা ধূম্রযুক্ত (হেতু, middle term), ধূম্র নামক হেতুটিই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জৈন তার্কিকেরা এই হেতুকে দুভাগে বিভক্ত করেন যা প্রত্যক্ষের এলাকাভুক্ত (উপলব্ধি) এবং যা প্রত্যক্ষের এলাকা-বহির্ভূত (অনুপলব্ধি)। প্রতিটির আবার ধনাত্মক (বিধি) ও ঋণাত্মক (প্রতিষেধ) দুটি দিক্ ঠিক আছে। হেতু থেকে উদ্ভূত দোষ হেত্বাভাস, যা তিন প্রকারঃ অসিদ্ধ (যা প্রমাণিত নয়), যেমন ইহা সুগন্ধযুক্ত কারণ ইহা আকাশকুসুম (এখানে হেতু আকাশকুসুম অপ্রমাণিত); বিরুদ্ধ, যেমন ইহা অগ্নিযুক্ত কারণ ইহা জলীয় (এখানে যা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে হেতুটি তার বিরোধী); এবং অনৈকান্তিক (অনিশ্চিত), যেমন শব্দ চিরন্তন, কারণ ইহা সর্বদা শ্রবণযোগ্য (এখানে হেতু অনিশ্চিত, কেননা শ্রবণযোগ্যতা চিরন্তনতার প্রমাণ হতেও পারে, নাও পারে)।

কিন্তু জৈন ন্যায়ের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। তা হচ্ছে প্রতিজ্ঞা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। এখানে জৈনেরা যে কথাটি বলেন তা হচ্ছে 'দৃষ্টিভঙ্গী'। জ্ঞান নিরালম্ব নয়, সর্বদাই আপেক্ষিক। এই কারণের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ওঠে, জৈন পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'নয়', যা সাত ধরনের। এখানে জৈনেরা দুটি বিশেষ বক্তব্যের দ্বারা চালিত। যেহেতু জ্ঞান নিরালম্ব নয়, আপেক্ষিক, কোন প্রতিজ্ঞাকে সোজাসুজি ব্যক্ত করা চলে না, কেননা প্রতিটি প্রতিজ্ঞাই ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা যুক্ত। এই কারণেই যে-কোন প্রতিজ্ঞাই ব্যক্ত করার আগে একটি সম্ভাবনাসূচক শব্দ বা স্যাদ্ ব্যবহার করতে হবে। স্যাদ অর্থ 'হতে পারে'। অর্থাৎ এখানে 'রাম বিদ্বান' বলা চলবে না, বলতে হবে 'হতে পারে, রাম বিদ্বান'। এই হচ্ছে জৈন স্যাদবাদ বা সম্ভাবনাবাদ। দ্বিতীয়ত সত্য একটা এমনই বস্তু, যেখানে কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে তার উপস্থাপন ভ্রমাত্মক হয়ে যায়। কাজেই তার উপস্থাপন করতে হবে বহু ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে। একে বলে অনেকান্তবাদ। স্যাদ্বাদ এবং অনেকান্তবাদ একত্রে 'সপ্তভঙ্গী নয়' নামে পরিচিত।

ভদ্রবাহু[১] এই সপ্তভঙ্গী-নয়কে নিম্নরূপে দাঁড় করিয়েছেনঃ (১) স্যাদ্-অস্তি (হতে পারে, এটা আছে), (২) স্যাদ্-নাস্তি (হতে পারে, এটা নেই), (৩) স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি (হতে পারে, এটা আছে এবং এটা নেই), (৪) স্যাদ্ অবক্তব্য (হতে পারে, এটা বর্ণনার উপযোগী নয়), (৫) স্যাদ্-অস্তি-অবক্তব্য (হতে পারে, এটা আছে, কিন্তু এটা বর্ণনার উপযোগী নয়), (৬) স্যাদ্-নাস্তি অবক্তব্য (হতে পারে,

১। সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তি ১, ১২।

এটা নেই, কিন্তু এটা বর্ণনার উপযোগী নয়) এবং (৭) স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি-অবক্তব্য (হতে পারে, এটা আছে এবং এটা নেই, এবং এটা বর্ণনার অযোগ্যও বটে)। সমন্তভদ্র তাঁর আপ্তমীমাংসা গ্রন্থে বিষয়টিকে এইভাবে বুঝিয়েছেন: স্যাদ্-অস্তি বলতে ভাব বা অস্তিত্ব বোঝায়। স্যাদ্-নাস্তি বলতে অভাব বা অনস্তিত্ব বোঝায়। ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব, এই দুটি ধারণা আপেক্ষিক, যেমন এক ডেলা কাদা যে মুহূর্তে কলসে রূপান্তরিত হচ্ছে তখনই তা অনস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে। এখানে কলস কাদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাগ্ভাব বা পূর্বগামী অনস্তিত্ব, আবার কাদা কলসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধংসাভাব বা অনুগামী অনস্তিত্ব। এই কারণে যদি নিছক অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয় এবং অনস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়, অথবা যদি নিছক অনস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় এবং অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়, তাহলে কোন কিছুকেই স্বীকার বা অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আবার যদি দুটি দিক্‌কেই একসঙ্গে স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ যদি অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে কোন বস্তুতে আরোপ করা হয় তাহলেই তা অবক্তব্য বা অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি ঘরে একটি কৃষ্ণবর্ণ মাটির কলস দেখে শর্তহীনভাবে একথা বলা যায় না যে 'কলসটি আছে' বরং বলা যেতে পারে 'হয়ত কলসটি আছে', যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এই বাক্যটি কেবল স্থান, কাল, গুণ, প্রভৃতির শর্তাধীনেই সত্য, যে শর্তাধীনে কলসটি রয়েছে, এবং যা আমাদের এই ভুল বোঝার সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখে যে কলসটি সর্বসময়ে এবং সর্বত্র আছে। যখন আমরা বলি 'হতে পারে কলসটি লাল রং-এর', তার কৃষ্ণত্ব বা রক্তিমত্ব স্বভাবতই শর্তাধীন, হয়ত দিনের বেলায় দেখলে তা লাল, রাত্রে লাল নয়, এক অর্থে তা অস্তি অপর অর্থে তা নাস্তি। যখন এই অস্তি নাস্তি উভয়ই একটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় বস্তুটির প্রকৃতি অবক্তব্য বা অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে। একটি কলস না-পোড়ানো অবস্থায় কালো, পোড়ানো অবস্থায় লাল। কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করে সর্বদা এবং সকল শর্তাধীনে কলসটির রং কি, এর একমাত্র উত্তর হবে তা অবর্ণনীয়। এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাকীগুলিরও উদ্ভব হয়েছে। স্থান, কাল, রং, আকার, উপাদান ইত্যাদির দৃষ্টিকোণে কলসের অবর্ণনীয় অস্তিত্ব স্বীকার, অস্বীকার এবং একই সঙ্গে স্বীকার ও অস্বীকার দুইই করা যায়। একটি কলস অস্তিত্ববান, কিন্তু রং ও আকারের দিক থেকে তা অবর্ণনীয় হতে পারে যদি তা দূর থেকে দেখা যায়। কলসটি অনস্তিত্ববান এবং অবর্ণনীয় হতে পারে যদি তা অন্ধকারে দেখা যায়। এটি একই সঙ্গে অস্তিত্ববান, অনস্তিত্ববান এবং অবর্ণনীয় হতে পারে যদি কারো দৃষ্টিভঙ্গী, দেখার ক্ষমতা, দূরত্ব, আলো অথবা অন্ধকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এর অর্থ কিন্তু এই নয় বস্তুর অস্তিত্ব সেই সম্পর্কে ব্যক্তি বা দ্রষ্টার কল্পিত ধারণা বা মনোভাবের উপর নির্ভরশীল, আসলে তা বস্তুটির বিভিন্ন সত্য ও বাস্তব দিক্‌গুলিকেই ব্যক্ত করে। এটা বিচারশীল মনের ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়, সত্যের বহুমুখিতা এবং আপেক্ষিক চরিত্রকে প্রকাশ করাই জৈন স্যাদবাদের মূল কথা।১

১। N. N. Bhattacharyya, *Jain Philosophy*, 108-119.

১১। দ্রব্য, গুণ ও পর্যায়

জৈনমতে প্রতিটি বস্তুরই অনন্ত চরিত্র আছে, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক (অনন্ত-ধর্মকং বস্তু)। অভাবাত্মক দিক্‌গুলিরই সংখ্যা বেশি। যদি কোন বস্তুকে তার ভাবাত্মক দিক্‌গুলির উপস্থিতি এবং অভাবাত্মক দিক্‌গুলির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায় তাহলে বস্তুটি কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট একথা আর বলা যায় না, যদিও লোকে তা ভুল করে বলে। কার্যত একটি বস্তু অনন্ত ধর্ম বা চরিত্রের অধিকারী। এছাড়া, যদি সময়কে হিসাবের মধ্যে গণ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু নূতন নূতন ধর্ম বা চরিত্র অর্জন করে।

তাহলে বস্তুর ধর্ম বা চরিত্র অনেক। এই ধর্মসমূহ এবং যা এই ধর্মসমূহকে ধরে রাখে (ধর্মী), উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোক্তটি, অর্থাৎ যা ধর্মসমূহ বা চরিত্রসমূহকে ধরে রাখে, তা দ্রব্য নামে পরিচিত। জৈন মতে প্রতিটি দ্রব্যের দু-রকম ধর্ম বর্তমান, নিত্য এবং পরিবর্তনশীল। প্রথমটিকে বলা হয় গুণ, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় পর্যায়। তাহলে দ্রব্য বলতে আমরা জৈন মতে তাকেই বুঝব যার গুণ ও পর্যায় বর্তমান (গুণ-পর্যায়বদ্‌ দ্রব্যম্‌)।

বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য দিয়েই জগৎ তৈরী। জৈন মতে এই দ্রব্যগুলির যা গুণ বা নিত্যধর্ম তা অপরিবর্তনীয়, এবং সেই হিসাবে জগৎ চিরন্তন, এবং এই দ্রব্য-গুলির যা পর্যায় তা পরিবর্তনশীল। এই কারণে জগৎ চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তনশীল। জৈনদের মতে বৌদ্ধরা ভ্রান্ত, কেননা তারা মনে করে জগতে কোন কিছুই চিরন্তন নয়, সবই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে (ক্ষণিকবাদ)। বেদান্ত-বাদীরাও ভ্রান্ত, কেননা তারা মনে করে পরিবর্তন মিথ্যা, সত্য হচ্ছে নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। বাস্তবকে একদিক থেকে দেখার (একান্তবাদ) অসুবিধা এখানে। কিন্তু যারা বহুদিক থেকে দেখে (অনেকান্তবাদ) সেই জৈনদের মতে পরিবর্তনশীলতা ও চিরন্তনতা দুই-ই সত্য। একটি দ্রব্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য—উৎপত্তি, স্থায়িত্ব এবং ধ্বংস (উৎপাদ-ব্যয়-ধ্রৌব্যযুক্তম্‌ সৎ)। স্থায়িত্ব বা ধ্রুবতা একটি দ্রব্যের গুণ, উৎপত্তি ও ধ্বংস তার বিভিন্ন পর্যায়।

জৈনমতে দ্রব্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। মূল দুটি শ্রেণী কায়বিশিষ্ট (অস্তিকায়) এবং কায়হীন (অনস্তিকায়)। সকল দ্রব্যই অস্তিকায়, একমাত্র সময় বা কালই অনস্তিকায়। অস্তিকায় দ্রব্যসমূহ দু' ভাগে বিভক্ত—জীব ও অজীব। জীবের দুই ভাগ এবং সেগুলি কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত। অজীব বলতে বোঝায় ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল। পর পৃষ্ঠার ছকটিতে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।
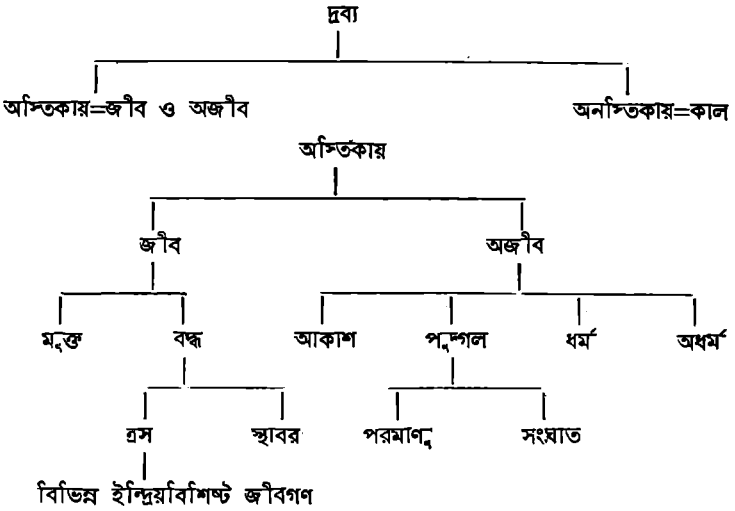
১২। জীব ও অজীব

জীব বলতে বোঝায় সচেতন দ্রব্য, তা সচল এবং অচল দুই-ই হতে পারে (চেতনা-লক্ষণো জীবঃ)। পরবর্তী কালে অবশ্য চৈতন্য বলতে আত্মাকে বুঝিয়েছে এবং তার সঙ্গে কর্মফল-তত্ত্ব যুক্ত হয়েছে, যদিও আদিতে দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ এবং জীব-অজীবের ভেদাভেদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ছিল যার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে।[১] সর্বনিম্ন পর্যায়ের জীব হচ্ছে মাটি, জল প্রভৃতির প্রাণবস্তু উপাদানসমূহ যে স্তরে প্রাণ-অর্থে চেতনা আছে, কিন্তু পরবর্তীকালের-আত্মা-অর্থে কোন চেতনা নেই। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে যথাক্রমে এক-ইন্দ্রিয়, দুই-ইন্দ্রিয় এইরূপ বিভিন্ন সংখ্যার ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণীরা স্থান পেয়েছে। তারও পরের পর্যায়ে মানুষ ও দেবতা, এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে মুক্ত মানুষ যাঁরা কেবলজ্ঞান বা পরম জ্ঞান লাভ করেছেন। এই জীব নানা বিষয় জানে, কাজকর্ম করে, সুখদুঃখ ভোগ করে, নিজেকে আলোকিত করে, অপরকেও। এই জীব চিরন্তন, যদিও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা দেহের ক্ষেত্রে, কিন্তু চিরন্তনতা আত্মার ক্ষেত্রে। পূর্বকর্ম থেকে উদ্ভূত ফলসমূহের প্রকৃতি অনুসারে আত্মা বা জীব (যেহেতু পরবর্তী কালের জৈন চিন্তায় চেতনা ও আত্মা সমার্থক হয়েছে, এবং তা গুণ বা দ্রব্যের চিরন্তন ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত, জীব ও আত্মা উভয় শব্দের তাৎপর্য সমার্থক হয়ে গেছে, এবং সেই হিসাবে আত্মারও নাম জীব) বিভিন্ন দেহে অধিষ্ঠান করে। যেমন একটি দীপশিখা সমগ্র ঘরকেই আলোকিত করে, আত্মা বা জীবও সেভাবে গোটা দেহেই ব্যাপ্ত হয়। এই আত্মার তাই কোন নির্দিষ্ট আকার নেই, অথচ তা ছোট কিংবা বড় যে কোন আয়তনই পূর্ণ করতে পারে।

অজীব বলতে বোঝায় পুদ্গল, আকাশ, ধর্ম ও অধর্ম। কাল বা সময়কেও

১। *ibid,* 120-140.

এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কালই বস্তুর ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব, রূপান্তর, চলমানতা, নূতনত্ব প্রভৃতির কারক। উমাস্বামী বলেছেনঃ বর্তনা-পরিণাম-ক্রিয়া-পরত্বপরত্বে চ কালস্য।১ কাল প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, অনুমানভিত্তিক। কাল একটি এমন শর্ত যার অভাবে দ্রব্য তার গুণ ও পর্যায় অর্জন করতে পারে না। জৈন লেখকগণ কখনও কখনও কালকে দুভাগে ভাগ করে থাকেন—পরমার্থিক কাল এবং ব্যবহারিক কাল। শেষোক্তটি সচরাচর সময় নামে পরিচিত যাকে দিন-ঘণ্টা-মুহূর্তে ভাগ করা যায়। গুণরত্নের মতে কাল কোন স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়, অন্যান্য দ্রব্যসমূহের একটা পর্যায়।

পুদ্গল বলতে জৈনমতে বস্তুকে বোঝায়, যা সংহত ও বিশ্লিষ্ট হয় (পূরয়ন্তি গলন্তি চ)। বস্তু পারমাণবিক সংযোগে গঠিত। ভারতীয় দর্শনে ন্যায়বৈশেষিক-দের মতে জৈনরাও পারমাণবিক তত্ত্বের উদ্গাতা। জৈনমতে বস্তুকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, এবং ক্ষুদ্রতর থেকে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে বিশ্লিষ্ট করা যায়। ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ থেকে যাকে আর বিশ্লিষ্ট করা যায় না তা হচ্ছে অণু। দুই বা ততোধিক অণু সহযোগে সংঘাত বা স্কন্ধ এবং এইভাবে বস্তুর উৎপত্তি হয়। প্রাকৃতিক বস্তু-সমূহ এমনকি জীবদেহ, এই অণুসহযোগেই নির্মিত। মন, বাক্য এবং নিঃশ্বাসও বস্তু থেকে উৎপন্ন। যে কোন বস্তু বা পুদ্গলের চারটি গুণ আছে—স্পর্শ, আস্বাদ, গন্ধ এবং বর্ণ। বস্তুর অণুতে, এবং সংশ্লিষ্ট অণু বা সংঘাতেও, এই গুণগুলি বর্তমান। শব্দ কোন মৌলিক গুণ নয়। জৈনমতে শব্দ, আলো, উত্তাপ, ছায়া, অন্ধকার, সংযোগ, বিয়োগ, সূক্ষ্মতা, আকার প্রভৃতি বস্তুরই আকস্মিক বিবর্তন বা পরিণাম।২

আকাশ সকল অস্তিকায় দ্রব্যসমূহের আশ্রয়স্থল। জীব, অজীব, ধর্ম এবং অধর্ম আকাশে অবস্থান করে। আকাশ যদিও প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় এইভাবে যে কায়সম্পন্ন দ্রব্যের অবস্থিতির জন্য স্থান প্রয়োজন, যা আকাশের অস্তিত্বের হেতু। কেননা, দ্রব্যের প্রকৃতিই হচ্ছে যে তা পরিব্যাপ্ত হবে, আর আকাশ হচ্ছে যেখানে ওই পরিব্যাপ্তি ঘটে। জৈনরা দু'রকম আকাশে বিশ্বাসী—লোকাকাশ ও অলোকাকাশ। বিশ্বচরাচর লোকাকাশেই অবস্থিত, যা পার হলে অলোকাকাশ, যা এখনও শূন্য।

আকাশের মতই ধর্ম ও অধর্মের অস্তিত্ব অনুমাননির্ভর। শব্দ দুটির প্রয়োগ জৈনধর্মে নানা অর্থে হলেও, দ্রব্যহিসাবে ধর্ম ও অধর্ম বিশেষ ধরনের অর্থবহ। ধর্ম বলতে বোঝায় গতি, অধর্ম স্থিতি। জৈনরা বিষয় দুটিকে বোঝাবার জন্য বলেন যে, যদিও নদীতে মাছের নড়নচড়ন মাছই সূত্রপাত করে, কিন্তু তা যেমন জলের মাধ্যম ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়, এবং ওই মাধ্যমই যখন মাছের গতিবিধির মূল শর্ত, সেই রকম কোন জীব বা বস্তুর গতিবিধি একটা মাধ্যম ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। গতির এই মাধ্যমই হচ্ছে ধর্ম এবং অধর্ম। ধর্ম কোন বস্তুর চলমানতাকে সাহায্য করে, যদিও তা নিজে থেকে কোন অচলকে চলমান করতে পারে না, যেমন জল মাছের গতিকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তার ইচ্ছায় মাছ গতিমান হয় না। অধর্ম ঠিক এর উল্টো যা স্থিতিকে সাহায্য করে, যেমন বৃক্ষের ছায়া পথিককে বিশ্রামে সাহায্য করে। ধর্ম যেমন নিজে থেকে কাউকে চালাতে

১। তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র, ৫, ২২।
২। তত্ত্বার্থ, ৫, ১৯, ২৩-২৪।

পারে না, অধর্মও তেমনি নিজে থেকে কাউকে থামাতে পারে না। ধর্ম ও অধর্ম চিরন্তন, আকারহীন, এবং আকাশে ব্যাপ্ত।১

১৩। নয়টি মূল তত্ত্ব

জৈনধর্মে নয়টি মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয় যেগুলি হল জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরা ও মোক্ষ।

জীব ও অজীবের কথা আমরা পূর্বে বলেছি। জীব সম্পর্কে আরও দুটি কথা বলার আছে, একটি হল লেশ্যা, অপরটি হল ভাব। দেহধারী জীবের বিভিন্ন মনোভাবকে লেশ্যা বলে। লেশ্যা ছয় প্রকার, এবং প্রত্যেক লেশ্যার নিজস্ব স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ আছে। কালো রং-এর লেশ্যা সবচেয়ে খারাপ, যার স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এই লেশ্যার প্রভাবে মানুষ নানাপ্রকার পাপ কর্ম করে। নীল ও ধূসর রং-এর লেশ্যাও অশুভকর। বাকি তিনটি শুভ লেশ্যা, যেগুলির রং যথাক্রমে লাল, হলদে ও সাদা। প্রথম দুটির প্রভাবে জীব ক্রোধ, গর্ব, অহংকার ও লোভকে জয় করতে পারে, এবং তৃতীয়টি জীবকে সম্পূর্ণ নির্মল করে তোলে। স্ফটিক যেমন নিকটস্থ রং-এর প্রভাবে সেই রং-যুক্ত হয়, জীবও সেই রকম লেশ্যার প্রভাবে বর্ণবান হয় (কৃষ্ণাদিদ্রব্যসাচিব্যাৎ পরিণামো য আত্মানঃ, স্ফটিকস্যেব তত্রায়ম্ লেশ্যাশব্দঃ প্রবর্ততে)।

জীব বা আত্মা নিত্য হলেও তার নানারকম অবস্থাভেদ বা পরিণাম আছে, যাকে ভাব বলে। এছাড়া সংসারবদ্ধ জীবের স্থূল শরীর ব্যতীত আর একটি সূক্ষ্মশরীর থাকে যার নাম কার্মণ শরীর। উত্তপ্ত বান বৃষ্টির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে যেমন তা জলকণা সংগ্রহণ করতে করতে অগ্রসর হয়, জীবের কার্মণশরীরও অনুরূপভাবে কর্মগ্রহণ ও তা ধারণ করে। এইভাবে সংগৃহীত কর্ম ক্ষয় করাই জৈন জীবনচর্যার উদ্দেশ্য।

পাপ ও পুণ্যসম্পর্কে আগে আলোচনা করার সুযোগ আমাদের হয়েছে। দিগম্বর মতে, এবং শ্বেতাম্বরগণের কারো কারো মতে পাপ ও পুণ্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়। পাপ আস্রবের এবং পুণ্য সংবরের অন্তর্গত।

যার দ্বারা জীবের সঙ্গে কর্মের সংযোগ হয় তাকে আস্রব বলে। এই সংযোগ শুভ বা অশুভ দুই-ই হতে পারে। অশুভ সংযোগের কারক হচ্ছে কষায়, সংখ্যায় যা চারটি—ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এবং যা সংসারগতির কারণ। কষায়ের অধীন হলে মানুষ কর্মযোগ্য পুদ্গল গ্রহণ করে। জীবের সঙ্গে পুদ্গলের মিশ্রণের ফলে জীব আবদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাটাকে বলা হয় বন্ধ। কাজেই কর্মের অনুপ্রবেশ রোধ করাই হচ্ছে মুক্তির উপায়। আগেই বলেছি এই অনুপ্রবেশের নাম আস্রব। আস্রব নিরোধের নাম সংবর, যার বহুবিধ পদ্ধতি আছে। সংবরের দ্বারা কর্মবন্ধনের আংশিক ক্ষয়ের নাম নির্জরা, পূর্ণ কর্মক্ষয়ের নাম মোক্ষ।২

১। N. N. Bhattacharyya, *Jain Philosophy*, 120-25.
২। *ibid*, 146-54.

১৪। কর্ম ও মোক্ষ

কর্মফলতত্ত্ব ভারতবর্ষের প্রায় সকল দর্শনেই স্থান পেয়েছে। তবে এই তত্ত্বের উপস্থাপনা জৈনদের তরফ থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। সচরাচর কর্ম বলতে বোঝায় মানুষের ক্রিয়াকলাপ যার সুফল বা কুফল মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরে ভোগ করে। কিন্তু জৈনমতে কর্ম পৌদ্গলিক, অর্থাৎ তা একটি বস্তু যা জীব বা আত্মার বাইরে থেকে এসে পড়ে তাকে মলিন করে, যেভাবে কাপড়ের উপর ধুলা এসে পড়ে তাকে মলিন করে দেয়।

জীব বা আত্মা মূলত পবিত্র ও পরিষ্কার। এর সম্ভাবনা অনন্ত। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বাস, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া জীবের পক্ষে সম্ভব, যদি তা তার পথের সমস্ত বাধাকে দূর করতে পারে। এই বাধাগুলি আসে কর্মের সংস্পর্শে, যখন কর্মাণুগুলি জীব বা আত্মায় সংক্রমিত হয়ে তার স্বাভাবিক গুণগুলিকে দূষিত করে দেয়। এই সংক্রমণেরই নাম হচ্ছে আস্রব।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে কিভাবে কর্মাণু বস্তুহিসাকে জীবে সংক্রমিত হয়? এক্ষেত্রে জীবেরই বা দায়িত্ব কিভাবে থাকে? আত্মা বা জীবের ক্ষেত্রে একটা দেহের প্রশ্ন আছে, তাকে দেহের কাঠামোয় আবদ্ধ হতে হয়। এই দেহ তৈরী হয় পুদ্গল বা বস্তুর অণু দিয়ে, বিশেষ ধরনের দেহের জন্য বিশেষ ধরনের বস্তুর অণুর বিশেষ ধরনের সংযোগ প্রয়োজন। এই দেহগঠনের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে জীব বা আত্মার নিজস্ব আবেগ ও আকর্ষণসমূহ। আসলে জীব বা আত্মা সেই ধরনের দেহই প্রাপ্ত হয় যে দেহ লাভের প্রতি তার আন্তরিক আকর্ষণ আছে। তার বিগত জীবনের ধর্ম—সেই জীবনের চিন্তা, বাক্য এবং কাজ—আত্মা বা জীবের মধ্যে কতকগুলি অন্ধ তৃষ্ণার এবং আকর্ষণের সৃষ্টি করে এবং সেগুলির তৃপ্তি চায়। জীবের এই সকল তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা বিশেষ বিশেষ ধরনের বস্তুর অণুকে আকর্ষণ করে যেগুলির সংযোগে তার অচেতন ভাবে আকাঙ্ক্ষিত দেহটি গঠিত হয়। তাহলে কার্যত জীব তার আকাঙ্ক্ষিত কর্মাণু দ্বারা নিজে নিজেই সৃষ্টির কারক হচ্ছে যদিও দেহের উপাদান কারণ কর্মাণুযুক্ত বস্তু।

জীব যে প্রকৃতির এবং যতসংখ্যক বস্তুর অণুসংযোগে দেহধারী হয় সেগুলি নির্ভর করে তার অতীত কর্মের উপর এবং এই কারণেই ওই অণুগুলিকে কর্ম-পুদ্গল, বা কর্ম বলা হয়। এই কর্মের আস্রব বা সংক্রমণেই জীব বদ্ধ-দশা প্রাপ্ত হয়। এই বন্ধ দুই প্রকার—ভাববন্ধ ও দ্রব্যবন্ধ। কাজেই জীবের মুক্তি বা মোক্ষের পথ হচ্ছে এই আস্রবকে নিরোধ করা। সেটা দুই উপায়ে সম্ভব—আগন্তুক কর্মের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা (সংবর) এবং অর্জিত কর্ম ক্ষয় করে ফেলা (নির্জরা)। পূর্ণ কর্মক্ষয়ই মোক্ষ বা নির্বাণ, যে অবস্থাকে অনন্ত সুখ, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত দর্শন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কর্মের পুরোপুরি ক্ষয় হয়ে গেলে পুনরায় আর জন্ম হয় না। সঠিক বিশ্বাস, সঠিক জ্ঞান, সঠিক আচরণই ওই পদ্ধতিগুলিকে কার্যকর করে জীবকে মোক্ষের পথে নিয়ে যায়।

১৫। উপসংহার

জৈনধর্ম দুটি ধারার সমন্বয়ে বর্তমান আকার পেয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, আদিতে এই ধর্ম কয়েকটি বিশেষ নৈতিক আদর্শের প্রবক্তা ছিল। পরবর্তী

কালে ওই নৈতিক আদর্শগুলিকে বিশেষভাবে পল্লবিত করা হয়, যার ফলে জৈন কর্মতত্ত্ব ও মোক্ষতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে—লেশ্যা, আস্রব, কষায়, নির্জরা, সংবর, বন্ধ প্রভৃতি ওই পল্লবিতকরণের অভিব্যক্তি। এর পাশাপাশি আরও একটি ধারার বিকাশ হয়েছিল যা হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধিৎসা, যার অভিব্যক্তি জৈন নিরীশ্বরবাদী ন্যায়শাস্ত্রে, জীবাজীবের শ্রেণী বিভাগে, বিশ্বতত্ত্বে। জৈন দার্শনিকরা জগৎকে বস্তুহিসাবে দেখেছেন, এবং একটা যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টি-ভঙ্গীতেই বস্তুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। দ্রব্য গঠিত হয় গুণ ও পর্যায় নিয়ে—প্রথমটি চিরন্তন এবং দ্বিতীয়টি পরিবর্তনশীল। এই দুটি আদর্শের ভিত্তিতেই জগতের চিরন্তনতা এবং পরিবর্তনশীলতার ব্যাখ্যার প্রয়াস ঘটেছে। বস্তুজগৎকে অস্বীকার না করার দরুনই জৈন দার্শনিকেরা বস্তুকে বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁরা পরমাণুর ধারণা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতে জৈনধর্মই একমাত্র ধর্ম যার আওতায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল। উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে জৈনধর্মের অবদান অপরিসীম।

৬

ভাগবত বা বৈষ্ণবধর্ম

১। ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভূমিকা

পুরোদস্তুর একেশ্বরবাদী হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দুটি ধর্ম পরিচিত তারা হল বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম। এদেশে একেশ্বরবাদী ধর্মকে গোড়ার দিকে সম্ভবত ভাগবত ধর্ম বলা হত, যে নামটি শুধু বৈষ্ণবধর্মেরই নয়, শৈব ধর্মেরও বিশেষণ হিসাবে প্রযুক্ত হত। পতঞ্জলি কোন কোন শৈব সম্প্রদায়কে শিবভাগবত বলে উল্লেখ করেছেন; তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে ভাগবত বলতে বিষ্ণুভাগবতদেরই বুঝিয়েছে এবং তা বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখযোগ্য যে বৈষ্ণব-ধর্ম নামটি ভাগবতধর্মের তুলনায় অর্বাচীন। আসলে প্রাচীন ভাগবতদের মধ্যে বিষ্ণুভাগবতদেরই এত প্রাধান্য ছিল যে ওই বিশেষণটি তাদেরই একচেটে হয়ে যায়। পরে বৈষ্ণবধর্ম নামটির উদ্ভব হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাদের বিষ্ণুর সঙ্গে সমীকরণের পর।

আমরা আগেই দেখেছি যে একেশ্বরবাদ একটি সামাজিক বিবর্তন পদ্ধতির ধ্যান-ধারণাগত পরিণতি, যার সূত্রপাত হয়েছিল প্রাচীন ট্রাইবাল জীবনধারার ভাঙনের মধ্য দিয়ে এবং যার চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজতন্ত্র পাকাপাকি কায়েম হয়ে যাবার পর। পরম শক্তিমান ঈশ্বর জগতের উপর চরমভাবে প্রভুত্ব করেন, এই ধারণা আসলে মর্তলোকের বাস্তব শক্তিমান রাজার দৈব প্রতিচ্ছবি। প্রাক্-বিভক্ত সমাজে দেবতাদের উপর মানুষদের প্রভুত্ব ছিল। তারা বিশ্বাস করত সমবেত আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা প্রকৃতির শক্তিসমূহ এবং সেগুলির প্রতীক দেবতাদের বশ করতে এবং নিজেদের ইচ্ছায় চালিত করতে সক্ষম। শ্রেণীসমাজে এই বিশ্বাসের অবলুপ্তি ঘটে, দেবতারা শাসক শ্রেণীর প্রতীক হিসাবে কল্পিত, হন, যাঁদের স্তুতি ও ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন করতে হয়। একেশ্বরবাদ এই পদ্ধতিরই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।

ভাবগত বা বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিম ভারতে এবং এই ধর্মের আদি প্রবক্তারা ছিলেন সম্ভবত যাদব ট্রাইবের ভাঙনের যুগের মানুষ। এই ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে ওই ট্রাইবের কতিপয় পুরাতন আমলের বীরপুরুষ—কৃষ্ণ ও তাঁর জ্ঞাতিরা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হন, এবং পরবর্তী পর্যায়ে, তাঁদের প্রধান দেবতা কৃষ্ণ সুপ্রাচীন বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষিত হন। বৈদিক দেব গোষ্ঠী থেকে এঁরা বিষ্ণুকে বেছে নিয়েছিলেন সর্বশক্তিমান একেশ্বর হিসাবে, এবং সেই কারণে ভাগবত ধর্মের পরবর্তী পর্যায় বৈষ্ণবধর্ম রূপে খ্যাত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক থেকেই এই ধর্মের জনপ্রিয়তার সূত্রপাত হয়।

একেশ্বরবাদ স্বাভাবিক ভাবেই রাজানুকূল্য পেয়ে থাকে, যা বৈষ্ণবধর্ম ও শৈব ধর্ম বরাবরই পেয়েছে। এক ঈশ্বরে ভক্তি এক রাজাকে ভক্তিরই নামান্তর, যে কারণে ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর নিজেকে নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ বলেছেন। বৈষ্ণবধর্ম এদেশে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে যামুনাচার্যের একটি উক্তির সাক্ষ্য উল্লেখ করা যায়, যেখানে তিনি বলেছেন যে, যদি বলা যায় যে

চোল রাজা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সম্রাট্ তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁর সমকক্ষ আর কোন সম্রাট্ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু এ থেকে চোল নৃপতির পুত্র-কলত্র ভৃত্যাদির অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না। অর্থাৎ শুধু ঈশ্বরস্বরূপ সম্রাটই নন তাঁর অধীনস্থ সামন্তগণও ভক্তির পাত্র।

আদি মধ্য ও মধ্যযুগে, যখন পুরোদস্তুর রাজতন্ত্র ব্যতীত আর কোন ব্যবস্থা ভাবা যেত না, বৈষ্ণবধর্ম ও তার দেখাদেখি শৈবধর্মও, তাদের পুরাতন তাত্ত্বিক ভিত্তি সাংখ্যদর্শনকে কার্যত অস্বীকার করে বেদান্তের একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যার উপরেই নিজেদের তত্ত্বসমূহকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিল। বেদান্তের চরম অদ্বয়বাদী ভাষ্যে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যেহেতু এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন ধর্মব্যবস্থাকে দাঁড় করানো যায় না, বেদান্তপন্থী বৈষ্ণব ও শৈবগণ ত্রিতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রহ্ম (ঈশ্বর=পরমাত্মা=সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা), চিদ্ (জীবাত্মা=চেতন জীব=মানুষ) এবং অচিদ্ (অচেতন বস্তু=বস্তুজগৎ)। একের মধ্যে এই তিনের বিকাশ, বা তিনের সম্পর্কে এক, চিদাচিদের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক, তাঁর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণত্বের যাথার্থ্য, এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব ও শৈব দার্শনিকেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তুলে-ছিলেন। আচরণের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়সমূহ চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন—চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান।

বৈষ্ণব ও শৈব উভয় ধর্মেরই উপরিতলের এই চিত্র, কিন্তু লৌকিক উপাদান সমূহকে উভয় ধর্মের কাঠামো থেকে নির্বাসিত করা যায় নি, বরং তার প্রভাব উপরিতলকে সম্পৃক্ত করেছে। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানসমূহ ও সৃষ্টির মূলে নারী-রূপিণী শক্তিতত্ত্বের অনুপ্রবেশ, লৌকিক জীবনচর্যার প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয় আমরা পরে আলোচনা করব। মধ্যযুগীয় সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম কি কি পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল, তা আমার পরবর্তী অধ্যায়ের, যেখানে শৈবধর্ম আলোচিত হয়েছে, সূচনায় উল্লেখ করব। বর্তমান অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে বৈষ্ণব ধর্মের উপর তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে কিছু কথা বলা হবে।

২। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু

ঋগ্বেদের বিষ্ণু খুব প্রভাবশালী না হলেও একজন প্রধান দেবতা যিনি সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।১ বিষ্ণুর ত্রিপাদের একটা প্রাথমিক কল্পনা, যা পরবর্তী কালে পৌরাণিক বামনাবতার ও বলির কাহিনীর জন্ম দিয়েছে, ঋগ্বেদে বর্তমান, যাস্কের মতে যা সূর্যের তিনটি অবস্থানের প্রতীক—প্রভাতের, মধ্যাহ্নের ও অপরাহ্নের।২ ঋগ্বেদের বহুস্থলে বিষ্ণু আদিত্যগণের সঙ্গে উল্লিখিত এবং পরবর্তী সাহিত্যে আদিত্যদের মধ্যেই একজন হিসাবে তিনি গণ্য। এছাড়া ঋগ্বেদে তিনি সম্বরহন্তা যুদ্ধনেতা,৩ ঋতের গর্ভ৪ এবং পশু রক্ষক৫ হিসাবেও কল্পিত।

শতপথ ব্রাহ্মণবর্ণিত একটি কাহিনী-অনুযায়ী, দেবতাদের কৌশলে বিষ্ণুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি একজন আদিত্যে রূপান্তরিত

১। ১, ১০০, ৫-৬; ১, ১৫৫, ৬; ৭, ৯৯, ১।
২। নিরুক্ত ১২, ১৯। ৩। ১, ১৫৫, ৬। ৪। ১, ১৫৬, ৩।
৫। ১, ২২, ১৮; ১, ১৫৪, ৫; ১০, ১৯, ৪; ইত্যাদি।

হয়েছিলেন।১ ওই একই গ্রন্থে বিষ্ণুর তিনটি স্থানহিসাবে পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল ও আকাশের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে।২ শতপথ ব্রাহ্মণের৩ একটি কাহিনী তৈত্তিরীয় আরণ্যক৪ ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে৫ স্থান পেয়েছে যা অনুযায়ী দেবতাদের মধ্যে কীর্তির দ্বারা যজ্ঞের চরম ফল লাভ করার জন্য একটি প্রতিযোগিতায় বিষ্ণু জয়ী হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে অসুরনিধন কর্মে বরুণ ও বৃহস্পতিসহ ইন্দ্রের সহকারী-রূপে দেখা গেছে।৬ সেখানে আরও বলা হয়েছে; বিষ্ণু যজ্ঞকার্যের ত্রুটি সংশোধন করে দেন,৭ যিনি দীক্ষাপাল বা দীক্ষাগুরু৮ দ্বারপ বা দেবগণের দ্বাররক্ষক৯ এবং পরম দেবতা।১০ মৈত্রী উপনিষদে পৃথিবীপালক খাদ্যকে ভগবৎ বিষ্ণু বলা হয়েছে,১১ এবং কঠ উপনিষদে আত্মার অগ্রগতির লক্ষ্যহিসাবে বিষ্ণুর পরম পদ উল্লিখিত হয়েছে,১২ বৌধায়ন ধর্মসূত্রে তাঁকে গোবিন্দ ও দামোদর বলা হয়েছে,১৩ যা পশুপালন ও কৃষিকাজের উপর তাঁর প্রভাব সূচনা করে।

, তাহলে দেখা যাচ্ছে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুর প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী কালে আরও একজন নূতন দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। তিনি হলেন নারায়ণ। বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেব কৃষ্ণের অভিন্নতা ঘটেছে আরও কিছুকাল পরে।

৩। বিষ্ণু ও নারায়ণ

সম্ভবত আদিতে নারায়ণ কোন ট্রাইবের মানুষ ছিলেন যাঁর কুল বা গোত্র বা ক্লানের নাম ছিল নর, যেমন কাত্যকুলের কাত্যায়ন বা কণ্বকুলের কাণ্বায়ন। শতপথ ব্রাহ্মণে একজন পুরুষ-নারায়ণের উল্লেখ আছে যিনি তিনবার প্রজাপতির আদর্শে যজ্ঞ করেছিলেন।১৪ ওই গ্রন্থে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে যে, এই নারায়ণ পাঞ্চরাত্র সত্রের অনুষ্ঠান করে সকলের উপর প্রভুত্বলাভ করেছিলেন।১৫ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের নাম এখানে প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। এটা অসম্ভব নয় যে আদিতে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় বলতে নারায়ণের অনুগামীদেরই বোঝাত যারা পরে বাসুদেব কৃষ্ণের উপাসকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বিষ্ণুর সঙ্গে নারায়ণের অভিন্নতা আমরা প্রথম দেখি বৌধায়ন ধর্মসূত্রে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।১৬ এখানে বিষ্ণু নারায়ণ ও বাসুদেবকে অভিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। মহাভারতেও এঁদের তিনজনকে অভিন্ন করে দেখার প্রবণতা বর্তমান। একটি কাহিনী অনুযায়ী নারায়ণ ছিলেন একজন ঋষি যিনি ধর্মের পুত্র এবং নর নামক আর একজন ঋষির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাঁরা ব্রহ্মলোকে দৈত্য সংহারের জন্য গিয়েছিলেন এবং সেখানে দেবতা ও গন্ধর্বের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। অসুর বধের কাজে তাঁরা ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয়

১। ১৪, ১, ১। ২। ১, ৯, ৩, ৯। ৩। ১৪, ১, ১।
৪। ৫, ১। ৫। ৭, ৫, ৬। ৬। ৩, ৫০।
৭। ৩, ৩৮ ৮। ১, ৪। ৯। ১৩০।
১০। ১, ১। ১১। ৬, ১৩।
১২। ৩, ৯; তুলনীয় ঋগ্বেদ ১, ২২ ২০। ১৩। ২, ৫, ২৪।
১৪। ১২, ৩, ৪। ১৫। ১৩, ৬, ১। ১৬। ১০, ১১।

কাহিনী অনুযায়ী ধর্মের পুত্র নারায়ণ হিমালয়ে তপস্যা করে ব্রহ্মত্ব লাভ করেছিলেন। তৃতীয় কাহিনী অনুযায়ী পুরাকালের নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় অর্জুন এবং বাসুদেব কৃষ্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শান্তিপর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে নারায়ণকে পরমাত্মারূপে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ এই চার রূপে কল্পিত। রাজস্থান থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের ঘোসুণ্ডি লেখে নারায়ণ-বাটকের উল্লেখ আছে। গুণ্টুর থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের একটি লেখে নারায়ণের দেউল উল্লিখিত হয়েছে।

৪। বাসুদেব কৃষ্ণ

যাদব ট্রাইবের বৃষ্ণি কুলের বাসুদেব কৃষ্ণ বিষ্ণু ও নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে ঘোষিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখা ভাল যে যাদবদের আরও কয়েকটি শাখা ছিল যেমন অন্ধক, সাত্বত ইত্যাদি, যেগুলির নামেও কখনও কখনও বৈষ্ণব ধর্ম পরিচিত হয়েছে। যেমন পাঞ্জাবের হিসার জেলা থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের তুশাম লিপিতে একজন ভাগবতের (অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর) উল্লেখ আছে আর্য-সাত্বত-যোগাচার্য হিসাবে, অর্থাৎ যিনি সাত্বত-যোগের শিক্ষক।১

বাসুদেব কৃষ্ণ এক ও অবিমিশ্র চরিত্র নয়। মূল ব্যক্তিটি তিনি, যাঁর কীর্তিকলাপের পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। যাদব ট্রাইবের এই অন্যতম প্রধান ব্যক্তিটি যাঁকে মহাভারতের কয়েক স্থানে সংঘ মুখ্য বলা হয়েছে, তৎকালীন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারত থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যাদবদেরই একটি প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লবের ফলে তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা নিহত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হন। এই অন্তর্বিপ্লবের, যার ফলে সমস্ত বৃষ্ণিকুল ধ্বংস হয়েছিল কাহিনী শুধু মহাভারতেই নেই, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এ কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ ঘট-জাতকেও অন্তর্বিপ্লবের ফলে বাসুদেব কৃষ্ণের নিহত হবার খবর আছে।২

এই মূল চরিত্রটি দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হবার পর আরও দুটি চরিত্র তাঁর উপর আরোপিত হয়। একটি হচ্ছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ দেবকীপুত্র৩ যিনি ছিলেন ঘোর-আঙ্গিরসের শিষ্য। বাসুদেব কৃষ্ণের মাতার নামের সঙ্গে এঁর মাতার নামের অভিন্নতা এর একটা বড় কারণ। দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র যা বাসুদেব কৃষ্ণের উপর আরোপিত হয়েছিল তা ছিল পশ্চিম ভারতের এক পশুপালক দেবতার, যার বিকাশ হয়েছিল সম্ভবত আভীর ট্রাইবদের মধ্যে। পরবর্তী কালের সাহিত্যে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার যে সকল কাহিনী পাওয়া যায় তা আসলে এই পশুপালক দেবতাটিকে ঘিরেই হয়ত গড়ে উঠেছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ নামক দেবতাটি অন্তত তিনটি ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলেন—যাদব ট্রাইবের বাসুদেব কৃষ্ণ, ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ দেবকীপুত্র এবং

১। *Corpus Inscriptionum Indicarum,* III. 270.

২। E. B. Cowell, *Jatakas,* IV. 55 ff.

৩। ৩, ১৭, ৬।

আভীর ট্রাইবের উপাস্য কোন পশুপালক দেবতা। এই সম্মিলিত কৃষ্ণ প্রথমে নারায়ণের সঙ্গে একাত্ম হন, পরে বৈদিক বিষ্ণুর সঙ্গে।

৫। ভাগবত ধর্মের আদি পর্যায়

যদিও পতঞ্জলি শিব-ভাগবতদের উল্লেখ করেছেন তথাপি ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে ভাগবত ধর্ম বলতে মূলত বৈষ্ণব ধর্মকেই বোঝায়। এই ধর্মের কেন্দ্রস্থ দেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু, যিনি নারায়ণ ও কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে ঘোষিত। এই ধর্মের মূলকথা ভক্তি, যা ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে১ বাসুদেবক ও অর্জুনক শব্দ আছে যা থেকে অনুমান করা হয় যে পাণিনির যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বাসুদেব দেবত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মেগাস্থেনিস শূরসেনদের (Soura-senoi, যাদব-সাত্বত-বৃষ্ণিদের একটি শাখা) দুটি শহর, মথুরা (Methora) ও কৃষ্ণপুর (Kleisobora), উল্লেখ করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে তারা হেরাক্লেসের (বাসুদেব কৃষ্ণকে চেনাবার জন্য তিনি তাঁর অনুরূপ গ্রীক দেবতার নাম করেছেন। শিবকেও তাঁরা দিওনিসোস বলতেন) উপাসক ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে যার কিছুটা অংশ রচিত হয়েছিল সেই ভগবদ্গীতায় বাসুদেব কৃষ্ণ সর্বোচ্চ দেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন দেখা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বেসনগর (গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ) লেখে তক্ষশীলার হেলিওদোরস নামক জনৈক গ্রীক নিজেকে ভাগবত বলে ঘোষণা করেছেন, এবং বিদিশায় দেবদেব বাসুদেবের সম্মানে একটি গরুড়ধ্বজ, অর্থাৎ বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতীকযুক্ত একটি স্তম্ভ, নির্মাণের কথা বলেছেন। রাজস্থানের চিতোরগড় থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের ঘোসুণ্ডি লেখে নারায়ণ-বাটক নামক একটি পূজা-শিলা প্রাকারের (প্রস্তর নির্মিত উপাসনা স্থান) উল্লেখ পাওয়া যায় যেটি নির্মাণ করেছিলেন জনৈক ভাগবত যিনি সংকর্ষণ ও বাসুদেবের সম্মানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।২ ওই একই সময়কার মহারাষ্ট্রের নানাঘাট লেখে, যেটি জনৈকা সাতবাহন কুলের রানী উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন, অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে বাসুদেব ও সংকর্ষণের উল্লেখ আছে।৩

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপরিউক্ত লেখমালায় বাসুদেবের সঙ্গে গরুড় এবং বিষ্ণুর ও নারায়ণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁকে সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণ বলে অভিহিত করা হয়নি। বাসুদেবকে কৃষ্ণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতে, মহাভারতের অংশস্বরূপ ভগবদ্গীতায়, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এবং ঘট-জাতকে। মহাভারতের সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠা পেতে কৃষ্ণের সময় লেগেছে অনেক। সভাপর্বের শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে দেখা যায় যে কৃষ্ণের দেবত্ব চ্যালেঞ্জ করার মত লোকের অভাব ছিল না। মহাভারতে একজন পৌণ্ড বাসুদেবের উল্লেখ আছে, যিনি সম্ভবত কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী অপর একটি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। অনেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মানে না বলে কৃষ্ণ গীতায়—আক্ষেপ করেছেন।৪ পতঞ্জলির

১। ৪, ৩, ৯৮।
২। D. C. Sircar, *Select Inscriptions,* 1942, I. 91 f.
৩। *ibid,* 186 ff.
৪। ৭, ১১; ৭, ২৪; ১৮, ৬৭।

মহাভাষ্যে বাসুদেবভক্ত ও কংসভক্তদের মধ্যে বিরোধের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতকের এই গ্রন্থে কংসভক্তদের কালমুখ ও বাসুদেব-ভক্তদের রক্তমুখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মহাভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে বাসুদেব-বর্গ্য বা বাসুদেবের অনুগামীদের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে বলদেব ও অনিরুদ্ধের নামও আছে। মথুরার নিকট মোরা থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের একটি লেখে পঞ্চ-বৃষ্ণি-বীরের উল্লেখ আছে। এরা হলেন সংকর্ষণ (রোহিণীর গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র সেই হিসাবে কৃষ্ণের বড় ভাই), বাসুদেব (দেবকীর গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র যাঁর পরিচয় কৃষ্ণ হিসাবে), প্রদ্যুম্ন (রুক্মিণীর গর্ভজাত বাসুদেবের পুত্র), সাম্ব (জাম্ববতীর গর্ভজাত বাসুদেবের পুত্র) এবং অনিরুদ্ধ (প্রদ্যুম্নের পুত্র)। এঁরা সকলেই দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই ভাগবতধর্ম যে মথুরার বাইরে প্রচলিত হয়েছিল উপরিউক্ত লেখগুলির সাক্ষ্য থেকে তা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র সমান ভাবে হয় নি। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি একটি লিপিতে নিজেকে রাম (বলরাম), কেশব (কৃষ্ণ), অর্জুন ও ভীমের সমতুল্য বীর হিসাবে গণ্য করেছেন, কিন্তু তাঁদের ঠিক দেবতা মনে করছেন না। কিন্তু তাঁর পুত্র যজ্ঞ সাতকর্ণির চিন্না লেখে (দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকের, প্রাপ্তিস্থান কৃষ্ণা জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশ) বাসুদেব পুরোদস্তুর একেশ্বর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন। পঞ্চাল রাজ বিষ্ণুমিত্রের একটি মুদ্রায় চক্রধারী একটি চতুর্ভুজ মূর্তি উৎকীর্ণ আছে, যা বিষ্ণুর হওয়াই সম্ভব। শঙ্খ, চক্র, গদা ও চেনা যায় না এমন একটি বস্তুসহ একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি একটি কুষাণ-শীলে অঙ্কিত আছে।১ হুবিষ্কের কতিপয় মুদ্রায় অঙ্কিত চতুর্ভুজ দেবতা বিষ্ণু বলেই অনেকের অনুমান। কুষাণদের এক রাজার নাম বাসুদেব, যা তাঁদের ভাগবত ধর্মের প্রতি আকর্ষণের পরিচায়ক।

প্রাচীনতর সাহিত্যে ও লেখমালার যে সকল উদাহরণ আমরা দিয়েছি সেখানে বৈষ্ণব নামটি পাওয়া যায় না। সত্য বলতে কি গুপ্তযুগের পূর্বে বৈষ্ণব নামটির প্রচলন হয়নি। পাদ্মতন্ত্র নামক একটি পাঞ্চরাত্র সংহিতায় ভাগবত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নামের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে বৈষ্ণব শব্দটি নেই। শ্লোকটি হচ্ছে সূরিস্-সুহৃদ ভাগবতস সাত্বতঃ পঞ্চকালবিৎ। একান্তিকস-তন্ময়শ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যাদি।২ এখানে পাঁচটি নাম পাওয়া যায়—ভাগবত, সাত্বত, একান্তিক, পাঞ্চ-রাত্রিক ও তন্ময়। আমরা আগেই দেখেছি যাদবদের একটি কুলের নাম সাত্বত, এবং অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে বাসুদেব-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ধর্ম-মত আদিতে এই নামেই পরিচিত ছিল। একান্তিক ও তন্ময় সমার্থক, যার মূল কথা একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণতা। ভগবদ্গীতায় এই একান্তিক ভক্তদের উল্লেখ আছে, এবং এই সম্প্রদায় কালক্রমে একায়ন-পন্থী হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। ঈশ্বর সংহিতা নামক একটি পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে

মোক্ষন্যায় বৈ পন্থা এতদ্যো ন বিদ্যতে।
তস্মাদ্ একায়নং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥৩

পাঞ্চরাত্র বা পাঞ্চরাত্রিক নামটির প্রকৃত তাৎপর্য যে কি তা বলা মুস্কিল।

১। J. N. Banerjea, *Development of Hindu Iconography*, 1956, 143-44.
২। ৪ ২, ৮৮; ৩। ১৬ ১৮।

সম্ভবত এমন কোন যজ্ঞের নাম থেকে এই শব্দটি এসেছে যা সম্পন্ন করতে পাঁচটি রাত্রি লাগত। শতপথ ব্রাহ্মণে নারায়ণ কর্তৃক সম্পাদিত পাঞ্চরাত্র সত্রের উল্লেখ আমরা আগে করেছি এবং একথা ইঙ্গিত করেছি যে হয়ত, আদি নারায়ণ পূজকরা ওই নামে পরিচিত ছিল। পাদ্মতন্ত্র থেকে আমরা পূর্বে যে শ্লোকটি উল্লেখ করেছি তা থেকে এটাও প্রতীয়মান হতে পারে যে ভাগবত, সাত্বত, একান্তিক, তন্ময় ও পাঞ্চরাত্রিক সমার্থক। এও হতে পারে যে ভাগবত ধর্মের একেশ্বর পাঁচটি পৃথক্ দেবতার সমন্বয় বা সমীকরণ, যাঁরা আদিতে পাঁচটি পৃথক্ ট্রাইব, বা অঞ্চলের বা কল্পনার প্রতিভূ ছিলেন। পঞ্চ বৃষ্ণি বীরের পূজাও—সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অনিরুদ্ধ—এই নামের দ্বারাও সূচিত হতে পারে। বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিত্রে ভাগবত এবং পাঞ্চরাত্রিকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর টীকাকারের মতে ভাগবত বলতে বোঝায় বিষ্ণুভক্ত আর পাঞ্চরাত্র একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম। নারদীয় পাঞ্চরাত্র সংহিতায় বলা হয়েছে যে পাঁচ প্রকার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই পাঞ্চরাত্র নাম হয়েছে, এবং এই পাঁচটি বিষয় হল তত্ত্ব, মুক্তি, ভক্তি, যোগ ও বৈশেষিক। এই ব্যাখ্যা কিছুটা কষ্ট কল্পিত হলেও স্রাডারের মতে কাজ চলার যোগ্য।[১] মনে হয় গুপ্তযুগের পূর্বে পাঞ্চরাত্র বলতে সামগ্রিক ভাবে প্রচলিত ভাগবত ধর্মের বিভিন্ন দিক্‌কেই বোঝাত। গুপ্তযুগ থেকেই এই ধর্মমতের একটি বিশিষ্ট অংশ ব্যূহবাদ হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

৬। ব্যূহবাদ

আদি পাঞ্চরাত্র ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি ব্যূহবাদ। বিষয়টি বোঝার আগে এর সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিক্ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকলে সুবিধা হয়। ভাগবত ধর্মের প্রধান কথা ভক্তি যা গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি পরবর্তীকালের পাঞ্চরাত্র তত্ত্ব, যুক্তি, ভক্তি, যোগ ও বৈশেষিক, এই পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা পরিচিত হয়েছে। বৈশেষিক বলতে নিশ্চয়ই বৈশেষিক দর্শনকে বোঝান হয়েছে, যার মূল আলোচ্য বিষয় পদার্থতত্ত্ব, পরবর্তী কালে কণাদের দ্বারা যা একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক চিন্তায় রূপ পেয়েছে। যোগ বলতে একটা বিশেষ ধরনের জীবনচর্যা বোঝায়, দৈহিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা চিত্তবৃত্তির বিরোধ, যা ভারতের প্রায় সকল দার্শনিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে স্থান পেয়েছে, এমন কি ষড় দর্শনের একটি হিসাবে পতঞ্জলির নামে চিহ্নিত হয়েছে। মুক্তির আদর্শও এদেশের প্রতিটি ধর্মে ও দর্শনে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র ভক্তিমার্গের সঙ্গে তৎকালীন চিন্তাধারা ও জীবনচর্যার সকল দিকেরই সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিল।

বৈশেষিক ব্যতিরেকে বাকি চারটি বিষয়ই গীতায় উপস্থিত রয়েছে, এবং যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, গীতায় সাংখ্যদর্শনের উপর একটি গোটা অধ্যায় দেওয়া রয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব ধর্ম—যা রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত—সম্পূর্ণভাবে বেদান্ত ভিত্তিক, বেদান্তের দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল, যেখানে সাংখ্যের কোন

১। F. O. Schrader, *Introduction of the Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita*, 1916, 24-25.

স্থান নেই। সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ সম্পূর্ণভাবেই বস্তুতান্ত্রিক, মানবজীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পক্ষান্তরে বেদান্তের চেতনকারণবাদ, যা অনুযায়ী বিশুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, বস্তুময় জগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। বৈষ্ণব ধর্মের এই ভিত্তিবদলই তার শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তনকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ব্যূহবাদের মূলকথা প্রাচীন সাংখ্যকথিত তত্ত্বসমূহের উপর ভাগবত ধর্মের গোড়ার দিকের নির্ভরতা। এই মতবাদ অনুযায়ী বাসুদেব প্রথমে ব্যূহ্য-সংকর্ষণ ও প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন, সংকর্ষণের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগে ব্যূহ্য প্রদ্যুম্ন এবং মনঃ বা বুদ্ধির সৃষ্টি হয়, প্রদ্যুম্ন ও বুদ্ধির সংযোগে সৃষ্টি হয় ব্যূহ অনিরুদ্ধ ও অহংকারের, অনিরুদ্ধ ও অহংকারের সংযোগে সৃষ্টি হয় পঞ্চমহাভূত এবং ব্রহ্মার। শেষোক্ত জন পঞ্চমহাভূত থেকেই বিশ্বসৃষ্টি করেন। এইভাবে সাংখ্যের তত্ত্বগুলির সঙ্গে বৃষ্ণি বীরদের যুক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব এই তালিকা থেকে বাদ গেছেন। এই সাম্ব সম্ভবত আদিতে কোন ঈরানীয় ট্রাইবের দেবতা ছিলেন। এবং সেই হিসাবে গোড়ার দিকে তাঁকে কৃষ্ণের পুত্র হিসাবে পাঞ্চরাত্র ধর্মে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীকালে সম্ভবত ঈরানের সঙ্গে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। তৎসত্ত্বেও কিন্তু সাম্ব পূজাকে লোপ করা সম্ভব হয়নি, কেননা এদেশে ঈরানীয়দের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা, যাঁরা শাকদ্বীপী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে বরাহমিহিরও ছিলেন একজন। সাম্বের প্রসঙ্গে আমরা সূর্য পূজা সংক্রান্ত আলোচনার সময় আবার আসব।

ধর্মের দিক থেকে ব্যূহ্যবাদ বলতে সাম্ব ব্যতিরেকে বাকি চারজন বৃষ্ণি বীরের পূজা বোঝায়, যাঁদের মধ্যে বাসুদেব কৃষ্ণ বাদ দিয়ে, সংকর্ষণ বা বলরামের পূজা বেশ কিছুটা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি।

৭। পাঞ্চরাত্রের কয়েকটি দিক্‌ঃ ভাগবদ্গীতা ও সংহিতাসমূহ

পাঞ্চরাত্র ধর্মে উপাস্য দেবতা পঞ্চরূপে কল্পিত হয়েছেন—ব্যূহ, পর, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা। ব্যূহ প্রসঙ্গ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ‘পর’ বলতে বোঝায় পরমেশ্বর যাঁতে সব কিছুই লীন আছে, যিনি পর্যায়ক্রমে সকল কিছুরই স্রষ্টা এবং আদি কারণ, এই ঐশী সত্তা পাঞ্চরাত্রে পর-বাসুদেব নামে পরিচিত। তাঁর অন্তর্যামী রূপ এই ধারণারই ব্যাপ্তি। এই দুই বিষয় ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছেঃ

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ১০।৮

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ১০।২০

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌॥ ১০।৩৯

ঈশ্বরঃ সর্বভূতনাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ম্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

বিভব কথাটির অর্থ 'বিশিষ্ট রূপে আবির্ভাব'। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর পার্থিব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন, এবং সেজন্যই তাঁর বিভব রূপের অপর নাম অবতার। গীতায় এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৫-৮

উপাস্য দেবতার শেষ রূপটি তাঁর অর্চা রূপ। অর্চার অর্থ পূজার যোগ্য প্রতিমা। ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে বিশেষ কোন আলোকপাত করা হয়নি। কিন্তু পাঞ্চরাত্র সংহিতাসমূহে এ প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

পাঞ্চরাত্র আগম বা সংহিতার সংখ্যা দুশোরও বেশি যদিও প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা অনেক কম। কয়েকটি প্রধান পাঞ্চরাত্র সংহিতা হল পৌষ্কর, বারাহ, ব্রহ্ম, নারদ, সাত্বত, বিশ্বকসেন, জয়, অহির্বুধ্ন্য, পরমেশ্বর, সনৎকুমার, পরম, পদ্মোধব, মহেন্দ্র, কান্ব, পাদ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি। প্রতিটি পাঞ্চরাত্র সংহিতাই মূলত চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যেগুলিকে বলা হয় পাদ। এগুলি হল চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শৈব আগমগুলিরও বিষয়বস্তু ওই চার ভাগে বিভক্ত।

৮। বিষ্ণুর অবতারসমূহ

পাঞ্চরাত্রিকদের বিভব কল্পনার মধ্যে অবতারতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। ব্যূহবাদের মধ্যেও তার কিছুটা ইঙ্গিত আছে। বিষ্ণুর অবতারতত্ত্বের ধারণার উপর বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব কিছুটা বর্তমান। জৈনধর্মের চব্বিশজন তীর্থংকর অথবা বুদ্ধের নানারূপে জন্মগ্রহণের কাহিনীসমূহ, বুদ্ধবংশের ধারণা অর্থাৎ অতীত বর্তমান-ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের কল্পনা, বৈষ্ণব অবতারবাদের মূলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যে সকল চরিত্র বিষ্ণুর অবতার হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন তাঁদের কারো কারো উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মৎস্য, কূর্ম এবং বামনের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান১ যদিও সেগুলির সঙ্গে বিষ্ণুর অবতারত্বের কোন যোগ নেই। মহাভারতের শান্তি পর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে চারজন অবতারের কথা উল্লিখিত হয়েছে যাঁরা হচ্ছেন বরাহ, বামন, নরসিংহ এবং মানব অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণ।২ অন্যত্র, ওই একই গ্রন্থে, রাম ভার্গব এবং রাম দাশরথি যুক্ত হয়ে ছয়জন অবতারের

১। শতপথ ব্রাহ্মণ ১, ২, ৫; ১৪, ১, ২; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭, ১, ৫; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১, ১, ৩; ইত্যাদি।

২। মহাভারত ১২, ৩৪৯, ৩৭।

সৃষ্টি হয়েছে,১ এবং অপর এক স্থলে আরও চারজন হংস, কূর্ম, মৎস্য ও কল্কি—যোগ হয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ-এ।২ মৎস্য পুরাণে৩ তিনজন দেবাবতার—নারায়ণ, নরসিংহ ও বামন—এবং সাতজন মনুষ্যাবতার—দত্তাত্রেয়, মান্ধাতৃ, রাম-জামদগ্ন্য, রাম-দাশরথি, বেদব্যাস, বুদ্ধ ও কল্কি উল্লিখিত হয়েছেন। ওই একই তালিকা বায়ু-পুরাণেও৪ বর্তমান তবে সেখানে বুদ্ধের স্থলে কৃষ্ণ উল্লিখিত। হরিবংশে৫ দশাবতারের যে তালিকা আছে তাতে মৎস্য, কূর্ম, একজন রাম ও বুদ্ধের পরিবর্তে পদ্মা, দত্তাত্রেয়, কেশব ও ব্যাসের নাম আছে। ভাগবত পুরাণে চারটি তালিকা আছে।৬ প্রথম তালিকায় বলা হয়েছে অবতার অগণ্য, তবে কিছু নাম দেওয়া আছে যেমন ব্রহ্মা, বরাহ, নারদ, নর, নারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, নরসিংহ বামন, রাম-জামদগ্ন্য, বেদব্যাস, রাম-দাশরথি, রাম-হলধর, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। অগ্নিপুরাণ৭ ও বরাহপুরাণের৮ মতে অবতার অগণ্য, তবে এ দুটি পুরাণেও বুদ্ধ ও কল্কিসহ মাত্র দশজনেরই নাম আছে। গরুড় পুরাণে৯ উনিশজন অবতারের নাম আছে যাঁরা হচ্ছেন মৎস্য, ত্রিবিক্রম, বামন, নরসিংহ, রাম, বরাহ, নারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়গ্রীব, মকরধ্বজ, নারদ, কূর্ম, ধন্বন্তরি, শেষ, যজ্ঞ, ব্যাস, বুদ্ধ ও কল্কি। একাদশ শতকের কাশ্মীরী লেখক ক্ষেমেন্দ্রের দশবতার চরিত্র গ্রন্থে বুদ্ধকে অবতার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের তালিকাটিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এতে কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলা হয়েছে, এবং এই তালিকায় আছেন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম-ভার্গব, রাম-দাশরথি, রাম-হলধর, বুদ্ধ ও কল্কি।

উপরিউক্ত অবতারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। পশ্চিম ভারতে পরশুরামের পূজার ব্যাপকতা লেখমালার দ্বারা সমর্থিত। শক ঋষভ দত্তের নাসিক লেখে সুর্পারকের নিকট (বর্তমান সোপারা, থানা জেলা, মহারাষ্ট্র) রাম তীর্থের উল্লেখ আছে যা পরশুরাম বা রাম-জামদগ্ন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।১০ কালিদাসের রঘুবংশে দাশরথি-রামকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে। পঞ্চম শতকের বাকাটক রানী প্রভাবতী গুপ্তা ভগবৎ রামগিরি স্বামীর ভক্ত ছিলেন, যিনি দাশরথি রামের সঙ্গে অভিন্ন। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়১১ রামচন্দ্রের মূর্তি নির্মাণের কায়দাকানুন বর্ণিত হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লেখে পরোক্ষভাবে বামনাবতারের উল্লেখ আছে।১২ কিন্তু যে অবতার সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন বরাহ। রাজা তোরমানের আমলের এরাণ লিপি (আঃ ৫০০ খৃীঃ) একটি প্রস্তর নির্মিত বরাহের উপরেই উৎকীর্ণ, যাতে বরাহ-রূপী নারায়ণের মন্দির নির্মাণের কথা বলা হয়েছে।১৩ বুধগুপ্তের সময়কার (৪৭৭-৯৫ খৃীঃ) উত্তরবঙ্গের দামোদরপুর লেখে শ্বেতবরাহস্বামী এবং কোকামুখীস্বামীর

১। ১২, ৩৩৯, ৭৭-৯৯। ২। ১২, ৩৩৯, ১০৪।
৩। ৪৭, ২৩৭-৪৮। ৪। ৯৮, ৭১-১০৪।
৫। ১, ৪১; ব্রহ্মপুরাণ ২১৩।
৬। ১, ৩; ২, ৭; ৬, ৮; ১১, ৪।
৭। ১-১৬। ৮। ৩৯-৪৮। ৯। ১, ২০২।
১০। D. C. Sircar, *Select Imscriptions* I. 161.
১১। ৫৮, ৩০
১২। *Corpus Inscriptionum Indicarum* III. 56.
১৩। Sircar, *op. cit.*, I. 396 f.

উল্লেখ করা হয়েছে যাঁরা উভয়ই বরাহ অবতার।১ দক্ষিণ ভারতেও বরাহ অবতারের জনপ্রিয়তা ছিল। বাদামির চালুক্য রাজাদের পারিবারিক প্রতীকই ছিলেন বরাহ। ভারতের ধর্মীয় ভাস্কর্যে বরাহের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্তযুগের লেখমালায় সংকর্ষণ বা বলরাম অবতার হিসাবে বড় উল্লিখিত হয়নি, তবে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়২ বলদেব, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার সম্মিলিত মূর্তি নির্মাণের বিধিসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

৯। বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি

মূলত ভারতে গুপ্তবংশীয় রাজাদের আমল থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিপত্তি দেখা যায়। গুপ্তরাজারা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এবং তাঁদের পারিবারিক চিহ্ন ছিল গরুড়। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে অচিন্ত্যপুরুষের উল্লেখ আছে যা দিয়ে নিঃসন্দেহে বিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে পরমভাগবত বলে পরিচিত করেছেন, তাঁর চক্রবিক্রম ধরনের মুদ্রায় তাঁকে বিষ্ণুর কাছে দান গ্রহণকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে।৩ প্রথম কুমারগুপ্তের গধবা লেখে বিষ্ণুকে শুধুমাত্র ভগবৎ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।৪ ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এরাণ লিপিতে বিষ্ণুকে জনার্দন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বেই ভারতের বাইরে নেপালে চাঙ্গু-নারায়ণের পুজা প্রবর্তিত হয়েছিল। ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দের মান্দাসোর লিপিতে কৃষ্ণের শক্র উৎসবের কথা উল্লিখিত হয়েছে।৫ ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দের গঙ্গধর লিপিতে কৃষ্ণের (মধুসূদন) নিদ্রার কাহিনী বলা হয়েছে।৬ এই সকল লেখের সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্ম ও বিষ্ণু সংক্রান্ত কাহিনীগুলি সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ ভারতেও ভাগবত ধর্মের প্রসার ঘটেছিল সুপ্রাচীন কাল থেকেই। আমরা ইতিপূর্বেই কৃষ্ণা জেলা থেকে প্রাপ্ত চিন্না লেখের উল্লেখ করেছি যা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের এবং যেখানে বাসুদেব পুজার উল্লেখ করা হয়েছে। গুণ্টুর থেকে প্রাপ্ত চতুর্থ শতকের একটি লেখে নারায়ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।৭ সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য দেশ সম্পর্কে মেগাস্থেনেস মন্তব্য করেছিলেন যে সেখানকার রাণী হেরাক্লেসের (বাসুদেব কৃষ্ণের) কন্যা হিসাবে বিবেচিতা ছিলেন। এই ঐতিহ্য সম্ভবত ওই এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সূচিত করে। পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানীর নামও মথুরা (মাদুরা, মথুরারই দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চারণ, এবং দক্ষিণের মথুরা হিসাবেই মাদুরার প্রতিষ্ঠা)। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে কৃষ্ণ ও বলদেবের জনপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। দক্ষিণের আড়বার সাধকরা বৈষ্ণব ধর্মকে প্রায় সেখানকার জাতীয় ধর্ম করে তুলেছিলেন যা আমরা পরে দেখব। আদি পল্লব ও পশ্চিমী গঙ্গ রাজারা ভাগবত ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। একথা কদম্বদের ক্ষেত্রেও সত্য।

১। *ibid* 323.
২। ৫৮, ৩৭-৩৯।
৩। *Journal of the Numismatic Society of India*, X. 104.
৪। *Corpus Inscriptionum Indicarum*, III, 41.
৫। Sircar, *op. cit.*, I. 377 ff.
৬। *ibid*, 379 ff. ৭। *ibid*, 443 ff.

খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের একটি কদম্ব লেখে হরিকে জগৎ-প্রবৃত্তি-সংহার-সৃষ্টি-মায়াধর বলা হয়েছে। চালুক্য রাজারা নিজেদের বিষ্ণুর অবতার বলে দাবি করতেন এবং শ্রী-পৃথিবী-বল্লভ উপাধি গ্রহণ করতেন।

বিষ্ণুর প্রণয়িনী শ্রী বা লক্ষ্মী কোশাম্বী, উজ্জয়িনী, অযোধ্যা ও মথুরা থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহে উৎকীর্ণা হয়েছেন, এমন কি পান্তালিয়ন, আগাথোলেস, ময়েস, আজিলাইসেস প্রমুখ বৈদেশিক রাজাদের মুদ্রাতেও তিনি বর্তমান।১ গজলক্ষ্মী অর্থাৎ হস্তী কর্তৃক লক্ষ্মীদেবীকে জলসিঞ্চনের দ্বারা অভিষেক একটি সর্বজন গ্রাহ্য ধর্মীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছিল যা অজস্র মুদ্রা, শীল ও ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ।

ভারতবর্ষের বাইরেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। জাভার চি-আরুটন প্রস্তর লিপিতে (খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতক) রাজা পূর্ণবর্মা নিজেকে বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।২ আন্নামের প্রাচীন চম্পা রাজ্যের খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের মাইসন লিপিতে অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণু উল্লিখিত হয়েছেন।৩ লেখমালার সাক্ষ্য থেকে আরও জানা যায় শ্রীলক্ষ্মী চম্পায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং সেখানকার কোন কোন রাজা ভারতীয় প্রথা অনুসারে নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষণা করতেন। খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে কাম্বোডিয়ায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন হয়। দক্ষিণ কাম্বোডিয়ার ত্রেয়াঙ্গ প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত নেক-তা-দামবাঙ্গ-দেক লেখটি বিষ্ণুর বন্দনা দিয়েই শুরু হয়েছে যেখানে তাঁর পত্নী শ্রীও উল্লিখিতা হয়েছেন। থাপ-মুসি লেখে চক্রতীর্থ স্বামী নামক বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।৪ তবে বিষ্ণুর চেয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শিব অধিকতর প্রাধান্য অর্জন করতে পেরেছিলেন।

১০। তামিল দেশের আড়বার বা বৈষ্ণব সাধকগণ

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রবন্ধম নামক প্রাচীন তামিল সংকলনে যেখানে আড়বার নামক বৈষ্ণব সাধকগণ রচিত চার হাজারেরও বেশি সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। আড়বারদের সঙ্গীতে নারায়ণ ও কৃষ্ণ ছাড়াও, দাশরথি-রাম, বলরাম, বামন, প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতারেরাও স্থান পেয়েছেন। গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনীর সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। জনৈকা মহিলা সাধক আণ্ডাল নিজেকে গোপী হিসাবে কল্পনা করেছেন এবং প্রেমিক হিসাবে বেছে নিয়েছেন বিষ্ণু রঙ্গনাথকে, যিনি শ্রীরঙ্গম মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা। এই আড়বার সাধকেরাই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব আচার্যদের পথ করে দিয়েছিলেন, যেসব আচার্যদের মধ্যে নাথমুনি, পুণ্ডরী-কাক্ষ, যামুনাচার্য প্রভৃতির নাম বৈষ্ণব ঐতিহ্যে রীতিমত পবিত্র।

আড়বাররা মূলত ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুযায়ী তামিল ভূমিতে বারোজন আড়বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁদের নাম যথাক্রমে পোইগই-আড়বার বা সরযোগী, ভূতাত্তাড়বার বা ভূতযোগী, পেই-আড়বার বা মহদ্‌যোগী, বা ভ্রান্তযোগী, তিরুমড়িশাই আড়বার বা ভক্তিসার,

১। Banerjea, *op. cit.*, 151.
২। Sircar, *op. cit.*, 468.
৩। *ibid*, 474.
৪। R. C. Majumdar, *Kambujadesa*, 1944, 30, 40-42.

নম্মাড়বার বা শকটকোপ, মধুরকবি, কুলশেখর, পেরিয়াবাড় বা বিষ্ণুচিত্ত, তৎকন্যা আণ্ডাল বা গোদা, তোণ্ডরডিপ্পোড়ি বা ভক্তাংঘ্রিরেণু, তিরুপ্পান-আড়বার বা যোগিবাহণ এবং তিরুমঙ্গই আড়বার বা পরকাল। প্রথম চারজন আড়বারের জন্ম পল্লবরাজ্যে এবং শেষের তিনজনের চোলরাজ্যে। সপ্তমজন কেরল থেকে এসেছিলেন এবং বাকি সকলে পাণ্ড্যদেশের। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তালিকার অষ্টমজন অর্থাৎ পেরিয়াড়বার ছিলেন ব্রাহ্মণ, ভিন্ন ঐতিহ্য অনুযায়ী পারিয়া। পঞ্চমজন অর্থাৎ নম্মাড়বার ছিলেন বেড়্ড়ার জাতিভুক্ত। সপ্তম আড়বার কুলশেখর ছিলেন একজন রাজা, পক্ষান্তরে দ্বাদশতম আড়বার তিরুমঙ্গই ছিলেন ডাকাত পরিবারের মানুষ।

প্রথম তিনজন আড়বার সম্পর্কে এত কম জানা যায় যে তাঁদের চরিত্র পরবর্তী ঐতিহ্যে অনেকটা কাল্পনিক হয়ে গেছে। তাঁরা প্রত্যেকে একশোটি করে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে প্রকাশ। তাঁরা বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষিত হয়েছেন। চতুর্থজন অর্থাৎ তিরুমড়িশাই পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মার (আঃ ৬০০-৬৩০ খৃীঃ) সমকালীন। পঞ্চমজন অর্থাৎ নম্মাড়বার চার খণ্ডে তেরশত সঙ্গীত রচনা করে-ছিলেন যার মধ্যে ১১০২টি সঙ্গীত সম্বলিত তিরুবায়মোড়ি (মুখনির্গত পবিত্র শব্দ) নালাইর-প্রবন্ধম নামক সংকলনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ অংশে স্থান পেয়েছে। ষষ্ঠজন অর্থাৎ মধুরকবি তাঁর গুরু নম্মাড়বারের উপাসক ছিলেন। সপ্তমজন ছিলেন কেরলের রাজা কুলশেখর যিনি মুকুন্দমালা নামক একটি ভক্তিমূলক সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে প্রকাশ। অষ্টমজন যিনি পেরিয়াড়বার বা বিষ্ণুচিত্ত নামে পরিচিত অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তার কন্যা আণ্ডাল যিনি আড়বারদের তালিকায় নবম, ১৭৩টি প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। দশম আড়বার তোণ্ডরডিপ্পোড়ি দুটি ছোট সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং একাদশতম আড়বার তিরুপ্পন লিখেছিলেন মাত্র দশটি সঙ্গীত। শেষ আড়বার তিরুমঙ্গই ছয় খণ্ডে ১৩৬১টি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা পূর্বোক্ত নালাইর-প্রবন্ধমে স্থান পেয়েছে।

১১। রামানুজঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদঃ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়

দক্ষিণ ভারতের আড়বার সম্প্রদায় যে ভক্তিমূলক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন, তা অবলম্বন করে পরবর্তীকালে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম মত গড়ে ওঠে, যার প্রবক্তা নাথমুনি বা রঙ্গনাথাচার্য। একাদশ শতকের এই সাধক বিখ্যাত নম্মাড়বার বা শটকোপের পদাবলীর সঙ্কলন করেন, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করে ন্যায়তত্ত্ব নামক একট গ্রন্থ রচনা করেন, যা শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের একটি মূল গ্রন্থ। এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী দুই আচার্য ছিলেন পুণ্ডরীকাক্ষ এবং রামমিশ্র। শেষোক্তের উত্তরাধিকারী হন নাথমুনির পৌত্র যামুনাচার্য, যিনি কার্যত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের নাম সিদ্ধিত্রয়, আগম প্রামাণ্য, গীতার্থসংগ্রহ, মহাপুরুষনির্ণয় এবং স্তোত্ররত্ন।

যামুনাচার্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন রামানুজ (১০১৬-১১৩৭ খৃীঃ) যিনি শুধু শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন না, বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী ভাষ্য রচনা করে এদেশের দার্শনিকমণ্ডলীর মধ্যেও একটি বড় স্থান অধিকার করেছেন। এই ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। তাঁর অপরাপর রচনাবলীঃ গীতাভাষ্য, বেদান্তসার, বেদার্থ-সংগ্রহ ও বেদান্তদীপ।

রামানুজের কিছুকাল পূর্ব থেকেই বৈষ্ণব ধর্মকে বেদান্তভিত্তিক করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বেদান্ত সূত্রের শঙ্করাচার্য কৃত ভাষ্য অনুযায়ী ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সদ্বস্তু নেই, অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র অস্তিত্ববান সত্তা যার অতিরিক্ত কিছু নেই, পরদৃশ্যমান বস্তুজগৎ আসলে মিথ্যা, অলীক। এই তত্ত্বের উপর কোন ভক্তিবাদকে দাঁড় করানো দুঃসাধ্য। শঙ্কর কথিত এই ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ এবং এত বেশি প্রসিদ্ধ যে বেদান্তকেই সচরাচর অদ্বৈতবেদান্ত বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বেদান্তের দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও আছে যা অনুযায়ী ব্রহ্ম ও জীব বা বস্তুজগতের মধ্যে চিরন্তন বৈলক্ষণ্য ও ভেদ বর্তমান। রামানুজের ব্যাখ্যা এই উভয়ের মাঝামাঝি এবং এই কারণেই তার নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এখানে চরম অদ্বয়বাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সমন্বয় করার চেষ্টা হয়েছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই কথা বলার প্রয়াস পায় যে জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ স্বরূপ। ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ সর্ববস্তুর উৎপত্তিস্থল। সর্বভূতে তিনি অন্তর্যামীস্বরূপ বর্তমান এবং একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাতীতও বটে।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হলেও তাঁর তিন প্রকার রূপভেদ আছে যথা ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা। এই তিনটি নিত্য সত্তা হচ্ছে চিৎ (জীবাত্মা), অচিৎ (জড়জগৎ) এবং ঈশ্বর (পরমাত্মা)। জীব ভোক্তা, জড়জগৎ ভোগ্য এবং ঈশ্বর প্রেরিতা। জীবাত্মা এবং জড়জগৎ ঈশ্বরের বিশেষণ। পরমাত্মা বা ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে সূক্ষ্মাবস্থায় বিরাজমান থাকেন, সৃষ্টিকালে নিজেকে বিশ্বচরাচর রূপে ব্যক্ত করেন। তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারক। তিনি একই সঙ্গে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এবং যৌগিক সত্তা যেখানে জড়জগৎ জীবাত্মা তাঁর দেহের অঙ্গীভূত। তিনি সর্বদোষমুক্ত এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তের নিকট তিনি পঞ্চরূপে ব্যক্ত—পরা, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী এবং প্রতিমা।

১২। বড়কলই ও তেন্‌কলই

রামানুজের মৃত্যুর পর শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বড়কলই ও তৈন্‌কলই। শব্দ দুটির অর্থ উত্তর দেশীয় বিদ্যা ও দক্ষিণ দেশীয় বিদ্যা। এই দুটি উপসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার ঐতিহ্য পৃথক, সাধনমার্গ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও পার্থক্য আছে।

বড়কলই উপসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা নিম্নরূপঃ রামানুজ, কুরুকেশ, বিষ্ণুচিত্ত, বরদাচার্য, আত্রেয় রামানুজ, বেদান্ত দেশিক। শেষোক্তজন (১২৬৯-১৩৭০ খ্রীঃ) মনীষা ও বিচক্ষণতায় রামানুজের সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাতা এবং শতাধিক গ্রন্থের লেখক বেদান্ত দেশিক কবিতার্কিকসিংহ, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, বেদান্তাচার্য প্রভৃতি উপাধি পেয়েছিলেন।

তেন্‌কলই উপসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা নিম্নরূপঃ রামানুজ, এম্বার, পরাশরভট্ট, নাঞ্জিয়ার, নাম্‌পিল্লাই, কৃষ্ণপাদ, পিল্লাই লোকাচার্য। শেষোক্তজন বেদান্ত দেশিকের সমকালীন ছিলেন।

বড়কলইরা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধিকতর প্রামাণ্য স্বীকার করতেন, তেন্‌কলইরা তামিলের। বড়কলইরা ভক্তির ক্ষেত্রে মর্কটমার্গে বিশ্বাসী ছিলেন। যেমন বানরশিশু মাতৃবক্ষকে আঁকড়ে থাকে, ভক্তের উচিত সেভাবে ঈশ্বরকে আঁকড়ে থাকা। পক্ষান্তরে তেন্‌কলইরা মার্জারমার্গে বিশ্বাসী। তাঁদের বক্তব্য বিড়ালশাবককে

যেমন তার মা মুখে করে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার সময় শাবকটি যেমন নিশ্চেষ্ট থাকে, ভক্তেরও সেই রকম নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত। তেন্‌কলইরা আচার-অনুষ্ঠান এবং জাতিভেদে বিশ্বাস করেন না। এই উপসম্প্রদায়ের পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা শ্রীমনবল মহামুনি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৩। নিম্বার্ক ঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ঃ সনকাদি সম্প্রদায়

নিম্বার্ক ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের বেলারি জেলার তেলুগু ব্রাহ্মণ যিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় হলেও তিনি বৃন্দাবনে বাস করতেন এবং তাঁর অনুগামীরা অধিকাংশই উত্তর ভারতীয় ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় সনক সম্প্রদায় নামে পরিচিত যাঁরা কপালে গোপীচন্দনের তিলক, দুটি লম্ব ও মধ্যে একটি কৃষ্ণবিন্দু, তুলসীর মালাও ধারণ করতেন।

নিম্বার্ক বেদান্ত সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তার নাম বেদান্ত পারিজাত সৌরভ।১ এছাড়া তিনি দশটি শ্লোক সম্বলিত সিদ্ধান্তরত্ন নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন যা সাধারণত দশশ্লোকী নামে পরিচিত।২ তাঁর দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামে কথিত যা অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের সংমিশ্রণ। এই মতে বলা হয়, ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ একই সময়ে পরস্পর হতে অভিন্ন এবং পরস্পর হতে পৃথক্‌। জীব ও জড় ঈশ্বর হতে ভিন্ন নয় কারণ এরা তাঁর উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অন্যদিকে এদের পরস্পরের পার্থক্যও অস্বীকার করা যায় না যেহেতু বেদান্তেই বলা হয়েছে যে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ পরমব্রহ্মের তিনটি বিভিন্ন রূপ।

তাহলে নিম্বার্ক অন্যান্য বৈষ্ণব বৈদান্তিকদের ন্যায় ত্রিতত্ত্ববাদী। এই তিনটি তত্ত্ব হল ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ সমভাবে নিত্য ও সত্য। সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হলেন ব্রহ্ম যিনি কৃষ্ণ বা হরি। এই ব্রহ্ম চিদচিদ্‌ বিশিষ্ট বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সাধারণত উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ভিন্ন হয়, মৃন্ময় ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার এক নয়। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই একাধারে জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরিণাম বিশেষ মাত্র।

নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রপত্তিমার্গের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যার মূল কথা ঈশ্বর নিজ করুণা ও মহিমায় ভক্তকে দেখবেন। এ দিক থেকে নিম্বার্ক সমর্থিত ধর্মবিশ্বাস শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তেন্‌কলই শাখার ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ। তবে একটি বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ে পার্থক্য আছে। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু নারায়ণ এবং তাঁর শক্তিত্রয় শ্রী, ভূ এবং লীলা। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা গোপীজনবল্লভ গোপালকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনী শক্তি রাধা।

নিম্বার্কের শিষ্য আচার্য শ্রীনিবাস বেদান্তপারিজাত-সৌরভের একটি ভাষ্য রচনা করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ত্রয়োদশ আচার্য, দেবাচার্য সিদ্ধান্তজাহ্নবী নামক গ্রন্থের লেখক। পরবর্তী আচার্য সুন্দরভট্ট এই গ্রন্থের একটি ভাষ্য রচনা করেন

১। সম্পাদনা ধুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী, ১৯৩২।

২। পুরুষোত্তমকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ভাষ্য সমেত সম্পাদনা রত্নগোপাল ভট্ট ১৯০৭।

যার নাম সেতু। ত্রিংশতম আচার্য কেশব কাশ্মীরী ব্রহ্ম বা বেদান্তসূত্রের আর একটি ভাষ্য রচনা করেন। বত্রিশতম আচার্য হরিব্যাসদেব নিম্বার্কের দশশ্লোকীর ভাষ্য রচনা করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায় উত্তর ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান। মথুরা ও বঙ্গদেশে তাঁদের অধিকতর সংখ্যায় পাওয়া যায়।

১৪। মধ্ব ঃ দ্বৈতবাদ ঃ ব্রহ্মসম্প্রদায়

মধ্ব মহীশূরের উদিপি তালুকের অন্তর্গত কল্লিয়ানপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর দীক্ষা হয় অচ্যুতপ্রেক্ষানন্দের নিকট। প্রথম জীবনে তিনি শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে ঈশ্বর ও চেতনসম্পন্ন জীব, ঈশ্বর ও জড়জগৎ, জীব ও জড়-জগৎ, এক জীবসত্তা ও অন্য জীবসত্তা এবং একটি জড়পদার্থ ও অপর জড়পদার্থের মধ্যে চিরন্তন পার্থক্য বর্তমান। ইষ্টদেবতা হিসাবে মধ্ব বিষ্ণু ও তাঁর শক্তি লক্ষ্মীকে স্বীকার করতেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং ৩৭ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, যার মধ্যে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, অণুব্যাখ্যান, বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, তন্ত্রসার, তন্ত্রসংখ্যান, তন্ত্রবিবেক, সদাচার-স্মৃতি, মহাভারত-তাৎপর্য নির্ণয়, ভাগবত-তাৎপর্য, উপনিষদ-ভাষ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মধ্বের মতে ব্রহ্ম বা বিষ্ণু নিত্য ও অপরিহার্য। ব্রহ্মই সব কিছুর কারণ, এভাবে দেখলেই তিনি বুদ্ধিগম্য হন। চেতন আত্মা অথবা বিষয়ীসমূহ এবং বস্তু-সমূহ নিয়ে জগৎ গঠিত হয়। জীবাত্মা বহু যারা আটটি অবস্থার মধ্য দিয়ে গমন করে যেগুলি হল অস্তিত্ব, ধ্বংস, সাপেক্ষ, অবস্থিতি, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধন ও মুক্তি। জীবাত্মা ও বস্তুজগৎ পরতন্ত্র এবং সেই হিসাবে নিজে থেকে এরা কিছুই ঘটাতে পারে না। কেবল ব্রহ্মেরই এই শক্তি আছে, এবং সেই কারণে তিনি স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু পূর্ণ, নির্দোষ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় এবং সকলের গম্য।

মধ্বের চার শিষ্য—পদ্মনাভতীর্থ, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্থ ও অক্ষোভ্যতীর্থ। তাঁদের দ্বারা প্রবর্তিত সম্প্রদায় ব্রহ্মসম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের আরও দুটি নাম আছে—মাধ্ব ও সদ্বৈষ্ণব। দক্ষিণ ভারতে এই সম্প্রদায়ের প্রসার, বিশেষ করে উদিপিনগর। যেখানে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আটটি মঠ আছে। পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায় দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, ব্যাসকূট ও দশকূট। প্রথম শাখাটি শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বড়কলইর মতই রক্ষণশীল। এই সম্প্রদায় সংস্কৃতে লিখিত ভাষ্যসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই শ্রেণীর কতিপয় রচনা হচ্ছে মণিমঞ্জরী, মাধ্ববিজয়, বায়ুস্তুতি প্রভৃতি। দ্বিতীয় শাখাটি তেন্‌কলইর মতই উদারপন্থী, এবং কন্নড় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিকেই তাঁরা প্রামাণ্য মনে করতেন। মধ্ব সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন জয়তীর্থ (চতুর্দশ শতক) এবং বিদ্যা-ধিরাজ (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক)।

১৫। বল্লভ ঃ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ঃ রুদ্র সম্প্রদায়

নাভাজীর ভক্তমালে বিষ্ণুস্বামী নামক একজন আচার্যের কথা আছে যাঁর শিষ্য ছিলেন জ্ঞানদেব, নামদেব, ত্রিলোচন এবং বল্লভ। এই বিষ্ণুস্বামী সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের মানুষ ছিলেন। তাঁর মতবাদের সঙ্গে বল্লভের মতবাদ বহুলাংশে মেলে।

বল্লভের মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত যার মূল কথা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হতে যেমন স্ফুলিঙ্গসকল বিচ্ছুরিত হয়, এবং এগুলি যেমন অগ্নিরই অংশবিশেষ তেমনই ব্রহ্ম অংশী এবং জীব, জড় জগৎ ও তাঁর অন্তর্যামী রূপ তাঁরই অংশত্রয়। বল্লভের মতে কৃষ্ণই চরমসত্তা। তিনিই উপনিষদে ব্রহ্ম ও ভাগবতে পরমাত্মা নামে পরিকীর্তিত।১ তিনি এক ও অদ্বিতীয়, নিত্য, অপরিণামী ও সর্বজ্ঞ, জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। সমস্ত জীবাত্মা তাঁর থেকেই নির্গত এবং তিনি তাদের থেকে ভিন্ন নন। তিনি জগৎ ও জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপত অভিন্ন। ব্রহ্ম সম্পূর্ণ শুদ্ধ এবং মায়ার মত কোন কিছুর দ্বারাই তিনি আবিষ্ট হন না।২

বল্লভের জন্ম ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কণকরব নামক তেলুগুভাষী অঞ্চলে। তিনি অধিকাংশ সময়ই মথুরা, বৃন্দাবন ও বারাণসীতে বাস করতেন। শ্রীনাথজী মন্দির তাঁরই নির্দেশে নির্মিত হয়। বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রচারের ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম ভারত। বল্লভ পুষ্টিমার্গের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করতে হলে দৈহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অবহেলা করার প্রয়োজন নেই। পরমাত্মা ও জীবাত্মায় যখন কোন প্রভেদ নেই, জীব যদি নিজেকে বঞ্চিত করে তাহলে প্রকারান্তরে পরমেশ্বরকেই নিগৃহীত করা হবে। বল্লভ ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করেছিলেন তা অণুভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। এছাড়া সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবত-টীকাসুবোধিনী প্রভৃতি তাঁর রচনা। বল্লভপন্থীরা বিষ্ণুর দ্বাদশ রূপের প্রতীক দ্বাদশটি গোপিচন্দন চিহ্ন ধারণ করেন। বল্লভ জাতিভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না।

বল্লভের মতে ভগবান কৃষ্ণ রস, আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ রূপ, তিনি শৃঙ্গার রসের আধার। গোপীরা কৃষ্ণের জন্য উন্মত্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রেমের বেদীতে সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিল। প্রেমিক-প্রেমিকার ঐকান্তিক প্রেমের মধ্য দিয়েই জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড়তম সংযোগ সম্ভব। রাধা এই প্রকার প্রেমেরই প্রতিমূর্তি। নারীসুলভ কমনীয়তা না থাকলে ভক্তি অসম্ভব। বস্তুত সকল জীবাত্মাই নারী এবং কৃষ্ণই তাদের স্বাভাবিক স্বামী। এই কারণেই বল্লভপন্থীরা সখীভাব আচরণ করে এবং অনেকে মেয়েদের পোশাক পরিধান করে।

বল্লভের পুত্র বিঠলনাথ এবং চুরাশিজন প্রধান শিষ্যের চেষ্টায় রুদ্রসম্প্রদায় গুজরাত ও রাজস্থানের বণিক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। বিঠল গোকুলে বাস করতেন বলে গোকুল গোসাঁইজি নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁর বংশধরেরা যাঁরা অদ্যাপি বর্তমান, গোসাঁই উপাধিধারী। এঁরা শিষ্যগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অবতার ও মহারাজ বলে পূজিত হয়ে থাকেন। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরে এঁদের আখড়া আছে। বল্লভ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুবাদ এত বেশি প্রবল যে সব কিছুই তাঁরা গুরুকে প্রথম নিবেদন করেন। ভোগবিলাসের প্রতি এঁদের প্রবল আগ্রহ থাকায়, বিশেষ করে তাঁদের পুষ্টিমার্গী মতবাদের জন্য, উত্তরকালে এই সম্প্রদায় অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বামীনারায়ণ নামক একজন বল্লভী, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি একটি পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

১। তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ১, ৬, ১৪; ২, ১১৮।
২। অণুভাষ্য ১, ১-৩; ৩, ২; শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড্য ২৬-২৯।

১৬। শ্রীচৈতন্য : অচিন্ত্যভেদাভেদ : গৌড়ীয় সম্প্রদায়

বল্লভের কর্মক্ষেত্র যেমন ছিল পশ্চিম ভারত—চৈতন্যের পূর্বভারত, বিশেষ করে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা। চৈতন্য যে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন তার ক্ষেত্র পূর্বেই প্রস্তুত করেছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী, যাঁর উনিশজন শিষ্যের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশব ভারতী, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল।

চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, মারা যান মাত্র ৪৭ বছর বয়েসে, এবং এই অল্পপরিসর আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি শুধু প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ রাধাকৃষ্ণ ভক্তির তরঙ্গ দেশের মধ্যে বইয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, কার্যত তিনি এমন একটি ধর্মবিপ্লব এনে দিয়েছিলেন যার তুলনা ইতিহাসে বিরল। তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্মে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-যবনের কোন ভেদ ছিল না।

তিনি নিজে কোন তত্ত্বমূলক গ্রন্থ লিখে যাননি, যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দশমূল-শ্লোককে চৈতন্যের নিজস্ব রচনা বলে মনে করেন। তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী ভক্তগণ সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় বৈষ্ণব তত্ত্বমূলক বহু গ্রন্থ রচনা করেন যাঁদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ, কবি কর্ণপুর, গোপালভট্ট, প্রবোধানন্দ, মুরারি গুপ্ত, রূপ ও সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরু মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তিনি নিজেকেও ওই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজে যে মত প্রচার করেছিলেন, দশমূল-শ্লোক থেকে যা মনে হয়, তা একপ্রকার ভেদাভেদবাদ যা নিম্বার্কমতের কাছাকাছি। এই মতবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে পরিচিত। চৈতন্য ও তাঁর অনুগামীরা শঙ্করাচার্যের এই মতের বিরোধী যে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র পরমতত্ত্ব। তাঁদের মতে পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সেই ব্রহ্ম যিনি সৃষ্ট জগতের প্রভুস্বরূপ এবং সৃষ্ট জীবের সঙ্গে যার প্রেম ও স্নেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চৈতন্য মতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেখানে ঈশ্বর ও তাঁর শক্তিকে কৃষ্ণ ও রাধা বলে ধারণা করা হয়েছে।

ঈশ্বর, জীবসমূহ ও জড়জগতের মধ্যে সম্বন্ধ হচ্ছে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। যুক্তিশাস্ত্রসম্মত যথাযথ ভাষায় এই সম্পর্কের বর্ণনা দেওয়া যায় না। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তির বিভিন্ন রূপ হলেও, ঈশ্বরের একটি বিশ্বাতীত স্বরূপ আছে এবং তিনি বিভিন্ন শক্তি ব্যবহার করলেও তা পূর্ণ ও অপরিবর্তিত থাকে। ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, এবং তাদের অতিক্রম করে এই সকল শক্তির সঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে নিজেকে প্রকাশিত করে থাকেন।

কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম এবং তাঁর শক্তি মায়াশক্তিরূপে বিশ্বজগৎ আচ্ছাদন করে রয়েছে। যে শক্তির বলে তিনি নিজে বহুরূপে প্রতিভাত হন তার নাম বিলাস-শক্তি যা দু'প্রকার—প্রভাববিলাস ও বৈভববিলাস। প্রথমটির বশে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলাকালে তিনি বহু কৃষ্ণে পরিণত হন, দ্বিতীয়টির বশে তিনি বাসুদেব (বুদ্ধি), সংকর্ষণ (চেতনা), প্রদ্যুম্ন (প্রেম) ও অনিরুদ্ধ (লীলা) এই চতুর্ব্যূহ রূপ পরিগ্রহ করেন। কৃষ্ণের প্রধান শক্তি প্রেম, সর্বগুণবতী শ্রীমতী রাধা এই মহান্ প্রেমভাবের মূর্ত প্রতীক বা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি।

কৃষ্ণ পরমাত্মা, অসীম ও পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ। চিৎশক্তি যুক্ত জীবাত্মা তাঁর

আণবিক অংশ। অংশী ও অংশরূপে উভয়ের ভেদ নেই বটে কিন্তু জীবাত্মার পৃথক্ সত্তার দরুন একটা ভেদের ব্যাপারও থেকে যায়। অন্যান্য কয়েকটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত চৈতন্য সম্প্রদায়ও প্রপত্তিমার্গে বিশ্বাসী। ভক্তির পাঁচটি ভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পঞ্চমুখী ঈশ্বরপ্রেমের উৎস হরি বা কৃষ্ণ, এবং তাঁর নাম-সংকীর্তনই একমাত্র অবলম্বন।

১৭। বিষ্ণু ও শক্তিঃ তান্ত্রিক প্রভাব

বিষ্ণুর সঙ্গে আদিতে যে দুজন দেবী সম্পর্কিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন শ্রী (লক্ষ্মী) ও ভূমি (পৃথিবী)। এই দুই দেবীর বিকাশ অবশ্য স্বাধীন ভাবেই হয়েছিল এবং পরে তাঁরা বিষ্ণুর সংস্পর্শে এসেছিলেন। ঋগ্বেদে পৃথিবী আকাশ-দেবতা দ্যৌঃ-এর প্রণয়িনী। স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উদ্দেশে ঋগ্বেদে একটি[১] ও অথর্ব-বেদে[২] একটি সূক্ত আছে। মহাভারতে ও পুরাণে তিনি বিষ্ণুর বরাহ রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছেন। শ্রী বা লক্ষ্মী গোড়ার দিকে তান্ত্রিক দেবী ছিলেন না, তাঁর ক্রমবিকাশ হয়েছিল ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবীরূপে, যদিও পরবর্তীকালে তান্ত্রিক ধর্মে তাঁর এক রূপ মহালক্ষ্মীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে প্রজাপতির দেহ থেকে শ্রীদেবীর উদ্ভব। তাঁর রূপ, ঐশ্বর্য ও বিবিধ গুণাবলী দেবতারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন, পরে দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করে শ্রী সেগুলি ফেরৎ পান।[৩] আদিতে সম্ভবত শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক দেবতা ছিলেন। ঋগ্বেদে প্রাচুর্য অর্থে লক্ষ্মী শব্দটি বর্তমান, এবং অথর্ববেদে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর অর্থভেদ করা হয়েছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় স্ত্রী ও লক্ষ্মীকে আদিত্যের দুই সপত্নী বলা হয়েছে। সিরিমা বা সিরিদেবী এবং লক্খী বৌদ্ধধর্মেও বর্তমান। মুদ্রা, সীল ও ভাস্কর্যে এই দেবীর মূর্তি দেখা যায়, পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান মূর্তিতে। আর একটি প্রচলিত ভঙ্গীর নাম গজলক্ষ্মী যেখানে দুটি হস্তীর জলসেচনের দ্বারা তাঁকে অভিষিক্ত হতে দেখা যায়। সৌভাগ্যের দেবী হিসাবে তিনি রাজলক্ষ্মী, নগরলক্ষ্মী, ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিতা।

মহাভারতে[৪] ও রামায়ণে[৫] শ্রী ও লক্ষ্মী একসঙ্গে স্তুত হয়েছেন, এবং উভয়ের সমীকরণ হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের কাহিনী থেকেই জানা যায় যে লক্ষ্মী গোড়ায় বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিতা ছিলেন না, সমুদ্র থেকে ওঠবার পর তিনি বিষ্ণুর ভাগে পড়েন। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে লক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্নী হিসাবে উল্লিখিত। প্রকটাদিত্যের সারনাথ লিপিতে তিনি বাসুদেবের পত্নী হিসাবে কল্পিত। অজস্র লেখমালায় শ্রী বা লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রণয়িনী। বিষ্ণুর দ্বিতীয় পত্নী পৃথিবী শরভ-পুরের রাজাদের লিপিতে বৈষ্ণবী হিসাবে উল্লিখিত। বিষ্ণুর ধ্যানে তাঁকে ইন্দিরা-বসুমতী-সংশোভি-পার্শ্বদ্বয় বলা হয়েছে। বিষ্ণুভক্ত (পরমভাগবত) চালুক্য রাজারা শ্রীপৃথিবীবল্লভ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পুরাণসমূহে শ্রী বা লক্ষ্মী পাকাপাকিভাবেই বিষ্ণুর স্ত্রী, বিশেষ করে বিষ্ণুর নারায়ণ রূপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের ধারণায় লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর সম্পর্ককে একটি তাত্ত্বিক

১। ৫, ৮৪; ২। ১২, ১; ৩। শতপথ ব্রাহ্মণ ১১, ৪, ১;
৪। ৩, ৩৭, ৩৩; ৫। ৩, ৪৬, ১৬।

আকার দিয়েছে, এবং এই দুই দেবতা সৃষ্টির নারী ও পুরুষ আদর্শরূপে কল্পিত হয়েছেন। শাক্ত ধর্মের শক্তির ধারণায় লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন।

শাক্ত ধর্ম কিভাবে বৈষ্ণব দেবদেবীকে আত্মসাৎ করার প্রয়াস পেয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যাবে মহাভারতের দুটি দুর্গাস্তবে ও হরিবংশের আর্যাস্তবে। মহাভারতে দুর্গাকে বাসুদেব-কৃষ্ণের ভগিনী ও নন্দগোপকুলোদ্ভবা বলা হয়েছে।১ হরিবংশের আর্যাস্তবেও তাঁকে লক্ষ্মী, বলদেবের ভগিনী, নন্দগোপসুতা প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের (যা সচরাচর চণ্ডী নামে পরিচিত, শাক্তদের বাইবেল) সাক্ষ্য আরও চিত্তাকর্ষক। এখানে দেবী বৈষ্ণবী শক্তি। এই বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া যাঁর প্রেরণায় বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে বধ করেছিলেন। পরে যখন শুম্ভ-নিশুম্ভ ও মহিষাসুর বিনাশকারী দেবী অপরাপর দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়েছেন, তখন তাঁকে যা বলে সম্বোধন করেছিলেন তা হচ্ছে নারায়ণী। শিবের স্ত্রী পার্বতী হিসাবে শাক্ত দেবীর যতটা প্রসিদ্ধি আছে, ঠিক ততটা না হলেও নারায়ণী বা কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনী হিসাবেও তাঁর কিছু খ্যাতি বর্তমান। কৃষ্ণ-বলরামের এই ভগিনী রূপটি একানংশা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, যাঁর প্রসঙ্গে বরাহমিহির বলেছেনঃ কৃষ্ণবলদেবয়োর্মধ্যে একানংশা কার্যা।২ ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দিরস্থ গর্ভগৃহে কৃষ্ণবলরামের মধ্যস্থিত এই মূর্তি আজও বর্তমান। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ বলরামের মধ্যবর্তী ইনিই সুভদ্রা। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের বলদেব একানংশা কৃষ্ণের একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে। কিভাবে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনা বৈষ্ণবদের প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ খ্রীষ্টীয় ৪২৩-২৪ অব্দের একটি শিলালেখ যা মধ্যপ্রদেশের গাঙ্গধার নামক গ্রামে পাওয়া গেছে। এই লেখ থেকে জানা যায় যে, প্রথম কুমারগুপ্তের সামন্তরাজ বন্ধুবর্মনপুত্র বিশ্ববর্মনের ময়ূরাক্ষক নামক জনৈক মন্ত্রী, যিনি ভাগবত ছিলেন এবং বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন (বিষ্ণোঃ স্থানমকারয়ৎ ভাগবতম্ শ্রীমান ময়ূরাক্ষকঃ), একটি মাতৃকামন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন যা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, ডাকিনী-নৃত্য প্রভৃতির দ্বারা মুখরিত থাকত। একই সঙ্গে জনৈক বিষ্ণুভক্ত কর্তৃক বিষ্ণু ও মাতৃকামন্দির নির্মাণ করানোর এই ঘটনাটি বৈষ্ণবদের উপর শাক্ত তন্ত্রের প্রভাব সূচনা করে।

শাক্ত ভাবধারায় পুষ্ট বৈষ্ণবী বা লক্ষ্মীর শক্তি উপাদানটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা অস্বীকার করতে পারেন নি। শ্রীবৈষ্ণব ও মধ্ব সম্প্রদায় ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর শক্তি হিসাবে লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। পক্ষান্তরে নিম্বার্ক, বল্লভ ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের নিকট এই শক্তি রাধা। রাধাতত্ত্বের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় আড়বার সাধিকা আণ্ডালের রচনায়। গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যা নবম-দশম শতকে দক্ষিণ ভারতে রচিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও ত্রয়োদশ শতকে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কটি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটি হচ্ছে সহজিয়া দৃষ্টিকোণ, যার কথা আমরা বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। কৃষ্ণ ও রাধার মিলন, বৌদ্ধ শূন্যতা ও করুণার মতই, পুরুষ ও স্ত্রী আদর্শের মিলনের প্রতীক। এরই

১। ৪, ৬; ৬, ২৩।   ২। বৃহৎসংহিতা, ৫৭।

পরিপ্রেক্ষিতে জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ সম্পর্ককে দেখতে হবে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্পর্কে নাভাজী তাঁর ভক্তমালে লিখেছেন, কোককাব্য-নবরস-শৃঙ্গার-কো-আগার। জয়দেব নিজেকে কখনও কখনও সহজিয়াপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। এই সহজিয়া ঐতিহ্য বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্মে স্থান করে নিয়েছিল, বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে যা প্রতীয়মান হয়। বৈষ্ণব পরকীয়া তত্ত্ব বৌদ্ধ সহজযান থেকে গৃহীত। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী প্রভৃতিরা সহজ-সাধনা করেছিলেন। এমন কি শ্রীচৈতন্য নিজেও এই পথ অবলম্বন করেছিলেন, এবং এক্ষেত্রে তাঁর সাধনসঙ্গিনী ছিলেন সাঠি, সার্বভৌমের কন্যা। অকিঞ্চন দাসের বিবর্তবিলাস নামক গ্রন্থে বৈষ্ণব সাধকদের সাধনসঙ্গিনীদের কথা উল্লেখিত হয়েছেঃ শ্রীরূপের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন মীরা, ভট্টরঘুনাথের কর্ণবাই, সনাতনের লক্ষ্মীহীরা, লোকনাথের জনৈক চণ্ডালকন্যা, কৃষ্ণদাসের পিঙ্গলা-গোয়ালিনী, শ্রীজীবের শ্যামা নাপিতানী, রঘুনাথের মীরাবাঈ, গোপাল ভট্টের গৌরপ্রিয়া ইত্যাদি।[১]

পাঞ্চরাত্র আগমসমূহকে চারভাগে ভাগ করা যায়—আগমসিদ্ধান্ত, মন্ত্রসিদ্ধান্ত, তন্ত্রসিদ্ধান্ত এবং তন্ত্রান্তর সিদ্ধান্ত। এই বিপুল আগম সাহিত্যের মধ্যে আমরা একটি গ্রন্থ বেছে নিচ্ছি যার নাম লক্ষ্মীতন্ত্র।[২] শাক্ত-তান্ত্রিক আদর্শসমূহ কিভাবে বৈষ্ণব ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল, এই গ্রন্থটি তার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। এখানে লক্ষ্মীই সর্বোচ্চ সত্তা। তিনি বিষ্ণুর চেয়েও বড়, কেননা তিনিই তাঁর শক্তি এবং সকল সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। এখানে লক্ষ্মীকে শুধুমাত্র শাক্ত দেবীর স্থানই দেওয়া হয়নি, শাক্ত আদর্শ অনুযায়ী সকল স্ত্রীলোককেই তাঁর অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সর্বোপরি তাঁকে তুষ্ট করার জন্য পঞ্চমকারসহ বামাচারী সাধনা নির্দিষ্ট হয়েছে।[৩] এই কারণেই পরবর্তীকালের শাক্ত দার্শনিকগণ, যেমন ললিতা-সহস্রনামের ভাষ্যকার ভাস্কর রায়, দুর্গাসপ্তশতীর টীকাকার নাগেশ ভট্ট এবং চন্দ্রকলাস্তুতির টীকাকার অপ্পয় দীক্ষিত শুধু এই গ্রন্থটির উল্লেখই করেন নি, এই গ্রন্থ থেকে বহু অংশ নিজেদের রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। লক্ষ্মীতন্ত্র নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত। পাঞ্চরাত্র সংহিতার অন্তর্গত হলেও গ্রন্থটি শাক্তদের নিকট স্বাভাবিক কারণেই প্রামাণ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে বৈখানস নামক একটি বৈষ্ণব সংখ্যাল্প সম্প্রদায় আছেন যাঁরা অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও জড়জগৎ এই ত্রিতত্ত্ব মানলেও সর্বোপরি শ্রী বা লক্ষ্মীকে স্থান দেন ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তি হিসাবে। তাঁদের মতে শ্রী বা লক্ষ্মী ব্রহ্মের বিভূতি বা ঐশ্বর্য, যিনি 'নিতানন্দ-মূল-প্রকৃতি শক্তি' এবং যিনি চেতন ও অচেতন জগতের স্রষ্টা। এঁরা আড়বার, আচার্যগণ ও মঠাধিপতিদের প্রতি বিশেষ ভক্তিযুক্ত নন, তিলকাদি কোন চিহ্নও ধারণ করেন না। পাঞ্চরাত্রিকদের মধ্যে যে তান্ত্রিক ঝোঁক আছে এঁরা তারও বিরোধী, যদিও এঁদের তত্ত্বে শক্তির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

১। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৫ ; S. B. Dasgupta, *Obscure Religious Cults* (1969), 113 ff. ; N. N. Bhattacharyya, *Ancient Indian Rituals,* 135-36.

২। সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদঃ সংযুক্তা গুপ্ত, ১৯৭২।

৩। ২৭, ৪৪-৪৭; ৪২, ৩০-৩১।

গুহ্যাতিগুহ্য তন্ত্রে বিষ্ণুর দশাবতারের সঙ্গে শাক্ত দশ মহাবিদ্যার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। চিত্তাকর্ষক শ্লোকগুলি নিম্নরূপঃ

কৃষ্ণমূর্তিঃ কালিকা স্যাদ্ রামমূর্তিস্তু তারিণী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাদ্ বামনো ভুবনেশ্বরী॥
জামদগ্ন্যঃ সুন্দরী স্যান্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ।
বগলা কূর্মমূর্তিঃ স্যাদ্বলভদ্রশ্চ ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥

৭

শৈবধর্ম

১। ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সূচনায় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ প্রসঙ্গে আমরা শৈবধর্মের কথাও আলোচনা করেছি। দুটি ধর্মই একেশ্বরবাদী এবং সেই হিসাবে বিকাশের ক্ষেত্রে উভয় ধর্মের পদ্ধতি একই রকম। একেশ্বরবাদ হিসাবে উভয় ধর্মই রাজানুকূল্য পেয়েছে। উভয় ধর্মই ভক্তিবাদী। চর্যা, ক্রিয়া যোগ ও জ্ঞান উভয় ধর্মেরই ব্যবহারিক পদ্ধতি। উভয় ধর্মেরই মূল ভিত্তি সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসমূহ, কিন্তু আদিমধ্য ও মধ্যযুগে উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই বেদান্তের দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা গুরুত্ব পেয়েছে। বিষ্ণুর মত শিবও ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে গৃহীত হয়েছেন। ব্রহ্ম, চিদ্ ও অচিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের নিরিখেই বৈষ্ণবধর্মের মত শৈবধর্মেরও তাত্ত্বিক ভিত্তিসমূহ গড়ে উঠেছিল। উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই নানা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু একেশ্বরবাদী হলেও, এবং বৈষ্ণবধর্মের মত শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও, শৈবধর্মের কয়েকটি লৌকিক দিক বরাবর বজায় ছিল। নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, কৃষিজীবী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান, যেগুলির অনেকটা অংশ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বর্তমান, শৈবধর্মে যতটা প্রশ্রয় পেয়েছে অন্য কোথাও ততটা পায়নি। আদি বৈষ্ণব ধর্মের উপর তলায় ছিলেন বৈদিক বিষ্ণু ও শাস্ত্রীয় দেবতারা, পঞ্চ বৃষ্ণিবীর প্রভৃতি, নীচের তলায় তন্ত্রোক্ত আচারসমূহ, মাতৃদেবী, ইত্যাদি, এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে তা ছিল সাংখ্য অনুসারী। কালক্রমে উপরিতলটি প্রাধান্যলাভ করেছে, যদিও নিম্নতলটি একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়নি, এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে সাংখ্যের স্থান দখল করেছিল বেদান্ত। শৈবধর্মের ক্ষেত্রে নিম্নতলটি বরাবর কিন্তু ভীষণ শক্তিশালী ছিল। শৈবধর্মকে বেদান্তমুখী করা হলেও, তন্ত্র ও সাংখ্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি, যার ফলে শৈবধর্ম ও শাক্তধর্ম এমনভাবে মিশে গেছে যে সময় সময় তাদের ভেদ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

উভয় ধর্মই অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে কিছু মুক্ত বাতাস আনবার চেষ্টা করেছিল। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতা থাকলেও তা কোন দিন বেদকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু কোন কোন শৈব সম্প্রদায় বেদপ্রামাণ্য মানতে অস্বীকার করেছিল। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তেন্‌কলই শাখা জাতিভেদে বিশ্বাসী ছিল না, মধ্ব জাতিভেদ মানতেন না, রামানন্দ সম্প্রদায়, চৈতন্য, প্রভৃতিরা নিম্নশ্রেণীর কাছে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কোন কোন শৈব সম্প্রদায় এবিষয়ে আরও স্পষ্টতা দেখিয়েছিলেন। উগ্রপন্থী শৈব সাধকেরা ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শকে খোলাখুলি অস্বীকার করেছিলেন। কাশ্মীর শৈবেরা জাতিভেদ মানতেন না, আর বীরশৈবেরা তো দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক ছিলেন। তাঁরা শুধু জাতিভেদই বর্জন করেননি, নারীর সমানাধিকার, বাল্যবিবাহ বিরোধিতা এবং বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে ঘোরতর উৎসাহী ছিলেন।

আগেই বলেছি শৈবধর্মের সঙ্গে শাক্তধর্মের সম্পর্ক এত নিবিড় যে মাঝে মাঝে উভয়ের পার্থক্য করাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। নারীশক্তি বা প্রকৃতি শিবের শক্তি, তা ব্যতিরেকে তাঁর কোন অস্তিত্বই নেই। অদ্বয়বাদী শৈব তাত্ত্বিকেরা শিব-তত্ত্বের সঙ্গে শক্তিতত্ত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে। বর্তমান অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে আমরা শৈবধর্মের উপর শাক্তধর্মের প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। শাক্ত ধারণাসমূহ ও আচার-অনুষ্ঠান বৈষ্ণব ধর্মকেও যে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল সে প্রসঙ্গ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি, তবে এ প্রভাব শৈবধর্মের উপর অনেক বেশি পরিমাণে ঘটেছিল।

শৈবধর্ম বহু ও বিভিন্ন ধারার সমন্বয় ও সংঘাতের ইতিহাস। বলাই বাহুল্য এ ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। এখানে আমরা প্রত্যেকটি ধারাকে পৃথক্ করে দেখাতে চেষ্টা করব।

২। প্রাক্ বৈদিক ধারা

প্রাক্-বৈদিক হরপ্পা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের নিদর্শনরূপে যা আমাদের হাতে এসেছে, তা হচ্ছে কয়েকটি মাতৃকামূর্তি, লিঙ্গ ও যোনির কিছু অনুকৃতি এবং কয়েকটি সীলে অঙ্কিত একটি পুরুষ দেবতা। এই তিন ধরনের নিদর্শন একটি অখণ্ড ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় বহন করে যা আমরা আগে দেখেছি। লিঙ্গ ও যোনির উপস্থিতি একটি উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস-কেন্দ্রিক ধর্মের সূচনা করে যেগুলি যথাক্রমে ওই পুরুষ দেবতা ও মাতৃকাদেবীর প্রতীক, যা থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে এগুলি পরবর্তীকালের সুবিস্তৃত শিব ও শক্তির ধারণার পূর্বাভাস।

মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত একটি সীলে ত্রিমুখ, দ্বিশৃঙ্গ, যোগাসনে উপবিষ্ট (সম্ভবত কূর্মাসনে) একটি মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। মূর্তিটির দুই বাহু বলয়বিশিষ্ট পূর্ণ প্রসারিত ও হাঁটুর উপর ন্যস্ত। বক্ষঃদেশে কয়েকটি মালা বিদ্যমান। মূর্তিটির দু'পাশে চারটি প্রাণী অঙ্কিত আছে—হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও মহিষ। এই মূর্তিটিকে স্যার জন মার্শাল পৌরাণিক শিব-পশুপতির আদি প্রতীক বলেছেন১, এবং এ বক্তব্য অনেকেই সমর্থন করেছেন। আর একটি সীলে এই দেবতা যোগাসনে উপবিষ্ট, দুপাশে দুটি নাগজাতীয় মূর্তি দেখা যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি পোড়া-মাটির সীলে যোগাসনে উপবিষ্ট, শিরোভূষণযুক্ত এবং নানা প্রাণী পরিবেষ্টিত এক দেবতাকে দেখা যায়। সীলের পিছন দিকে প্রদর্শিত বৃষ মূর্তি ও ত্রিশূল-ধ্বজ, মূর্তিটির উপবেশনভঙ্গী প্রভৃতি শিবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।২

কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়া এক কথা, প্রমাণিত হওয়া আর এক। প্রথমোক্ত সীলটির উপর মার্শাল সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান যুক্তি হল সীলটির উপর অঙ্কিত নানা চিহ্ন থেকে শিব কল্পনার বিভিন্ন পৌরাণিক উপাদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে প্রচলিত কয়েকটি নির্বাচিত পৌরাণিক উপাদান অবলম্বন করে প্রাচীনকালের কোন চিত্রকে অবধারিত-ভাবে শিবমূর্তি বলে শনাক্ত করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যেরও মূল্য আছে, যা হচ্ছে সমগ্র হরপ্পা সভ্যতা জুড়ে আবিষ্কৃত অজস্র লিঙ্গ ও যোনি

১। J. Marshall, *Mohenjodaro and the Indus Civilization* (1931) I. 52-56.

২। M. S. Vats, *Excavations at Harappa* (1950), 129-30.

মূর্তি।১ উত্তরকালের ভারতীয় ধর্মে লিঙ্গ বলতে প্রধানত শিবলিঙ্গই বোঝায়। আলোচ্য সীলের মূর্তিটি পৌরাণিক শিব হোক আর নাই হোক সমগ্র হরপ্পা সভ্যতা জুড়ে যে অজস্র লিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মূর্ত সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় হতে পারে না।

বেদোত্তর ভারতের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে লিঙ্গ উপাসনা এবং তার সঙ্গে শিবের গভীর ও ব্যাপক সংযোগ চোখে পড়ে। এ প্রভাব আকস্মিক হতে পারে না বলেই সুদূর কোন এক প্রাগৈতিহাসিক অতীত অনুমেয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো থেকে প্রাপ্ত লিঙ্গসমূহ স্বভাবতই সেই প্রাগৈতিহাসিক অতীতের ইঙ্গিত দেয়। উত্তরকালের প্রথা অনুসারে এই উপাস্য লিঙ্গগুলিকে যদি আমরা শিবলিঙ্গ আখ্যা দিতে সম্মত হই, তাহলে এই দিক থেকেই সিন্ধুধর্মে শৈব সাধনার আদিরূপ স্বীকারযোগ্য হতে পারে। তাই এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে শক্তিসাধনার মত শৈব-সাধনারও সূত্রপাত প্রাক্-বৈদিক যুগে এবং বেদোত্তর ভারতের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও শক্তি-সাধনার মত শৈব-সাধনাও অবিচ্ছিন্ন প্রভাবে টিঁকে থেকেছে।

৩। লিঙ্গপূজা

হরপ্পা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসে লিঙ্গ উপাসনার এমন গভীর ও ব্যাপক প্রভাবের কারণ এই যে অন্যান্য দেশের নানা ধর্মবিশ্বাসের মতই এখানকার ধর্মবিশ্বাসও এক আদিম উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস থেকে জন্মলাভ করেছিল। ঋগ্বেদে শিশ্নদেব বা লিঙ্গ উপাসনা নিন্দিত হলেও পরবর্তীকালে এই উপাসনার ব্যাপকতা বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি।

কিভাবে লিঙ্গ ও যোনি পূজা শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তার ইঙ্গিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায়।২ গোড়ার দিকে লিঙ্গ ও যোনি স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হত। প্রাক্-গুপ্ত যুগের যে সব শিবলিঙ্গ বা তার চিত্র মুদ্রায় বা সীলে দেখা যায়, সেগুলিতে পরবর্তীকালের যোনিপট্ট অনুপস্থিত। এই যুগের একটি বিশেষ মূর্তির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই মূর্তিটি অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়িমল্লম গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি একটি পরশু ও মৃগধারী দ্বিভুজ শিবের। সংশ্লিষ্ট লিঙ্গটি ঊর্ধ্বোত্থিত, মুক্তমুখচর্ম পুরুষাঙ্গের আকারে রূপায়িত।৩ মথুরা ও লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতকের যে সকল যোনিপট্টহীন শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে সেগুলি মুক্তমুখচর্ম পুরুষাঙ্গের পুরোদস্তুর অনুকরণ। উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি মুদ্রার একদিকে শিবের মনুষ্য মূর্তি, অপর দিকে তাঁর লিঙ্গ মূর্তি অঙ্কিত আছে।৪ শৈবধর্মে তান্ত্রিক প্রভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ ও যোনির যুক্তরূপ অধিকতর জনপ্রিয় হয়।

শিবলিঙ্গের সঙ্গে যোনিপট্ট যুক্ত হবার পর লিঙ্গের মুক্তমুখচর্ম ধরনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশ পূজাপ্রতীক রূপে লিঙ্গ আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে দেখা যায় যে উপমন্যু কৃষ্ণের সম্মুখে এই বলে শিবের

১। Marshall, *op-cit.*, I. 58-63; Vats, *op-cit.*, 26, 51 ff, 116, 368 ff.
২। ৪, ১১; ৫, ২।
৩। J. N. Banerjea, *Development of Hindu Iconography* (1956) 456-57.
৪। J. Allan, *Coins of Ancient India* (1936) 85, 233, 243.

গুণগান গাইছেন যে শিবই একমাত্র দেবতা যাঁর লিঙ্গ ব্যাপকভাবে পূজিত হয়। পূজাপ্রতীক হিসাবে লিঙ্গ এতদূর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভ-গৃহে প্রধানতম এবং মুখ্য পূজার বস্তু হিসাবে লিঙ্গই অধিষ্ঠিত হয়। শিবের মনুষ্য মূর্তি গৌণ হয়ে ওঠে। ইলোরার কৈলাস মন্দিরের গর্ভগৃহে যে মূল দেবতাটি স্থান পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন লিঙ্গ, মনুষ্য মূর্তিগুলির স্থান অন্যান্য গৌণ স্থানে। একথা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের ক্ষেত্রেও সত্য।

৪। বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র-শিব

ঋগ্বেদে শিব নেই আছেন রুদ্র,১ যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'হে রুদ্র তুমি ক্রোধবশে আমাদের সন্তানসন্ততি ও উত্তরাধিকারিগণের অনিষ্ট করিও না, আমাদের অনুগত লোকদিগকে, আমাদের গৃহগুলিও যেন তোমার কোপে ধ্বংস না হয়। আমরা তোমাকে স্তব স্তুতি ও বলির দ্বারা সর্বদা আবাহন করি।' ঋগ্বেদের রুদ্র ঝড়ঝঞ্ঝা, অশনি, অগ্নি, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিপর্যয় ও দুর্বিপাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেবতাটি ভীতির, আদরের নয়।২ ঋগ্বেদে তিনি মরুৎগণেরও পিতা।

যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় অংশে৩ রুদ্রের শতনাম কীর্তিত হয়েছে। এই নাম-গুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর উগ্র রূপ ব্যঞ্জনা করে, কয়েকটি আবার তাঁর মঙ্গলময় সত্তার দ্যোতক। রুদ্র যেমন ব্যাধি, মৃত্যু ও অমঙ্গলের কারক, তাঁকে তুষ্ট করলে তিনি সেগুলির প্রতিকারও করেন। অথর্ববেদে রুদ্রের কয়েকটি নাম পাওয়া যায় যথা রুদ্র, শর্ব, উগ্র, ভব, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান। শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র উষাদেবীর পুত্র বলে বর্ণিত হয়েছেন। এখানে তাঁর আটটি নাম, যেখানে অথর্ববেদোক্ত সাতটি নামের সঙ্গে অশনি বা বজ্র যুক্ত হয়েছে। ঐতরেয়, শতপথ, তাণ্ড্য এবং গোপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতির অগম্যাগমনের জন্য রুদ্রকে তাঁর শাস্তিদাতা-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শাংখ্যায়ন, কৌষীতকি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেও রুদ্রের বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র ক্রমশ সর্বপ্রধান দেবতা, এবং একেশ্বর হিসাবে কীর্তিত হয়েছেনঃ একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমান লোকানীশত ঈশানীভিঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতে সঞ্চুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা।৪ এখানে তাঁকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে যেমন মহাদেব, মহর্ষি, ভগবান, ঈশ, ঈশান এবং শিব। শেষোক্ত নামটি রুদ্রের উপাধি হিসাবে মাত্র কয়েক স্থলে উল্লিখিত হয়েছে।৫ তিনি প্রকৃতিরূপে মায়ার অধীশ্বর এবং এই বিশ্বভুবন তাঁর অবয়বের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত।৬ তিনি সর্বভূতে স্থিত শিব (শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্), ঈশ্বরগণের মধ্যে পরম মহেশ্বর, দেবতাগণের মধ্যে পরম দৈবত (তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্)। তিনি বিশ্বস্রষ্টা এবং তাঁর অনেক রূপ (বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্)।

১। ঋগ্বেদ ১, ১১৪, ৮; ২, ৩৩, ৯-১৩।

২। R. G. Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems* (1913), 103.

৩। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪, ৫, ১; বাজসনেয়ী সংহিতা ১৬।

৪। ৩, ২। ৫। ৩, ১১; ৪, ১৬; ৫, ১৪। ৬। ৪, ১০।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র শিবকে কেন্দ্র করে যে একেশ্বরবাদী প্রবণতা দেখা যায়, তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে অনেক পরবর্তীকালে রচিত অথর্বশিরস্ উপনিষদে।

৫। প্রাচীন রচনাসমূহে শিবের উল্লেখ

বৌদ্ধ দীঘ নিকায় গ্রন্থে ঈশানের উল্লেখ আছে, এছাড়া বিভিন্ন পালি গ্রন্থে কখনও কখনও শিবের নাম পাওয়া যায়। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বৌদ্ধ নিদ্দেস গ্রন্থে দেব নামক যে দেবতাটির উপাসকদের কথা বলা হয়েছে, আসলে তিনি শিব কেননা শ্বেতাশ্বতরে শিবের একটি নাম দেব। পরবর্তীকালে হিউয়েন সাং শিবকে দেব বা ঈশ্বরদেব বলে উল্লেখ করেছেন।১ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত বৌদ্ধ মহামায়ূরী গ্রন্থে শিবপুর এবং ভীষণ নামক নগরদ্বয়ের পালক-দেবতা হিসাবে শিব ও শিবভদ্রের উল্লেখ আছে। গ্রীক লেখকগণ এদেশে শিবপূজার ব্যাপকতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং নিজেদের দিওনিসোসের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে রুদ্রের কয়েকটি নামের উল্লেখ আছে যেমন ভব, শর্ব, রুদ্র এবং মৃড়।২ প্রত্যক্ষভাবে শিব নামটির উল্লেখ না থাকলেও শিবাদিভ্যোন নামক একটি সূত্র আছে৩ যার অর্থ শিবাদি শব্দের পর 'অন' প্রত্যয় যোগ করে যে পদ নিষ্পন্ন হয় তা দিয়ে শিব ইত্যাদির অপত্যগণকে বোঝায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে রুদ্র ও শিবের উল্লেখ আছে। রুদ্রের উদ্দেশে পশুবলি এবং রুদ্রের ভৈষজ্যগণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে। সর্বোপরি শৈব সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ উল্লেখ পতঞ্জলিতে বর্তমান যিনি তাদের শিবভাগবত আখ্যা দিয়েছেন।৪

মহাভারত ও রামায়ণের বহু স্থানে শিব ও তাঁর অনুগামীদের উল্লেখ আছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে বৈষ্ণবদের মত শৈবরাও এই দুইটি মহাকাব্য নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং সুবিধামত মহাকাব্যদ্বয়ের এখানে ওখানে শিবের মাহাত্ম্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। মহাকাব্যদ্বয়ে দক্ষযজ্ঞের যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রামায়ণে এই কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে,৫ কিন্তু মহাভারতের সৌপ্তিক ও শান্তিপর্বে তা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। দক্ষ প্রজাপতি অনুষ্ঠিত যজ্ঞে সকল দেবতা নিমন্ত্রিত হলেও রুদ্র-শিব নিমন্ত্রিত হননি কেননা বৈদিক যজ্ঞের ভাগে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। এরই পরিণাম শিব কর্তৃক দক্ষ যজ্ঞ নাশ। এই প্রসঙ্গে দক্ষের একটি কথা স্মরণীয় যে তিনি শূলধারী ও জটামুকুট বিশিষ্ট একাদশ রুদ্রকে চেনেন, কিন্তু মহেশ্বরকে চেনেন না (সন্তি নো বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ, একাদশ-স্থানগতাঃ নাহং বেদ্মি মহেশ্বরম্)। এ থেকে বোঝা যায় যে এই রুদ্র-শিব বৈদিক ধর্মের এলাকার বাইরে ছিলেন।

রামায়ণে শিব শিতিকণ্ঠ, মহাদেব, রুদ্র, ত্র্যম্বক, পশুপতি ও শঙ্কর নামে

১। J. N. Banerjea, *Pauranic and Tantric Religion* (1966) 70-71.

২। ৪, ১, ৪৯। ৩। ৪, ১, ১১২।

৪। J. Kielhorn, *Mahabhasya* (1880) I. 331, 424; III. 403, 474.

৫। ১, ৬৬।

আখ্যাত হয়েছেন'। উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের তপস্যার কাহিনী, শিবের অভিশাপে কন্দর্পের দেহহীন হবার কাহিনী, কার্ত্তিকেয়ের জন্মের কাহিনী, গঙ্গা আনয়নের জন্য শিবের উদ্দেশে ভগীরথের তপস্যার কাহিনী, সমুদ্র মন্থনে শিব কর্তৃক গরল পানের কাহিনী প্রভৃতি রামায়ণে স্থান পেয়েছে।১ মহাভারতেও ওই সকল কাহিনী বর্তমান। অনুশাসনপর্বে কৃষ্ণ কর্তৃক শিবের উপাসনার কাহিনী আছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল মহাভারতে পাশুপত-শৈব ধর্মের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি, যা দেওয়া হয়েছে বেদ, সাংখ্য, যোগ এবং পাঞ্চরাত্রের পাশাপাশি। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের পর শিব দক্ষকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে পাশুপত ধর্ম।

মহাভারতের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে পূর্বতন যুগের রুদ্র, শিব ও সমজাতীয় দেবতাদের বিচ্ছিন্ন উপাসনা খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং বিচ্ছিন্ন পূজাপদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণাসমূহ সংহতি লাভ করেছিল। এটা শৈব ধর্মের দ্বিতীয় পর্যায় যা পাশুপত ধর্ম নামে খ্যাত।

৬। পাশুপত ধর্ম

মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে ব্রহ্মদেবের পুত্র উমাপতি শিব শ্রীকণ্ঠ পাশুপত ধর্মের প্রবর্তক: উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ, উক্তবান ইদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ। বায়ু পুরাণে২ বলা হয়েছে শিব শ্মশানে পরিত্যক্ত একটি মৃতদেহে প্রবেশ করে নকুলী বা নকুলীশ নামে আবির্ভূত হন এবং পাশুপত ধর্মের প্রচার করেন। তাঁর চারজন প্রধান শিষ্য ছিল—কুশিক, গার্গ্য, মিত্রক এবং রুষ্ট—যাঁরা মাহেশ্বর যোগে দীক্ষাগ্রহণ করে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন। লিঙ্গপুরাণেও৩ ওই একই কাহিনী স্থান পেয়েছে, তবে সেখানে নকুলীর পরিবর্তে লকুলী নামটি উল্লিখিত হয়েছে। রাজস্থানের উদয়পুরের কিছু উত্তরে একটি মন্দিরগাত্রে ৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লেখে বলা হয়েছে যে ভৃগুকচ্ছ দেশে শিব লগুড়হস্ত (লকুল) এক ব্রহ্মচারীরূপে আবির্ভূত হন ও পাশুপত যোগ প্রবর্তন করেন। ত্রয়োদশ শতকের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে শিব লাটদেশে ভট্টারক শ্রীলকুলীশ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর চারজন শিষ্য—কৌশিক, গার্গ্য, কৌরুষ এবং মৈত্রেয়—পাশুপতদের চারটি সম্প্রদায়ের প্রবক্তা হন। মথুরা থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের এক লিপি থেকে জানা যায় যে পাশুপত ধর্মগুরু লকুলীশ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।৪

ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত এই যে মহাদেবের আঠাশতম ও শেষ অবতার বলে কথিত পুরাণাদিতে উল্লিখিত লকুলীশ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পূর্ব-প্রচলিত শৈব মত ও আচার অনুষ্ঠানসমূহকে শৃংখলাবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করেছিলেন, এবং তাঁর

১। ১, ২৩; ১, ৩৫; ১, ৩৮; ১, ৪৫।
২। ২৬, ২১০-১৩।   ৩। ২৪, ১২৭-৩১।
৪। লেখমালার জন্য দ্রষ্টব্য *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, XXII, 151 ff; *Epigraphia Indica*, XXI, 1-9. *Archaeological Survey of India: Annual Report*, 1906-07, 190-91.

প্রবর্তিত ধর্মমত পাশুপত নামে খ্যাত। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে এই ধর্মের দার্শনিক দিকগুলির ব্যাখ্যা করেছেন নকুলীশ (লকুলীশ) পাশুপত শিরোনামায়। তাঁর প্রণীত একটি গ্রন্থেরও নাম তিনি করেছেন যার নাম পঞ্চার্থ-বিদ্যা। পাশুপত ধর্মমতের মূলতত্ত্ব সম্বলিত একটি সুপ্রাচীন গ্রন্থের নাম পাশুপতসূত্র।১ গুপ্তযুগে রাশীকর কৌণ্ডিণ্য নামক এক পাশুপতাচার্য এই গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যকেই অবলম্বন করে মাধবাচার্য পাশুপত ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন।

পাঁচটি বিষয়ের উপর পাশুপত ধর্ম কেন্দ্রীভূত—কার্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। এ থেকেই বোঝা যায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে পাশুপত ধর্ম বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ ধারণাই পোষণ করে। এরও মূল প্রতিপাদ্য দুঃখ ও দুঃখের নিবৃত্তি। বৌদ্ধধর্মের মত পাশুপত ধর্মও কার্য-কারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী। যোগ ও বিধি বৌদ্ধধর্মেরও বিষয়। তবে তফাৎ এই যে বৌদ্ধধর্ম যেখানে কতকগুলি নৈতিক অনুশাসনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে, যেগুলির অনুশীলন করলেই নির্বাণলাভ ঘটবে, পাশুপত ধর্ম সেখানে অতি পুরাতন প্রাক্-বিভক্ত সমাজব্যবস্থার জীবনচর্যায় ফিরে যেতে চেয়েছে, লৌকিক আচার অনুষ্ঠান-সমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। আদি কৃষিনির্ভর সমাজের তান্ত্রিক ধ্যানধারণা-সমূহ পাশুপত ধর্মে বিশেষভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে। দ্বিতীয় পার্থক্য হল বৌদ্ধধর্ম যেখানে নিরীশ্বরবাদী, পাশুপত ধর্মে সেখানে ঈশ্বরের বিশেষ স্থান আছে, যে ঈশ্বর হলেন শিব। পাশুপত ধর্মে জাতিভেদ স্বীকৃত নয়।

পাশুপত কার্যকারণতত্ত্ব সাংখ্য আশ্রয়ী। কার্য বলতে জগৎকে, জাগতিক বস্তু ও প্রাণীসমূহকে বোঝায়, পাশুপত তত্ত্বে যাদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে পশু। জীব বা পশুর গুণসমূহের নাম বিদ্যা এবং উপাদানসমূহের নাম কলা। একজন মানুষ আসলে কলা ও গুণযুক্ত পশু। কলা বা উপাদানসমূহের অবলম্বনে পশু যতদিন দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততদিন সে অবিশুদ্ধ এবং যখন এই বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয় তখন সে শুদ্ধ পর্যায়ে উন্নীত হয়।

পশুর অস্তিত্বের, বন্ধনের ও মুক্তির কারণ নানাবিধ, কিন্তু সব কারণের মূল কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি শিব। পাশুপত কারণতত্ত্ব আসলে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যা দিয়ে প্রকৃতির বিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরবাদী হবার দরুনই সাংখ্যের কারণ পরম্পরার মাথায় ঈশ্বরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে পাশুপত যোগদর্শনের মতই সেশ্বর সাংখ্য। স্বাভাবিক নিয়মেই সেই কারণে যোগদর্শনের সঙ্গে পাশুপতের একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে, এবং যোগ পাশুপত ধর্মের পঞ্চতত্ত্বের একটিতে পরিণত হয়েছে। পাশুপত ধর্ম মূলত আচার-অনুষ্ঠানমূলক হলেও, সেখানে ক্রিয়া-নিরপেক্ষ যোগের একটা স্থান রাখা হয়েছে।

পাশুপত ধর্মের মূল উদ্দেশ্য দুঃখান্ত যা ওই ধর্মের পঞ্চম তত্ত্ব। দুঃখ তিন প্রকার—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক দুঃখ পাঁচ প্রকার—গর্ভে বাস, জন্মগ্রহণ করা, অজ্ঞান, জরা ও মরণ। আধিদৈবিক দুঃখও পাঁচ প্রকার—ইহলোকভয়, পরলোকভয়, অহিত-সংপ্রয়োগ, হিত-বিপ্রয়োগ ও ইচ্ছা-

১। ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত গ্রন্থমালার ১৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ, সম্পাদনা, কৌণ্ডিন্য ভাষ্যসহ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (১৯৪০)।

ব্যাঘাত। আধ্যাত্মিক দুঃখ মানস-সঞ্জাত, প্রবৃত্তিসঞ্জাত (ক্রোধ, লোভ, ভয়, বিষাদ, ঈর্ষা, অসূয়াদি) এবং দেহসঞ্জাত।১

এখন, এই দুঃখের নিবৃত্তির দুটি রাস্তা, একটি যোগ ও অপরটি বিধি যা যথাক্রমে পাশুপত ধর্মের তৃতীয় ও চতুর্থ তত্ত্ব। যোগের দ্বারা পাঁচ প্রকার জ্ঞান (দূরদর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান ও সর্বজ্ঞত্ব) এবং তিন প্রকার কর্মশক্তির (মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিকরণধর্মিত্ব) উদ্ভব হয়।২ মনোজবিত্ব বলতে যে কোন কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা, কামরূপিত্ব বলতে যে কোন রূপ ও আকার গ্রহণের ক্ষমতা ও বিকরণধর্মিত্ব বলতে সর্বপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিত্ব বোঝায়। এইগুলির অধিকারী হলে মহাদেবের মহাগণপতিত্ব লাভ সম্ভব।

বিধি হচ্ছে আচার-অনুষ্ঠানসমূহ। প্রধান বিধিগুলির নাম চর্যা। চর্যার দুই ভাগ—ব্রত এবং দ্বার। দেহে ছাই মাখা, ছাই-এর গাদায় শয়ন করা, হাস্য-গীত-নৃত্য-হুড়ুক্কার ধ্বনি করা, নমস্কার, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি ব্রতের অঙ্গ। (ভস্মনা ত্রিষবণং স্নায়ীত; ভস্মনি শয়ীত: হসিত-গীত-নৃত্য-হুড়ুক্কার-নমস্কার জপ্যোপহারণোপতিষ্ঠেৎ)।৩ দ্বার ছয় প্রকার—ক্রাথন (জেগে থেকে ঘুমানোর ভাণ), স্পন্দন (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন ঘটানো), মণ্ডন (ভ্রমণকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক নড়াচড়া ঘটানো), শৃঙ্গারণ (মেয়েদের প্রতি আদিরসাত্মক ভঙ্গীর প্রকাশ), অবিত্তকরণ (অসামাজিক উন্মত্তবৎ আচরণ) এবং অবিতদ্ভাষণ (প্রলাপ বকা)। এগুলি সুপ্রাচীন যুগের জাদুবিশ্বাসমূলক আচার আচরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রেণীসমাজের পটভূমিকায় এগুলির তাৎপর্য বোঝা মোটেই কঠিন নয়, যদিও এগুলির আদি তাৎপর্য স্বাভাবিকভাবেই বহু ক্ষেত্রে বিপরীতে পর্যবসিত। পাশুপত সূত্রকারের যথেষ্ট রসজ্ঞান আছে যখন তিনি বলেন উন্মত্তোমূঢ় ইত্যেবং মন্যতে ইতরে জনাঃ, অর্থাৎ সাধারণ লোক তাঁকে উন্মত্ত ও মূর্খ বলে মনে করবে। কিন্তু ব্যাপারটা উন্মত্ততা নয়, ভট্ট-উৎপল পাশুপত শাস্ত্রকে বাতুলতন্ত্র আখ্যা দিলেও।

৭। পাশুপত ধর্মের বিস্তৃতি

শৈবধর্মের গোড়ার দিকের ইতিহাসে লেখমালার সাক্ষ্য বড় বেশি পাওয়া যায় না, তবে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের মুদ্রায়, বিশেষ করে উজ্জয়িনী থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায় দণ্ডকমণ্ডলু যুক্ত ত্রিমুখ শিবের চিত্র বর্তমান। তক্ষশিলার অনতিদূরে শিরকপ থেকে প্রাপ্ত একটি ব্রোঞ্জ সীলে ত্রিশূলসহ দ্বিভুজ একটি শিবমূর্তি অঙ্কিত আছে এবং তাতে শিবরক্ষিত শব্দটি উৎকীর্ণ আছে। মউএস্ এবং গণ্ডোফারেসের তাম্রমুদ্রায়, ঔদুম্বরদের মুদ্রায় এবং কুষাণ বিম কদফিস, কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের মুদ্রায় শিবমূর্তি অঙ্কিত আছে।৪ বিম কদফিস পাকাপোক্তভাবেই শৈব ছিলেন। তাঁর সুবর্ণ ও তাম্রমুদ্রার যেদিকে শিব ও তাঁর বাহন নন্দীর মূর্তি অঙ্কিত সেই দিকে খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ রয়েছে: মহরজস রজতিরজস সবলোক ইশ্বরস মহিশ্বরস বিম কদফিসস ত্রতরস।

১। পাশুপত সূত্র ৪, ৪৯ ইত্যাদি, কৌণ্ডিন্য ভাষ্যসহ।
২। পা· সূ· ১৬ ২৩-৩০।
৩। পা· সূ· ১, ২; ১, ৩; ২, ৮।
৪। J. N. Banerjea, *Development of Hindu Iconography* (1956), 117 ff.

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের অজস্র শিবমূর্তি, লিঙ্গ ও মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। লেখমালার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে শিবভক্ত রাজা ও প্রধানেরা মাহেশ্বর, পরম-মাহেশ্বর, অত্যন্ত-মাহেশ্বর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। গুপ্ত রাজারা যদিও বৈষ্ণব ছিলেন, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত তাঁর গুণৈঘর লিপিতে নিজেকে ভগবন্-মহাদেব-পাদানুধ্যাত বলেছেন। পশ্চিম ভারতের ষষ্ঠ শতকের জনেন্দ্র যশোধর্মা, হূন সর্দার মিহিরকুল, বাকাটক বংশীয় রাজগণ, বলভীর মৈত্রকগণ, পরবর্তী গুপ্তবংশীয় দেবগুপ্ত ও বিষ্ণুগুপ্ত, মৌখরি শাসকবর্গ প্রভৃতি অনেকেই পাশুপত মতাশ্রয়ী ছিলেন। আর্য উদিতাচার্যের মথুরা শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ওই অঞ্চলে কুশিকের অনুগামী পাশুপতাচার্যদের ঘাঁটি ছিল। চিন্ত্র প্রশস্তি থেকে জানা যায় গার্গ্য অনুগামী পাশুপতাচার্যগণ কাথিয়াবাড় অঞ্চলে বাস করতেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং পাশুপত সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় গন্ধার প্রদেশে ভীমাদেবী পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত শিবমন্দির, বারাণসীর দশহাজার পাশুপত তীর্থিক, মালব ও মধ্যপ্রদেশের শিবমন্দিরসমূহ, প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া বালুচিস্তানের পূর্ব সীমানায় লাঙ্গল নামক দেশের বহুসংখ্যক শিবমন্দির ও পাশুপত সম্প্রদায়, আফগানিস্তানের বন্নু এমন কি খোটানেও শিবমন্দির ও পাশুপতদের কথা হিউয়েন সাং বলছেন। উড়িষ্যায় পাশুপত ধর্ম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একাম্রক্ষেত্র ভুবনেশ্বরে মধ্যযুগের বহু শিবমন্দির বর্তমান। রাজারাণী, মুক্তেশ্বর, শিশিরেশ্বর, প্রভৃতি ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ লকুলীশ ও তাঁর চারজন প্রধান শিষ্যের মূর্তি দেখা যায়। বাংলাদেশে লকুলীশের মূর্তি বিরল। বরাকর জেলার নিকটবর্তী বেগুনিয়া গ্রামে একটি শিব মন্দিরের শিখরে লকুলীশের একটি মূর্তি আছে, যার প্রতি জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কালীঘাটের দেবীর ভৈরবের নাম লকুলীশ।

হিউয়েন সাং দক্ষিণ ভারতের মলয়কূট প্রদেশে ভ্রমণ কালে পাশুপত তীর্থিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কর্ণাটকের সির তালুকের অন্তর্গত হেমাবতী গ্রামে প্রাপ্ত ৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে ওই স্থানে লকুলীশ মুনিনাথ চিল্লুকরূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি লকুলীশ মত পুনরুজ্জীবিত করেন। ১১০৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটক থেকে প্রাপ্ত অপর একটি লেখ থেকে জানা যায় যে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিক সোমেশ্বর সূরি লকুলীশ পাশুপত মতবাদের একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি বংশীয় নৃপতিরা এবং সে দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ অনেক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৮। নায়নার সম্প্রদায়

দক্ষিণ ভারতে নায়নার নামক একটি শৈব সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল যারা বৈষ্ণব আড়বারদের মতই তামিল সাহিত্যে ভক্তিবাদের প্রচলন করেন। এঁদের রচনাগুলিকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন শৈব ধর্মগুরু নম্বি-আণ্ডার-নম্বি। তিনি সমস্ত শৈব রচনাকে এগারোটি তিরুমুরাই-এ সংগ্রহ করেন। প্রথম সাতটি তিরুমুরাই-এর একত্র নাম তেবারম, যাতে সম্বন্দর, অপ্পর ও সুন্দররের রচনাবলী আছে। অষ্টমটির নাম তিরুবাচকম যা মাণিক্যবাচকরের রচনা সঙ্কলন। নবম থেকে একাদশ তিরুমুরাই অপরাপর কবিদের রচনাসংগ্রহ।

দশম তিরুমন্নাই-এর লেখক তিরুমূলর তিন হাজার শ্লোকে শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং তাঁর গ্রন্থ, যা তিরুমন্দিরম নামেও পরিচিত, পরবর্তী শৈব সাধক ও কবিদের অনুপ্রেরণাস্বরূপ ছিল। তিরুমূলরের আবির্ভাবের কাল ষষ্ঠ শতক। তাঁর পরবর্তী সাধক কবিদের মধ্যে অপ্পর (৬০০-৬৮১), সম্বন্দর (৬৪৪-৬৬০), মাণিক্যবাচকর (৬৬০-৬৯২) এবং সুন্দরর (৭১০-৭৩৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যারা সময়াচার্য নামে কথিত হতেন। অপ্পর রচিত মোট ৩১৩টি পদের পরিচয় পাওয়া গেছে। সম্বন্দর মাত্র ষোল বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে ১০,০০০ পদ রচনা করেছিলেন বলে প্রকাশ। যদিও তাঁর প্রাপ্ত পদসমূহের সংখ্যা ৩৮৪টি। মাণিক্যবাচকর পাণ্ড্য রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি ওই পদ পরিত্যাগ করে সাধকের জীবন গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকথা তিরুবিঢ়ইয়াদল এবং বদবুরর পুরাণদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রচিত পদাবলী অসংখ্য। যেগুলি তিরুবাচকম নামক তিরুমুরাই গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। সুন্দরর রচিত শ'খানেক ভক্তিগীতির পরিচয় পাওয়া গেছে, যেগুলির জনপ্রিয়তা অসীম। আজও পর্যন্ত প্রতিটি তামিল শৈবমন্দিরে সুন্দরর রচিত ভক্তিগীতি নিয়মিত গাওয়া হয়। উপরিউক্ত কবিগণের রচনাসমূহ ছাড়াও তামিল শৈব সাহিত্যে পেরিয়া-পুরাণম নামক একটি গ্রন্থ আছে যাতে ৬৩ জন শৈব সাধকের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক ছিলেন শেক্কিঢ়ার।

পেরিয়াপুরাণে উপরিউক্ত শৈব সাধকদের ৬৩ জনের মধ্যে ৫৯ জনের জাতি, জন্মস্থান ও উপজীবিকার কথা আছে। এ'দের মধ্যে মাত্র ১৫ জন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন, অমাত্য ছিলেন ৩ জন, শাসনকর্তা ১১ জন, বৈশ্য ৫ জন, বেড়ুড়ার ১৩ জন, গোয়ালা ২ জন, কুমোর, জেলে, ব্যাধ (বেড়ন), তাড়িসংগ্রাহক, তাঁতী, ধোপা এবং তেলি প্রত্যেকটি এক-একজন করে, এবং অবশিষ্ট ৩ জন যথাক্রমে পানন, পরইথন ও কুরুম্বন জাতীয়। দেখা যাচ্ছে অর্ধেকেরও বেশি নিম্নশ্রেণীর। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১। শৈব সিদ্ধান্ত বা তামিল শৈবধর্ম

উপরিউক্ত নায়নার সাধকদের রচনাবলী থেকে কালক্রমে দক্ষিণ ভারতে একটি বিশেষ ধরনের শৈব মতবাদ গড়ে উঠেছিল যা শৈব সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। নায়নার সাধকগণ সচেতনভাবে অবশ্য এ মতবাদ গড়ে তোলেননি। তাঁরা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন, পরবর্তীকালে মেয়কণ্ডদেব, অরুণন্দি, মরয়জ্ঞানসম্বন্ধ ও উমাপতি, এই চারজন শিবাচার্য তা অবলম্বনে শৈব সিদ্ধান্ত মত সৃষ্টি করেন। মেয়কণ্ডদেবের উপর আরোপিত শিবজ্ঞানবোধম্ (ত্রয়োদশ শতক)[১] এই সম্প্রদায়ের মৌলিক গ্রন্থ। অরুণন্দির শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়ার ও উমাপতির শিবপ্রকাশম এই সম্প্রদায়ের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শৈব সিদ্ধান্তবাদীগণ তাঁদের তত্ত্বে কিছুটা বেদান্তের ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন, যদিও শৈবধর্মের সবচেয়ে বড় উপাদান যে সাংখ্য তাকে পরিত্যাগ করেন নি। তাঁদের প্রধান তত্ত্ব তিনটি—পতি (ঈশ্বর), পশু (জীব) ও

১। শিবজ্ঞানবোধম্ ও শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়ারের সম্পাদনা ও সটীক অনুবাদঃ জে· এম· নল্লস্বামী পিল্লাই, ১৯৪৫, ১৯৪৮।

পাশ (সংসার বন্ধন)। এই তিনটি তত্ত্বই সৎ বা অস্তিত্ববান। ঈশ্বর যেমন বাস্তব তাঁর সৃষ্ট জগৎও সেই রকম বাস্তব। ঈশ্বর স্বয়ং শিব যিনি স্বেচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করে থাকেন। তিনি সকল প্রকার পরিণাম বা রূপান্তরের উৎস, কিন্তু নিজে পরিণামাধীন নন। ন্যায়-বৈশেষিকদের মত শৈব সিদ্ধান্তবাদীরাও বিশ্বাস করেন যে কুম্ভকার যেমন ঘটাদি প্রস্তুত করে, সেই রকম ঈশ্বরও জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকা যেমন কুম্ভকারের ঘটাদি সৃষ্টির উপাদান কারণ, জগৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ হচ্ছে মায়া। এখানে বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট।

এখানে বেদান্তের যা সমস্যা শৈব সিদ্ধান্তবাদীদের সেই একই সমস্যা। জগৎ-রূপ এই কার্যের নিশ্চয়ই কোন উপাদান কারণ আছে, এবং সেই উপাদান কারণ প্রকৃতির দিক থেকে কার্য হতে ভিন্ন নয়। জগৎ জড় বা অচিৎ, ঈশ্বর চেতনা বা চিৎ, সুতরাং ঈশ্বর এই জগতের উপাদান কারণ হতে পারে না। তাহলে জড়রূপী মায়াই উপাদান কারণ। এখানে তিনটি সমস্যা। জড় মায়ার সৃষ্টি হল কিভাবে? তা কি ঈশ্বরের মতই চিরন্তন? তাহলে ঈশ্বর তার স্রষ্টা হতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর যদি মায়ার স্রষ্টা হন তাহলে তাঁকে তাঁর চৈতন্যময় সত্তা থেকেই জড়বস্তুর সৃষ্টি করতে হবে। চৈতন্য থেকে জড়ের উদ্ভব কিভাবে হবে? যদি তর্কচ্ছলে ধরে নেওয়া যায়, তা হওয়া সম্ভব, তাহলে ঈশ্বরকে পরিণামী হতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর তো অপরিণামী। তৃতীয়তঃ, যেহেতু মায়া জড় বা অচিৎ সেহেতু তা স্বয়ং সক্রিয় হতে পারে না। তার জন্য চেতন পরিচালনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ঈশ্বর সেটা কিভাবে করবেন?

এই মৌল সমস্যাগুলি সমাধান হবার নয়, শৈব সিদ্ধান্তীরাও এগুলিকে পাশ কাটিয়ে কয়েকটি কল্পিত ধারণা দিয়ে সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। মায়াকে তাঁরা দুভাগ করেছেন—শুদ্ধমায়া ও অশুদ্ধমায়া। আণব ও কর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মায়া অশুদ্ধমায়ায় পর্যবসিত হয়। ঈশ্বর বা শিব সাক্ষাৎভাবে মায়ার উপর ক্রিয়া করেন না, তাঁর চিৎশক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করেন। এইভাবে শিব কর্তৃক চালিত হয়ে মায়া নিজ থেকেই তত্ত্বসমূহ সৃষ্টি করে এবং এই তত্ত্বগুলিই প্রকৃতিতে বিবর্তন ঘটিয়ে জগৎ সৃষ্টি করে সাংখ্য প্রদত্ত ছক অনুসারে। [২০৭ পৃঃ দেখুন]

ধর্মের ব্যবহারিক দিকে শৈব সিদ্ধান্তীগণ চরম ভক্তিবাদী। তাঁদের মতে চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা আত্মার মুক্তি হয়। চর্যা মার্গের সাধক নিজেকে ঈশ্বরের ভৃত্যের ন্যায় মনে করবেন, যার ফলে তিনি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হবেন। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ক্রিয়া মার্গে সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে অধিকতর অন্তরঙ্গতা অর্জন করবেন এবং নিজেকে তাঁর সৎ পুত্র হিসাবে মনে করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ যোগমার্গে এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবং তিনি ঈশ্বরকে তাঁর সখা হিসাবে মনে করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করবেন, তাঁর শিবত্বের উপলব্ধি হবে, যা হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ। প্রথম স্তর সালোক্য, দ্বিতীয় স্তর সামীপ্য, তৃতীয় স্তর সারূপ্য এবং চতুর্থ স্তর সাযুজ্য।

১০। আগমান্ত শৈবধর্ম

খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে দক্ষিণ ভারতে আরও একটি শৈব মত প্রতিষ্ঠালাভ করে যা আগমান্ত শৈবধর্ম নামে খ্যাত। এই মত মূলত শৈব সিদ্ধান্ত অনুসারী, কিন্তু এই মতের সাধকরা তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের আদি

[সাংখ্য প্রদত্ত ছক]
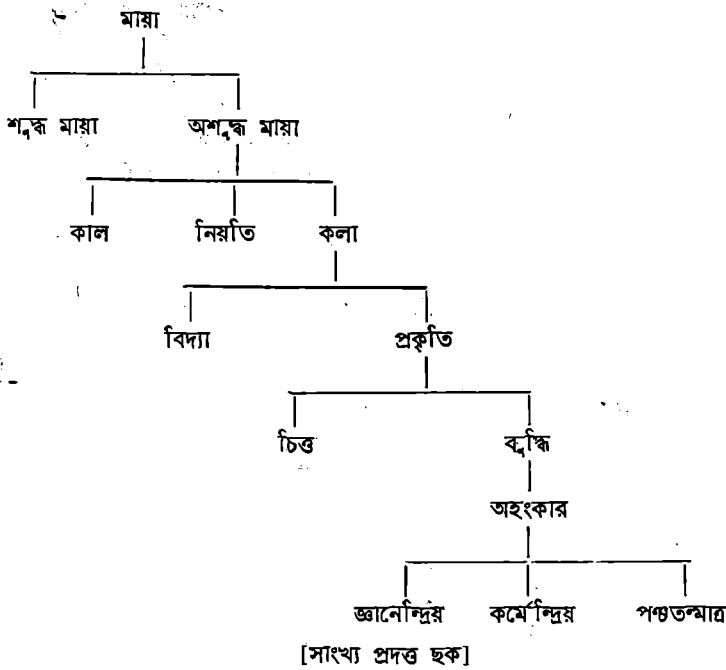
এলাকা ছিল গোদাবরী তীরে মন্ত্রকালী নামক অঞ্চল। চোল বংশীয় রাজারা এই আগমান্ত শৈবাচার্যদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই মতের প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্বাদশ শতকের অঘোর শিবাচার্য বিরচিত ক্রিয়াকর্মদ্যোতিনী। এছাড়া ত্রিলোচন শিবাচার্যের সিদ্ধান্তসারাবলী, নিগম-জ্ঞানদেবের জীর্ণোদ্ধারদশকম্ প্রভৃতিও এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আগমান্ত শৈবেরা বেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। আঠাশটি আগম-শাস্ত্রই (অধিকাংশ এখনও অপ্রকাশিত) তাঁদের নিজস্ব শাস্ত্র, যা তাঁদের মতে মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে নির্গত। কামিকাগম, সুপ্রভেদাগম, বিজয়াগম, কিরণাগম, বাতুলাগম প্রভৃতি ওই আঠাশটি আগম শাস্ত্রের অন্তর্গত। আগমান্ত শৈবেরা জাতিভেদ মানতেন না, যে কারণে অপরাপর সম্প্রদায় কর্তৃক তাঁরা অপমার্গী, নাস্তিক, শূদ্র হিসাবে নিন্দিত ছিলেন। গুরুকরণ ও দীক্ষা তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। দীক্ষায় যোগ্যতালাভের জন্য দেবীর কৃপার উপর নির্ভর করতে হত, এই কৃপালাভকে বলা হত শক্তিপাত। দীক্ষান্তে নূতন নামকরণের প্রয়োজন হত এবং নামগুলি প্রধানত শিবের পঞ্চমুখের নামানুসারে রাখা হত।

দীক্ষা তিন প্রকার—সময় দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা ও নির্বাণ-দীক্ষা। সাধারণের জন্য প্রথমটিই নির্দিষ্ট ছিল, বাকি দুটি উন্নততর মানসিকতা সম্পন্নদের জন্য। সময় দীক্ষা গ্রহণকারীদের গুরু ও শিবাগ্নির পূজা করতে হত, এবং তাঁরা দাসমার্গী ছিলেন, অর্থাৎ নিজেদের ঈশ্বরের ভৃত্য বা সেবক হিসাবে গণ্য করতেন, পূর্বোক্ত শৈব সিদ্ধান্ত মতে যা চর্যা মার্গ। বিশেষ দীক্ষার অধিকারীরা পুত্রক নামে পরিচিত ছিলেন যাঁরা ক্রিয়া ও যোগের অধিকারী ছিলেন এবং ঈশ্বরের অধিকতর অন্তরঙ্গতা

দাবি করতেন। নির্বাণ-দীক্ষিতেরা ছিলেন আরও উচ্চস্তরের যাঁরা যোগের ও জ্ঞানের অধিকারী।

আগমান্ত শৈবেরাও শৈব সিদ্ধান্তীদের মত পতি, পশু, পাশ এই ত্রিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁদের মতে পতি বা শিব কিছুটা জীব বা পশুর কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সৃষ্টিকার্যে অগ্রসর হন। তিনি সর্বজ্ঞ এবং কর্ম ও মলাদিমুক্ত হলেও, কর্মনিরপেক্ষ কারণ নন। পশু বা জীবাত্মার প্রতি আগমান্ত শৈবধর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানসিক শক্তিভেদে এই জীব তিন প্রকার —বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল। প্রথম শ্রেণীটি সর্বোৎকৃষ্ট। এঁরা দুই প্রকার—সমাপ্ত কলুষ ও অসমাপ্ত কলুষ। সমাপ্ত কলুষেরা বিদ্যেশ্বর নামে পরিচিত। পাশ ও বন্ধন চার রকমের—মল, কর্ম, মায়া এবং রোষ। মল জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়া আচ্ছন্ন রাখে, ফলকামনা বিশিষ্ট কার্যের নাম কর্ম এবং মায়া স্থূল বস্তু যা জগতের উপাদান কারণ। চতুর্থটি শিবপ্রদত্ত ক্ষমতা যা প্রয়োগ করে জীব পাশ বা বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে।

আগমান্ত শৈবেরা আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী। দীক্ষা ছাড়াও মন্ত্রসাধন, পূজা, অষ্টসিদ্ধি লাভের নানা প্রক্রিয়া এবং তৎসহ প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি, ষট্‌চক্র প্রভৃতি সবকিছুই তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্গত। আগমান্ত শৈবগণ শৈব সিদ্ধান্তীদের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত যে জীব ও ঈশ্বর পৃথক সত্তা, এবং জড়জগতের উপাদান-কারণ মায়া। চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত জীব শিবেরই অনুগ্রহে প্রথমে তাঁর মহাগণপতিত্ব এবং পরিণামে তাঁর সারূপ্য লাভ করে।

১১। শুদ্ধশৈব: শিবাদ্বৈত

বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের সমকালীন বলে কথিত শ্রীকণ্ঠ শিবাদ্বৈতবাদ একটি বিশেষ ধরনের শৈব মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিও বেদান্তসূত্রের স্বকৃত ভাষ্য করেছিলেন, যার উপর শৈবধর্মের ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্য বহুলাংশে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুরূপ, তবে রামানুজ যেমন চরম অদ্বয়বাদ ও দ্বৈতবাদের মধ্যবর্তী পথ গ্রহণ করেছিলেন, শ্রীকণ্ঠের মত একটু বেশি অদ্বয় ঘেঁসা, বরং তাঁকে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ফেলা যায়।

জীবাত্মা ও জড়জগতের সঙ্গে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা শিবের সম্পর্ককে শ্রীকণ্ঠ দেহ ও আত্মার সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম বা শিবই হচ্ছেন জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জীবাত্মা ও জড়জগতের আণবিক উপাদানসমূহ তাঁরই শক্তিবশে তাঁতেই সঞ্জাত হয় এবং এই শক্তিবলেই তাঁর দ্বারা জগতের সৃষ্টি হয়। বিশ্বজগৎ ব্রহ্ম হতে অ-পৃথক, যেমন কলস মাটি হতে অ-পৃথক, কিন্তু একই সঙ্গে, ব্রহ্ম জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অ-ভিন্ন নন, কেননা তিনি চেতনকারণ যেখানে জগৎ 'অংশত' অচেতন। 'অংশত' এই কারণে যে সেখানে অচেতন বস্তু ও চেতন জীব দুই বর্তমান।

শিবই ব্রহ্ম। ক্রমাগত ধ্যানের দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা যায় যার নাম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। এই একমাত্র পন্থা যার দ্বারা জীব বন্ধন বা পশুভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। আত্মোপলব্ধিতেই শিবোপলব্ধি। এটা একটা মানসিক অবস্থা যার নাম শিবত্ব। বন্ধন যুক্ত জীব এই সাধনার প্রথম স্তরে নিরন্বয়-উপাসক নামে পরিচিত হবে। তার কর্মসমূহ পরিপক্ক হবার পূর্বপর্যন্ত মুক্তি হবে না। ক্রমাগত ধ্যানের

অগ্রগতির ফলে তার কিছু বিশেষ গুণ (অসাধারণ) জন্মাবে, পরবর্তী স্তরে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, অবশেষে মুক্তি।

শ্রীকণ্ঠ রামানুজের সমকালীন বলে কথিত হলেও, তাঁর রচনায় রামানুজ দর্শনের প্রভাব এত বেশি যে তাঁকে রামানুজ-পরবর্তী বলাই সঙ্গত। আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকেই তাঁকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে স্থান দেবার পক্ষপাতী। তবে রামানুজ অস্বাভাবিক দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং সেই হিসাবে শ্রীকণ্ঠ তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন হলেও হতে পারেন। শ্রীকণ্ঠের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যের নাম ব্রহ্মমীমাংসা[১] ষোড়শ শতকের অপ্পয় দীক্ষিত এই ব্রহ্মমীমাংসা-ভাষ্যের নিজস্ব ভাষ্য রচনা করেছিলেন।[২]

১২। বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক অঞ্চলে এক ধরনের জঙ্গী শৈবধর্ম গড়ে ওঠে যার নাম বীর শৈব বা লিঙ্গায়ৎ। এই ধর্ম অনেক পুরাতন যুগের ঐতিহ্যবাহী, যে ঐতিহ্যকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন বসব নামক একজন কন্নড় দেশীয় ব্রাহ্মণ, যাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল কর্ণাটক থেকে জৈনদের উৎখাত করা, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন। দুটি উদ্দেশ্যই বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছিল।

বীরশৈবেরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে শরীরে শিবলিঙ্গ ধারণ করেন।[৩] এই লিঙ্গ ধারণই হচ্ছে তাঁদের উপনয়ন বা দীক্ষা। তাঁরা উপবীত ধারণ করেন না, গায়ত্রী পাঠ করেন না। তাঁদের দীক্ষার নাম লিঙ্গ-স্বায়ত্ত-দীক্ষা। বীরশৈবেরা ইষ্টলিঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন দেবমূর্তির পূজা করেন না, তবে শিবের সম্পর্কিত দেবতারা তাঁদের কাছ থেকে সম্মান পান। বেদ সম্পর্কে বীরশৈবেরা ঔদাসীন্যের নীতি নিয়েছিলেন। তাঁরা বেদবিরোধিতা করেননি, কিন্তু বেদপ্রামাণ্যও স্বীকার করেননি। সমাজ-সংস্কারের দিকে তাঁদের বিশেষ ঝোঁক ছিল, এবং দরিদ্রশ্রেণীর অবস্থার উন্নতির দিকে তাঁদের নজর ছিল। জৈনদের অনুকরণে তাঁরা অন্ন দান, জল দান, ঔষধ দান ও বিদ্যা দানকে সম্প্রদায়ভুক্তদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। বীরশৈবেরা জাতিভেদ মানেন না। তাঁরা ধূমপান, মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণের বিরোধী। বীরশৈব সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নারীর স্থান। তাঁদের সমাজ বাল্যবিবাহ বিরোধী এবং যা সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা বিধবা বিবাহের সমর্থক। এই সকল দিক থেকে দেখলে এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রবক্তা আচার্য বসব শুধু অসাধারণই নন, অনন্যসাধারণ।

একটা অনগ্রসর ও স্থাবর সমাজকে গতিশীল করতে গেলে কিছুটা জবরদস্তির প্রয়োজন আছে, বসবও তা করেছিলেন। বসব ছিলেন কল্যাণের চালুক্যরাজ বিজ্জলের মন্ত্রী। বিজ্জল ১১৫৭ থেকে ১১৬৭ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। শাসন

১। সম্পাদনা এল· শ্রীনিবাসাচার্য।

২। শ্রীকণ্ঠের মতবাদ সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য দ্রষ্টব্য S. N. Dasgupta *History of Indian Philosophy*, V, 65-95.

৩। এই প্রথার সর্বপ্রাচীন ইঙ্গিত পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের সূত-সংহিতা নামক গ্রন্থে। প্রাক্-গুপ্ত কালের উত্তর ভারতীয় ভারশিব রাজবংশের রাজারা, যাঁরা মথুরা, পদ্মাবতী প্রভৃতি অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, মস্তকে শিবলিঙ্গ ধারণ করতেন।

কার্যে বসবের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়, এবং তাঁর প্ররোচনায় বিজ্জল নিহত হন। বসব তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার সুযোগে বীরশৈব সম্প্রদায়কে সুসংহত করেন। ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে বসব শিবানুভব-মণ্ডপ নামক একটি সংস্থার সৃষ্টি করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষয়িষ্ণু ধর্মে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করা, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতিভেদ-প্রথার বিলোপ, বাণিজ্য ও কায়িক শ্রমে উৎসাহ প্রদর্শন। শ্রীকুমারস্বামীজী যথার্থই বলেছেনঃ "বসবের কর্মক্ষেত্র যেমনই বৈচিত্র্য-পূর্ণ তেমনি বিশাল ছিল, এবং এই প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রতিভার একটি বিশেষ প্রমাণ। এটা যে কেবলমাত্র তাঁর ব্যবহারিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় তাই-ই নয়, তাঁর মধ্যে যে বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ ও কর্মদক্ষতার সমন্বয় হয়েছিল তারও পরিচয় দেয়। কারণ তিনিই শৈবধর্মকে বর্ণাশ্রমের শৃংখল থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবং তাতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এনেছিলেন।"১

বসব নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর উপদেশসমূহ সঙ্কলিত হয়েছিল, যা বচন নামে খ্যাত। এই বচনগুলি কন্নড় সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। বীর-শৈবদের পবিত্রতম ও প্রামাণিক শাস্ত্র কন্নড় ভাষায় রচিত বসব পুরাণ (ত্রয়োদশ শতক) ও ছন্ন বসব পুরাণ (ষোড়শ শতকে আচার্য বিরূপাক্ষী কর্তৃক রচিত)। এছাড়া সংস্কৃতে মগেগয় মায়িদেব রচিত শিবানুভব সূত্র, মরিতন্তাদার্যের বীর-শৈবাণ্ডচন্দ্রিকা, রেণুকাচার্য রচিত সিদ্ধান্তশিখামণি, প্রভৃতি বীরশৈবদের নিকট প্রামাণ্য গ্রন্থ। কন্নড় ভাষায় রচিত প্রভুলিঙ্গলীলা এই সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ গ্রন্থ। বীরশৈবধর্মের মূল কথা হলঃ

সর্বেষাং স্থান ভূতত্বাল লয় ভূতত্বতস্তথা।
তত্ত্বানাং মহদাদিনাং স্থলমিত্যভিধীয়তে॥২

অর্থাৎ, দৃশ্যমান জগতের যিনি আদি কারণ ও আধার এবং সমস্ত জাগতিক ক্রমবিকাশের মূল ও চরম গতি, তিনি হলেন স্থল। স্থ অর্থ স্থিতি যাতে বিশ্ব-জগতের কারণ স্থিত, ল অর্থ লীন যাতে সৃষ্ট বিশ্বচরাচর প্রলয়কালে লীন হয়ে যায়। অন্তর্নিহিত শক্তির আলোড়নের ফলে এই স্থল লিঙ্গস্থল ও অঙ্গস্থল নামক দুই অংশে বিভক্ত হন। লিঙ্গস্থল উপাস্য শিব, পরমাত্মা, অঙ্গস্থল জীব বা জীবাত্মা। আবার লিঙ্গ শব্দটির ধাতুগত অর্থ লী ধাতু (দ্রবীভূত হওয়া) এবং গম্ ধাতু (যাওয়া), যা সেই চরম তত্ত্বকেই নির্দেশ করে যাতে সকল কিছুই লয়প্রাপ্ত হয়, আবার যা হতে সকলই উদ্ভূত হয়। লিঙ্গস্থল অর্থাৎ শিবের যিনি শক্তি, তিনিও দু'ভাগে বিভক্ত, কলা এবং ভক্তি—প্রথমটির সম্পর্ক পরমাত্মার সঙ্গে, দ্বিতীয়টির জীবাত্মার সঙ্গে। সমস্ত সদ্বস্তুর মধ্যে উপাদান অপেক্ষা আকারের গুরুত্ব অধিক। উপাদানগত অংশ শক্তি। বীরশৈব মতে একটি আদি সত্তাই তার নিজস্ব শক্তির ক্রিয়ায় পরমাত্মা ও জীবাত্মায়, ঈশ্বরে ও জীবে রূপান্তরিত হন। বীরশৈব মতবাদ মায়াবাদ স্বীকার করে না, কেননা জগৎ চৈতন্যের মিথ্যা বিবর্তন হতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সঙ্গে এই মতবাদের মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জীব ও জগতের সূক্ষ্ম উপাদান ঈশ্বরের বিশেষ গুণরূপে সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তাঁতেই বিদ্যমান এবং

১। *History of Philosophy : Eastern and Western* (ed. Radhakrishnan), art. on Virasaiva sect.

২। শিবানুভব সূত্র ২, ৩।

পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁর থেকেই বিকাশমান। কিন্তু বীরশৈব মতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তি ও তাঁর বিভিন্ন ক্রম হতেই জীব ও জগতের উদ্ভব হয়।

১৩। কাশ্মীর শৈববাদ

কাশ্মীর শৈববাদের উদ্ভব খ্রীষ্টীয় নবম শতকে। এই মতবাদ বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করে না, জাতিভেদও নয়। ত্রিক, স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞা এই তিনটি আদর্শ কাশ্মীর শৈববাদকে চিহ্নিত করেছে, এবং তিনটি নামেই এই মতবাদকে বোঝানো হয়েছে। ত্রিতত্ত্বের দিকে প্রবণতা আছে বলে এই মত ত্রিক নামে পরিচিত।১ এই ত্রিতত্ত্ব হচ্ছে শিব-শক্তি-অণু অথবা পতি-পাশ-পশু। এই ত্রিতত্ত্ব শৈবধর্মের অপরাপর শাখাতে বিদ্যমান থাকলেও, কাশ্মীর শৈববাদে জীব ও জড়জগৎ শিবের সঙ্গে অভিন্ন। শিব যেভাবে নিজেই জীবসমূহ ও জগতের আকারে প্রতিভাত হন, সেই রূপান্তরের পদ্ধতির নাম স্পন্দ। প্রত্যভিজ্ঞা বলতে বোঝায় পরমাত্মা বা শিবের সঙ্গে জীবাত্মার অভিজ্ঞতার উপলব্ধির উপায়।

শিবসূত্রের প্রণেতা বসুগুপ্ত (৮২৫ খ্রীঃ) কাশ্মীর শৈববাদের প্রবক্তা হিসাবে কথিত। তাঁর শিষ্য কল্লট স্পন্দকারিকা বা স্পন্দসর্বস্ব গ্রন্থে শিবসূত্র অনুসরণে কাশ্মীর শৈববাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন। বসুগুপ্তের অপর শিষ্য সোমানন্দ শিবদৃষ্ট নামক গ্রন্থের লেখক। পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-কারিকার লেখক উৎপল, রামকণ্ঠ এবং অভিনবগুপ্ত উল্লেখযোগ্য। অভিনবগুপ্ত ছিলেন মহামনীষী, ৪১ খানি গ্রন্থের লেখক। অভিনবগুপ্তের অবদান দুদিক থেকে অভিনব। প্রথমত, তিনি ৬৪ খানি প্রামাণ্য শৈবাগামের সঙ্গে অদ্বৈত শৈববাদের সকল দিকের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি অদ্বৈত শৈববাদের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অভিনবগুপ্তের লেখক জীবন ৯৯১ থেকে ১০১৫ পর্যন্ত। কাশ্মীর শৈববাদের উপর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা পরমার্থসার। পরবর্তী কাশ্মীর শৈববাদী লেখকদের মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ের লেখক ক্ষেমরাজ (১০৪০ খ্রীঃ) এবং বিভিন্ন টীকাগ্রন্থের লেখক উল্লেখযোগ্য, যাঁরা হলেন অভিনবগুপ্তের পরমার্থসারের টীকাকার যোগরাজ, তন্ত্রলোকের টীকাকার জয়রথ এবং প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিণীর টীকাকার ভাস্কর-কণ্ঠ (১৭০০ খ্রীঃ)।২

শৈবধর্মের অপরাপর শাখার মতই কাশ্মীর শৈববাদে চরম সত্তা শিব বা শম্ভু। তিনি সকল জীবের আত্মস্বরূপ, অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন পূর্ণ। তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং চরম অভিজ্ঞতা (পরা সংবিৎ) ও পরমেশ্বর। তিনি সকল অস্তিত্বের ভিত্তি এবং সকল জীবের মর্মমূল। তিনি অনাদি এবং এক, সচল এবং অচল সব কিছুতেই তাঁর অধিষ্ঠান। স্থান ও কাল তাঁকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না, তিনি তাদের অতিক্রম করেন এবং তারা তাঁর আভাস মাত্র। তিনি বিশ্বময় এবং বিশ্বোত্তীর্ণ। জগৎ তাঁকে নিঃশেষ করতে পারে না, কারণ তিনি অনন্ত। তিনি সেই অনুত্তর, অর্থাৎ সেই বাস্তবতা যার বাইরে কিছু নেই।

বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ শিব একই সঙ্গে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

১। K. C. Pande, *Abhinavagupta : An Historical and Philosophical Study* (1936) 170.

২। *ibid*, 22 ff.

এখানে কারণে এবং কার্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু এখানেও সেই পুরাতন সমস্যা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে কিভাবে জড়-জগতের উদ্ভব হতে পারে? প্রত্যুত্তরে প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রে আভাসবাদের কথা বলা হয়েছে। এই মত অনুযায়ী ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট জগৎ তাঁরই প্রতিচ্ছবি এবং আপাত দৃষ্টিতে জগতের সঙ্গে তাঁর যে পার্থক্যবোধ তা ভ্রান্তিপ্রসূত। সৃষ্ট জগৎ ও জীবের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই। দর্পণে ধৃত জীবজন্তু গৃহাদির প্রতিচ্ছবি যেমন দর্পণের উপর কোন রেখা বা কলঙ্ক আরোপ করে না, সেই রকম বিশ্বজগৎ তাঁতে প্রতিভাত হয়ে তাঁর মহিমাকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করে না।১

বিশ্বজগতের প্রকাশ কার্যকর হয় শিবের শক্তির মারফৎ। স্ত্রীরূপিণী এই শক্তি শিবের থেকে পৃথক্ নয়। এই শক্তি বহু ধরনের, প্রধানত পাঁচ ধরনের—চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। শক্তির প্রকাশেই জগতের প্রকাশ হয়, শক্তি রুদ্ধ হলেই জগৎ লুপ্ত হবে। সৃষ্টি এবং প্রলয় পরপর ঘটে যায়, এই প্রক্রিয়ার শুরুও নেই, শেষও নেই।

জীব আসলে ঈশ্বরের থেকে পৃথক নয়, কিন্তু অজ্ঞানরূপ তমসায় আচ্ছন্ন থাকার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সে তার প্রকৃত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি উপমা ব্যবহৃত হয়। কোন অপরিচিত যুবকের রূপ ও গুণাবলীর বিষয় বিভিন্ন সূত্র থেকে শুনে কোন যুবতী তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে। কিন্তু যখন সে তাকে সাক্ষাৎ দেখবে তার মনে কোনই ভাবোদয় হবে না। কেননা আর পাঁচজনের সঙ্গে তার পার্থক্য করা সহজ নয়। কিন্তু তখন যদি কেউ তাকে জানিয়ে দেয় এই সেই পুরুষ, যার কথা সে এতকাল শুনেছে, তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না।২ ঠিক সেই রকম জীব, শিবের সকল বিষয় জেনে তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণ করলেও, জানে না যে সেই ঈশ্বর তার মধ্যেই আছেন। গুরুর উপদেশে তার অজ্ঞানতা দূর হয়, এবং সে বুঝতে পারে যে ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোন সত্যকার ভেদ নেই, তখনই পরম শান্তি ও আনন্দ তার চিত্তে চিরবিরাজমান হয়।

স্পন্দ শাস্ত্রমতে এবং প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতাবোধই জীবের পাশমুক্তির প্রাথমিক উপায়। তাই কাশ্মীর শৈববাদে আচার-অনুষ্ঠান এমন কি আসন-প্রাণায়ামাদিও অপ্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে সর্বদর্শন-সংগ্রহে মাধবাচার্য লিখেছেনঃ বাহ্যাভ্যন্তরচর্যাপ্রাণায়ামাদি ক্লেশ প্রথাসকলাবৈধুর্যেন সর্বসুলভমভিনবং প্রত্যভিজ্ঞামাত্রং পরাপরসিদ্ধ্যুপায়মভ্যুপগচ্ছন্তঃ পরে মাহেশ্বরা-প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রমভ্যস্যন্তি।৩ কাশ্মীর শৈববাদে মোক্ষ হচ্ছে পূর্ণতার মূল অবস্থায় এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যে প্রত্যাবর্তন। অভিনবগুপ্তের মতে, দ্বৈতমূলক ধারণাসমূহের অবসান ঘটলেই জীব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, জল যেমন জলের সঙ্গে, অথবা দুধ যেমন দুধের সঙ্গে। উপাদানসমূহ একমাত্র পরম সত্তা শিবে বিলীন হয়ে যায়। যে বিশ্বজগৎসহ নিজেকেও শিবরূপে উপলব্ধি করতে পারে, সে সকল দুঃখ ও বিভ্রান্তিমুক্ত।৪

১। পরমার্থসার, ১২-১৩ ; *Journal of the Royal Asiatic Society* (1910), 723.

২। মাধবের সর্বদর্শনসংগ্রহ, Eng. tr. Cowell and Gough 136.

৩। সর্বদর্শনসংগ্রহ, ৯০। ৪। পরমার্থসার ৫১-৫২।

১৪। কাপালিক, কালামুখ, মত্তময়ূর

শৈবধর্মের দার্শনিক উপরিতল সম্পর্কে একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া গেল। এবারে তার নিম্নতল সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। নিম্নতল বলতে বোঝায় সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক জীবনচর্যা যা শৈবধর্মে স্থান করে নিয়েছিল। দুইটি তলের মধ্যে উপরিতলটিকে শ্রেষ্ঠতর বলার কোন কারণ নেই। হতে পারে উপরিতলটির ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশুদ্ধ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু নীচের তলটি জীবনের প্রতিফলন, যার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়।

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঋগ্বেদের একটি সূক্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা কেশীসূক্ত নামে পরিচিত।১ এখানে ধূলিমলিন পিঙ্গলবস্ত্র পরিহিত, দীর্ঘকেশযুক্ত, উন্মত্তপ্রায় একশ্রেণীর মুনির ইঙ্গিত আছে যাদের হয়ত পাশুপত ব্রতধারী রুদ্রশিব পূজকদের পূর্বসূরী হিসাবে গণ্য করা যায়, বিশেষ করে যখন এখানে কেশীমুনির সঙ্গে রুদ্রের বিষপানের ঐতিহ্যকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।২, পতঞ্জলি আয়ঃশূলিক (লৌহ-ত্রিশূলধারী) এবং দাণ্ডাজিনিক (দণ্ডধারী ও পশুচর্ম পরিধানকারী) শিবভাগবতের ধর্মাচরণ সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন কটাক্ষপাত করেছেন, যে আচরণ পরবর্তীকালের লকুলীশ পাশুপত শৈবদের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি। ক্রাথন-স্পন্দন-মণ্ডন-শৃঙ্গারণ-অবিত্তকরণ-অবিতদ্ভাষণাদি পাশুপত চর্যাসমূহ সুস্পষ্টভাবেই কৌণ্ডিণ্য কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যকর্মবিরুদ্ধ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। শিবের বেদবাহ্যতার মূলে লিঙ্গ পূজাও যে বর্তমান ছিল সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি। যক্ষ ও গুহ্যকগণের সঙ্গে শিব ও উমার সম্পর্ক রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে।৩ ভাগবত পুরাণে শিবকে মর্কটলোচন, শ্মশানচারী, ভূত-প্রেতের সহচর, ক্রিয়াহীন, অশুচি, দিগম্বর, প্রসারিত জটাবিশিষ্ট, উন্মত্তবৎ পরিভ্রমণশীল, চিতাভস্মে স্নানকারী, অস্থিভূষণ ও মুণ্ডমালী, অমঙ্গলদায়ক, উন্মাদ ও উন্মাদগণপ্রিয়, তমোগুণান্বিত, প্রমা, ভূতপতি ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে কটূক্তি করা হয়েছে।৪ আসলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে শিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুণই এবং ওই শ্রেণীর মানুষদের লৌকিক আচার-আচরণ শৈবধর্মে স্থান পাবার কারণেই বিরোধীপক্ষরা শিবকে এইভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আজকের চড়ক-গাজন ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে যেগুলি বীভৎস ও ঘৃণ্য বলে প্রতিভাত হয়।

পাশুপত ছাড়াও শৈবধর্মের যে সব শাখায় নিম্নশ্রেণীর ও উপজাতীয় মানুষদের আচার অনুষ্ঠান স্থান পেয়েছে সেগুলি কাপালিক, কালামুখ, অঘোরপন্থী ইত্যাদি নামে পরিচিত। উচ্চবর্ণভুক্ত লেখকগণ এই সকল আচার-অনুষ্ঠান পছন্দ করেন নি এবং এগুলিকে ভয়াবহভাবে চিত্রিত করেছেন, তবে সত্য কথা বলেছেন কিনা সন্দেহ। এই সকল সম্প্রদায়ের কোন নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র নেই, থাকলেও তা লুপ্ত হয়েছে বা লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এগুলির উল্লেখ বিরোধী পক্ষের রচনায়, এবং বলাই বাহুল্য বিকৃতভাবে পরিবেশিত। স্বয়ং শঙ্করাচার্যের মত মানুষও

১। ১০. ১৩৬।
২। J. N. Banerjea *Pauranic and Tantric Religion* (1966), 72-73.
৩। ৫, ৮৯। ৪। ৪, ২-৭।

পূর্বপক্ষ হিসাবে বিরোধী পক্ষের মত যখন নিজ রচনা-বিকৃত করে উপস্থাপন করেন, তখন অন্য লেখকদের তো কথাই নেই। কাজেই কাপালিক-কালামুখাদি সম্প্রদায় বিকৃতভাবে চিত্রিত। এছাড়া এইসব সম্প্রদায় মৌলিকভাবে মাতৃপূজক ছিল, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধগুলিতে পুরোদস্তুর আস্থাহীন ছিল এবং সর্বোপরি জাতিভেদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিল না। স্মার্ত-পৌরাণিক ঐতিহ্যে গঠিত আমাদের লেখকরা, কি প্রাচীন যুগের, কি আধুনিক যুগের, এদের বরদাস্ত করতে পারেন নি। শঙ্করাচার্যের কাছে জগৎ মিথ্যা হলেও জাতিভেদ মিথ্যা নয়, তা ব্রহ্মের মতই ধ্রুব সত্য। সামাজিক ক্ষেত্রে শঙ্করের কাছে একমাত্র মনুই অথরিটি। কথাটি তিক্ত হলেও সত্য।

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর ভ্রাতুষ্পুত্র নাগবর্ধনের, যিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে রাজত্ব করতেন, একটি তাম্রশাসনে নাসিক জেলার ইগাতপুরীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম কপালেশ্বর শিবের পূজার ব্যয় হিসাবে বরাদ্দ ছিল। ওই লেখে মহাব্রতী হিসাবে বর্ণিত কাপালিক-কালামুখাদি সম্প্রদায় উল্লিখিত হয়েছে। পাঞ্জাবের কাংড়া জেলায় নির্মন্দ নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে নির্মন্দ-অগ্রহারে কপালেশ্বর শিবের এক প্রাচীন মন্দির ছিল এবং সেখানে অথর্ববেদী একদল শৈব ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কর্ণাট প্রদেশের আর্সিকোর তালুক থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি মধ্যযুগীয় লেখ থেকে জানা যায় যে, এই অতিমার্গিক সম্প্রদায়গুলি সাধারণভাবে লাকুল সম্প্রদায়ের শাখা হিসাবে বিবেচিত হত। এর সমর্থন আমরা আর্কট জেলা থেকে প্রাপ্ত দুটি লেখ থেকে জানতে পারি যেখানে বলা হয়েছে মেলপাড়ি এবং জম্বই এই দুই গ্রামস্থ কালামুখ সম্প্রদায়ের দুজন সর্বাধিনায়কের নাম ছিল যথাক্রমে লকুলীশ্বর পণ্ডিত ও মহাব্রতী লকুলীশ্বর পণ্ডিত।১ কর্ণাটকে প্রাপ্ত ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখে একদল তপস্বীকে কালামুখ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং লাকুলাগমসময়ের প্রচারক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।২ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী পর্যাপ্ত প্রমাণসহকারে দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে কালামুখ সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিপত্তিশীল ছিল।৩

প্রাচীন লেখকদের রচনায় কাপালিক ও কারুকসিদ্ধান্তী (কারুণিকসিদ্ধান্তী), সম্প্রদায়দ্বয়ের উল্লেখ আছে। রামানুজ ও কেশব কাশ্মীরী শেষোক্তটিকে কালামুখ বলে উল্লেখ করেছেন। রামানুজ বলেছেন যে কাপালিকগণ ছয়টি মুদ্রা বা মুদ্রিকা ধারণ করে যোনিতে অধিষ্ঠিত পরমাত্মায় চিত্ত নিবিষ্ট করেন। এই ছয়টি মুদ্রা হল কণ্ঠহার, অলংকার, কুণ্ডল, শিরোমণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত।৪ কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কাপালিকদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য দিয়েছেনঃ তাঁদের কণ্ঠহার ও অন্যান্য অলংকার মানুষের অস্থি থেকে নির্মিত; উপবাসের পর তাঁরা ব্রহ্মকপাল হতে সুরাপান করেন; তাঁদের হোমাগ্নি নরমাংস, কপাল হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত থাকে; তাঁরা নরবলি ও নররক্তের দ্বারা দেবতার তুষ্টিবিধান করেন; তাঁরা ভবানীপতি শিবকে স্রষ্টা, পাতা, সংহারকর্তা ও সর্বশক্তিমান হিসাবে ধ্যান

১। J. N. Banerjea, *op. cit*, 96-98; R. G. Bhandarkar, *op. cit.*, 119-20.
২। *Epigraphia Carnatica* V (1) 135.
৩। N. Sastri, *The Colas* (1955), 648-49.
৪। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ২, ২, ৩৫-৩৬।

করেন; তাঁরা অধিকাংশই আভীর ও মালব প্রদেশের বাসিন্দা যেখানে নীচ পামর জাতিরা বাস করে; তাঁরা নরকপাল থেকে খাদ্যগ্রহণ, মৃতদেহের ভস্ম সর্বাঙ্গে অনুলেপন, দণ্ডধারণ ও কারণে (মদ্য) অধিপতি ঈশ্বরকে পূজা সমর্পণ করে থাকেন; তাঁরা জাতিভেদের বিরোধী, কেননা তাঁদের মহাব্রতে যাঁরাই দীক্ষিত হবেন, তাঁরাই ব্রাহ্মণ। মাধব বিরচিত শঙ্করদিগ্বিজয় কাব্যে১ শঙ্করের সঙ্গে এক কাপালিক গুরুর তর্কবিচারের উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতীমাধবেও কাপালিকদের বর্ণনা পাওয়া যায় যাঁদের ঘাঁটি ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত শ্রীশৈল বা শ্রীপর্বত।

মধ্যভারতের ত্রিপুরী ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের কয়েকটি শিলালিপিতে মত্তময়ূর নামক একটি শৈবসম্প্রদায় উল্লিখিত হয়েছে, যাদের অধীনে বহু মঠ ছিল এবং যাদের আচার্যগণ নামের শেষে শিব অথবা শম্ভু উপাধি গ্রহণ করতেন, যেমন রুদ্রশম্ভু, ধর্মশম্ভু, মহাশিব, চূড়াশিব, কবচশিব, প্রভাবশব, প্রশান্তশিব, প্রবোধশিব, অঘোরশিব ইত্যাদি।২ মত্তময়ূর নামক একটি ট্রাইবের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়।৩ খ্রীষ্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এঁদের বিকাশ হয়েছিল। গ্রন্থান্তরে দেখিয়েছি যে বাংলাদেশেও পালযুগে এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।৪ এঁদের ধর্মাচরণ সংক্রান্ত বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। লেখমালার সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে এঁরা উদারপন্থী ছিলেন, মূলত যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং জনসেবামূলক কাজকর্ম, যেমন দরিদ্রকে আহার্য দান, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন, এই ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত থাকতেন।৫

১৫। শিব ও শক্তি : তান্ত্রিক প্রভাব

ভারতের সকল ধর্ম ব্যবস্থাই কোন-না-কোন ভাবে তান্ত্রিক অন্তঃস্রোতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। শৈবধর্মের ক্ষেত্রে এই প্রভাবটা সবচেয়ে বেশি। শাক্ততান্ত্রিক ধারণাসমূহ, স্বতন্ত্র ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, শৈবধর্মকেই আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছিল। সাংখ্যোক্ত ও তন্ত্রোক্ত পুরুষ-প্রকৃতির ধারণাই শিব ও শক্তির ধারণার উৎস। একটি অন্যনিরপেক্ষ নয়। শৈব ও শাক্তধর্মের মূল তত্ত্বগুলি একই, পার্থক্য হচ্ছে প্রথমটির ক্ষেত্রে পুরুষপ্রাধান্য, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রকৃতি-প্রাধান্য। তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি সমভাবেই শৈব ও শাক্ত ধর্মে বর্তমান।

যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতাতেই৬ আমরা প্রথম রুদ্রের (শিব) সঙ্গে অম্বিকার (দেবী) সংযোগ দেখি, ভ্রাতা-ভগ্নী হিসাবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও৭ উভয়ের ওই একই সম্পর্ক, যেখানে বলা হয়েছে রুদ্র তাঁর ভগিনী অম্বিকার সাহায্যেই ধ্বংস-কার্যে লিপ্ত থাকেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে৮ উভয়ের সম্পর্ক পতি-পত্নীর সম্পর্কে

১। ১৫, ১-২৮।
২। R. D. Banerji, *The Haihyas of Tripuri* (MASI. 23), 110 ff.
৩। ২, ৩২, ৪-৫।
৪। N. N. Bhattacharyya, *Ancient Indian Rituals* (1975), 133-34.
৫। Banerjea, *op-cit.*, 104-06.
৬। ৩, ৫৭। ৭। ১, ৬, ১০, ৪৫।
৮। ১০, ১৮।

রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এই সম্পর্কটাই পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়েছে। কেনোপনিষদে[১] আমরা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা-হৈমবতীর উল্লেখ পাই, কিন্তু এখানে তিনি রুদ্র-পত্নী নন। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অংশগুলিতে শিব ও দেবী (উমা-পার্বতী) পতিপত্নী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, যদিও মহাভারতের দুর্গাস্তোত্রদ্বয়ে এবং হরিবংশের আর্যাস্তবে দেবীর সঙ্গে শিবের বিশেষ সম্পর্ক দেখানো হয়নি। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অংশগুলিতে শিব ও দেবীর পতিপত্নী সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সকল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, পরবর্তীকালের কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারগণ সেগুলিকে তাঁদের সাহিত্য রচনার উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

দক্ষযজ্ঞের কথা পূর্বে উল্লেখ করার সুযোগ আমাদের হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তা থেকে বোঝা যায় শিব ও দেবীর প্রাধান্য বৈদিক ঐতিহ্যে স্বীকৃত হয়নি। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য অংশে শিবের কিছু ভূমিকা থাকলেও তা গৌণ। তবে লেখমালার সাক্ষ্যে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে গুপ্তযুগের পর থেকেই শিব ও দেবী পাকাপাকিভাবে সংযুক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন পুরাণ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। শিবতত্ত্ব ও শক্তি-তত্ত্বের পাকাপাকি সংযোগের সূত্রপাতও গুপ্তযুগ থেকে। এই সংযোগের অন্য প্রমাণ পাওয়া যায় ভাস্কর্য থেকে। উমা-মহেশ্বর-মূর্তি ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। এই যুগল মূর্তির একটি বিশেষ দিক হল কল্যাণসুন্দর বা বৈবাহিক মূর্তি, যার বিষয়বস্তু শিব ও উমার বিবাহ। এই প্রসঙ্গে এলিফাণ্টা গুহার মূর্তিকলা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সকল শ্রেণীর শৈবমতের মূলকথা চরম সত্তা ব্রহ্ম বা শিব একই সঙ্গে শিবময় ও বিশ্বাতীত। যিনি বিশ্বময় তিনি শক্তি, যিনি বিশ্বাতীত তিনি শিব। শিব ও শক্তি দুটি পৃথক সত্তা নয়, একই সৎ-এর দুটি ধারণাগত দিক। শক্তি সর্বদাই শিবের সঙ্গে অভিন্ন, অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তির মত।[২] প্রকৃত বিশ্বাতীত হিসাবে শিব শব মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শিব ও শক্তির সমতা বা সামরস্য বিদ্যমান। আসলে শক্তি শিবের ঐশ্বর্য, হৃদয় এবং সার।[৩] বিভিন্ন শৈব মতবাদে এই শক্তি মূলত পাঁচ প্রকার—চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া।

কাশ্মীর শৈববাদে শক্তিকে স্বাতন্ত্র্য বলা হয়েছে, কেননা তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর নিজের বাইরের কোন কিছুর উপরেই নির্ভর করে না, কারণ শিবের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে শক্তিকে বলা হয়েছে প্রকাশ-বিমর্শময়। বিমর্শের অনেক অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে স্পন্দনশীল। এই শব্দটি শক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে প্রকাশ শব্দটি শিবের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। বিমর্শকে চমৎকৃতিও বলা হয়। প্রকাশ ও বিমর্শ একই সত্তার দুই দিক, কিন্তু বিমর্শ হচ্ছে প্রকাশের আত্মসচেতনতার দিক। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি ধরা যায় প্রকাশ হচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও তার বহুমুখী বিকাশ, বিমর্শ হচ্ছে ওইগুলি যে তারই এই বিষয়ে ওই ব্যক্তির সচেতনতা। কাশ্মীর শৈবমতে বিশ্বজগৎ চরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্কেই বর্তমান, যে চরম সত্তা একই সঙ্গে স্থাণু ও গতিশীল, বিদ্যমান ও রূপান্তরী।

১। ৩, ২৫।
২। শিবদৃষ্টি ৩, ৭।
৩। ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা ১, ৫, ১৪।

গতিশীল দিকটিই হচ্ছে শক্তি, যিনি নিজের থেকেই নিজেকে বিশ্বজগৎরূপে ব্যক্ত করেন, বটের বীজ থেকে যেমন বটবৃক্ষের উন্মেষ হয় (বটধানিকাবৎ)।১ সৃষ্টি যেমন তাঁর উন্মেষ, প্রলয় তেমনই তাঁর উন্মেষ, প্রলয় তেমনই তাঁর নিমেষ, যা চলছে পর্যায়ক্রমে।২

বীরশৈব মতে শক্তির প্রাধান্য এত বেশি যে এই মতকে দার্শনিকেরা শক্তি-বিশিষ্টাদ্বয়বাদ বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে শক্তিকে শিবের বিমর্শ শক্তি হিসাবেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্ম বা পরশিব অনন্ত অস্তিত্ব, চৈতন্য ও আনন্দের অধিকারী, এবং তিনি যে এ সকল বিষয়ে সচেতন তার কারণ তাঁর বিমর্শ শক্তি। শিবের সচেতন প্রকৃতি হচ্ছে তাঁর অপরিবর্তনীয়ত্ব এবং অব্যক্ততা। রত্নের মতই তিনি স্বয়ংপ্রভ, কিন্তু রত্ন যেমন নিজের থেকে সে বিষয়ে সচেতন নয়, বিমর্শ-শক্তি ব্যতিরেকে তিনিও এ বিষয়ে সচেতন নন। বিমর্শ এই কারণেই তাঁর সঙ্গে সামরস্য বা তাদাত্ম্য সম্পর্কে বিদ্যমান, যেমন উত্তাপ এবং আলোক যথাক্রমে অগ্নি ও সূর্যের সম্পর্ক বিদ্যমান। একথা বলে আপত্তি তোলা যেতে পারে যে এই রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি ও শক্তের (শক্তির অধিকারী) মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকা সম্ভব। এর উত্তরে বীরশৈবরা বলেন যে অগ্নির উত্তাপ বা সূর্যের আলোর ক্ষেত্রে বস্তুর প্রকৃতি থেকে গুণের বিভিন্নতা নেই, এখানে গুণ এবং বস্তুর পৃথকীকরণ হয় না, যেহেতু উভয়ের সম্পর্ক অভেদাত্মক। এই কারণেই শক্তিকে বলা হয় ব্রহ্মনিষ্ঠা সনাতনী।৩ শক্তি শিবের অন্তর্নিহিত, তাঁর আত্মসচেতনকারী বিমর্শশক্তি। শক্তির বিমর্শতাই তাঁর বিশিষ্টত্ব যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলেই বীরশৈব মতবাদকে শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। এই বিশিষ্টত্বের সঙ্গে রামানুজ-দর্শনের কোন সম্পর্ক নেই।

১। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় ৪, টীকাসহ; মহেশ্বরানন্দ, মহার্থমঞ্জরী ১৪।
২। স্পন্দনির্ণয় ১, ১, টীকাসহ।
৩। সিদ্ধান্তশিখামণি ৫, ৩৯।

৮

শাক্তধর্ম ও তন্ত্র

১। সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকা

কিভাবে মাতৃকেন্দ্রিক শাক্ত-তান্ত্রিক আদর্শসমূহ ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থা দার্শনিক ভাবধারার মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল, তার কিছু কিছু পরিচয় প্রতিটি অধ্যায়েই দেওয়া হয়েছে। শাক্তধর্মের যে বর্তমান আকার, তার বিকাশ মূলত মধ্যযুগে হলেও তার উৎস আদিম যুগের মাতৃদেবীর উপাসনা এবং তৎকেন্দ্রিক তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ, যেগুলি গড়ে উঠেছিল সুদূরতম অতীত যুগের মানুষদের জীবনচর্যায় নিহিত কয়েকটি মৌল ধারণার অনুষঙ্গের ভিত্তিতে, যা নিয়ে বিশদ আলোচনা করার সুযোগ আমাদের পূর্বে হয়েছে।

বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও শৈবধর্মে তন্ত্রের স্থান থাকলেও, কার্যত শাক্তধর্ম ও তন্ত্র সমার্থক হয়ে গেছে। শাক্ত-তান্ত্রিক ভাবধারায় সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে সর্বোচ্চ দেবতা একজন নারী, যিনি নানা নামে ও নানা রূপে কল্পিতা। অন্যান্য ধর্মে তাঁর অবস্থান সেই সকল ধর্মের প্রধান দেবতার স্ত্রী বা সহচরী হিসাবে, কিন্তু শাক্তধর্মে সেই সকল দেবতারাই দেবীর অধীন এবং আজ্ঞাবহ। শাক্ত পুরাণসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী স্বয়ং আদ্যাশক্তি তাঁর নিজ দেহ থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করেন এবং তারপর নিজেকে ত্রিধাবিভক্ত করে তাঁদের সহচারী হন, যার ফলে জগৎ ও জীবনের উদ্ভব।

তান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তন্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ তান্ত্রিক গ্রন্থই মধ্য ও শেষ-মধ্যযুগে রচিত। এই গ্রন্থগুলিতে প্রচুর বাড়তি ব্রাহ্মণ্য উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যার ফলে তন্ত্রের মূল বক্তব্যসমূহ বিপর্যস্ত হয়েছে। তন্ত্র নিয়ে যেসব আধুনিক চর্চা হয়েছে সেগুলি এই অনুপ্রবিষ্ট ব্রাহ্মণ্য উপাদানগুলিরই চর্চা, তন্ত্র চর্চা নয়। উনিশ শতকের পণ্ডিতদের অধিকাংশই তাঁদের যুগের নীতিবোধের তাগিদে তন্ত্রকে অশ্লীল ব্যাপার ও শাক্ত ধর্মকে বিকৃত ধর্মাচরণ বলেই দায়িত্ব শেষ করেছেন। এই ক্ষেত্রে যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতা নিয়ে কাজ করেছেন, যেমন স্যার জন উড্রোফ বা মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, তন্ত্রের মূল ও আরোপিত অংশের পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি, যার ফলে তাঁদের রচনা অত্যন্ত একপেশে। তাঁরা তান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বৈদিক ঐতিহ্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তন্ত্রের সেই অংশের উপর নির্ভর করেছেন যা ব্রাহ্মণ্য হস্তাবলেপে বিকৃত, বলা যায় তন্ত্রবিরোধীও। তন্ত্র যে একটি সম্পূর্ণ বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যবিরোধী সংস্কৃতি, এটা তাঁরা নিজেদের পূর্বসংস্কার বশেই লক্ষ্য করেননি।

ইদানীং কিছু ইউরোপীয় ও মার্কিনী তন্ত্র নিয়ে বড় বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছেন, কেননা তন্ত্রে সরল প্রকৃতি-অভিমুখী জীবনযাত্রা ও নারী-পুরুষের যৌন-স্বাধীনতার একটা ধর্মীয় ভিত্তি আছে। আধুনিক ইউরোপীয় ও মার্কিন তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবাধ যৌনচর্চার হিড়িক পড়ে গেছে তাকে যুক্তিসহ করবার

জন্য তাঁরা তন্ত্রের সাহায্য নিতে যান। তন্ত্র নিয়ে গবেষণা করার জন্য প্রতি বছরই দু'চারজন করে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী আমার কাছে এসে থাকেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দু'চারটি কথা বললেই তাঁদের মূল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারা যায়। এ'দের মধ্যে অনেকেই তন্ত্র নিয়ে বইটই লিখেছেন, বেশ ছবিওয়ালা বই, বলাই বাহুল্য মৈথুন চিত্র, আর সেগুলিকে তাঁরা তান্ত্রিক আর্ট নামে চালান। এই জাতীয় বই তন্ত্র সম্পর্কে যে কোন প্রকৃত ধারণা দিতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য।

শাক্তধর্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে এই ধর্ম প্রকৃতির দিক থেকে নমনীয় হবার দরুন বিভিন্ন যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় চাহিদার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছিল। প্রতি যুগেই শাক্তধর্ম সেই যুগের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিগুলির শরিক হয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও শাক্তধর্ম যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিল। শাক্তধর্ম ও তন্ত্রের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। তবে মোটামুটিভাবে আমরা তাদের সামাজিক অবদানগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

(১) শাক্তধর্ম ও তন্ত্র জাতিভেদ বিরোধী। যদিও পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য হস্তাবলেপের প্রভাবে কোন কোন তন্ত্রে জাতিপ্রথাকে যুক্তিসহ করার চেষ্টা হয়েছে, ওই অংশগুলি তন্ত্রের মৌল অংশ নয় বলে আমাদের মনে করতে হবে। কেননা, তন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বার বার বলা হয়েছে যে জাতিগত ধারণা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার নিয়ে এ পথে আসা চলবে না। দীক্ষিত হলে জাতিধর্মে বিশ্বাস রাখা চলবে না। নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাও গুরু হতে পারেন এবং ব্রাহ্মণকেও তাঁর চরণাশ্রিত হতে হবে। অসংখ্য নীচ জাতীয় গুরুর উল্লেখ তন্ত্রে দেখা যায়, যাঁদের মধ্যে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল সকলেই আছেন।

(২) তন্ত্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধী। শাক্তধর্ম অনুযায়ী সকল নারী, এমন কি সে পেশায় গণিকা হলেও, সাক্ষাৎ মহামায়া এবং সেই হিসাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। তন্ত্রমতে নারী কখওন অধঃপতিত হতে পারে না, ইচ্ছামত পুরুষ-সংসর্গ করলেও তার কোন চরিত্র দোষ ঘটে না। নারীরাও গুরু এবং দীক্ষাদাত্রী হতে পারেন। নারীমুক্তির ক্ষেত্রে একালের সমাজ-সংস্কারকদের চেষ্টার বাস্তব ফল কি হয়েছে জানি না, তবে তান্ত্রিকদের সম্পর্কে এটুকু বলা যায় মধ্যযুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত তাঁরা অসংখ্য সমাজচ্যুতা, পতিতা হিসাবে পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা নারীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন; তাঁদের সাধিকা, ভৈরবী, যোগিনী ইত্যাদিতে পরিণত করেছিলেন; তাঁদের কাছে নূতন জীবনের স্বাদ এনে দিয়েছিলেন; সমাজের চোখে তাঁদের শ্রদ্ধেয়া করে তুলেছিলেন। হয়ত তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়নি, কিন্তু তাঁরা সামাজিক মর্যাদা পেয়েছিলেন, উচ্চবর্ণের ও বিত্তবান ব্যক্তিরা তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করেছিলেন, অনেকে দীক্ষাও নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন একজন তান্ত্রিক ভৈরবী, যিনি তাঁকে পরমহংস বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর ধর্মজীবনের পরিচালিকা ছিলেন। তাঁর জাত-কুল-গোত্র-চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার সাহস সে যুগের সমাজের হয়নি।

(৩) বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তান্ত্রিকদের বিশিষ্ট অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র মূলত তাঁদের সৃষ্টি। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁদের অবদান অতুলনীয়। মানবদেহের গঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সূত্রপাত তাঁরাই করেন। শব ব্যবচ্ছেদ, নিষিদ্ধ খাদ্যসমূহের গুণাগুণ পরীক্ষা

প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যসমাজ বরদাস্ত করেনি। চিকিৎসকদের প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রকারদের বিষোদ্গারের ধরন দেখলেই তা বোঝা যায়। অত্যন্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই এদেশে বিজ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটেছে। তান্ত্রিকদের পক্ষেই এপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল, কেননা তাঁরা সামাজিক অনুশাসনের বড় একটা ধার ধারতেন না, লোকে তাঁদের ভয়ও করত, আত্মরক্ষার্থেই তাঁরা নিজেদের চারপাশে একটা ভীতির প্রাচীর খাড়া করেছিলেন। নিষিদ্ধ খাদ্যাখাদ্যের ভৈষজ্য গুণ পরীক্ষার জন্যই তাঁরা ওইগুলিকে নিজস্ব ধর্মচর্যার উপকরণ করেছিলেন, শবদেহ ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনেই তাঁরা শ্মশানচারী ছিলেন, শব সাধনায় যা হচ্ছে আসল তাৎপর্য।১

২। দেবী কল্পনার বিবর্তন

হরপ্পা সভ্যতার মাতৃকাদেবী প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত দেবীরাও পূর্বে বর্ণিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের একটি সূক্তের নাম দেবীসূক্ত২ যেখানে বিশ্বনিয়ন্ত্রিকা শক্তিরূপিণী দেবীর একটি সর্বাত্মক বর্ণনা আছে। কিন্তু এই সূক্তটি অনেক পরবর্তীকালে রচিত এবং ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত। দেবীসূক্ত ছাড়াও আর একটি সূক্ত ঋগ্বেদে বর্তমান যা রাত্রিসূক্ত নামে পরিচিত।৩ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী ও দুর্গার উল্লেখ আছে।৪ গিরিসুতা-গৌরী নামটি পাওয়া যায় মৈত্রায়ণী সংহিতায় যা আমাদের কেনোপনিষদের উমাহৈমবতীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাজসনেয়ী সংহিতায় বর্ণিত অম্বিকার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মুণ্ডকোপনিষদে৫ অগ্নির সপ্ত জিহ্বার দুটি হিসাবে কালী এবং করালীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ভদ্রকালী ও শ্রী শাংখ্যায়ন ও হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত হয়েছেন।

উপরউক্ত দেবীগণের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছেন। কাত্যায়নী সম্ভবত আদিতে ছিলেন কাত্য উপজাতির দেবতা, পরে এই নামটি শাক্তদেবীর অনিবার্য বিশেষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্গা, উমা, গৌরী, কালী পরবর্তীকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এবং শাক্ত দেবীর সঙ্গে অভিন্না বলে ঘোষিতা হয়েছেন। কন্যাকুমারী দেবীর উল্লেখ অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক রচিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে পাওয়া যায়।৬ মহাভারতের দুটি দুর্গাস্তোত্র ও হরিবংশের আর্যস্তবের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মহাভারতে তাঁকে নারায়ণবরপ্রিয়া, নন্দগোপকুলেজাতা, কুলবর্ধিনী, কংসবিদ্রাবণকরী, অসুরনাশিনী প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত করা হয়েছে। তিনি কুমারী ও ব্রহ্মচারিণী, বিন্ধ্যপর্বতে তাঁর বাস, তিনি রক্তমাংসপশুপ্রিয়া, ভক্তগণকে নানাপ্রকার দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন বলেই তিনি দুর্গা। তাঁর নামগুলি তাঁর চরিত্রের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যগুলির দ্যোতক : আর্যা, মন্দরবাসিনী, কুমারী, কালী, কাপালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, চণ্ডী, কাত্যায়নী, করালী, শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণী, মহিষাসৃকপ্রিয়া, কৌশিকী, গোপেন্দ্রানুজা, নন্দোগোপ-

---

১। শাক্তধর্ম সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য মৎরচিত *Indian Mother Goddess* এবং *History of the Sakta Religion* (1974) দ্রষ্টব্য।

২। ১০, ১২৫; ৩। ১০, ১২৭; ৪। দশম খণ্ড ৫। ১, ২, ৪।

৬। *Periplus of the Erythraen Sea,* (ed. Schoff), sec. 58.

কুলোদ্ভবা, কোকমুখা, শাকম্ভরী, ব্রহ্মবিদ্যা, বেদশ্রুতি, সাবিত্রী, বেদমাতা, স্কন্দমাতা প্রভৃতি। হরিবংশের আর্যাস্তবেও এই সকল নাম বিদ্যমান। হরিবংশে প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে পর্বতগুহায়, নদীতীরে ও বনমধ্যে তিনি শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি উপজাতি দ্বারা পূজিতা। তিনি বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁর বাসস্থান কুক্কুট, ছাগ, মেষ, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি পশুগণের দ্বারা পূর্ণ। তিনি অপর্ণা অর্থাৎ বিবসনা। তাঁর এক নাম তারা যিনি ত্রাণ করেন, ভক্তগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিদাহে, নদীতীরে, কান্তারে, প্রবাসে, রাজরোষে, তস্কর ও শত্রু সঞ্জাত ভয়ে রক্ষা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ দেবী তারাও অগ্নিভয়, দস্যুভয়, বন্ধনভয়, মজ্জনভয়, সর্বভয় ইত্যাদি অষ্টবিধ ভয় থেকে ভক্তগণকে রক্ষা করেন।১ শাক্তধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করার জন্য বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শাক্তধর্মের বিকাশ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবার জন্য পুরাণসমূহ অনুশীলন করার প্রয়োজন। প্রায় সকল পুরাণেই দেবীর ক্রিয়াকলাপ, নামসমূহ ও গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। তবে দেবী-কেন্দ্রিক পুরাণগুলিই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। এই পর্যায়ের পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মার্কণ্ডেয় পুরাণ। কালিকা পুরাণ, দেবীপুরাণ ও দেবী ভাগবত অনেক পরবর্তী কালের রচনা, যেগুলি পুরোদস্তুর ভাবেই শাক্তধর্মের প্রচারক। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্যের দেবী কল্পনা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে যে মহিষাসুরের অত্যাচারে নিপীড়িত দেবতাগণ বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করলে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার মুখ থেকে ক্রোধজাত যে তেজোরাশির উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে অন্যান্য দেবগণের দেহ-নির্গত তেজ মিলিত হয়ে এক অপূর্ব নারীরূপ গঠিত হয়। ইনিই অসুরহন্তা মহাদেবী। দেবীমাহাত্ম্যের নারায়ণী-স্তুতি অংশে তাঁর বিশ্বাধার, বিশ্ববীজ, বৈষ্ণবী শক্তি, মাতৃকা, লক্ষ্মী, নারায়ণী, সরস্বতী, কাত্যায়নী, দুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের স্তব করা হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে তিনি বিভিন্ন যুগে বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী প্রভৃতি নানাবিধ নামে অবতীর্ণ হয়ে দানবনিধন ও বিশ্বকল্যাণ করেছিলেন।

দেবী মাহাত্ম্যে দেবীর যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তা তাঁর উগ্ররূপ। পাশাপাশি দেবীর একটি সৌম্যরূপ আছে। সৌম্য রূপের দেবীদের মধ্যে আমরা পৃথিবী-দেবী, শ্রী, শাকম্ভরী, পার্বতী-উমা সতী প্রভৃতিকে গণ্য করতে পারি। বেদের পৃথিবী-দেবীর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পুরাণসমূহে ও মহাভারতে তাঁকে বরাহরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এই পৃথিবী-দেবী থেকেই সীতা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী প্রভৃতি শস্যদেবীরা জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে সীতা ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিতা শস্যদেবী।২ পুরাণাদিতে পৃথিবী শ্রী বা লক্ষ্মীর অপর নাম। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের বিষ্ণু মূর্তিগুলির

১। Debala Mitra in *Journal of the Asiatic Society* (1957) 20-22.

২। ঋগ্বেদ ৪, ৫৭; অথর্ববেদ ৩, ১৭, ৪, যজুর্বেদ ১২, ৬৯-৭২; গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪, ৪, ২৭-৩০; পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২, ১৭, ৯-১০; *Sacred Books of the East* XXIX, 334; XXX, 113-14; A. B. Keith, *Religion and Philosophy of the Veda* (1925), 186.

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা শ্রী ও ভূ এই দুই দেবীকে বিষ্ণুর দু'পাশে দেখি। কালিকাপুরাণে১ বলা হয়েছে পৃথিবীই জগদ্ধাত্রী, পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ন্ত্বিদম্।২ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলছেন: অনন্তর আমি আত্মদেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয় ততদিন পর্যন্ত জগৎ প্রতিপালন করব এবং এইজন্য আমি শাকম্ভরী হিসাবে বিখ্যাত হব।৩ এই শাকম্ভরীই অন্নদা বা অন্নাপূর্ণায় রূপান্তরিত হয়েছেন। পার্বতী পর্বত সম্বন্ধীয়া দেবী, যাঁর সঙ্গে পরে উমার যোগ হয়েছে। পুরাণসমূহে উমা একটু চাপা পড়ে গেছেন কিন্তু তাঁর বিকাশ হয়েছে বিশুদ্ধ সাহিত্যে সেখানে তিনি জগজ্জননীও বটে, শিবপত্নীও বটে। সতীর প্রসঙ্গ আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

দুর্গার মধ্যে সৌম্য ও উগ্র উভয় রূপের সংমিশ্রণ হয়েছে। দুর্গা আসলে শস্য দেবী যাঁর প্রতিষ্ঠা ও পূজা নব পত্রিকায়। একটি কলাগাছের সঙ্গে কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, অশোক, মান ও ধান্য একত্রে বেঁধে যে শস্য-বধূ নির্মাণ করা হয় তা-ই হচ্ছে নব পত্রিকা। এই শস্যদেবী কিভাবে দানবদলনী হয়ে উঠলেন তার ব্যাখ্যা রমাপ্রসাদ চন্দ এই বলে করেছেন যে মহিষ, শুম্ভ-নিশুম্ভ, দুর্গম প্রভৃতি অসুররা, যাঁদের দেবী বধ করেছেন, আসলে অনাবৃষ্টির রূপক।৪ দুর্গ রক্ষার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল৫ যা তাঁর দুর্গা নামের কারণ হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে অবশ্য বলা হয়েছে দুর্গাসি দুর্গ-ভবসাগর-নৌ রসঙ্গা, অর্থাৎ অসঙ্গা তুমি দুর্গম ভবসাগরে নৌকাস্বরূপ বলে দুর্গা। চণ্ডিকা বা অম্বিকা, কখনও কখনও ইনি কৌশিকী নামেও পরিচিতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশের নায়িকা। ইনি বহু দেবীকে আত্মসাৎ করে গড়ে উঠেছিলেন। ইনি পার্বতীর কৃষ্ণবর্ণ কোষ থেকে উদ্ভূত বলে এঁর নাম কৌশিকী (কৌশিকী আসলে কুশ বা কুশিক ট্রাইবের দেবী, যিনি বিন্ধ্যবাসিনী হিসাবেও পরিচিতা)। এই কৃষ্ণবর্ণ কোষ থেকে উদ্ভবের কাহিনীটি নানারূপে পল্লবিত। সবচেয়ে পল্লবিত কাহিনীটি পাওয়া যায় পদ্মপুরাণে৬, যেখানে বলা হয়েছে সতী যখন পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য মেনকার জঠরে ছিলেন যখন ব্রহ্মা একটি গূঢ় উদ্দেশ্যে রাত্রি দেবীকে অনুরোধ করেন যেন তিনি নিজ সত্তা দিয়ে মাতৃগর্ভেই দেবীকে কৃষ্ণবর্ণ করে দেন। এই কৃষ্ণবর্ণা পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়, পরে একদিন শিব তাঁর গাত্রবর্ণ নিয়ে বক্রোক্তি করলে, দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং ব্রহ্মার বরে তিনি কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করে গৌরী হন। দেবীর পরিত্যক্ত কৃষ্ণবর্ণ ত্বক থেকে কৌশিকী দেবী উৎপন্ন হলেন, যিনি চণ্ডিকা, একানংসা, বিন্ধ্যবাসিনী ও রাত্রি নামেও পরিচিতা।

দেবী কালিকা বা কালী সম্পর্কেও অনুরূপ কাহিনী কালিকাপুরাণে বর্তমান যেখানে বলা হয়েছে কৌশিকী-রূপে পার্বতীর দেহ থেকে নিঃসৃতা দেবীই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে কালিকা হলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যে

১। ৩৭, ২৫-২৮; ২। ৩৮, ৬৩; ৩। ৯১ অ।

৪। R. P. Chanda, *Indo Aryan Races* (ed. N. N. Bhattacharyya 1969), 130 ff.

৫। দেবীপুরাণ ৮৩, ৬২-৬৩; দেবীভাগবত ৩, ২৪, ৫-৬; হরিবংশ ১২০, ৩৫।

৬। সৃষ্টিখণ্ড ৪৩-৪৪।

ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য পার্বতীর কাছে প্রার্থনা জানালে পার্বতীর শরীরকোষ থেকে কৌশিকী দেবী নিঃসৃতা হলেন। কৌশিকী তাঁর দেহ থেকে নির্গত হয়ে গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেলেন এবং এইজন্য তিনি হিমালয়বাসিনী কালিকা নামে আখ্যাতা হলেন। অবশ্য দেবীমাহাত্ম্যের অন্যত্র কালীর উদ্ভব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে চন্ড-মুন্ড ও অন্যান্য অসুরগণ দেবীর নিকটবর্তী হলে তাঁর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটফলক থেকে অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হলেন এবং চন্ড-মুন্ডকে বধ করে চামুন্ডা নামে খ্যাতা হলেন। পরবর্তীকালে পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রে এই দেবীর রীতিমত বিস্তার ও বিবর্তন হয়েছে, শিবের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি ঘটেছে এবং তন্ত্রশাস্ত্রের তিনি প্রধান ও পরমতত্ত্ব হয়ে উঠেছেন। সকল কালী মূর্তিতেই দেবী শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান। এই মূর্তি তিনটি বিষয়বস্তুর প্রতীক। প্রথমটি হচ্ছে, তন্ত্রোক্ত এবং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব যেখানে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই ব্রহ্মান্ডের একমাত্র চালিকাশক্তি। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন ও অক্ষম; দ্বিতীয়টি হচ্ছে তন্ত্রের বিপরীতবিহারতত্ত্ব (মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্); তৃতীয়টি হচ্ছে, শক্তিদেবীর প্রাধান্য।

৩। শাক্ত পীঠসমূহ

কৌশিকী বা কালীপ্রসঙ্গে আমরা দেখলাম কিভাবে এক দেবীর সঙ্গে অপর দেবীর সমীকরণ হয়। আসলে কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের সর্বত্রই অসংখ্য বিভিন্ন মর্যাদার স্থানীয় মাতৃকাদেবী ছিলেন এবং আজও আছেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রিকা শক্তি-রূপিণী মহাদেবীর একত্বের ধারণা বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান প্রধান আঞ্চলিক দেবীদের সঙ্গে ওই মহাদেবীর সমীকরণের প্রয়োজন দেখা গেল। একান্ন পীঠের একান্নজন দেবী (আসলে পীঠ ও দেবীর সংখ্যা আরও অনেক বেশী) আসলে আঞ্চলিক দেবী, শাক্ত মহাদেবীর সঙ্গে তাঁদের সমীকরণ করার জন্যই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের কাহিনীর সঙ্গে সতীর দেহত্যাগ, তাঁর দেহের খণ্ডীকরণ এবং খণ্ডিত অংশগুলির পতনস্থলে শাক্ত পীঠস্থান গড়ে ওঠার কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কাহিনী অনুযায়ী পতি নিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগের পর শিব উন্মত্তপ্রায় হয়ে সতীর মৃতদেহ কাঁধে করে পৃথিবী ভ্রমণ করতে থাকলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ডীকৃত করেন। যে সকল স্থানে ওই দেহাংশগুলি পড়ে, সেই সকল স্থান পীঠস্থান হয়ে ওঠে, যেখানে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিভূ হিসাবে কোন অমূর্ত প্রতীক ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে। শিবলিঙ্গ এখানে ভৈরবের প্রতীক। শিব ভৈরব-রূপ ধারণ করে বিভিন্ন পীঠে সতীর দেহাংশ রক্ষা করেন বলে প্রকাশ।[১] এছাড়া বিভিন্ন পুরাণে দেবীর ১০৮ নাম ও রূপ এবং তাঁদের অবস্থান ক্ষেত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে, বিশেষ করে মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে।[২] ব্রহ্মান্ড পুরাণে ললিতাসহস্র নামে দেবীর সহস্র নাম ও রূপভেদের পরিচয় আছে।

১। শক্তিপীঠ সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য D. C. Sircar, The Sakta Pithas (JRASB, Letters, XIV. 1948), 1–108; reprint 1972.

২। মৎস্য ১৩, ২৬-৫৩; পদ্ম, সৃষ্টি ১৭, ১৮৪, ১৮৪-২১১; স্কন্দ, আবন্ত্য-রেবা ৯৮; দেবীভাগবত ৭, ৩০, ৫৫-৮৩।

৪। মাতৃকা, ডাকিনী, যোগিনী

মাতৃকাদেবীরা ছিলেন গোড়ায় স্থানীয় দেবী, মূলত মাতৃত্ব ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার প্রতীক। প্রাচীন মাতৃকা মূর্তিগুলি পোড়ামাটির নির্মিত। পরবর্তী কালে তাঁর প্রস্তর নির্মিত মূর্তিও হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমষ্টিগতভাবে সপ্ত বা অষ্ট মাতৃকা মূর্তি মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হত। কোন কোন স্থানে তাঁদের মাতৃকা হিসাবে চেনাবার জন্য ক্রোড়ে শিশু দেখানো হয়েছে। মহাভারতের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে সাতজন মাতৃকা স্কন্দকে লালন-পালন করেছিলেন। উত্তরকালে মাতৃকাগণ বিভিন্ন দেবতার শক্তি হিসাবে কল্পিতা হয়েছেন যেমন ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে মাতৃকাদের সংখ্যা সাত থেকে বেড়ে ন'য়ে দাঁড়িয়েছে, ওই তালিকার সঙ্গে শিবদূতী ও নারসিংহী যুক্ত হয়েছে। কালক্রমে কোন কোন মাতৃকার সঙ্গে খোদ শাক্ত মহাদেবীর সমীকরণ হয়েছে।

বরাহমিহির বলেছেন, মাতৃগণঃ কর্তব্যঃ স্বনামদেবানুরূপকৃত চিহ্নঃ,১ অর্থাৎ মাতৃকাগণ নিজ নিজ দেবতার নামানুযায়ী লাঞ্ছনযুক্ত হয়ে চিত্রিত হবেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও বলা হয়েছে যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনম্।২ এ বক্তব্য আবিষ্কৃত মাতৃকামূর্তিগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়। বরাহমিহির আরও বলেছেন, মাতৃণামপি মণ্ডলক্রমবিদো অর্থাৎ মাতৃকাগণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মণ্ডলক্রমবিদ্‌গণই উপযুক্ত।৩ এর উপর ভাষ্য করতে গিয়ে উৎপল বলেছেন, মাতৃণাং ব্রাহ্ম্যাদীনাং (সপ্তমাতৃকাঃ) মণ্ডলক্রমবিদো যে মণ্ডলক্রমং পূজাক্রমং বিদন্তি জানন্তি, অর্থাৎ তাঁরাই ব্রাহ্মী ইত্যাদি সপ্ত মাতৃকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন যাঁরা এই পূজাক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এখানে তান্ত্রিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, মাতৃণাং স্বকল্পবিহিত বিধানেন। কল্প বলতে বোঝায়, আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র।

গুপ্তযুগের গাঙ্গধার শিলা লেখের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যেখানে মাতৃকা মন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মাতৃণাঞ্চ প্রমুদিতঘনাতার্থ-নির্হ্রাদিনীনাং তন্ত্রোদ্ভূত প্রবল-পবনোদ্বর্তিতাম্ভোনিধীনাং...গতমিদং ডাকিনী-সম্প্রকীর্ণাং বেশ্মত্যুগ্রং নৃপতি-সচিবোঽকারয়ৎ পুণ্যহেতোঃ, অর্থাৎ মন্দির ডাকিনী পরিপূর্ণ ছিল, যারা আনন্দে উচ্চ ও ভয়ংকর কলরব করত, এবং যাদের তান্ত্রিক আচারাদি থেকে উত্থিত প্রবল বায়ু যেন সমুদ্রগণকে আলোড়িত করত। পরবর্তীকালের বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে ডাকিনী, লাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এঁরা তান্ত্রক দেবীদের অনুচর। কোষগ্রন্থে ডাকিনীদের কালীগণবিশেষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে ডাকিনী, শাকিনী প্রভৃতিরা পশ্চিম তিব্বত থেকে আমদানী হয়েছেন।৪

পুরাণসমূহে যোগিনীদের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যাঁদের সংখ্যা

১। ১৭, বৃহৎসংহিতা ৫৭, ৫৬;

২। ৮৮, ১৩; ৩। বৃ· স· ৫৯, ১৯।

৪। *Indian Historical Quarterly*, VII. 8; *Studies in the Tantras* (1939) 45 ff.

চৌষট্টি। অগ্নিপুরাণে১ বলা হয়েছে মাতৃকা আটজন এবং প্রত্যেকেরই আবার আট রকম করে প্রকাশ, যার ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় আটের আটগুণ। মধ্যযুগে চৌষট্টি যোগিনীর পূজা খুবই জনপ্রিয় ছিল যার প্রমাণ জব্বলপুরের নিকটে ভেরাঘাট, খাজুরাহো, ভুবনেশ্বরের নিকট হীরাপুর, সম্বলপুরের নিকট রাণীপুর, ঝরিয়াল প্রভৃতি স্থানের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরসমূহ।

৫। তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ

তন্ত্রশাস্ত্র বলতে মোটের উপর সেই সকল গ্রন্থাদি বোঝায় যেগুলিতে শক্তি সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে নানাপ্রকার দেবদেবী সংক্রান্ত ধারণাগত ও আচার-অনুষ্ঠানগত বিধিব্যবস্থা ও সেগুলির প্রয়োগ আলোচিত হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌরাদি পূজাক্রম, যেখানে শক্তির বিশেষ ভূমিকা আছে, তান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত। পাঞ্চরাত্র সংহিতাসমূহের মধ্যে তন্ত্রসাগর, পাদ্মসংহিতা-তন্ত্র, পাদ্মতন্ত্র, লক্ষ্মীতন্ত্র প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থটিকে যে শাক্ত তান্ত্রিকেরাও প্রামাণ্য বলে মনে করেন সেকথা অন্যত্র বলা হয়েছে। সৌর ও গাণপত্য ধর্মমত সংক্রান্ত কোন রচনাকেও তন্ত্রের পর্যায়ে ফেলা হয়। শৈব তন্ত্রসমূহকে শাক্তরা বহুস্থলেই প্রামাণ্য বলে মনে করেন। অভিনবগুপ্ত প্রমুখ শৈব লেখকেরা শাক্তদের নিকটেও বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হন। এখানে অবশ্য আমরা বিশুদ্ধ শাক্ত তন্ত্রগুলিরই উল্লেখ করব। বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের যে তালিকা দেওয়া আছে তার তুলনায় প্রাপ্ত পুঁথি অনেক কম।

বারাহীতন্ত্রের মতে তান্ত্রিক সাহিত্য চার প্রকার—আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র। আগম বারোটি—মুক্তক, প্রপঞ্চ, সারদা, নারদ, মহার্ণব, কপিল, যোগ, কল্প, কপিঞ্জল, অমৃতশুদ্ধি, বীর ও সিদ্ধসম্বরণ। ডামর ছয়টি—যোগ, শিব, দুর্গা, সারস্বত, ব্রহ্ম ও গন্ধর্ব। যামল ছয়টি—আদিত্য, ব্রহ্ম, আদি, বিষ্ণু, রুদ্র ও গণেশ। তন্ত্র কুড়িটি ও উপ-তন্ত্র এগারোটি। কুড়িটি তন্ত্র হল নীলপতাকা, বামকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, যোগার্ণব, মায়া, দক্ষিণামূর্তি, কালিকা, কামেশ্বরী, হরগৌরী, কুব্জিকা, কাত্যায়নী, প্রত্যঙ্গিরা, ত্রিপুরার্ণব, সরস্বতী, যোগিনী, বারাহী, গবাক্ষী, নারায়ণীয় এবং মৃড়ানী। একাদশটি উপতন্ত্র হল বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র ও বৃহস্পতি।

এই তালিকার বাইরে অনেক তন্ত্রগ্রন্থ আছে যেগুলির বিষয়বস্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভূতডামর, জয়দ্রথযামল, গ্রহযামল, দেবীযামল, যামলাক্ষ্য তন্ত্র, নিত্যা, নিরুত্তর, গুপ্তসাধন, চামুণ্ডা, মুণ্ডমালা, মালিনীবিজয়, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্রমহোদধি, ত্রিপুরাসার, ত্রিপুরারহস্য, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয়, প্রাণতোষণী, মহানির্বাণ, প্রপঞ্চসার, শারদাতিলক, মৎস্যসূক্ত ইত্যাদি অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এছাড়া শক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান ও সর্বদা ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে সৌন্দর্য-লহরী, ললিতাসহস্রনাম, ললিতোপাখ্যান, ষট্‌চক্রক্রম, যোগচিন্তামণি, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।২

১। ১, ১৪৬।

২। তন্ত্র সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য আমার *History of the Sakta Religion* (1974) দ্রষ্টব্য।

তান্ত্রিক ঐতিহ্যে তিনটি স্রোত স্বীকৃত হয়—দক্ষিণ, বাম ও মধ্যম। দক্ষিণ স্রোতের অন্তর্গত তন্ত্রসমূহের নাম যোগিনীজাল, যোগিনীহৃদয়, মন্ত্রমালিনী, অঘোরেশী, অঘোরেশ্বরী, ক্রীড়াঘোরেশ্বরী, লাকিনীকল্প, মারিচী, মহামারিচী ও উগ্রবিদ্যাগণ। মধ্যম স্রোতের অন্তর্গত তন্ত্রসমূহ হচ্ছে বিজয়, বিশ্বাস, স্বায়ম্ভুব, বাতুল, বীরভদ্র, রৌরব, মাকুট ও বীরেশ। বাম স্রোতের তন্ত্র হচ্ছে চন্দ্রজ্ঞান, বিম্ব, প্রোদ্গীত, ললিত, সিদ্ধ, সন্তান, সর্বোদ্গীত, কিরণ ও পরমেশ্বর। ব্রহ্মযামলের পরিশিষ্ট পিঙ্গলামতে দু' ধরনের তন্ত্রের উল্লেখ আছে কামরূপী ও উড্ডিয়ানী। অপর একটি পরিশিষ্ট জয়দ্রথযামলে তিন ধরনের মহাযোগী তন্ত্রের উল্লেখ আছে মঙ্গলাষ্টক, চক্রাষ্টক ও শিখাষ্টক। মহাসিদ্ধসার তন্ত্রে ভারতবর্ষকে তিনটি ভৌগোলিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা, প্রতিটি অঞ্চলে চৌষট্টিটি করে তন্ত্র বর্তমান। শক্তিমঙ্গল তন্ত্রের মতে বিন্ধ্য থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত এলাকা বিষ্ণুক্রান্তা, উত্তরে বিন্ধ্য থেকে মহাচীন পর্যন্ত রথক্রান্তা এবং পশ্চিমের অবশিষ্ট অংশ অশ্বক্রান্তা। ষট্-সম্ভব-রহস্যে চারটি তন্ত্র সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে—গৌড়, কেরল, কাশ্মীর ও বিলাস। বাস্তবে মোটামুটি তিনটি তান্ত্রিক আঞ্চলিক সম্প্রদায় স্বীকৃত—গৌড়ীয়, কাশ্মীরীয় ও দ্রাবিড়ীয়।

কাশ্মীর শৈববাদের গ্রন্থসমূহ কাশ্মীরীয় তন্ত্রের অন্তর্গত। অনুরূপভাবে শৈব সিদ্ধান্তীদের রচনাসমূহ দ্রাবিড়ীয় তন্ত্রের অন্তর্গত। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহের মধ্যে কৌলাবলী, গান্ধর্ব, কুলার্ণব, ফেৎকারিণী, সনৎকুমার, মহাচীনাচার, কামাখ্যা, গুপ্তসাধন, মাতৃকাভেদ, তারারহস্য, গায়ত্রী, গৌতমীয়, মহানির্বাণ, শ্যামারহস্য, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, উড্ডামেশ্বর, নিরুত্তর, কামধেনু, কংকালমালিনী, নীলতন্ত্র, নির্বাণ, বৃহন্নীল, রুদ্রযামল, যোগিনী, যোগিনীহৃদয়, তন্ত্ররাজ প্রভৃতি। জয়দ্রথ তন্ত্রালোকে১ কথিত হয়েছে যে শিবের যোগিনী মুখ হতে চৌষট্টিটি ভৈরব আগম নির্গত হয়েছিল যেগুলি অদ্বৈতপন্থী ছিল। এভিন্ন দশটি দ্বৈতপন্থী শৈব আগম ছিল এবং আঠারোটি মিশ্র মতবাদের রৌদ্র আগম ছিল। শঙ্করের উপর আরোপিত সৌন্দর্যলহরীতে২ চৌষট্টিটি তন্ত্রের উল্লেখ আছে, যেগুলির নামের তালিকা লক্ষ্মীধরের ভাষ্যে দেওয়া আছে। বিভিন্ন শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিদ্যা সম্প্রদায়ের সাহিত্য অতি বিস্তৃত, কালীসম্প্রদায়েরও নিজস্ব সাহিত্য আছে।

শাক্ত দার্শনিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনবগুপ্ত যাঁর তন্ত্রালোক প্রভৃতি গ্রন্থ শৈব-শাক্ত দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ। এছাড়া গোরক্ষ বা মহেশ্বরানন্দের মহার্থমঞ্জরী, পুণ্যানন্দের কামকলাবিলাস, নথনানন্দের চিদ্‌বল্লীটীকা, অমৃতানন্দের যোগিনীহৃদয়দীপিকা ও সৌভাগ্যসুভগোদয়, ও স্বতন্ত্রানন্দের মাতৃকাচক্রবিবেক শাক্তদর্শনের উপর রীতিমত আলোকপাত করে। অভিনবগুপ্তের পর সবচেয়ে বিদ্বান শাক্ত দার্শনিক ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ভাস্কর রায়। নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ভাষ্য সেতুবন্ধ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর সৌভাগ্যভাস্কর, গুপ্তবতী, শাম্ভবানন্দকল্পলতা, বরিবস্যাপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে তান্ত্রিক শাক্তদর্শন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

১। ১, ১৮। ২। ৫, ৩৭।

৬। সাধনা ও সাধক: সপ্ত আচার

তান্ত্রিক সাধনাকে তিনটি ধরনে ভাগ করা হয়—পশু, বীর ও দিব্য। পশু হচ্ছে সাধনার প্রথম স্তর। আমরা আগেই দেখেছি শৈব ধর্মে পশু বলতে জীবাত্মাকে বোঝায়, এবং সকল মানুষই এই অর্থে পশু। তন্ত্রেও পশু বলতে বদ্ধ জীবকে বোঝানো হয়েছে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয় রিপুর অধীন। অধিকাংশ মানুষই এই পর্যায়ভুক্ত। বীর বলতে আরও একটু উন্নত চরিত্রের মানুষ বোঝায়। চরিত্র ও সদ্‌গুণের সাধনার দ্বারা পশু বীরে পরিণত হয়। বীর পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন, সামাজিক মঙ্গলের স্বপক্ষে কাজ, ইন্দ্রিয়দমন, সমদৃষ্টি, নারীর প্রতি মর্যাদা, দুর্বলের পক্ষ সমর্থন—অর্থাৎ এক কথায় একটি মানুষকে সৎ ও সজ্জন হতে গেলে যা কিছু করার প্রয়োজন তাই করতে হবে। এজন্য তাকে যে শাক্তমতে দীক্ষা নিতে হবে তার কোন মানে নেই। সে বেদপন্থী, বৈষ্ণব, শৈব যা খুশি হতে পারে। তন্ত্রের নমনীয়ত্ব ও ঔদার্য এখানেই।

নৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা পশু বীরে রূপান্তরিত হয়। কামাখ্যাতন্ত্রে বীরের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সে হবে নির্ভয়, প্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়সংকল্প। কথাবার্তায় ভদ্র, পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে সদা মনোযোগশীল, শক্তিশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান ও কর্মপ্রবণ। ব্যবহারে সে নম্র এবং সর্বদাই সর্ব-জীবের মঙ্গলের কথা সে চিন্তা করে। বীরপর্যায়ের মানুষেরা দক্ষিণাচারে এবং বামাচারে দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী। দক্ষিণাচারী পর্যায়ে তাকে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের চর্চা করতে হবে ও অত্যন্ত সংযত, সামাজিক ও নীতিনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে হবে। বামাচারী পর্যায়ে সে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবে এবং পঞ্চতত্ত্বে বাস্তব অনুশীলনের অধিকারী হবে। এই পর্যায়ে সে স্বাধীন এবং সামাজিক বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করার অধিকারী। সামাজিক নিয়মকানুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না, সে কোন শৃঙ্খলেরই অধীন নয়।

দিব্য পর্যায় আরও উন্নত স্তর যখন তার অর্জিত গুণাবলী তার একান্তই নিজস্ব হয়ে যায়, যে গুণাবলীকে তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই পর্যায়েই সে সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচারে দীক্ষা নিতে পারে। বীরাচারীর মধ্যে কিছুটা অহংবোধ থাকে। সে সাচ্চা মানুষ, কিন্তু অন্তরে কোমল হলেও বাইরে কঠোর, কাজে কর্মে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ থাকে। কিন্তু দিব্য স্তরে সে শিশুর মত সদা সন্তুষ্ট, সর্ব অভিমানমুক্ত, তার ভিতর ও বাইরের কোন প্রভেদ নেই।

মানুষের রূপান্তর সম্ভব, পশুভাবের মানুষকে দিব্যভাবের মানুষে রূপান্তরিত করাই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। তন্ত্রে সাতটি আচারকে স্বীকার করা হয়। কুলার্ণব মতে সেগুলি হল, বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। প্রথম তিনটি পশুভাবের মানুষদের জন্য, চতুর্থ ও পঞ্চমটি বীরভাবের মানুষদের জন্য ষষ্ঠ এবং সপ্তমটি দিব্যভাবের মানুষদের জন্য। প্রথম আচারটি দেহ ও মনের শুচিতার জন্য; দ্বিতীয় আচারটি ভক্তির জন্য, তৃতীয়টি জ্ঞানের জন্য, চতুর্থটি প্রথম তিনটির সমন্বয়, পঞ্চমটি ত্যাগের জন্য, ষষ্ঠটি ত্যাগের উপলব্ধির জন্য এবং সপ্তমটি মোক্ষের জন্য নির্দিষ্ট। পরশুরামকল্পতন্ত্রে বলা হয়েছে প্রথম পাঁচটি ক্ষেত্রে গুরুর সাহচর্য ও নির্দেশ লাগে, কিন্তু শেষ দুটি ক্ষেত্রে সাধক স্বাধীন। আচারে এই সাতটি স্তরকে অন্যভাবে বলা হয় আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনী ও

অনবস্থা। সৌন্দর্যলহরীর ভাষ্যকার লক্ষ্মীধর আবার অন্যরকম উপাসক ভাগ করেছেন—সময়াচার, মিশ্রাচার ও কৌলাচার।

৭। গুরু, দীক্ষা, মন্ত্র

তন্ত্রের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য গুরুবাদ। সাধককে সর্বদাই মনে রাখতে হবে গুরু স্বয়ং ঈশ্বর, শিব অথবা শক্তি। শিষ্যকে গুরু সর্বতোভাবে পরিচালনা করবেন। গুরুর যোগ্যতাই বিবেচ্য—জাত-কুল নয়। নারীরাও গুরু হতে পারেন। দীক্ষা মানেই পুনর্জন্ম। দীক্ষা বহুপ্রকার, যা শিষ্যের যোগ্যতা ও মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। সাধারণ দীক্ষাকে বলা হয় ক্রিয়া-দীক্ষা, দ্বিতীয় পর্যায়ে দীক্ষাকে বলা হয় বেধ-দীক্ষা। গুরু, মন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্পর্কবোধ দীক্ষিতের পক্ষে অত্যাবশ্যক। উপরিউক্ত দুটি দীক্ষা ছাড়াও আরও নানাপ্রকার দীক্ষা আছে, যেমন তত্ত্ব, ভুবন, পাদ, বর্ণ, যন্ত্র, শক্তি, নাদ, প্রাণ, জীব, চোর, স্পর্শ, বেধ, বস্ত্র, ঘট, সদ্যোনির্বাণ, নির্বাণ, আলোক, জ্ঞান ইত্যাদি। গুণগতভাবে দীক্ষা তিন প্রকার—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। শাম্ভবী দীক্ষা সাধারণ গুরু দিতে পারেন না, সকল সাধকেরই এতে অধিকার নেই। এই দীক্ষা শ্রীবিদ্যা বা ললিতা বা কামেশ্বরী তন্ত্রে দীক্ষা। এই শ্রীবিদ্যার ভৈরব বা শিবের নাম কামেশ্বর। উদ্দেশ্য শিব-শক্তির সামরস্যের উপলব্ধি। শাক্তী দীক্ষায় গুরু নিজের শক্তি শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। মান্ত্রীদীক্ষা আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত। এতে ঘটস্থাপন, মণ্ডপনির্মাণ, মন্ত্রপাঠ, হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষাদান এবং শিষ্যকর্ণে বীজমন্ত্র দান করা হয়।

তন্ত্রে মন্ত্রের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রে দুরকম শক্তি, বাচক ও বাচ্য, প্রথমটি দ্বিতীয়টির স্বরূপ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টি জ্ঞাতব্য, প্রথমটি জানার পদ্ধতি। মন্ত্রের বাচক সত্তা বাক্যের দ্বারা গঠিত, বাক্য শব্দের দ্বারা, শব্দ ধ্বনির দ্বারা। ধ্বনির সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পর্যায় দুটির নাম যথাক্রমে বিন্দু ও নাদ। ধ্বনির প্রকাশ হয় বর্ণে বা অক্ষরে, এবং বর্ণ বা অক্ষরই বীজ। বর্ণই ভাব ও রূপের স্রষ্টা ও তাদের থেকেই সিদ্ধ বীজমন্ত্রের বোধ বা জ্ঞান হয়। হ্রীং ক্লীং ঐং শ্রীং ক্রীং প্রভৃতি বীজ। বৃহৎ বটবৃক্ষ যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকে সেইরূপ সমুদয় তত্ত্ব ওই একাক্ষরা বীজের মধ্যে বর্তমান। বর্ণমালাই মাতৃকা। পঞ্চাশটি বর্ণ মাতৃকাবর্ণ, দেবী সরস্বতীর অক্ষমালা বা দেবী কালীর মুণ্ডমালা। ধ্বনির গঠনকারী বিন্দু ও নাদের প্রকাশিত দিকটিই হচ্ছে বীজ, আর এই তিন একত্রে মিলেই শব্দব্রহ্ম, যা সর্বজীবাশ্রয়ী বস্তু ও চৈতন্য, তন্ত্রের বিশেষ ভাষায় যা ব্যাপকশক্তি কুণ্ডলিনী অথবা কুণ্ডলীরূপা কামকলা। বিন্দু হচ্ছে শিবের প্রতীক, বীজ হচ্ছে শক্তির প্রতীক আর নাদ হচ্ছে শিব-শক্তি সামরস্য।[১]

উপরিউক্ত মন্ত্ররহস্যকে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সমীকরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রকাশ ও বিমর্ষ এই দুই তত্ত্বের কথা আলোচনা করেছি। শিব জ্যোতি বা প্রকাশরূপে বিমর্ষস্বরূপা শক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবার সময় বিন্দুরূপ ধারণ করেন, যার ফলে নাদ বা সূক্ষ্ম শব্দের উৎপত্তি হয়। বিন্দু পুংবীজ (শুক্র)

১। শারদাতিলক ২, ১০৮-১১।

নাদ স্ত্রীবীজ (রজঃ)।১ এদের মিলনই হচ্ছে কামকলা। বিন্দু বিশ্বজগতের নিমিত্ত কারণ, নাদ উপাদানকারণ, এবং কামকলাই সৃষ্টিকার্যের পদ্ধতিগত দিক্।

৮। যৌনাচার, পঞ্চমকার ও ষট্‌চক্র

তাহলে দেখা গেল, তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে একটি প্রাচীন বিশ্বাস কাজ করছে যা হল দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, মানবিক সৃষ্টির পদ্ধতিও যেমন কামকলা, জগৎ সৃষ্টির পদ্ধতিও তাই।২ যদিও চরমতত্ত্বের দিক থেকে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির মত শিব ও শক্তি অভিন্ন, তথাপি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের একটা দ্বৈত ভূমিকা আছে। শিব সৃষ্টির পুং আদর্শ, শক্তি স্ত্রী এবং উভয়ের মিলন বা কামকলাই সৃষ্টির পদ্ধতি। এই শিব ও শক্তির মধ্যে শিব নিষ্ক্রিয় এবং শক্তি সক্রিয়। এই প্রসঙ্গে তন্ত্র ও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব স্মরণীয়। বিমর্ষ ব্যতিরেকে প্রকাশের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই, যেমন প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই কেননা সে উদাসীন, অক্ষম ও নিষ্ক্রিয়, যে কারণে বলা হয় শক্তিবিহীন শিব শব মাত্র। সৃষ্টির প্রকৃতি একটি চক্রের মত যেখানে বার বার অনুবর্তন চলছে। শক্তি তাঁর উৎস থেকে নির্গত হয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একটি চক্র সম্পূর্ণ করে আবার তাঁর মূল উৎসে মিলিত হচ্ছেন। এই ব্যাপারটা চলছে কল্পের পর কল্প ধরে।

তান্ত্রিকেরা কোন ঘৃণ্য কাজ করেন না। এই দুই রহস্যের অনুকরণ করেন। মূল ব্যাপারটাকে অনুধাবনের জন্যই অনুকরণের প্রয়োজন, মানুষ যা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই করে থাকে, শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই নয়। অনেক অনুষ্ঠান প্রাচীনত্বের জন্য এত পল্লবিত যে মূল ব্যাপারটি যার অনুকরণ করা হয়েছে, খুঁজে বার করা কষ্টকর। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনুষ্ঠান সেখানে অনুকরণের মূল বিষয়টি বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, মুসলমানদের মহরম অনষ্ঠানটি যে কারবালা যুদ্ধের যথার্থ অনুকরণ তা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। তান্ত্রিকেরা যে দুটি রহস্যের অনুকরণ করেন তার প্রথমটি হল শিব শক্তির কামকলা, সাধক ও তাঁর সাধন সঙ্গিনীর আনুষ্ঠানিক দেহমিলন, যা পঞ্চমকার সাধনা বা পঞ্চতত্ত্ব নামে পরিচিত, এবং দ্বিতীয়টি হল, শক্তির উৎসে প্রত্যাবর্তন, যা ষট্‌চক্রভেদ।

শুধু অনুষ্ঠানগুলিই অনুকরণমূলক নয়, অনুষ্ঠানের উপকরণগুলিও অনুকরণমূলক। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত উপকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নারীদের স্রাব থেকে নিঃসৃত রক্ত বা রজঃ। আগেই বলেছি এই রজঃ স্ত্রী বীজ হিসাবে কল্পিত, তন্ত্রের ভাষায় রক্তচন্দন বা খ-পুষ্প, যা দেবীর নিকট অতি

১। প্রাচীন জগতের সর্বত্রই বিশ্বাস ছিল, শুধু এদেশেই নয়, আরিস্টটল, প্লিনি প্রভৃতি মনীষীরাও বিশ্বাস করতেন, যা আমার *Indian Puberty Rites* (1968) গ্রন্থে দেখিয়েছি, সন্তানের উদ্ভব বাস্তব উপাদান ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং তা হচ্ছে পুরুষের শুক্র এবং নারীর রজঃ, যার মাসিক নিঃসরণ একটা প্রত্যক্ষের ব্যাপার। এই বিশ্বাসটি বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ফল, যদিও অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, শুক্র পুরুষ-বীজ হলেও রজঃ স্ত্রী-বীজ নয়।

২। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাচীন যুগের যৌনাচারসমূহের, যা মূলত সর্বজাগতিক ছিল, কিছু উদাহরণ প্রথম অধ্যায়ে ও গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র। সবচেয়ে পবিত্র কার্যকর হচ্ছে অক্ষতযোনি কিশোরীর প্রথম রজঃ। চণ্ডালীর রজের নাম বজ্রপুষ্প, কুমারীর স্বয়ম্ভূকুসুম, সধবার কুণ্ডোদ্ভব এবং বিধবার গোলোদ্ভব।১ মৈথুন ব্যতিরেকে, পঞ্চমকারের বাকি চারটি মকারও উপকরণমূলক যেগুলি হল মুদ্রা, মাংস, মৎস্য ও মদ্য। মুদ্রা শস্যের প্রতীক, মৎস্য প্রজননের, মাংস ও মদ্য সৃষ্টির উপাদান কারণের। প্রজননের প্রতীক হিসাবে মৎস্য প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাতৃদেবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত।২ মদ্যকে বলা হয় কারণ যা সর্বত্রই জীবনীশক্তি হিসাবে কল্পিত, এবং সেই হিসাবেই বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।৩ বাজপেয় যজ্ঞের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল মদ্য। কিন্তু তন্ত্র সাধনার মূল অনুষ্ঠানটি হল মৈথুন, যেখানে সাধক ও তার সঙ্গিনী শিব ও শক্তির ভূমিকাকে অনুকরণ করেন।

দ্বিতীয় রহস্যটির মূল কথা শক্তির নিজ উৎসে প্রত্যাবর্তন যার আনুষ্ঠানিক অনুকরণ করা হয় ষট্‌চক্রভেদ নামক ক্রিয়ার দ্বারা। শক্তি অণুতে ও মহতে যুগপৎ বিরাজমান এবং মানবদেহে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে মূলাধারচক্রে সুপ্ত থাকেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে কায়-সাধনের দ্বারা জাগ্রত করে মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে, পরে পর্যায়ক্রমে মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধি ও আজ্ঞাচক্রের মধ্য দিয়ে সহস্রারে উন্নীত করাই সাধকের লক্ষ্য। এই ছয়টি চক্র যথাক্রমে গুহ্যে, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও মস্তিষ্কে অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তিকে সম্যক জাগরিত করে নিম্নতর চক্রগুলির মধ্য দিয়ে সহস্রারে প্রেরণ করার অর্থ শক্তিকে তাঁর উৎসে পৌঁছে দেওয়া।৪ তাহলেও শিবশক্তি সামরস্যের উৎপত্তি ঘটবে।

বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী ও কৌলাচারীগণ পঞ্চমকার ও ষট্‌চক্রভেদের অধিকারী। তিনটি সাধনার ধারাই একপ্রকার, তবে কৌলাচারই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ। বামাচারীরা বিহিত বিধানে কুলস্ত্রীর পূজা করেন। কুলস্ত্রী বলতে কোন গৃহবধূ নয়, তন্ত্রসাধনার উপযোগী সংগৃহীতা নারী, সচরাচর সাধকের সাধনসঙ্গিনী। এই কুলস্ত্রী বামাস্বরূপা পরমাশক্তির প্রতীক, যাঁর পূজায় পঞ্চমকার ও খ-পুষ্পের ব্যবহার কর্তব্য। সকল নারীই শক্তিস্বরূপা, তবে যেহেতু কুমারী পর্যায়ই নারীত্বের সবচেয়ে মনোহর রূপ, কুমারী পূজাতেই দেবী সবচেয়ে প্রীতা হন। তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে কুমারী পূজার বিধি দেওয়া আছে। বামাচারী-সিদ্ধান্তাচারী-কৌলাচারীরা মদ্যমাংসাদির সাহায্যে দেবীর পূজা করেন। কুলার্ণবতন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, মদ্য ও মাংস যথাক্রমে শক্তি ও শিব স্বরূপ, এবং তাঁর

১। আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নারীর রজের ভূমিকা, প্রাচীনত্ব ও সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ N. N. Bhattacharyya, *Indian Puberty Rites*, 8-19.

২। S. K. Dikshit, *Mother Goddess* (1943).

৩। *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, V. 79-80.

৪। এই ক্রিয়াটিরও একটি যৌন-প্রতীক হিসাবে প্রয়োগ আছে, যার মূল তত্ত্বটি হচ্ছে রেতঃ বা শুক্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা। তবে ব্যাপারটি প্রতীকী বা অনুকরণমূলক, বাস্তব আচরণ নয়, কেননা তা দুঃসাধ্য। এর পিছনকার তত্ত্বটি হচ্ছে মানবদেহে যেখানে শুক্রের অধিষ্ঠান, সেটা তার আসল স্থান নয়, সৃষ্টির প্রয়োজনেই তা তার মূল উৎস থেকে সরে এসেছে, শক্তির মতই, এবং ওই প্রয়োজন মিটে গেলেই তাকে আবার স্ব স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। এর সঙ্গে তান্ত্রিক বজ্রোলির কোন সম্পর্ক নেই, যদিও অনেকে ভুল করে তা মনে করেন। বজ্রোলি বীর্য ধারণ পদ্ধতি, যা কিছুটা অভ্যাস করলেই আয়ত্ত করা যায়।

ভোক্তা স্বয়ং ভৈরব। এই তিন একত্র হলে আনন্দরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হয়।১ মদ্যপান সহস্রারে শিবশক্তি সামরস্য উদ্ভূত মধুপানের প্রতীক (মধুপানমিদং দেবি চেতরং মদ্যপানকম্)। শিবশক্তির সংযোগই মৈথুন।২ এই শিবশক্তি সংযোগ কিভাবে ঘটে নীচের শ্লোকটিতে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত কুলপথ—যথা মূলাধারে ক্ষিতি, মণিপুরে অপ্, স্বাধিষ্ঠানে তেজ, অনাহতে বায়ু, বিশুদ্ধিতে আকাশ এবং ভ্রূদ্বয়ে মন—ভেদ করে দেবী সহস্রারে পতির সঙ্গে বিহার করেন।

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং।
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি॥
মনোপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং।
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে॥৩

সবচেয়ে কঠিন কৌল সাধনা। শ্যামারহস্যে বলা হয়েছে কৌল নিজের প্রকৃত রূপ প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য ভিতরে শাক্ত, বাইরে শৈব ও সভামধ্যে বৈষ্ণবরূপে বিচরণ করেন।৪ কৌল মন্ত্র সাধনে স্থান ও কালের কোন নিয়ম নেই, কোথাও শিষ্ট, কোথাও ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করে কৌল পৃথিবী ভ্রমণ করেন। কর্দম ও চন্দনে, পুত্র ও শত্রুতে, যিনি ভেদজ্ঞান করেন না, শ্মশানে ও গৃহে, কাঞ্চনে ও তৃণে যাঁর পার্থক্যবোধ নেই, তিনিই প্রকৃত কৌল।৫

দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্কচিৎ শিষ্টঃ ক্কচিৎ ভ্রষ্টঃ ক্কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দমে চন্দনেহভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ॥

৯। তান্ত্রিক দেবীগণ

তন্ত্রে দেবীর সংখ্যা অগণ্য। তাই সকলের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমরা মোটামুটি প্রধান দেবীদের কথাই এখানে বলব।

তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহ নিয়ে আলোচনাকালে আমরা বলেছি যে, যে বর্ণমালা দিয়ে শব্দ গঠিত হয়, তার প্রতিটি বর্ণই মাতৃকা হিসাবে কল্পিত। বর্ণমালার প্রতিটি বর্গের একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্তমান। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে বলা হয়েছেঃ

১। সুরা শক্তি শিবোমাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম।
তয়োরৈক্যে সমুৎপন্নে আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে॥
২। পরশক্ত্যাত্মমিথুন সংযোগানন্দ নির্ভরাঃ।
মুক্তাস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥
৩। সৌন্দর্যলহরী ৯॥
৪। অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবা সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥
৫। নিত্যাতন্ত্র, ৩য় পটল।

অ-বর্গে তু মহালক্ষ্মী ক-বর্গে কমলোদ্ভবা।
চ-বর্গে তু মহেশানী ট-বর্গে তু কুমারিকা॥
নারায়ণী ত-বর্গে তু বারাহী তু পবর্গিকা।
ঐন্দ্রী চৈব য-বর্গস্থা চামুণ্ডা তু শ-বর্গিকা॥
এতা সপ্তমহামাতঃ সপ্তলোকব্যবস্থিতা।

এখানে সাতটি পৌরাণিক মাতৃকা ও তৎসহ মহালক্ষ্মীকে পাওয়া যাচ্ছে। বামকেশ্বর তন্ত্রে আবার আটটি বর্ণের দেবতাদের নাম পৃথক, যাঁরা হচ্ছেন বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশ্বরী ও কালিনী।

মাতৃকা ছাড়া তান্ত্রিক দেবীদের আর একটি গোষ্ঠী হলেন মহাবিদ্যা, সংখ্যায় যাঁরা দশ। এঁরা হলেনঃ

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্না মহাত্রিপুরসুন্দরী॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদাম্॥১

দেবী কালিকার প্রধান রূপ দুরকম—দক্ষিণকালিকা ও বামাকালিকা। তা ছাড়া শ্যামাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী প্রভৃতির পূজাও বাংলাদেশে প্রচলিত। দশমহাবিদ্যার সকল দেবীর সাধনা বিহিত থাকলেও দক্ষিণ-কালিকাই আসল। দক্ষিণকালীর পূজার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু ওই দেবীর 'রহস্যপূজার' অধিকার একমাত্র দীক্ষিত তান্ত্রিকদেরই। এই রহস্য পূজার প্রারম্ভে কামিনীদেবীর (বঙ্গদেশে দুর্গা, দক্ষিণ ভারতে শ্রীবিদ্যা বা ললিতা বা কামেশ্বরী) পূজার বিধি আছে। রহস্যপূজার নিয়ম হচ্ছে চক্রে বা মণ্ডপে পূজা। এই চক্রানুষ্ঠান হয় অভিষিক্ত সাধকদের নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সাধনসঙ্গিনীরাও থাকেন, এবং মুখ্য পূজকই হন চক্রেশ্বর। যিনি কারণ (মদ্য) পরিবেশন করেন, তিনিই শক্তিরূপে গণ্য হন। চক্রানুষ্ঠানে কিছু যৌন ব্যাপারও আছে। দক্ষিণা-কালীর যে মূর্তি বর্তমানে প্রচলিত তা শাস্ত্রানুমোদিত নয়। প্রকৃত মূর্তি হচ্ছে দেবী শিবের বিপরীতরতাতুরা ভঙ্গীতে উপবিষ্টা। বামাকালীর পূজা একমাত্র সন্ন্যাসীরাই করতে পারেন। বামাকালীর বামপদ সম্মুখে বিস্তৃত। উভয়ের ধ্যান-মন্ত্রে সামান্য পার্থক্য আছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে দক্ষিণাকালীর ধ্যান মন্ত্রঃ

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥ ইত্যাদি।

দেবী তারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই পূজিতা। তাঁর তিনটি প্রধান রূপ একজটা, নীলসরস্বতী ও উগ্রতারা। মহাযান বৌদ্ধধর্মে তারা অবলোকিতেশ্বরের

১। অপর একটি তালিকাঃ

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতে দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতাঃ॥

শক্তি। তারা দেবীর সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ হয়েছে। তোড়লতন্ত্রে শিবকে বলা হয়েছে অক্ষোভ্য এবং তারাকে বলা হয়েছে তাঁর শক্তি যা ওই তন্ত্রের উপর বৌদ্ধ প্রভাব সূচনা করে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রেও ওই একই ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

দশমহাবিদ্যার অপরাপর দেবীরা হলেন ষোড়শী (ত্রিপুরসুন্দরী), ভুবনেশ্বরী (রাজরাজেশ্বরী), ছিন্নমস্তা, ভৈরবী (ত্রিপুরভৈরবী) ধূমাবতী (অলক্ষ্মী), বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা (লক্ষ্মী)। মালিনীবিজয় তন্ত্রে দ্বাদশটি মহাবিদ্যার উল্লেখ আছে—কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা ছিন্নমস্তিকা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী। তারার মত কমলা ও ছিন্নমস্তার কিছু বৌদ্ধ সম্পর্ক আছে। কমলার ধ্যান মূর্তির সঙ্গে ভারহুতের স্তূপবেষ্টনীতে অঙ্কিত শ্রী বা গজলক্ষ্মীর মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ছিন্নমস্তার, যাঁর অপর নাম প্রচণ্ডচণ্ডিকা, ধ্যানের সঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ভট্টারিকা বজ্রযোগিনীর ধ্যান মিলে যায়।

১০। দুর্গাপূজা ও শাবরোৎসব

বঙ্গদেশের শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমায় যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ সহ মহিষমর্দিনীকে উপস্থাপিত করা হয় তা কত প্রাচীন বলা যায় না। আদিতে দুর্গাপূজা বসন্তকালেই অনুষ্ঠিত হত যে বাসন্তীপূজা আজও বর্তমান। শারদীয়া পূজার উল্লেখ কালিকাপুরাণে বর্তমান।১ রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালবোধনের কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণেই তা সবিস্তারে উল্লিখিত আছে। কালিকাপরাণ কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী, কাজেই কৃত্তিবাসের পূর্বেই শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রচলন ছিল। ষোড়শ শতকের স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর শ্রীদুর্গোৎসবতত্ত্বে দুর্গাপূজার নিয়ম কানুন বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী লেখকদের মত উল্লেখ করেছেন। বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীনাথ, শূলপাণি, জীমূতবাহন, রামকৃষ্ণ, প্রভৃতি নিবন্ধকারদের রচনার সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং তার মৃন্ময় মূর্তির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। হয়ত তার আগেও ছিল কিন্তু সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

আমরা আগেই বলেছি বঙ্গদেশের দুর্গাপূজা আসলে শস্যদেবীর পূজো যা অনুষ্ঠিত হয় তান্ত্রিক সর্বতোভদ্রমণ্ডল যন্ত্রে ও নবপত্রিকায়, যা হচ্ছে নয়টি গাছ—রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মানক ও ধান্য, যাদের প্রত্যেকটির অধিষ্ঠাত্রী দেবী যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, কালিকা, দুর্গা, কৌমারী, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং লক্ষ্মী। দুর্গা আরাধনায় দেবীকে উদ্ভিজ্জসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবীর শাকম্ভরী নামের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত তাঁর অন্নপূর্ণা রূপ, এবং কুলচূড়ামণি, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থে তান্ত্রিক শাক্ত উপাসনায় যে কুলবৃক্ষ পূজার উল্লেখ আছে, তা দেবীর সঙ্গে উদ্ভিদ জগতের সম্পর্ক ব্যক্ত করে।২

শূলপাণি তাঁর দুর্গোৎসব গ্রন্থে শারদীয়া দুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিতব্য শাবরোৎসবের

১। কালিকাপুরাণ ৬৫, ১।
২। R. P. Chanda, *Indo Aryan Races* (1969), 181 ff.

উল্লেখ করেছেন কালিকাপুরাণ[১] থেকে, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত যার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

দশমীর দিবস শ্রবণা নক্ষত্রে শাবরোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জন করিবে। সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিতা কুমারী ও বেশ্যা, এবং নর্তকগণ সঙ্গে লইয়া শংখ, তুরী, মৃদঙ্গ ও পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধূলিকর্দম নিক্ষেপ করতঃ নানা ক্রীড়াকৌতুক ও মঙ্গলাচরণ পূর্বক ভগলিঙ্গাদিবাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে। সেই দিবস যদি কোন মনুষ্য নিজের উপর অপর কর্তৃক অশ্লীল ব্যবহার করা না ভালবাসে, অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করেন'।[২]

কালিকাপুরাণের শ্লোক আছেঃ ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়ায়েযুরলং জনাঃ, প্রভৃতি যার উপরিলিখিত অনুবাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করেছেন। কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দ[৩] শূলপাণির গ্রন্থ থেকে যে পাঠ উদ্ধৃত করেছেন তার শেষ চরণটি ভিন্নরূপঃ ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ ক্রীড়য়েযুর লজ্জিত। দুটি শ্লোকের রীতিমত অর্থভেদ বর্তমান। শাবরোৎসব প্রসঙ্গে রঘুনন্দন বলেছেনঃ ততো ধূলিকর্দম বিক্ষেপক্রীড়াকৌতুকমঙ্গল ভগলিঙ্গাভিধানং ভগলিঙ্গ-প্রগীত পরাক্ষিপ্ত পরাক্ষেপকরূপং শাবরোৎসবং কুর্যাৎ।

মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে শাবর মার্গ তান্ত্রিক উপাসনার পাঁচটি শাখার একটি শাখা, বাকি চারটি হল কৌলিক, বাম, চীনক্রম ও সিদ্ধান্তীয়। এই পাঁচটি শাখাকে হাতের পাঁচ অঙ্গুলির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে : কৌলিক অঙ্গুষ্ঠ, বাম তর্জনী, চীনক্রম মধ্যমা, সিদ্ধান্তীয় অনামিকা এবং শাবর কনিষ্ঠা। শ্লোকটি নিম্নরূপঃ

> কৌলিকোহঙ্গুষ্ঠতাং প্রাপ্তো বামঃ স্যাত্তর্জনীসমঃ।
> চীনক্রমো মধ্যমঃ স্যাৎ সিদ্ধান্তীয়োহবরো ভবেৎ॥
> কনিষ্ঠঃ শাবরো মার্গঃ ইতি বামস্তু পঞ্চধা॥

১১। শাক্ত দর্শন

শাক্ত দর্শনের মূল ভিত্তি সাংখ্য, যা গড়ে উঠেছিল প্রাচীনযুগের তন্ত্র থেকে উদ্ভূত প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে। তান্ত্রিক পুঁথিসমূহের চেয়ে তন্ত্র অনেক বেশী প্রাচীন, যাঁর মূল খুঁজতে গেলে আমাদের বৈদিক যুগেরও অনেক পিছনে যেতে হবে। সেই সুদূর অতীতের মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে প্রকৃতিপ্রাধান্যবাদের উদ্ভব হয়েছে, মাতৃকাদেবীকেন্দ্রিক সেই প্রাচীন জীবনচর্যাই আদি তন্ত্র। পরবর্তী-কালের সাংখ্যদর্শন সেই প্রাচীন তন্ত্রকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। মাতৃ

১। ৬১, ১৭-২১।
২। পঞ্চোপাসনা ২৮৩-৮৪।
৩। *op. cit.*, 126.

বা প্রকৃতিপ্রধান ধর্মব্যবস্থা, যার আবেদন ছিল মূলত সমাজের নিম্নস্তরে, বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে, বরাবরই সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং এই প্রভাবের পরিধি এত বিস্তৃত যে ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মগুলিও শাক্ত-তান্ত্রিক ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই ধ্যানধারণাগুলি বিভিন্ন ধর্মকে প্রভাবিত করেই ফুরিয়ে যায়নি, গুপ্তোত্তর যুগ থেকে নূতনভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, আধুনিক শাক্ত ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি।

আগেই বলেছি শাক্তধর্মের মূল ভিত্তি ছিল জনজীবনের নীচের তলা, কৃষিজীবী, কারিগর প্রভৃতি নিয়েই যা গঠিত। এই ধর্মের গুরুরাও ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ, পরবর্তী অধ্যায়ে যাঁদের কারো কারো পরিচয় দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরাও এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁদের বিদ্যাবত্তার জোরে সহজেই নেতৃত্ব অধিকার করেন। ধর্ম ও দর্শনের মূল আদর্শসমূহ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও স্বাভাবিকভাবে তাঁদের হাতে এসে পড়ে, কিন্তু তার ফলে বিপদ হয় এই যে শাক্তধর্ম ও তন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্পর্শ লাগে এবং তারই প্রভাবে শাক্তধর্ম ও তন্ত্র তার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মণ দার্শনিকেরা সাংখ্যকে একেবারে পরিত্যাগ করেননি, কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি এঁরা সাংখ্যের উপরও কারিকুরি করে তাকে প্রচ্ছন্ন বেদান্তে পরিণত করেছিলেন। শাক্তদর্শনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি, অহংকার, তন্মাত্র, মহাভূত প্রভৃতি সাংখ্য ধারণাকে বজায় রাখলেও এগুলির উপর তাঁরা বেদান্তকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সাংখ্যের পুরুষের ধারণাটাকে একেবারে বদলে সেখানে তাঁরা বেদান্তের ব্রহ্মকে বসিয়েছিলেন যাঁর সঙ্গে তাঁরা সমীকরণ করেছিলেন শিবের। প্রকৃতিকেও তাঁরা স্বধর্ম বিচ্যুত করে ওই ব্রহ্মেরই বিমর্শ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

বৈদান্তিক দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মতবাদ শাক্তধর্মে স্থান পেয়েছে। তন্ত্র সাধনায় দুটি বিশেষ কুল বা সম্প্রদায়ের প্রচলন আছে—শ্রীকুল ও কালীকুল। শ্রীকুল অবলম্বীরা কিছুটা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যে শিবাদ্বৈতবাদের উল্লেখ করেছি, তার প্রণেতা শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য এবং অপ্পয় দীক্ষিতকৃত শিবার্কমণিদীপিকা তাঁরা মেনে থাকেন। তাঁরা শিবের সৎ ও চিৎপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন এবং শক্তিকে বিমর্শিনী অর্থাৎ শিবের স্বতঃসিদ্ধা স্পন্দস্বরূপা বলে মনে করেন। কালীকুল অবলম্বীরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী। তাঁরা বলেন সচ্চিদানন্দরূপে দেবী ব্রহ্ম-স্বরূপিণী এবং তাঁর মায়া বিবর্ত, পরিণামী নয়। তাঁদের মতে শিবশক্তিতত্ত্ব গুণাতীত, নির্দ্বন্দ্ব ও একমাত্র উপলব্ধিগম্য।

সাধারণভাবে যাকে আমরা শাক্ত দৃষ্টিভঙ্গী বলে থাকি, বৈদান্তিক দার্শনিকতা দ্বারা যা পল্লবিত, তার মূল কথা হচ্ছে চরম সত্তা, যা দেশ, কাল ও কারণাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, প্রকাশরূপে বর্তমান। বিমর্শশক্তি এই প্রকাশেরই ক্রিয়াসম্পর্কীয় স্বাতন্ত্র্য, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই শক্তি তাঁর স্বরূপ অর্থাৎ চরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন। তাঁরই মধ্যে নিহিত, এবং তাঁরই অবিচ্ছেদ্য গুণরূপে প্রকাশিত। শক্তির দুটি অবস্থা আছে—নিষ্ক্রিয় এবং ক্রিয়াশীল। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন বলা হয় যে বিমর্শ প্রকাশে লীন হয়ে গেছে। কিন্তু শক্তি যখন জাগ্রত তখন চরম সত্তাও স্বয়ং চেতন হন। তখন তাঁর আত্মজ্ঞান অহমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র বিশ্বজগৎ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় এই অহমে প্রতিফলিত হয়। চরমসত্তা যাঁর প্রকাশ শিব এবং বিমর্শ শক্তি, একই সঙ্গে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত।

দুয়ে মিলে এক অখণ্ড সত্তা। অহং-এর প্রথম অক্ষর, বর্ণমালার প্রথম অক্ষর অ, প্রকাশকে সূচিত করে, দ্বিতীয় অক্ষর, বর্ণমালার শেষ অক্ষর হ্, বিমর্শকে সূচিত করে, এবং এই দুই-এর ঐক্য যা অ থেকে হ্ পর্যন্ত বর্ণমালার সকল অক্ষরের ঐক্যকে বোঝায়, তা অনুস্বর বা বিন্দু।

এই চরম সত্তার সঙ্গে শক্তি বা কলা চিরকালীন ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। কলা শব্দটির অর্থ বিশ্বাতিক্রমী সর্বাতীত শক্তি। এই শক্তির প্রথম বিকার ইচ্ছা। তৈলবীজের মধ্য হতে যেমন তৈল নিষ্ক্রান্ত হয় তেমনই সৃষ্টির প্রারম্ভেই শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তির আবির্ভাব নিদ্রার অচেতনতার পর জাগ্রত ব্যক্তির পুনরাবির্ভাবের মত। সত্তা এবং শক্তি উভয়েই চিৎ বা শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, তবে শক্তি সকল বস্তুর উপর ক্রিয়া করেন বলে তাদেরই প্রকৃতি অনুসারে কখনও জ্ঞান এবং কখনও ক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হন। দ্বৈতবাদী শাক্তদের মতে বিন্দু হচ্ছে নিত্য জড় বস্তু কিন্তু শক্তির ক্রিয়ার অধীন। অদ্বৈতবাদী শাক্তদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এখানে যে যদিও তাঁরা শিবকে শক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেন, এবং তাঁদের এক ঈশ্বরসত্তার দুদিক বলে মনে করেন, বিন্দু বা জড় বস্তুকে তাঁরা শিবশক্তি অদ্বয়ের থেকে পৃথক করে দেখেন। তাঁদের মতে বিন্দু শিব ও শক্তির মতই নিত্য, সৃষ্টি বিষয়ে শিব কর্তা, শক্তি তাঁর যন্ত্র, এবং বিন্দু জড় উপাদান। শক্তি জড়স্বভাব নয় বলে ক্রিয়ার সময় তাতে কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু বিন্দুতে হয়ে থাকে।

বেদান্তকে ভিত্তি করার দরুন ভারতের ধর্মীয় দর্শনগুলি একটি বিশেষ ধরনের স্ববিরোধ এড়াতে পারেনি। শঙ্করাচার্য কথিত বেদান্তের চরম অদ্বয়বাদী ব্যাখ্যা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত কোন তরফই মানতে পারেনি, কেননা জগৎকে কোন ধর্মব্যবস্থার পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। কাজেই তাঁদের প্রধান সমস্যা ছিল বিশুদ্ধ চিদ্‌স্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে—তা তিনি বৈষ্ণবের বিষ্ণুই হন, শৈবের শিবই হন বা শাক্তের শক্তি হন—জড় জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার সমস্যা। কেউ কেউ বলেন যে পরিদৃশ্যমান জগৎ নিত্যসিদ্ধ চরমতত্ত্বে অর্থাৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত, সুতরাং জগৎ মিথ্যা অবভাস মাত্র এবং ব্রহ্মসত্তায় তার কোন ক্রিয়া নেই, তবে মোটামুটি যাঁরা বৈষ্ণব বা শৈব বা শাক্তধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়াস পান তাঁদের সমস্ত বক্তব্যের বাড়তি উপাদানগুলি বাদ দিয়ে একটি কাজচলা গোছের সারাংশ করা যায় যে জগৎ সত্য এবং তা কোন-না-কোন প্রকারে ব্রহ্মের পরিণাম অথবা বিকার, বিকল্পে ব্রহ্মের বা শক্তির অথবা বিমর্শ সারূপ্যের বিকার। কিন্তু চিদ্‌স্বরূপ ব্রহ্ম থেকে অচিদ্ জগতের উদ্ভবের ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা কষ্টকল্পনা আছে যা কোন ধর্মীয় দর্শনই এড়াতে পারেনি, শাক্তদর্শনও নয়।

কিন্তু শাক্তদর্শনের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও বেশি। ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যার সঙ্গে আরও গোটাকয়েক ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সমস্যা যুক্ত হয়ে শাক্তদর্শন অত্যন্ত ঘোরাল হয়ে গেছে। আমরা এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়েই প্রদর্শন করবার চেষ্টা করেছি যে তন্ত্র একটি সুপ্রাচীন যুগের অন্তঃস্রোত যার মধ্যে বহু ধরনের উপাদান বর্তমান। তন্ত্রের ভাববাদী রূপান্তরকরণ হাল আমলের, অর্থাৎ আদি মধ্য ও মধ্যযুগের, যখন থেকে বৈদান্তিকরা তন্ত্র ও শাক্তধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কিন্তু তার পূর্ববর্তী পর্যায়ে তন্ত্র মূলত বস্তুবাদী ও লোকায়তিক চরিত্রের অধিকারী ছিল, দেহাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যা দেখেছি। এই সকল উপাদান ছাড়াও আদিম জাদুবিশ্বাসমূলক নানা উপাদান তন্ত্রে

বর্তমান। তান্ত্রিক যৌনাচারসমূহ এই সকল আদিম উপাদানের অভিব্যক্তি। অনুরূপভাবে কায়-সাধন ও জীবন্মুক্তির ধারণারও উৎস পৃথক্ যেগুলির উপর কিছুটা লোকায়ত প্রভাব আছে। জাদুবিশ্বাসের পক্ষে অপরিহার্য শব্দ ও ধ্বনিগত কলাকৌশল তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহের রহস্যময়তায় ব্যক্ত হয়েছে। শব্দ, বীজ, নাদ, বিন্দু, বর্ণ, অক্ষর এগুলির উৎস সম্ভবত ওই আদিম জীবনচর্যা। এতগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমন্বয় এবং একটি বিশিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার যে কোনো প্রয়াসের মধ্যেই স্ববিরোধ থাকতে বাধ্য, যা মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মত মহামনীষী এবং তুলনাহীন বিদ্বানও এড়াতে পারেননি। কাজেই কোন সমন্বয়ী ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা না করে শাক্তধর্ম ও তন্ত্রের আলোচনায় যদি গঠনকারী উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা যায় এবং সেগুলিকে তাদের ঐতিহাসিক উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা হয়, বিবর্তিত ও পল্লবিত রূপ থেকে আলাদা করে, তা হলেই বিষয়টির উপর সুবিচার করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৯

গৌণ দেবতা ও সম্প্রদায়

১। সূচনা

ভারতের প্রধান ধর্মব্যবস্থাগুলি মোটামুটি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এগুলির বাইরেও নানা ধরনের দেবতা বর্তমান ছিলেন, যাঁরা জনসমাজের একটা বিরাট অংশের ভক্তি ও পূজার পাত্র ছিলেন, এবং যাঁদের কেন্দ্র করে নানা সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল। এঁদের অধিকাংশই বেশ প্রাচীন দেবতা, অনেকে এমন কি বৈদিক যুগ ও তার পূর্ববর্তী। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁদের যতটা কৌলীন্যপ্রাপ্তির প্রয়োজন ছিল, ততটা তাঁরা পাননি। বিষ্ণু, শিব বা শক্তির পাশে তাঁরা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছেন। অনেকে আবার বিষ্ণু বা শিবের পরিবারভুক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সকল দেবতার অনেকেরই উপাসকের অভাব হয়নি।

আমরা পূর্বেই বৌদ্ধগ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায় এবং মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেসে বর্ণিত সেই সব দেবতা ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছি যাঁরা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ের তালিকায় আমরা আজীবিক, নির্গ্রন্থ, মুণ্ড-শ্রাবক, জটিলক, পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রৈদণ্ডিক, অবিরুদ্ধক, গোতমক ও দেবধর্মিকের উল্লেখ পাই। নিদ্দেস গ্রন্থদ্বয়ে আজীবিক, নির্গ্রন্থ, জটিল, পরিব্রাজক, অবিরুদ্ধক ও তৎসহ হস্তী, অশ্ব, গরু, কুকুর, কাক, বাসুদেব, বলদেব, পূর্ণভদ্র, মণিভদ্র, অগ্নি, নাগ, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব, মহারাজ, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্ম, দেব ও দিক্-এর উপাসকদের উল্লেখ পাই। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোনটি সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ আমাদের ঘটেছে।

২। প্রজাপতি ও ব্রহ্মা

ব্রহ্মা এবং ব্রহ্ম একই। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম শব্দটি নানা অর্থে বুঝিয়েছে, যথা, অন্ন, সম্পদ, পুরোহিত, যজ্ঞোপকরণ প্রভৃতি। উপনিষদে এই ব্রহ্ম একটি বিশ্বজাগতিক আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছেন, এবং পরবর্তীকালে চরম সত্তারূপে কল্পিত হয়েছেন, যাঁর সঙ্গে সকল ধর্মব্যবস্থার সর্বোচ্চ দেবতার সমীকরণ করা হয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বড় কম কথা বলা হয়নি।

কিন্তু ঋগ্বেদে ও উপনিষদের মধ্যবর্তী যুগে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের যুগে একজন বিশিষ্ট দেবতা হিসাবে ব্রহ্মা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন যাঁকে জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতির সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি সমুদয় যজ্ঞের প্রতীক এবং তাঁকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে অনেক কাহিনী, বেশিরভাগই প্রতীকধর্মী, রচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিজ কন্যায় উপগত হবার প্রতীকী কাহিনীর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি, যে উপলক্ষ্যে রুদ্র তাঁকে ভেদ করেছিলেন। তাঁর রেতঃ দর্শন করে ভগ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তা আস্বাদ করে পূষা দন্তহীন হয়েছিলেন। এই কাহিনীটিই পরবর্তীকালের ব্রহ্মা ও শতরূপা কাহিনীটির উৎস, এবং দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর মূলেও এর প্রভাব আছে। সে যাই হোক,

ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে প্রজাপতি ব্রহ্মা মহৎ স্রষ্টা যিনি যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন।

বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে ব্রহ্মা শক্র বা ইন্দ্রের পাশাপাশি একজন দেবতা হিসাবে গণ্য যিনি বুদ্ধের সেবা করেন। পুরাণসমূহে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। তাছাড়া তিনি দেবগণের ও অসুরগণের পিতামহ। এই চতুর্মুখ দেবতাটি অসুর ও দৈত্যদের বর দিয়ে প্রায়ই দেবতাদের বেকায়দায় ফেলেন। পুরাণসমূহে তিনি স্রষ্টা হলেও তাঁর পূজার বিশেষ উল্লেখ নেই, এবং কেন তাঁর পূজা হয় না সে বিষয়ে অনেক গালগল্প পুরাণে আছে। ব্রহ্মার নিজস্ব উপাসক সম্প্রদায় সংখ্যাল্প হলেও পরবর্তী হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তি কল্পনায় তাঁকে বাদ দেওয়া যায়নি। একেশ্বরবাদী ধারণায় ঈশ্বরের তিনরূপের মধ্যে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও শিব ধ্বংসকর্তা।

ব্রহ্মার স্ত্রী বা প্রণয়িণী বেদমাতা গায়ত্রী বা সাবিত্রী, পরবর্তীকালে সরস্বতী। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে অবশ্য বাগ্‌দেবীর সঙ্গে ব্রহ্মার সম্পর্কের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।১

৩। নাগ ও যক্ষ

বৃক্ষপূজার মত সর্পপূজাও অতি প্রাচীন যুগের স্মারক। মহেঞ্জোদারোর দুটি সীলে, যেখানে শিবধরনের মূর্তি অঙ্কিত আছে, সর্পের চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। যজুর্বেদে শিবের সঙ্গে সর্পের সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। অথর্ববেদ এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সর্প বা নাগকে দৈবগুণসম্পন্ন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বৌদ্ধ নিদ্দেস গ্রন্থে নাগপূজকদের উল্লেখ আছে। কুষাণ যুগে ছারগাঁও নামক স্থানে একটি বিরাট নাগমূর্তি, ভগবা-নাগো লেখসহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পঞ্চালদের পরবর্তীকালের রাজধানীর নাম অহিছত্র এবং তাদের কুলদেবতা আদি নাগ। পঞ্চালরাজ অগ্নিমিত্র ও ভানুমিত্রের মুদ্রায় নাগজাতীয় প্রতীক লক্ষ্য করা যায়। কুলটোটেম হিসাবে নাগ জনপ্রিয় ছিল, যা গুপ্তদের সমকালীন কয়েকটি রাজবংশের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জৈনধর্মে পার্শ্বনাথের প্রতীক সর্প। শিবের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক খুবই নিবিড়, যদিও বৈষ্ণব ধর্মে সর্প বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিষ্ণুর বাহন গরুড় নাগজাতির শত্রু। কৃষ্ণের কালীয়দমনের কাহিনীও সর্পজাতির প্রতি খুব অনুকূল মনোভাবের পরিচায়ক নয়। আবার বলরাম শেষনাগের অবতার, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মুখ থেকে শ্বেতবর্ণের একটি সর্প নিষ্ক্রান্ত হয়ে সমুদ্রে চলে গিয়েছিল। পরীক্ষিতের সর্পসত্রের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যতদূর মনে হয় তিনি নাগপূজকদের বরদাস্ত করেননি। নাগরাজ বাসুকি, এবং অনন্ত, শেষ, প্রভৃতি বিখ্যাত নাগগণ পুরাণসাহিত্য জুড়ে আছেন। বাসুকির ভগিনী জরৎকারী পরবর্তীকালের সর্পদেবী মনসার সঙ্গে অভিন্না বলে ঘোষিতা হয়েছেন। সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে তিনি সারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন নামে ভীতির সঙ্গে পূজিতা। সর্বস্তরের হিন্দুরা তো বটেই, মুসলমানরাও তাঁকে মেনে চলেন। বঙ্গদেশের সাপুড়েরা অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু মনসার গান গেয়েই তাঁরা সাপ খেলিয়ে থাকেন। ধর্মীয় ভাস্কর্যে নাগমূর্তির বিশেষ ভূমিকা আছে, কেন না সর্পের চেহারা কারুকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

১। T. P. Bhattacharya, *Cult of Brahma* (1969).

কুমারস্বামী১ যথার্থভাবেই দেখিয়েছেন যে যক্ষ ও যক্ষিণীদের পূজা আসলে প্রাচীন বৃক্ষপূজারই অভিব্যক্তি। বৃক্ষ চৈত্য এবং স্থূল বৃক্ষের পূজা বহু প্রাচীন, যেগুলিকে অবলম্বন করেই সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব ও যক্ষপূজা পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ প্রকৃতিদের গুরুত্ব কমে যায়, এবং তাঁরা বৃহত্তর দেবতাদের পরিচারক রূপে কল্পিত হন। মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে যক্ষ ও যক্ষিণীদের অবদান অপরিসীম; কেননা তাঁদের মূর্তি-গুলিকেই মডেল করে পরবর্তীকালে দেবদেবী মূর্তি নির্মাণের প্রথা গড়ে ওঠে। বেসনগর, দীদারগঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত যক্ষ মূর্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ণভদ্র ও মণিভদ্র নামক দুজন যক্ষের পূজার উল্লেখ বৌদ্ধ নিদ্দেস গ্রন্থে বর্তমান। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পাওয়া থেকে প্রাপ্ত একটি মূর্তির পাদপদ্মে মণিভদ্র যক্ষের নাম উল্লিখিত হয়েছে ভগবৎ উপাধিসহ। কুবের বৈশ্রবনের পূজাও যে বহুল প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে যেখানে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তাঁর দুই নিধিসহ কুবেরের যে পূজা প্রচলিত ছিল তার ভাস্কর্যগত নিদর্শন আছে। মহাভারত এবং ললিত-বিস্তরে মণিভদ্রকে কুবেরের অনুচর বলা হয়েছে যিনি কুবেরের মতই ধনাধিপতি এবং বণিকদের পৃষ্ঠপোষক এবং যক্ষেন্দ্র, নিধীশ, ধনপতি প্রভৃতি উপাধিযুক্ত। গুপ্তযুগ থেকেই কুবেরপূজার অবক্ষয় শুরু হয় এবং কালক্রমে তিনি একজন নিছক দিক্‌পাল হিসাবে গণ্য হন।

৪। সূর্য ও সৌর সম্প্রদায়

ঋগ্বেদে সূর্য এবং তার সমগোত্রীয় দেবতাদের সংখ্যা বড় কম নয় যেমন সূর্য, সবিতা, পূষণ, বিবস্বৎ, ভগ, মিত্র, বিষ্ণু প্রভৃতি, যাঁদের সঙ্গে পরে যুক্ত হন অর্যমা, ত্বষ্টা, দক্ষ, মার্তণ্ড, ধাতা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি এবং এঁদের থেকেই আদিত্য গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এতগুলি দেবতা সৌর চরিত্রের অংশীদার হবার জন্য, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে অতি প্রসিদ্ধ হয়ে যাবার দরুন পৃথকভাবে সূর্যদেবের অবস্থার কিছুটা অবনতি হয়। তৎসত্ত্বেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সূর্যের ভূমিকা খুব একটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। ব্রাহ্মণদের ত্রিসন্ধ্যা, আহ্নিককৃত্য ও গায়ত্রীমন্ত্রে সূর্যের বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। গায়ত্রীমন্ত্রে২ বলা হয়েছে তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে৩ আদিত্যমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ সর্বাত্মক সর্বভূতের অধিপতি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মস্বরূপ আদিত্য-পুরুষ বর্ণিত হয়েছেন। মৈত্রায়ণীয় সংহিতায় শতরুদ্রীয়ের উপক্রমণিকা হিসাবে অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে সূর্যগায়ত্রীও উল্লিখিত হয়েছে—ভাস্করায় বিদ্মহে প্রভাকরায় ধীমহি তন্নো ভানু প্রচোদয়াৎ। গৃহ্যসূত্রসমূহে৪ সূর্যকে ব্রহ্মস্বরূপ রক্ষাকর্তা, ঐশ্বর্য ও যশ প্রদানকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিছু প্রাচীন মুদ্রায় এবং ভারহুত থেকে প্রাপ্ত একটি ফলকে সূর্যমূর্তির অস্তিত্ব খ্রীষ্টপূর্ব যুগে সূর্যপূজার ব্যাপকতার সাক্ষ্য দেয়। বোধগয়ার মন্দিরের প্রাকারে

১। A. Coomaraswamy, *Yaksas* (1971).

২। ঋগ্বেদ ৩, ৬২, ১০। ৩। ১০, ১৩, ১৫।

৪। আশ্বলায়ন ১, ২০, ৭; ৩, ৭, ৪-৬; খাদির ৪, ১, ১৪, ২৩।

চার অশ্বযুক্ত রথবাহিত উষা ও প্রত্যুষাসহ সূর্যমূর্তি বিদ্যমান। ভাজা গুহাগাত্রে উষা ও প্রত্যুষাসহ সূর্যমূর্তি বিরাজমান। মথুরা থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের কয়েকটি প্রস্তর মূর্তিতে সূর্য ও সাম্ব বর্তমান। সাম্ব শাকদ্বীপ বা ঈরান অঞ্চল থেকে এদেশে সূর্যপূজা আমদানী করেছিলেন এই রকম কাহিনী আছে। কুষাণ মুদ্রাসমূহেও সূর্যমূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কণিষ্কের মুদ্রায় যে সূর্যদেব অঙ্কিত আছেন তিনি হচ্ছেন ঈরানীয় মিহির। ভবিষ্য, সাম্ব, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে সূর্যপূজার একটা উন্নত রূপ ঈরান থেকে এসেছিল। বরাহমিহির পরিষ্কার বলেছেন যে একমাত্র মগরাই (ঈরানীয় পুরোহিত শ্রেণী, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তিনি নিজেও ছিলেন) সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠার অধিকারী।১

রামায়ণ ও মহাভারতে সূর্যপূজার উল্লেখ আছে। রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র আদিত্যহৃদয় স্তবপাঠ ও সূর্যপূজা করেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বের২ অন্তর্গত যুধিষ্ঠিরের সূর্য স্তবেও দেবতার সর্বাত্মকরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী-কালের সাহিত্যেও সূর্যপূজার ব্যাপক নিদর্শন মেলে। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ময়ূর রচিত সূর্যশতকের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভবভূতির মালতীমাধবের প্রথমাংশে সূত্রধারের সূর্যের নিকট প্রার্থনার মধ্যেও সাধারণভাবে সূর্যোপাসনার কথা জানা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সূর্যস্তুতি ও সূর্য সম্পর্কিত উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।৩ স্কন্দগুপ্তের সময়কার একটি লিপিতে দেববিষ্ণু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রপুরের সূর্যমন্দিরে (উত্তর প্রদেশের বুলন্দসর জেলায় ইন্দোর গ্রাম) প্রদীপদানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। হূণরাজ মিহিরকুলের নামযুক্ত গবালিয়র শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মাতৃচেট নামক এক ব্যক্তি উক্ত অঞ্চলে একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে জানা যায় হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন সৌর ছিলেন।৪ হর্ষবর্ধনের সোনপত তাম্রশাসনে তাঁর পিতা পিতামহকে পরমাদিত্যভক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একাদশ শতকের নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বৈষ্ণব, শৈব ও সৌরদের সরস্বতীর অধীনস্থ হয়ে বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকদের সঙ্গে যুদ্ধরত বলে বর্ণনা করে হয়েছে। পুরোদস্তুর সৌর সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়৫ গ্রন্থে। আনন্দগিরি সৌরমত হিসাবে যা বলেছেন তা হচ্ছে তাঁরা সূর্যকেই ব্রহ্মস্বরূপ এবং জগৎকারণ হিসাবে মনে করেন। তিনি ছয় রকম সৌর সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন যাঁরা রক্তচন্দন ও পুণ্ড্রমালাধারী। প্রথম গোষ্ঠী জগৎকারণ হিসাবে উদীয়মান সূর্যকে উপাসনা করতেন; দ্বিতীয় গোষ্ঠী সংহারকর্তা হিসাবে মধ্যগগনের সূর্যকে; তৃতীয় গোষ্ঠী সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের দেবতা হিসাবে অস্তগামী সূর্যকে; চতুর্থ গোষ্ঠী সূর্যের পূর্বোক্ত তিন প্রকাশকেই একসঙ্গে; পঞ্চম গোষ্ঠী সূর্যমণ্ডলের কেন্দ্রস্থ পুরুষ মূর্তিকে; এবং ষষ্ঠ গোষ্ঠী সমুদয় সূর্যমণ্ডলকে। এ'রা কপালে, বুকে ও হাতে মণ্ডলাকৃতি সূর্য চিহ্ন ধারণ করতেন।

হিউয়েন সাং মুলতানের বিখ্যাত সূর্য মন্দিরের কথা, সেখানকার সুবর্ণময় বিগ্রহ ও জাঁকজমকের কথা, উল্লেখ করেছেন।৬ অল-বিরুণী একাদশ শতকে ওই

১। বৃহৎসংহিতা ৫৭ অ। ২। ৩, ৩।
৩। ১০৭-১১০ সর্গ। ৪। হর্ষচরিত ৪।
৫। Ed. J. Tarkapanchanan, Bibliotheca Indica, 94-96.
৬। T. Watters, *On Yuan Chwang*, II, 254.

মন্দিরের সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করেছেন। সূর্যের সম্মানে প্রতি বছর সাম্বপুর যাত্রা উৎসব ও ঈরানীয় পুরোহিতদের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মুলতানের সূর্য-মন্দির ও বিগ্রহ সম্পর্কে আরব ভৌগোলিকদ্বয় অল্-ইস্তখরি এবং অল্ ইদ্রিসি কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই মন্দির ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বিনষ্ট হয়। মুলতান ছাড়াও ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে এবং অভ্যন্তরেও বহু সূর্যমন্দির বর্তমান ছিল। মুলতান থেকে গুজরাত ও কচ্ছদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যেগুলির মধ্যে পাটনের ১৮ মাইল দক্ষিণে মোঢ়েরা নামক স্থানের সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার অন্তর্গত কোনার্ক সূর্যমন্দির খুবই বিখ্যাত। মূল মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেলেও অগ্রভাগের যেটুকু নিদর্শন রয়েছে তা সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করে। এই মন্দির ত্রয়োদশ শতকের গঙ্গবংশীয় নৃপতি নরসিংহবর্মনের আদেশে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির ও বিগ্রহের উল্লেখ ব্রহ্মপুরাণে বর্তমান।১ ললিতাদিত্য নির্মিত কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরও বিখ্যাত।

৫। ভারতীয় সূর্য পূজা ও ঈরান

সূর্যমূর্তি কিভাবে নির্মাণ করা হবে সে বিষয়ে বরাহমিহির লিখেছেন যে এই দেবতা উদীচ্যবেশে সজ্জিত হবেন এবং তাঁর কটিদেশে বিয়ঙ্গ (অব্যঙ্গ) থাকবে।২ উদীচ্য বেশ বলতে শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক শাসকবর্গের পোশাক বোঝায়, যার নমুনা পাওয়া যাবে কণিষ্কের বিখ্যাত মুণ্ডহীন মূর্তিতে। বিয়ঙ্গ বা অব্যঙ্গ (ঈরানীয় *Aivyanonghen*) একপ্রকার মেখলা, যা দীক্ষা গ্রহণের পর উপবীতের ন্যায় সর্বদাই ধারণ করতে হয়। গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্তীকালের উত্তরভারতীয় সূর্য-মূর্তির পদদ্বয়ে বুটজুতা দেখা যায়। এগুলি নিঃসন্দেহে বহিরাগত প্রভাবের সূচনা করে।

সূর্যপূজা সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত থাকলেও তাঁর এদেশে জাঁকজমকপূর্ণ পূজাপদ্ধতির আমদানী হয় ঈরান থেকে। ঈরানীয় সূর্যদেবতা মিথ (মিত্র, মিহির) এই পূজার উৎস। কুষাণরাজগণের মুদ্রায় মিথ-মিহির নাম সম্বলিত দেবমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। কুষাণ ও অন্যান্য বৈদেশিকদের প্রচেষ্টায় এই পূজা জনপ্রিয় হয়। ঈরান থেকে আগত এই দেবতার পুরোহিতবর্গ (ম্যাগি) এ-দেশে মগদ্বিজ নামে পরিচিত হন। এই মগদ্বিজ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বংশধরেরাই কালক্রমে ভোজক ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন এবং দৈবজ্ঞের পেশা অবলম্বন করেন। এ'রা গ্রহবিপ্র নামেও পরিচিত হন। শ্রাদ্ধাদিতে এরা দানগ্রহণ করতেন এবং সেই হিসাবে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হিসাবেও কোন কোন স্থানে পরিচিত আছেন আজও পর্যন্ত।

বরাহ, সাম্ব ও ভবিষ্যপুরাণে ভারতবর্ষের ঈরান থেকে সূর্যপূজার অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সাম্ব ও ভবিষ্যপুরাণ অর্বাচীন হলেও শেষোক্ত পুরাণটি একমাত্র ভারতীয় রচনা যেখানে যেখানে ঈরানীয় ধর্মগুরু জরথুস্ত্রের উল্লেখ আছে।৩ কাহিনী অনুযায়ী কৃষ্ণপুত্র সাম্ব পিতার অভিশাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। তাঁর রোগের উপশম না হওয়াতে তিনি শাকদ্বীপী বা ঈরানীয় প্রথায় সূর্যোপাসনা করতে

১। ব্রহ্মপুরাণ ২৮, ৪৬-৪৭, ৬৪। ২। বৃহৎসংহিতা ৫৭, ৪৬-৪৭।
৩। ভবিষ্য ১৩৯ অ।

আদিষ্ট হন এবং মূলস্থানপুরে (মুলতান) তিনি সূর্য মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ পূজা করতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি শাকদ্বীপ থেকে সূর্যপূজক মগ ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসেন। দ্বাদশ শতকের গোবিন্দপুর শিলালেখে এই ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে বলা হয়েছে সূর্য থেকে মগদের উৎপত্তি এবং সাম্বই তাঁদের এদেশে নিয়ে আসেন।১

৬। গণপতি ও গাণপত্য সম্প্রদায়

নিছক সাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে, কোনরকম শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি না করেই, গণেশ সম্পর্কে পাকা কথা বলতে পেরেছিলেন পরলোকগত অতুল গুপ্ত, গণেশ শিরোনামায় রচিত একটি ছোট প্রবন্ধে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লোকায়ত দর্শন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গণেশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে বলেছেন যে দেবতাটি সত্যই সিদ্ধিদাতা কেননা ওই একটি দেবতাকে খোঁচাখুঁচি করেই ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের অনেক অজানা ব্যাপার জানা সম্ভব, এবং সেরকম বহু ব্যাপারই তিনি বার করতে সমর্থ হয়েছেন। এই যৌগিক ও লোকায়ত দেবতাটি খবরের একটি আকর বিশেষ। যদিও দেবীবাবুর পর তাঁকে নিয়ে আর কেউ সামাজিক বিষয়ে অনুসন্ধান চালাননি।

গণেশ বা গণপতি গণ বা ট্রাইবের দেবতা যা তাঁর নামেই প্রকাশ। ঋগ্বেদে দেবতাটির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে।২ গণেশ গণের দেবতা, অর্থাৎ যে কোন ট্রাইবের মুখ্য দেবতার প্রতীক (যে কারণে আজও সকল দেবতার পূজার আগে গণেশের পূজা করতে হয়) যদিও কোন একটি বিশেষ ট্রাইবের (হয়ত সে ট্রাইব শক্তিমান ছিল বলেই) টোটেম অবলম্বনে তাঁর হস্তীমুণ্ড হয়েছে। বিভিন্ন ট্রাইবের প্রধান দেবতার আদিম মানসরূপ হিসাবে গণেশ কল্পনায় অসংখ্য উপজাতীয় বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা স্থান পেয়েছে, যে কারণে এই দেবতাটিকে অবলম্বন করে দেবীপ্রসাদবাবু অনেক লুপ্ত সম্পদেরই সন্ধান পেয়েছিলেন। এখনও অনেক কিছু পাবার সম্ভাবনা আছে।

গণেশ গণসমূহের প্রধান দেবতার মানসরূপ, এবং ভারতের গণ বা ট্রাইব বা উপজাতি বলতে অবৈদিক ট্রাইবদের পাশাপাশি বৈদিক ট্রাইবরাও ছিল। একটি মুখ্য বৈদিক ট্রাইবের নেতা বা দেবতা হিসাবে ইন্দ্রও গণপতি, এবং এই অর্থেই ইন্দ্রকে ঋগ্বেদে গণপতি বলা হয়েছে, এবং সেই হিসাবে ইন্দ্রের চরিত্রেরও কিছু অংশ বর্তমান গণপতির উপর বর্তেছে। কিন্তু ইন্দ্র বেশিদিন গণপতি থাকেন নি, বাস্তব জীবনে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও রাজা এবং পরিণামে দেবরাজ হয়েছিলেন। ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে গণাধিপতি দেবতাদের মধ্যে ঋগ্বেদে উল্লেখযোগ্য রুদ্র ও মরুৎ এবং বলাই বাহুল্য গণেশ তাঁদের সঙ্গেও সম্পর্কিত। গণাধিপতি হিসাবে রুদ্রের ক্ষেত্র বিস্তৃততর এবং সেই হিসাবে গণেশের সঙ্গে রুদ্রের সম্পর্কটাও বেশি ঘনিষ্ঠ। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম আদিতে উপজাতীয় সমাজের বা গণসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল, কাজেই আমাদের আলোচ্য গণদেবতাটি সেখানেও আছেন।

আদিম উপজাতীয় দেবতা যতটা না প্রীতির তার চেয়ে অনেক বেশি ভীতির,

---

১। *Epigraphia Indica,* II. 333.

২। ২, ২৩, ১৯; বাজসনেয়ী সংহিতা ২৩, ১৯।

তাই প্রাথমিক কল্পনায় গণেশ রুদ্রের মতই বিঘ্নরাজ। ইনি অমঙ্গলের দেবতা যাঁকে ভয় করতে হয়, কোন কিছুর উপর এ'র দৃষ্টি পড়লেই সর্বনাশ, এমনকি কোন মেয়ের উপরেও এ'র দৃষ্টি পড়লে সে বেচারী বাঁজা হতে বাধ্য। পরবর্তীকালের কাহিনীতেও জানা যায় শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়েছিল এবং তার জায়গায় গজমুণ্ড বসিয়ে দেওয়া হয়। রূপকটি স্পষ্ট। সেটি হচ্ছে গণেশের বিঘ্নরাজ থেকে সিদ্ধিদাতায় রূপান্তরের ইতিহাস। কর্মবিঘ্নের দেবতা হিসাবে গণেশের যা আদি কল্পনা সেখানে তাঁর দৃষ্টি শনির দৃষ্টির মতই ভয়াবহ। সে দৃষ্টি যার উপর পড়ে তারই সর্বনাশ হয়। কাজেই গণেশ যখন সিদ্ধিদাতায় রূপান্তরিত হলেন তখন তাঁর প্রাচীন মস্তকটিকে সরানোর দরকার ছিল। শনির দৃষ্টি আসলে তাঁর আদি সত্তারই ভয়াবহতা।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে গণাধিপতি হিসাবে রুদ্রের সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক অপরের তুলনায় গভীরতর, যে কারণে পরবর্তীকালে তাঁকে রুদ্র শিব ও পার্বতীর সন্তান বলা হয়েছে। অথর্বাশিরস্ উপনিষদে রুদ্রের সঙ্গে বিনায়কের সমীকরণ করা হয়েছে, এবং বিনায়ক গণেশেরই অপর এক নাম। অমরকোশে গণেশের নিম্নলিখিত নামগুলি বর্তমানঃ

> বিনায়ক-বিঘ্নরাজ-দ্বৈমাতুর-গণাধিপাঃ।
> অপ্যেকদন্ত-হেরম্ব-লম্বোদর-গজাননাঃ॥

মহাভারতে গণেশ-বিনায়ককে বলা হয়েছে ঈশ্বরাঃ সর্বলোকানাং গণেশ্বর বিনায়কাঃ এবং তাঁদের যথাযোগ্যভাবে উপাসনা করলে তাঁরা সকল বিঘ্নের বিনাশ করেন।১ মানবগৃহ্যসূত্রে চারজন বিনায়কের নাম উল্লিখিত হয়েছে—সালকটংকট, কুষ্মাণ্ডরাজপুত্র, উস্মিত এবং দেবযজন।২। শিব, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে গণেশ-জন্মের ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়। পুরাণ ও শিল্পশাস্ত্রসমূহে চব্বিশটি বিভিন্ন গণেশ মূর্তির কথা বর্ণিত আছে : বিনায়ক, গণাধীশ, বিঘ্নেশ, প্রমথাধিশ, গজেশ, বীজগণপতি, হেরম্ব, বক্রতুণ্ড, বালগণপতি, ভক্তবিঘ্নেশ, শক্তিগণেশ, ধ্বজগণাধিপ, পিঙ্গলগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, লক্ষ্মীগণেশ, মহাগণেশ, ভুবনেশ, গণপতি, নৃত্যগণপতি, ঊর্ধ্বগণেশ, প্রসন্ন গণেশ, উন্মত্ত বিনায়ক ও হরিদ্রা গণেশ।

গুপ্তযুগের পর থেকেই গণেশপূজার বিস্তৃতি ঘটে। গণেশের প্রাচীনতর মূর্তিগুলির মধ্যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের একটি নগ্নমূর্তি উল্লেখযোগ্য যেটি মথুরা থেকে প্রাপ্ত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের ভুমারার শিবমন্দিরের দ্বিভুজ গণেশের মূর্তি আছে, যাঁর শুণ্ডটি মোদকাস্বাদনে রত। অনুরূপ একটি মূর্তি কাম্বোডিয়ার মাইসোন থেকে পাওয়া গেছে যেটির তারিখ সপ্তম শতক যা থেকে গণেশ পূজার বিস্তৃতির পরিচয় মেলে। এই দেবতাটির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় ৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্থানের যোধপুরের অন্তর্গত ঘাটিয়ালা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত একটি লেখে, যেখানে প্রতীহাররাজ কক্কুক কর্তৃক রোহিন্সকূপ নামক বাজারে চারটি গণেশমূর্তিযুক্ত একটি স্তম্ভ নির্মাণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ঘাটিয়ালার আরও দুতিনটি লেখে মণ্ডোরে গণেশস্তম্ভ স্থাপনের উল্লেখ আছে।৩ স্তম্ভোৎকীর্ণ লিপিগুলিতে গণেশ যে বিঘ্ননাশক ও ব্যবসায়ের সাফল্য আনয়নকারী

১। ১৩, ১৫০, ২৫। ২। ২, ১৪।
৩। *Epigraphia Indica*, IX, 277 ff.

দেবতা তা উল্লিখিত হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত মধ্যযুগের নৃত্যরত অনেক গণেশ-মূর্তির প্রভাবলীর উপরে সপল্লব আম্রগুচ্ছ অঙ্কিত দেখা যায়, যা গণেশের সিদ্ধি বা ফলদায়কত্বের প্রতীক।

৭। গণেশ ও তন্ত্র

কিভাবে বিঘ্নরাজ সিদ্ধিদাতা হলেন সে এক বিচিত্র ইতিহাস যা এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এখানে আমরা শুধু তাঁর আদিম প্রকৃতির একটি বিকাশ নিয়েই আলোচনা করব। তা হচ্ছে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আদিম উপজাতীয় দেবতা হিসাবে প্রাচীন তন্ত্রাচারের সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক থাকবে। গণেশের সঙ্গে সম্পর্কিত তন্ত্রাচার ভারতেরও সীমা অতিক্রম করেছিল। জাভায় বারা নামক একটি স্থানে আদি মধ্যযুগের একটি তন্ত্রাচারী গণেশের ভাস্কর্য বর্তমান। ভারতীয় ভাস্কর্যে গণেশ বহুস্থলে মাতৃকাদের সঙ্গে যুক্ত। নিজ শক্তির সঙ্গে মিথুনরত গণেশ মূর্তিরও নিদর্শন পাওয়া গেছে।

আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্বিজয় কাব্যে১ এবং মাধব বিদ্যারণ্য এবং ধনপতি কৃত ঐ কাব্যের ডিণ্ডিমাখ্য ভাষ্যে গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখা উল্লিখিত হয়েছে (গাণপত্যমিতি খ্যাতং ষড়্‌ভির্ভেদৈঃ সমন্বিতম্) যেগুলি যথাক্রমে মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি এবং সন্তানগণপতির উপাসক। মহাগণপতির উপাসকদের মতে, গজানন এবং একদন্ত মহাগণপতি, যিনি তাঁর শক্তির সঙ্গে চিরবিহারে রত, বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং চরমসত্তা। হরিদ্রা-গণপতির উপাসকদের মতেও গণপতি বিশ্বপ্রপঞ্চের আদিকারণ, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের সঙ্গে তাঁর অংশাংশীরূপ সম্বন্ধ (জগৎকারণমেবায়ং ব্রহ্মাদ্যা অংশরূপিণঃ)। এই সম্প্রদায়ের উপাসকগণ তাঁদের বাহুতে দেবতার গজমুখ চিত্রিত করে থাকেন।

পুরোদস্তুর তান্ত্রিক ছিলেন উচ্ছিষ্টগণপতির ভক্তবৃন্দ যাঁদের কল্পনায় গণেশ চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও অভয়মুদ্রাধারী, তাঁর শুণ্ডাগ্র তীব্র সুরাপানাসক্ত, তিনি মহাপীঠে আসীন, তাঁর বামোৎসঙ্গে স্থাপিতা তাঁর শক্তিকে তিনি চুম্বন, আলিঙ্গন এবং শুণ্ড দ্বারা ভগস্পর্শনাদিতে তৎপর।

> চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং পাশাঙ্কুশগদাভয়ম্।
> তুণ্ডাগ্র তীব্রমধুকং গণনাথমহং ভজে॥
> মহাপীঠনিষণ্ণং তং বামাঙ্গপরিসংস্থিতম্।
> দেবীমালিঙ্গ্য চুম্বতং স্পৃশংস্তুণ্ডেন বৈ ভগম্॥

উচ্ছিষ্টগাণপত্যরা পাপপুণ্যের ভেদ করতেন না, স্ত্রী-পুরুষের যথেষ্ট যৌন মিলনে কোন অন্যায় দেখতেন না, সুরাপান অনুমোদন করতেন। বিবাহাদি সংস্কার বর্জিত ছিলেন, জাতিভেদ মানতেন না। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে এগুলি তাঁদের দোষ বলে ঘোষিত হয়েছে, যদিও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এঁদের অনুষ্ঠানসমূহ আদিম যুগের সরল ও স্বাভাবিক জীবনচর্যার স্মারক।

১। আনন্দাশ্রম সিরিজ সং, ৩৫৭ ই।

৮। স্কন্দ-কার্তিকেয়ঃ আদিম উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস

স্কন্দ-কার্তিকেয় একজন লৌকিক দেবতা যিনি কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্থান পেয়েছিলেন। ইনি কৃষি ও প্রজননের দেবতা, প্রাচীন গ্রীস, এশিয়া মাইনর, মধ্য-প্রাচ্য ও মিশরের কৃষিদেবতাদের অনুরূপ (যেমন আদোনিস, আটিস, তম্মুজ, ওসিরিস প্রভৃতি), যাঁর প্রণয়িণী একজন আদিম মাতৃকাদেবী যিনি লৌকিক ধর্মে সন্তানোৎপাদনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী হিসাবে পরিচিতা। উচ্চবর্ণ কর্তৃক গৃহীত হবার পর তিনি দেব-সেনাপতি হিসাবে গণ্য হন, এবং ষষ্ঠী হন তাঁর পত্নী দেবসেনা। ইনি শিব ও পার্বতীর পুত্র হিসাবে কল্পিত হন যিনি তারকাসুরকে বধ করেছিলেন। তাঁর জন্মের কাহিনীই মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের ভিত্তি।

স্কন্দ-কার্তিকের প্রণয়িনী মাতৃকাদেবী ষষ্ঠীর পূজা হয় গাছতলায়, দেবী একটি অসমতল প্রস্তরখণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। কার্তিকের পূজা হয় প্রতীকে, একটি মাটির পাত্র বা সরায় কিছু বীজ বপন করে, এবং সেই বীজ থেকে উদ্ভূত চারা-গাছগুলিই দেবতার প্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কার্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় সৌর তিথি অনুসরণ করে, যেখানে অন্যান্য ভারতীয় পূজাপদ্ধতি মূলত চান্দ্র তিথির উপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে মেয়েলী ব্রতসমূহ যেগুলি মূলত গর্ভধারণ, সুপ্রসব, ফলোৎপাদন প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত, সাধারণত সৌর তিথি অনুসরণ করে। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এবং এই দেবী চণ্ডীর মত এমন কিছু দানবদলনী নন। ইনি সন্তান, সৌভাগ্য ও সম্পদ দান করেন। অম্বুবাচী ব্রতও সৌর তিথি অনুসরণ করে, ৭ই থেকে ১১ই আষাঢ়, এটি প্রজনন ব্রত। এই চারদিন পৃথিবীদেবী রজস্বলা থাকেন বলে বিশ্বাস। রজস্বলা মহিলার সঙ্গে যৌনসঙ্গম যেমন নিষিদ্ধ, অম্বুবাচীতে হলকর্ষণও তদ্রূপ নিষিদ্ধ। বিধবাদের কয়েকটি বিষয় থেকে এই ব্রত উপলক্ষে বিরত থাকতে হয়, কেননা তাদের সন্তান জন্ম দেবার কোন অধিকার নেই। ইতুপূজাও অনুষ্ঠিত হয় অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে। দেবী শস্যস্বরূপা, এই কারণে তাঁর পূজা হয় শস্যের প্রতীক দিয়ে, একটি মাটির সরায় অঙ্কুরিত পাঁচ রকম শস্যের আকারে। এছাড়া থাকে চিত্রবিচিত্র ইতুঘট। ঘট সর্বত্রই পূর্ণগর্ভা নারীর প্রতীক।

কার্তিক এবং ইতু উভয়েরই প্রতীক অঙ্কুরিত শস্য, এবং পৃথিবীর বহুস্থানেই ফসলের দেবতা ওই প্রতীকেই পূজিত হন। কোন পাত্রে বা স্থানে দেবতার প্রতীক হিসাবে যে শস্যক্ষেত্র তৈরী করা হয়, তা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে Garden of Adonis নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, কৃষিক্ষেত্রের মধ্যেই কার্তিক পূজার নিয়ম আছে। অনেক সময় ক্ষেত্রের মধ্যে মণ্ডলাকারে অনেকগুলি ছোট ছোট কার্তিক মূর্তি বসানো হয় এবং তার মধ্যে একটি বড় মূর্তিকে বসিয়ে তার পূজা করা হয়।

মেয়েরা পুত্রার্থে কার্তিক ব্রত পালন করে থাকে। পুরাণোক্ত কাহিনী অনুযায়ী, জনৈক ব্রাহ্মণ দম্পতি নিঃসন্তান হবার দরুন জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে অরণ্যে গমন করে, সেখানে কতিপয় বালিকাকে মাটির সরায় শস্য বপন করে কার্তিক ব্রত পালন করতে দেখে তাঁরাও ওই ব্রত পালন করেন এবং ফলে তাঁদের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এছাড়া কার্তিক পূজার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কোন কোন

জায়গায় কার্তিক গণিকাদের দ্বারা পূজিত হন। এ বিষয়ে আমার জন্মস্থান চুঁচুড়া শহর প্রসিদ্ধ। আমরা যখন বালক ছিলাম তখন গণিকাপল্লীতে অনেকগুলি কার্তিকপূজো হত, এখন একটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, যদিও পাশাপাশি বারোয়ারী কার্তিক পূজার বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই আর মূল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বাল্যকালে যে দু' একটি বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছিল এবং বর্তমানে অনুসন্ধান করে যা জেনেছি তা হচ্ছে এই যে, গণিকাদের কার্তিক পূজায় দেবতার সামনে মাটির উপর একটি ছোট নকল শস্যক্ষেত্র তৈরী করা হত এবং নপুংসকদের নাচ বাধ্যতামূলক ছিল। কারো বাড়ীতে পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করলে নপুংসকগণ সেই বাড়ীতে এসে নাচগান করে। এটা জাতকের পক্ষে শুভ ফলপ্রদ বলে সকলের বিশ্বাস। তাহলে দেখা যাচ্ছে কার্তিক এখানেও শস্য ও প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কিন্তু গণিকাদের মধ্যে এই পূজার বিশেষ ধরনের একটা বিকাশ ঘটল কেন? এটা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন যে, কার্তিকের মতই রূপগুণসম্পন্ন ক্রেতা তাঁরা পছন্দ করেন। বহু স্থলে তাঁদের উপাস্য দেবতার নাম বাবু কার্তিক। এই ধারণার বশেই বোধ হয় হাল আমলের দু' একটি বারোয়ারী কার্তিকের চেহারা করা হয় তাকিয়া হেলান দেওয়া বাবুর মতই। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, যদিও গণিকারা নিজেরাও বর্তমানে এই রকমই বিশ্বাস করেন। এই ভুল ধারণা নিরাকরণের পূর্বে কার্তিক প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে সরস্বতী দেবীর সঙ্গে কার্তিকের সম্পর্ক। কার্তিকের মত সরস্বতীও পূর্বে গণিকাদের দ্বারা পূজিতা হতেন। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে গৃহস্থ বাড়ীতে সরস্বতী পূজো হত বই দিয়ে। সরস্বতীর মূর্তি-পূজার রেওয়াজ ছিল না। কেবল গণিকাগৃহেই সরস্বতীর মূর্তি-পূজো হত। গণিকাদের দ্বারা একটি বিশেষ দেবতা ও একটি বিশেষ দেবীকে সম্পর্কিত করে এই যে পূজো তা গ্রীস-রোমের আফ্রোদিতি (ভেনাস) ও আদোনিস বা ব্যাবিলনের মাইলিট্টা, ইস্তার প্রভৃতি দেবদেবীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যাঁদের পূজার সঙ্গে গণিকাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

গণিকাবৃত্তি বর্তমানে সম্মানজনক পেশা না হলেও অতীতে তা সম্মানজনক ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে যা জানা যায়। বুদ্ধের সময়কার বিখ্যাত গণিকা আম্রপালীর যে রীতিমত সামাজিক সম্মান ছিল তার প্রমাণ আছে। মহাভারতের এক জায়গায় আছে নগর প্রবেশের পূর্বে যুধিষ্ঠির গণিকাদের তাঁর প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ লোক মারফত প্রেরণ করেন। ব্যাপারটা শুনতে অনেকেই পছন্দ করবেন না, প্রাচীন ভারতে গণিকারাই ছিলেন মহিলাদের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিতা শ্রেণী যাঁদের চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হতে হত, শুধু তাই নয় অলঙ্কার, ছন্দ ও কাব্য সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে হত। এই সকল জ্ঞান ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে সরস্বতী ধনী নাগরিক ও গণিকাদের দ্বারা যে পূজিতা হতেন সে কথা বাৎস্যায়নের কামসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য গণিকাবৃত্তি তার প্রাচীন গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল, দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমতে বা ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকায় যার পরিচয় পাওয়া যায়।১

গণিকা গণ বা ট্রাইবের সঙ্গে সম্পর্কিত, নামটিই যা সূচনা করে। অতি প্রাচীন গণজীবনের ইঙ্গিত এই নামটির মধ্যে রয়েছে। এমনকি বেশ্যা শব্দটিও বিশ থেকে

১। N. N. Bhattacharyya, *History of Indian Erotic Literature* (1975).

নিষ্পন্ন যার অর্থ জনপদ। অতি প্রাচীন যুগের ট্রাইবজীবন সঙ্গতভাবেই ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক, আধুনিক অর্থে পরিবারের স্থান যেখানে ছিল না। সেই হিসাবে নারীরাও ছিলেন সাধারণী, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন। যবে থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হয়েছে তখন থেকেই পুরুষপ্রাধান্য এসেছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের প্রয়োজনেই নারীর সতীত্ব দাবি করা হয়েছে, তাকে এক পুরুষের অধীন করা হয়েছে, এবং তখন থেকে আধুনিক অর্থে পরিবারের উদ্ভব। আমরা আগে একথা বহুবার বলেছি যে আদিযুগের জাদু অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই যৌনাচার সমূহের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, যার উদ্দেশ্য আমরা পূর্বে বুঝিয়ে বলেছি। সেই প্রাচীন সমাজে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও, গোষ্ঠীজীবনের স্থলে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত সত্ত্বেও, পুরাতন যুগের যৌনমূলক আচার অনুষ্ঠানগুলিকে বাতিল করা সম্ভব হয় নি, কেননা এগুলির মৃত্যু হতে সময় লাগে অনেক বেশি। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কুলস্ত্রীর পক্ষে এসকল আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, যদিও কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদেরও পূর্বতন যৌন অনুষ্ঠান-গুলির অনুকরণ সাধারণ্যে করতে হত, যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব-উপসংবেশন নামক অনুষ্ঠানটির ক্ষেত্রে, যেখানে রাজমহিষীকে পুরোহিতের প্রতীকরূপী মৃত অশ্বের সঙ্গে একত্রে শয়ন করতে হত। সে যাই হোক না কেন যৌন অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্র থেকে কুলস্ত্রীরা সরে যাবার ফলে সেগুলির দায়িত্ব সাধারণী মহিলাদের উপরই কালক্রমে এসে বর্তায়। যে সকল দেবদেবীর সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা ও মানবিক ফলপ্রসূতা বিশেষভাবে সম্পর্কিত হয়ে যায়, এবং যাঁদের পূজায় যৌন অনুষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বজায় থাকে সেগুলি স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণী বা গণিকাদের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে (এখনও দুর্গাপূজায় গণিকাগৃহের মৃত্তিকা প্রয়োজন হয়)। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অনুষ্ঠান-গুলির তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠার পরিণামে সেগুলির খানিকটা অংশ বিলুপ্ত হয়, খানিকটা থেকে যায়—উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক অনুষ্ঠানরূপে। সেই সব অনুষ্ঠান যারা করে, তারা করতে হয় বলেই করে, কেন করে তা নিজেরাই জানে না, জানা সম্ভবও নয়।

গণিকাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্তিক পূজা এই রকম একটি বহু পরাতন প্রথারই স্মারক, যা আচরিত হচ্ছে যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীনা ভাবে, যুগধর্মে যার চোদ্দ আনাই লুপ্ত হয়েছে, বাকিটুকুও বিলুপ্তির পথে। অবশিষ্ট দু আনা বিলুপ্ত হবার কারণ পুরোপুরি অর্থনৈতিক। একজন প্রাচীনার সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম যে আগে এইসব পূজাদির ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের খরিদ্দারদের কাছ থেকে রীতিমত উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য পেতেন, তাঁরা নিজেরাই দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করতেন, এখন সে দিন নেই।

তবে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভবপর নয়, একটি প্রাচীন প্রথার স্মারক ভারতবর্ষের একটা ছোট শহর চুঁচুড়াতেই বা টিঁকে রইল কেন।[১]

১। কলকাতার কোন কোন গণিকা পল্লীতে এবং কৃষ্ণনগরেও কার্তিকপূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

৯। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও স্কন্দ-কার্তিকেয়

কার্তিকেয় নামক আদিম শস্য দেবতা ও তাঁর প্রণয়িনী দেবী ষষ্ঠী কালক্রমে জাতে উঠেছিলেন, এবং স্কন্দ, বিশাখ, কুমার, মহাসেন, ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাণিনির একটি সূত্রের১ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পতঞ্জলি স্কন্দ ও বিশাখের মূর্তি নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাভারতেও স্কন্দ-কার্তিকের বহু উল্লেখ আছে। বনপর্বের স্কন্দোৎপত্তি পর্বাধ্যায়ে স্কন্দ-কার্তিকের উদ্ভবের অনেকগুলি কাহিনী আছে। এক হিসাবে তিনি অগ্নি ও স্বাহার পুত্র, এক হিসাবে কৃত্তিকাদের, অন্য হিসাবে গঙ্গার, কিন্তু কালক্রমে শিব ও দুর্গার। একটি কাহিনী অনুযায়ী দেবগণের শত্রু হিসাবেই স্কন্দের উদ্ভব (এখানে তাঁর লৌকিক ও আদিম সত্তাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে), জন্মলগ্নেই যাঁকে খতম করার জন্য ইন্দ্র মাতৃকাদের পাঠান, কিন্তু তাঁরা তাঁকে নিহত করার পরিবর্তে স্তন্য দিয়ে লালনপালন করেন। স্কন্দ দেবগণকে নিপীড়ন করতে শুরু করেন এবং দেবতাদের প্রচণ্ড ভীতির কারণ হন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের দক্ষিণ পঞ্জর বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে বিশাখ বা কার্তিক নির্গত হন এবং তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে দেবগণের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যায়। তখন একটা আপোস হয়, স্কন্দ-কার্তিকেয় দেব-সেনাপতির পদ পান এবং শিব ও দেবী তাঁর পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বীকার করে নেন। বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক দেবকুলে এই লৌকিক দেবতাটিকে গায়ের জোরেই স্থান করে নিতে হয়েছে।

হুবিষ্কের কয়েকটি মুদ্রায় স্কন্দ-কার্তিকের মূর্তি এবং তাঁর কুমার, বিশাখ, মহাসেন প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।২ অ্যাকোটাবাদ থেকে প্রাপ্ত একটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের লিপিতে একটি কুমার-স্থানের উল্লেখ আছে।৩ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের যৌধেয়দের মুদ্রায় তাঁর ষড়ানন এবং ময়ূর-কুক্কুটধারী মূর্তি বর্তমান। ওই সকল মুদ্রায় 'ভগবতো স্বামিনো ব্রহ্মণ্যদেবস্য কুমারস্য' বাক্যটি উৎকীর্ণ আছে। ভিটা থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের একটি সীল মার্শাল আবিষ্কার করেছেন যাতে বিন্ধ্যবিদারণকারী মহারাজ গৌতমী পুত্র বৃষধ্বজ তাঁর সমগ্র রাজ্য কার্তিককে উৎসর্গ করেছেন একথা লেখা আছে। গুপ্তবংশীয় রাজা কুমারগুপ্তের সমকালীন বিলসদ লেখে ব্রহ্মণ্যদেব স্বামী মহাসেনের মন্দিরের অংশ বিশেষ বাড়ানোর কথা উল্লিখিত হয়েছে। কুমারগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রায় ময়ূর-বাহন কার্তিক অঙ্কিত হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে এই দেবতাটি সুব্রহ্মণ্য নামে বিশেষভাবে পূজিত হন।

১০। স্মার্ত পঞ্চোপাসনা

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরকালে একটা সমঝোতা হয়েছিল, যার ফলে হিন্দু পঞ্চোপাসনার সূত্রপাত হয় যার মূল

১। ৫, ৩, ৯৯।

২। P. Gardner, *British Museum Catalogue,* 138, 149, 150, pl. XVII, 16, XVIII, 23-24.

৩। *Epigraphia Indica,* XXX, 59 ff.

কথা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব উপাস্য দেবতাই মুখ্য কিন্তু বাকিগুলিও পরিত্যাগ করার নয়, নিজেদের ধর্মকর্মে তাঁদেরও স্থান দিতে হবে। তন্ত্রসারে বলা হয়েছেঃ

ভবানীন্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং পার্বতীনাথং নৈঋত্যাং গণনায়কঃ॥
বায়ব্যাং তপনশ্চৈব পূজাক্রমঃ উদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ মধ্যে ভবানী, ঈশান কোণে অচ্যুত (বিষ্ণু), অগ্নি কোণে পার্বতীনাথ (শিব), নৈঋত কোণে গণপতি এবং বায়ু কোণে তপনকে (সূর্য) পূজা করতে হবে। এখানে কেন্দ্রস্থ দেবতা শক্তি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণপতিও বর্তমান। অনুরূপ ভাবে বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ও তাঁদের সাম্প্রদায়িক প্রধান দেবতা ছাড়া আরও চারজন দেবতাতে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

এই পঞ্চোপাসনা প্রবর্তিত হবার কারণ প্রথমত ব্রাহ্মণ্য আদর্শ বিরোধী মতবাদ-সমূহের সঙ্গে সংঘাত। এই ধর্মগুলির অধিকাংশই গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও পরে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা কবলিত হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বৈষ্ণব, সৌর ও শৈবদের দেবী সরস্বতীর অধীনে থেকে বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকদের সঙ্গে যুদ্ধরত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই সকল ধর্মের উদ্ভব যে আদর্শের ভিত্তিতেই হোক না কেন, বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে এগুলি বেদান্তের ঈশ্বরবাদী নানাপ্রকারের ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সকলেরই বিচার পদ্ধতি একই রকম, একই জাতীয় ধর্মীয় পরিভাষা এই পাঁচটি সম্প্রদায় ব্যবহার করেন। ফলে একটা সমন্বয়মূলক মনোভাব দেখা যায় যার ফলে উপাসনার ক্ষেত্রে হরি-হর, শিব-শক্তি, শিব-সূর্য, বিষ্ণু-সূর্য প্রভৃতি সমন্বয়াত্মক বিগ্রহের নির্মাণ হতে শুরু হয়েছিল।

পঞ্চোপাসনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রেরণা জুগিয়েছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা। উচ্চবর্ণের মানুষেরা মূলত স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যে কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত হোন না কেন। স্মৃতিশাস্ত্রগুলি পঞ্চোপাসনাকে জনপ্রিয় করার জন্য নানাপ্রকার নির্দেশ দিয়েছিল। আধুনিক হিন্দুধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তা কার্যত এই পঞ্চোপাসনা। বলাই বাহুল্য এটা উপরিতলের হিন্দুধর্ম, যার সঙ্গে জনজীবনের বৃহত্তর অংশের সম্পর্ক খুব কমই থাকার কথা, কিন্তু যেহেতু নিচের তলার মানুষেরা উপরতলার মানুষদের সংস্কৃতিকে অনেক সময় অনুকরণ করার চেষ্টা করে থাকেন, সেই হেতু উপরতলার মানুষদের আচরিত ধর্ম তাঁদেরও উপর প্রভাব বিস্তার করে, এক্ষেত্রে যা হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত পঞ্চোপাসনার প্রধান দেবতাদের অনেকখানিই ছিল গোড়ার দিকে নীচুতলার নিজস্ব, পরে তাদের ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর ঘটলেও, নীচুতলার মানুষেরা তাঁদের আদি দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। পঞ্চোপাসনার ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূল এখানেই। কিন্তু নীচুতলার মানুষের সঙ্গে পঞ্চোপাসনার সম্পর্ক থাকলেও, তা উপরিতলেরই সামাজিক স্বার্থ-সিদ্ধ করেছিল, নীচুতলার নয়। বিষয়টি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

১০

গুণগত রূপান্তর

১। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য ও তার বিরোধিতা

হিন্দু পঞ্চোপাসনার প্রধান পাঁচটি দেবতার উদ্ভব যে ঘটেছিল অত্যন্ত প্রাচীন কালে একথা প্রমাণসিদ্ধ। শিব ও শক্তির ধারণা প্রাক্-বৈদিকযুগের, সূর্যের দেবত্বের কল্পনা তো প্রায় মানবজাতির তুল্যই প্রাচীন, গণপতির আধুনিক চেহারাতেও তাঁর আদিমত্ব ঢাকা পড়েনি। এদের তুলনায় বিষ্ণু একটু অর্বাচীন, তাহলেও তিনি আসলে বৈদিক দেবতা, আর বেদও প্রাচীন কম নয়।

এই ধর্মগুলি তাদের উদ্ভবের সময় নিশ্চয়ই কোন সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিল। এই পর্যায়ে তারা সকল শ্রেণীর মানুষকেই টানবার চেষ্টা করেছিল, লৌকিক আচার অনুষ্ঠানসমূহকে তাদের নিজস্ব জীবনচর্যার অঙ্গীভূত করেছিল। তথাপি একটা কথা মনে রাখার দরকার যা হচ্ছে এই ধর্মগুলির আদি-রূপ ও তাদের পল্লবিত রূপের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। আদিম যুগে যা সমগ্র জনজীবনের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, পরবর্তী যুগে তা বিশেষ বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থের বাহন হয়েছিল।

পল্লবিতকরণের প্রথম পর্যায়টি তখন থেকেই শুরু হয় যখন থেকে এই সকল ধর্মের নিজস্ব শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ রচিত হতে শুরু করে। এই শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব যাঁদের হাতে পড়েছিল তাঁরা ছিলেন তৎকালীন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী, উচ্চবর্ণের মানুষ, যাঁরা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। তাঁদের অনেকের মধ্যেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা, মহানুভবতা বা অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের অভাব ছিল না, কিন্তু সচেতন ভাবেই হোক বা সংস্কারবশেই হোক তাঁরা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তাঁদের রচনায় তাঁরা সংশ্লিষ্ট ধর্মমতটি থেকে লৌকিক উপাদানগুলিকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন, যে সকল লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ও ধ্যান ধারণা নিয়েই সংশ্লিষ্ট উপাস্য দেবতাটির সার্থকতা, সেই পরিমণ্ডলটি থেকে দেবতাকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে চরম একেশ্বরের মর্যাদা দিয়েছিলেন, যে মনোভাবের পিছনে রাজতন্ত্র ও রাজার একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করাটাই ছিল বড় কথা, এবং তৃতীয়ত তাঁরা এই সুযোগে এই সকল ধর্মমতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ও বর্ণভেদ আমদানী করেছিলেন।

সর্বত্রই যা ঘটে থাকে, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্ববিরোধ বর্তমান, সে আমলের ব্রাহ্মণেরাও যা থেকে মুক্ত ছিলেন না। যদিও সর্বত্র দেখা যায় শিক্ষিতদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী, একটা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ অংশ কিন্তু তার বিরোধী। এই বিরোধিতার শক্তি সকলের অবশ্য সমান নয়, অনেকেই এক পা এগিয়ে ভয়ে বা প্রলোভনে দু'পা পিছিয়ে আসেন, অনেকে খানিকটা এগোতে চান। তাঁরা হন সংস্কারবাদী। অনেকে আমূল রূপান্তর চান, তাঁরা বিপ্লবী, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যর্থ হন, কেউ কেউ সফল হন। সেকালের ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যেও এরকম ঘটেছিল। যদিও ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণ কতকগুলি বাঁধা সামাজিক আদর্শকে ধর্মমতগুলির উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আরও অনেকে

ছিলেন যাঁরা তা মানেননি। আমরা আগেই দেখেছি বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও গাণপত্যদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় বর্ণভেদ, কর্তৃত্বপরায়ণতা ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রস্তাবিত জীবনচর্যার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

পঞ্চোপাসনার জনপ্রিয়তার কারণ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু বাস্তবে তা সাধারণ মানুষের চাহিদা সর্বাংশে মেটাতে পারেনি, কেননা ভেদ-পন্থী ও পীড়নমূলক যে স্মার্ত জীবনচর্যাকে পঞ্চোপাসকেরা মেনে নিয়েছিলেন, বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে তা একান্তই সামঞ্জস্যহীন।

নূতন ধরনের সংস্কারমূলক বা বৈপ্লবিক ধর্মমতসমূহের উদ্ভব এখানেই খুঁজতে হবে।

২। জাতিপ্রথা ও নবধর্মসমূহ

আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে যে সকল সংস্কারবাদী ও বৈপ্লবিক ধর্মমতসমূহের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলির প্রবক্তাদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের লোক কেউ কেউ থাকলেও সেগুলি মূলত ছিল অব্রাহ্মণ প্রণোদিত। এই ধর্মমতগুলির মূল কথা মানবহৃদয়ই হচ্ছে দেবতার আবাস, তাঁকে আলাদা করে খোঁজার প্রয়োজন নেই, প্রেম ও ভক্তির দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান মিথ্যা, জাতি বর্ণ সবই ভ্রান্ত ধারণা। বিভিন্ন ধর্মমতের ভেদও কাল্পনিক। এই আদর্শগুলি অবশ্য খুব নূতন নয়, বিভিন্ন বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা বিদ্যমান, কিন্তু নবধর্মমতগুলির কৃতিত্ব ছিল বিষয়গুলিকে নূতন ভাবে উপস্থাপিত করার, সেগুলির বাস্তবায়িত করণে এবং অসংখ্য মানুষকে এই পথে টেনে আনায়। গুরুবাদ ও দেহতত্ত্বের ধারণা (যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে), যা এই সকল নবধর্মমতকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছিল, তার অনুপ্রেরণা ছিল তন্ত্র, ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্র নয় লৌকিক-তন্ত্র।

ভারতের সামাজিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতিপ্রথা। এদেশের উৎপাদন ব্যবস্থাটাও ছিল নানা বৃত্তিধারী অসংখ্য জাতি বা জাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বংশানুক্রমে নিজেদের জাতিগত পেশার অনুসরণ করে যেতে বাধ্য ছিল যান্ত্রিকভাবে এবং বলাই বাহুল্য এইরকম একটা অনড় পরিবেশে উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশলের কোন সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা যে চতুর্বর্ণমূলক সামাজিক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন এবং যে আদর্শকে বাস্তবে রূপদান রাজা ও শাসকশ্রেণীর একমাত্র কর্তব্য হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল, তা অনুযায়ী নিম্নবর্ণভুক্তকারীরা শূদ্র হিসাবে পরিচিত যাঁরা উচ্চবর্ণের জন্য উৎপাদন করতেন এবং উচ্চবর্ণ বা দ্বিজগণ তাঁদের শ্রমফলভোগী ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য একটি জীবনযাত্রার মানও বেঁধে দিয়েছিলেন, যথাঃ—

> উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
> পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥১

বলাই বাহুল্য স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা নিম্নবর্ণের

১। মনু ১০, ১২৫।

মান্ষেরা অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারেন নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে উচ্চ ও নীচবর্ণের সংঘাত বরাবরই ছিল, এবং সে সংঘাত কখনও খ্বই তীব্র ছিল, যদিও এই বিষয়টির প্রতি ঐতিহাসিকদের এখনও নজর পড়েনি। আদি-মধ্য ও মধ্য-য্গের নবধর্ম আন্দোলনসম্হ এই সংঘাতেরই ফল। এ সংঘাত শ্ধ্ উচ্চ ও নিম্ন-বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উচ্চবর্ণের চিন্তাশীল মহলেও তার প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল। বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের আচার্যেরা অন্ধাবন করতে পেরেছিলেন যে জনসাধারণের ব্হত্তর অংশকে সঙ্গে নিয়ে চলতে গেলে জাতি-প্রথার কাঠামোটাকে ভাঙা দরকার। ফলে বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে অনেকগ্লি জাতিপ্রথা বিরোধী উপসম্প্রদায়ের স্ষ্টি হয়েছিল। এছাড়া আদিমধ্য ও মধ্যয্গের কয়েকজন সাধ্সন্ত জাতিপ্রথা বিরোধী এবং সর্বপ্রকার বহিরঙ্গ ও আচার অন্ষ্ঠান বিরোধী ধর্মমতের প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তাঁদের প্রবর্তিত উদার ধর্মমতের আশ্রয় নিম্নবর্ণের উৎপীড়িত মান্ষেরা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছিলেন।

অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে নবধর্ম আন্দোলনের প্রবক্তারা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মান্ষ ছিলেন, তাঁরা জাতিপ্রথা বিরোধিতা দিয়ে শ্র্ করলেও, তাঁদের ম্ত্যুর পর তাঁদের উত্তরাধিকারীরা ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ফিরিয়ে আনবার চেণ্টা করেছিলেন, এবং এই উপলক্ষ্যে সংশিলষ্ট সম্প্রদায়টি কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে কালক্রমে এই সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়-গ্লির আবার একটি জাতিতে পরিণতি ঘটেছিল, প্রচলিত জাতিপ্রথার কাঠামোর মধ্যেই। কিন্তু নেতৃত্ব যেখানে বরাবর নিম্নবর্ণের অধিকারে ছিল, যেমন নাথ ধর্মের ক্ষেত্রে, সেখানে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল বজায় ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন শিখধর্মে, হিন্দ্ধর্ম থেকে সরে যাবার ঘটনাও ঘটেছে। তা হলেও, এটা মোটেই উড়িয়ে দেবার নয়, যে এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের স্ষ্টি হয়েছিল যেখানে জাতিপ্রথা বিরোধিতা দিয়ে শ্র্ করেও অবশেষে জাতিপ্রথার নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়েছিল। এর কারণটা ব্যাখ্যা করা খ্ব সহজ নয়। তবে মোটাম্টি ভাবে বলা যেতে পারে, ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার অপরিবর্তনীয়তা এর জন্য কিয়দংশে দায়ী। ধর্মীয় আদর্শের ক্ষেত্রে যে র্পান্তর আদি-মধ্য ও মধ্যয্গে ঘটেছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন গ্ণগত পরিবর্তন আসেনি, যার ফলে সেই রকম কোন সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি যেখানে ন্তন ধর্মীয় আদর্শগ্লি কার্যকর হবার ক্ষেত্র পেতে পারে।

৩। সিদ্ধাচার্যগণঃ তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ-প্রভাব

বৌদ্ধধর্মের আওতায় একটি বিশেষ ধরনের তান্ত্রিক জীবনচর্যার প্নর্জ্জীবন হয় যার ম্ল আদর্শ সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতালাভ। এই আদর্শের ধারকেরা ছিলেন জাতিপ্রথা বিরোধী, অনেকেই ছিলেন নিম্নবর্ণের মান্ষ, এবং এই আদর্শ কবীর-পন্থা, নাথ-পন্থা প্রভৃতি পরবর্তী লৌকিক ধর্মগ্লিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে ঋদ্ধি বা অভিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও অষ্টসিদ্ধির উল্লেখ আছে যথা অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও কামা-বসায়িত্ব। শাক্ত তান্ত্রিক ললিতাসহস্রনামে তিন রকম সাধনার উল্লেখ আছে—দিব্য, মানব এবং সিদ্ধ। বিভিন্ন তান্ত্রিক গ্রন্থে সিদ্ধকুল, সিদ্ধাম্ত ইত্যাদি সম্প্রদায় এবং

সিদ্ধদের উল্লেখ আছে।১ এই ঐতিহ্য অনুযায়ী সিদ্ধদের সংখ্যা চুরাশীজন যাঁরা যোগের দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত বর্ণ-রত্নাকরে চুরাশীজন সিদ্ধের উল্লেখ আছে। তিব্বতী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে এঁদের জীবনী দেওয়া আছে। এঁদের নাম নিম্নে দেওয়া হল—

লুহি, লীলা, বিরু, ডোম্বী, শবরী, সরহ, কঙ্কালী, মীন, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী, বীণা, শান্তি, তান্তি, চর্মরী, খড়্গ, নাগার্জুন, কাণ্হ, কাণরী, থগন, নাড়, শালি, তিলো, ছত্র, ভদ্র, দ্বিখণ্ডী, অযোগী, কড়, ধোবি, কংকন, কম্বল, তৌঙ্ক, ভাদে, তান্ধি, কুক্কুরী, চুজ্বী, ধর্ম, মহী, অচিন্ত্য, বভহি, নলিন, ভুসুকু, ইন্দ্রভূতি, মেঘ, কুঠারী, কর্মার, জালন্ধী, রাহুল, গর্ভরী, ধকরী, মেদিনী, পঙ্কজ, ঘণ্টা, যোগী, চেলুক, বাগুরী, লুঞ্চক, নির্গুণ, জয়ানন্দ, চর্পটি, চম্পক, বিষাণ, ভলি বা তেলি, কুমরী, চার্পটি, মণিভদ্রা, মেখলা, মংখালা, কলকল, কন্থডি, দৌধি, উধলি, কপাল, কিল, পুষ্কর, সর্বভক্ষ্য, নাগবোধি, দারিক, পুত্তলি, পনহ, কোকিলা, অনঙ্গ, লক্ষ্মীঙ্করা, সামুদ্র ও ভলি।

লক্ষ্যণীয় যে এঁদের অনেকেই নীচ জাতীয়, নাম থেকেই বোঝা যায় কেউ ডোম, কেউ শবর, কেউ ধোপা, কেউ তেলী, কেউ তাঁতী। এদের উপাধি পা অর্থাৎ বাবা, অর্থাৎ ডোম বাবা, কুড়ুল বাবা, তাঁতী বাবা। এই তালিকায় কোন কোন বৌদ্ধ আচার্য আছেন। যেমন নাগার্জুন, কাণরী বা আর্যদেব প্রভৃতি। নাথধর্মের প্রবক্তারা যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরী, প্রভৃতিও এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। চর্যাগীতিকোশ বা চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত সিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ কাণরী, ভাদে, ভুসুকু, দারিক, ধর্ম, ডোম্বী, গুণ্ডরী, জয়ানন্দ, জালন্ধর, কম্বল, কুক্কুরী, কঙ্কন, লুহি, মহী, শান্তি, শবর, তান্তি, তেণ্টনা, বীণা, কাণ্হ ও সরহ।২ এই সকল সিদ্ধদের খবর ও তাঁদের কারো কারো রচনার অনুবাদ তিব্বতী তাঞ্জুরগ্রন্থমালায় বর্তমান। যাঁদের বিষয় সেখানে উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হলেন ইন্দ্রভূতি, কেরলী, অজ মহাসুখ, সরহ, মহাশবর, নারো, আর্যদেব, কৃষ্ণ (কাণ্হ) বিরু কর্ম, কিলো, শান্তিদেব, লুহি, থগন, ভাদে (ভাণ্ডদে), ধর্ম, মহী, শবরী, কম্বল, চাতে, কঙ্কালী, মীন, অচিন্দ, গোরক্ষ, চোরংঘি, (চৌরঙ্গী), বীণা, তান্তি, শিয়ালী, আজাকি, পঙ্কজ, ডোম্বী, কুক্কুরী, কর্মরী, চার্পটি, জালন্ধরী, কন্থরি, লুঞ্চক, গর্ভীর প্রভৃতি।৩ এই সকল সিদ্ধদের অধিকাংশই দশম ও একাদশ শতকের মানুষ।

সিদ্ধরা মূলত গুরুবাদী। গুরুই শিষ্যকে সাধনায় দীক্ষিত করেন তার গ্রহণ-শক্তি অনুযায়ী। এই হিসাবে সাধনার পাঁচটি কুল বর্তমান—ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী, এবং ব্রাহ্মণী—যেগুলি যথাক্রমে শক্তির পাঁচটি আকারের প্রতীক। সিদ্ধি-লাভের সাধনা মূলত কায় সাধনা। এই মত অনুযায়ী দেহে বত্রিশটি নাড়ী বর্তমান যেগুলির মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবাহিত হয়, যার মূলকেন্দ্র নাভির নিম্নদেশ। শক্তির সর্বোচ্চ আধার মহাসুখস্থান নামে কল্পিত। ওই বত্রিশটি নাড়ীর নানারকম নাম আছে—ললনা, রমণা, অবধূতী, প্রবণা, কৃষ্ণরূপিণী, সামান্যা, পাবকী, সুমনা,

---

১। P. C. Bagchi, *Kaulajnananirnaya,* Calcutta Sanskrit Series III, 33-34.

২। *Journal of the Department of Letters* (Cal. Univ.) XXX.

৩। Alaka Chattopadhyaya, *Catalogue of the Tanjur and Kanjur* (1972).

কামিনী প্রভৃতি। এগ্লির মধ্যে তিনটি—ললনা, রমণা ও অবধ্তী সবচেয়ে গ্র্ত্বপ্র্ণ, তন্ত্রে যেগ্লিকে বলা হয়েছে ইড়া, পিঙ্গলা, স্ষ্ম্না। সর্বোচ্চ স্থানটি যা মহাস্খস্থান নামে পরিচিত একটি সহস্রদল পদ্মর্পে কল্পিত। কয়েকটি বিরতিস্থান অতিক্রম করে শক্তি সেখানে পেঁছায়। এই বিরতিস্থানগ্লি তান্ত্রিক পীঠস্থানসম্হের নামে পরিচিত যেমন উড্ডীয়ান, জালন্ধর, প্র্ণগিরি, কামর্প। সাধকের লক্ষ্য সহজের উপলব্ধি। সহজ সব কিছ্র উৎস, যা চিরন্তন স্খ ও অনির্বচনীয় আনন্দের আকর, যেখানে সকল অন্ভূতিকে মিশিয়ে দিলেই চরম অদ্বয়বোধের উপলব্ধি ঘটে। সাধক তখন নিজেকে অন্য কিছ্র থেকে প্থক্ করে দেখেন না।

ম্ত্যুর পর আত্মার ম্ক্তি নয়, ম্ক্তি ইহজীবনেই, তাই সিদ্ধিপন্থার সাধকরা জীবন্ম্ক্তি শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। কায়সাধনের দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায়। জীবনদায়িকা শ্ক্র বা বীর্য বোধিচিত্তর্পে কল্পিত, যাকে পরাব্ত্তি বা স্বাভাবিক প্রব্ত্তির বিপরীত প্রব্ত্তি অন্সরণে ঊর্ধ্বম্খী করতে পারলে অমরত্বের পথ স্গম হয়। বোধিচিত্ত চর্চা রসায়নের সঙ্গেও সম্পর্কিত এবং সেই কারণেই রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। দেহের মধ্যে যে অস্থির রসস্রোত বইছে তাকে কঠিন করা, অর্থাৎ বজ্রে পরিণত করার দরকার, তবেই সকল ব্ত্তির স্থিরতা আসবে। এই উদ্দেশ্যে পারদঘটিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা সাধারণ মরণশীল দেহকে দিব্য দেহে পরিণত করার দরকার। তত্ত্বের দিক থেকে বলা হয় মানবদেহ অশ্দ্ধ মায়া বা অশ্দ্ধ বস্তু দিয়ে গঠিত, কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগ্লিকে শ্দ্ধ মায়া বা শ্দ্ধ বস্তুতে পরিণত করতে হবে। দেহের তিন রকম র্পান্তর হতে পারে মন্ত্র-তন্, প্রবণ বা বৈন্দব তন্ এবং দিব্য তন্। পাকাপাকি-ভাবে জীবন্ম্ক্তি ঘটলে সেই অবস্থাকে পরম্ক্তি বলা হয়।

সিদ্ধগণসহ কায়সাধনকারী সকল সম্প্রদায় এই তান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী যে দেহই হচ্ছে বস্তুজগতের সংক্ষিপ্ত র্প। পর্বত, সম্দ্র, চন্দ্র, স্র্য, নদী, বস্তু-জগতের সবকিছ্ই দেহের মধ্যে অবস্থিত। হঠযোগের দ্বারা দেহ ও মনের উপর সম্প্র্ণ প্রভুত্ব অর্জন করা যায়। শিব ও শক্তি দেহে বাস করেন, শিব থাকেন সহস্রারে, শক্তি থাকেন ম্লাধারে। দেহের দক্ষিণার্ধ শিব, বামার্ধ শক্তি। ডান দিকের নাড়ী পিঙ্গলা দিয়ে শিবের আদর্শস্বর্প অপান বায়্ প্রবাহিত হয়, বাম-দিকের নাড়ী ইড়া দিয়ে শক্তির আদর্শর্প প্রাণবায়্ প্রবাহিত হয়। সাধক যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে এই দ্ই প্রবাহকে মধ্য অঞ্চলে বা স্ষ্ম্না কাণ্ডে নিয়ে আসবেন এবং তাহলে দ্ই ধারার সম্প্র্ণ সামঞ্জস্য ও সাম্যাবস্থা ঘটবে। প্র্ষ শিবের প্রতীক, নারী শক্তির, তাদের যৌগিক মিলন চরম অদ্বয়বোধজনিত মহাস্খের কারণ হবে।

৪। নাথ ধর্ম

নাথ পন্থার উদ্ভব নিম্নশ্রেণীর মান্ষদের মধ্যেই ঘটেছিল, এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই ধর্মের ম্লে প্রবলভাবে জৈন ও আজীবিক প্রভাব বর্তমান। গোটা উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চল, এমন কি দক্ষিণ ভারতেও নাথপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। দক্ষিণ ভারতের মাহেশ্বর সিদ্ধ নামক যে সম্প্রদায়টি বর্তমান, তা ম্ল নাথপন্থী। এই সিদ্ধগণের সংখ্যা আঠারোজন। এদের প্রধান

ছিলেন মূল বা মূলের বা শ্রীমূলনাথ। তিনি এবং ছয়জন (কালঙ্গ, অঘোর, মালিকদেব, নাদান্ত, পরমানন্দ ও ভোগ) দক্ষিণী নাথ সিদ্ধদের সাতটি শুদ্ধমার্গের প্রতিষ্ঠাতা। এদের মধ্যে ভোগ ছিলেন চৈনিক এবং তাও-পন্থী, যাঁর সাধন কেন্দ্র ছিল তিনেভেলি জেলার সিদ্ধ পর্বত। তত্ত্বের দিক থেকে এঁরা শৈব ও শাক্ত আগম-সমূহ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এঁদের লক্ষ্য ছিল সিদ্ধান্ত হওয়া বা সিদ্ধিলাভ করা, যার পদ্ধতিকে তাঁরা রহস্য বা নিগূঢ় বলে আখ্যাত করেছেন।১

নাথ ধর্মের উদ্ভবকেন্দ্র হয়ত হিমালয়ের নিম্নাঞ্চল, যার প্রবক্তাদের মধ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নাম বিশেষ পরিচিত। তাঁদের লক্ষ্য অষ্টসিদ্ধি অর্জনের দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতালাভ, কায়সাধন ও রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে অমরত্ব অর্জন ইত্যাদি, যেগুলি সম্পর্কে পরে আলোচনা করার সুযোগ হবে। অন্তর্বেদী অঞ্চলের অর্থাৎ মহারাষ্ট্র অঞ্চলের রসেশ্বর সিদ্ধদের মধ্যে এই নাথ পন্থা প্রচলিত যারা বিশ্বাস করেন প্রাণায়াম বা বায়ুসমূহের যৌগিক নিয়ন্ত্রণ, কায়সাধন এবং অভ্র ও পারদনিষ্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের দ্বারা অমরত্ব অর্জন করা সম্ভব। বীরমাহেশ্বর নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্য-ভাগে নাথগুরু গোরক্ষনাথ তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে শুদ্ধমার্গের জনৈক বিখ্যাত মাহেশ্বর সিদ্ধের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই মাহেশ্বর সিদ্ধ জীবন্মুক্ত ছিলেন যাঁর কাছে গোরক্ষনাথ দীক্ষিত হন। দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী নয়জন নাথ সিদ্ধ (নবনাথসিদ্ধ) নয়টি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন যাদের সদস্য সংখ্যা নয় কোটি (নব-কোটিসিদ্ধ)। এঁদের উদ্ভবের উৎস রসেশ্বর সিদ্ধ সম্প্রদায়, যাঁরা রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতেন। এই রসায়ন তন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন চৈনিক তাও-পন্থী ভোগ। তাও-তে-কিং গ্রন্থে কায়সাধন, বায়ুসাধন ও রসায়নের প্রয়োগে পরম তাও-র প্রভাবাধীন দিব্য দেহ অর্জনের কথা বলা হয়েছে।২

উত্তর ভারতের বহুস্থলে নাথ পন্থীরা কান্-ফট যোগী হিসাবে পরিচিত, কেননা তাঁরা কান ফুটো করে একজাতীয় অলংকার ধারণ করেন তাঁদের নিজস্ব ভাষায় যাকে বলা হয় মুদ্রা বা দর্শন, বা কুন্ডল। তাঁরা রুদ্রাক্ষ ত্রিপুণ্ড্র ও ত্রিশূল ধারণ করেন, শিবরাত্রি উৎসব পালন করেন। শাক্ত তীর্থসমূহ তাঁরা ব্যবহার করেন, এবং দেবী সংক্রান্ত তান্ত্রিক বহু ধারণা তাঁদের ধর্মে বর্তমান। আবার তাঁদের দেবতাদের মধ্যে নিরঞ্জন, শূন্য, অনাদি ও আদিনাথ বর্তমান আছেন। এ থেকে বোঝা যায় নাথধর্মের উপর শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ এবং জৈন সবরকমই প্রভাব বর্তমান। বৈষ্ণব ও ইসলামধর্মেরও কিছু প্রভাব তাঁদের জীবনচর্যার মধ্যে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে বিভিন্ন নাথ সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের ধর্মস্থান এবং মঠাদি আছে, তাঁদের সাম্প্রদায়িক মোহান্তরা যেগুলি পরিচালনা করেন। বঙ্গদেশ ও আসামে নাথগণ যোগী বা যুগী নামে পরিচিত, তাঁদের প্রধান জীবিকা, কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিল, তাঁত বোনা। অনেক বাউল বৈষ্ণবও এই সম্প্রদায়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

নাথদের সৃষ্টিতত্ত্বটি নিম্নরূপঃ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত কিছুই অন্ধকার ও শূন্য

১। এঁদের সম্পর্কে খবরাখবর পাওয়া যাবে কামিকাগমের অন্তর্গত কালদহন-তন্ত্রে, বিজয়াগমের অন্তর্গত মৃত্যুনাশক তন্ত্রে, কুমারদেব বিরচিত শুদ্ধসাধকে এবং রাবণারাধ্য বিরচিত শিবজ্ঞানদীপে।

২। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে তাও ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় সাধনপদ্ধতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ছিল। সেই শূন্যের মধ্যে একটি বুদ্বুদের উদয় হল, যা থেকে তৈরী হল একটি ডিম, যার সাদা অংশটি আকাশ এবং কুসুমটি পৃথিবী। প্রধান দেবতা আদিনাথের ঘর্ম থেকে জন্মালেন তাঁর প্রণয়িণী কেতকী বা মনসা, যাঁদের সঙ্গমে উদ্ভূত হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব। এঁদের পরীক্ষা করার জন্য আদিনাথ পূতিগন্ধ মৃতদেহরূপে পথে পড়ে রইলেন যা দেখে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু তাঁকে এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর পিতার মৃতদেহকে শিব সঠিকভাবেই চিনলেন এবং তাঁর দেহের সৎকার করলেন। সৎকার-কালীন আদিনাথের নাভি থেকে জন্মালেন মীননাথ, গোরক্ষ জন্মালেন মাথার খুলি থেকে, হাড়িপা জন্মালেন অস্থি থেকে, কানু-পা জন্মালেন কান থেকে এবং চৌরঙ্গী-নাথ জন্মালেন পদদ্বয় থেকে। এঁরা হচ্ছেন পঞ্চ আদি সিদ্ধ।

শিব যেহেতু আদিনাথের যোগ্যতম পুত্র, আদিনাথ তাঁর সঙ্গেই কেতকীর বিবাহ দিয়েছিলেন যিনি গৌরী বা চণ্ডী নামে পরিচিতা। শিব মহাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যা মানুষকে অজরামর করে। গৌরী এই মহাজ্ঞান প্রার্থনা করতে শিব তাঁকে তা দেবার মনস্থ করলেন, এবং পাছে কেউ তা শুনে ফেলে সেই জন্য গৌরীকে একটি মহাসমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গেলেন। মীননাথ ব্যাপারটাকে আঁচ করতে পেরে মাছ হয়ে সমুদ্রের জলে লুকিয়ে শিবের মুখ থেকে তা জেনে নিলেন। এটা জানতে পেরে শিব তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে মীননাথ একদিন এই জ্ঞান বিস্মৃত হবেন। ইতিমধ্যে গৌরী পঞ্চসিদ্ধকে সংসারী করার চেষ্টা করলেন, এবং নারীর প্রতি তাঁদের যাতে আসক্তি আসে তার জন্য নিজস্ব ছলাকলা প্রয়োগ করলেন। তাঁদের মধ্যে চারজনই দেবীকে দেখে কামাবিষ্ট হলেন যার ফলে মীননাথ কদলী-দেশের মহিলাদের উপর রাজত্ব করতে, হাড়ি-পা রাণী ময়নামতীর আস্তাবলের ঝাড়ুদার হতে, কানু-পা ডাহুকা প্রদেশে নির্বাসিত হতে এবং শিশু পা বা চৌরঙ্গী তাঁর বিমাতার সঙ্গে সহবাস করতে বাধ্য হলেন। একমাত্র গোরক্ষনাথই অটল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে জনৈকা রাজকুমারীর বিবাহ হয় যার গর্ভে দেহমিলন ব্যতিরেকে নিছক গোরক্ষনাথের মন্ত্র শক্তির জোরে কর্পটিনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

গোরক্ষবিজয় নামক গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী, যা মীনচৈতন্য নামে পরিচিত, গোরক্ষ তাঁর আত্মবিস্মৃত গুরু মীননাথকে কদলীদেশের রমণীদের মোহ থেকে উদ্ধার করেন। মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামক তান্ত্রিক গ্রন্থে তাঁকে যোগিনী কৌলের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তিনিই সহজিয়া বৌদ্ধ সাধক লুইপাদের সঙ্গে অভিন্ন।[১] বৌদ্ধ সিদ্ধসমূহের তিব্বতী তালিকায় মৎস্যেন্দ্রনাথ উল্লিখিত। নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের সমীকরণ করা হয়েছে। নেপালে তাঁর উদ্দেশ্যে আজও রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী মুসলমান-দের নিকট তিনি মছন্দলী বা মোচরা পীর নামে পরিচিত। মুনিদত্ত বিরচিত চর্যাগীতিকোশে মৎস্যেন্দ্রনাথের উপর আরোপিত কয়েক ছত্র রচনা পাওয়া যায়।

বজ্রযানী গ্রন্থসমূহে মৎস্যেন্দ্র এবং গোরক্ষ সিদ্ধ হিসাবে উল্লিখিত। গোরক্ষ-নাথের পূজা নেপাল ও উত্তর ভারতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী গোরক্ষ জাতিতে মৎস্যজীবী, কেওটিয়া বা কৈবর্ত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় ঐতিহ্যে তিনি গোয়ালা ছিলেন। গোরক্ষনাথের কোন নিজস্ব রচনার উল্লেখ তিব্বতী

১। P. C. Bagchi, *Kaulajnananirnaya and Minor Texts of the School of Matsyendra Natha,* intro. 33.

তালিকায় নেই। গোরক্ষ-সংহিতা নামে অনেক পরবর্তীকালে রচিত একটি গ্রন্থ অবশ্য আছে। উত্তর ভারতের গোরক্ষ পন্থা একটি গুহ্য সাধন পদ্ধতি যার সঙ্গে তন্ত্র ও যোগের সম্পর্ক আছে।১

হাড়িপা সম্পর্কিত লৌকিক কাহিনী নিম্নরূপ। তিনি রাণী ময়নামতীর আস্তাবলের ঝাড়ুদার হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই রাণী ছিলেন একজন সিদ্ধ ডাকিনী যিনি সহজেই হাড়িপার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পান। তাঁর স্বামী মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র রাণী ময়নামতীর তত্ত্বাবধানে রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর অকালমৃত্যুর আশংকা করে ময়নামতী তাঁকে হাড়িপার নিকট দীক্ষা নিতে আদেশ দেন। কিন্তু তিনি নীচজাতীয় এবং নীচকর্ম করেন বলে রাজা দীক্ষা নেন অনিচ্ছুক চিত্তে। পরে হাড়িপার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে রাজা যোগব্রত অবলম্বন করে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। উত্তর ভারতীয় কাহিনী-সমূহে এর সঙ্গে আরও দুটি চরিত্র যুক্ত হয়েছে। একজন ময়নামতীর ভাই ভরত-হরি, অপরজন গোপীচন্দ্রের বোন চম্পাদেবী। হাড়িপার অপর নাম জালন্ধরী। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের তিব্বতী গ্রন্থ তালিকায় জালন্ধরী বা হাড়িপার নামে আরোপিত কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, যেমন বজ্রযোগিনীসাধনা, শুদ্ধিবজ্রপ্রদীপ, শ্রীচক্র-সংবরগর্ভতত্ত্ববিধি এবং হুংকারচিত্তবিন্দুভাবনাক্রম।

কৃষ্ণপাদ বা কানু-পার নামে অনেকগুলি অপভ্রংশ দোঁহা বর্তমান। তিনি সম্ভবত নাথ পন্থা দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করেছিলেন, পরে পুরোদস্তুর তান্ত্রিকপন্থা নিয়েছিলেন। চৌরঙ্গীনাথের উপর আরোপিত বায়ুতত্ত্বোপদেশ গ্রন্থের উল্লেখ তিব্বতী তালিকায় বর্তমান। বঙ্গদেশের বাইরে নাথ সিদ্ধ কাণরী বা কনেরী বিশেষ পরিচিত, যাঁর রচনাবলীর তিব্বতী অনুবাদের কথা তাঞ্জুর তালিকায় বিদ্যমান।

এখানে অতি সংক্ষেপে নাথ ধর্ম সংশ্লিষ্ট কিছু লৌকিক কাহিনী এবং কয়েকটি বিভিন্ন ধারার ইঙ্গিত দেওয়া গেল। বাংলা ভাষায় নাথধর্মের উপর প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন ডঃ কল্যাণী মল্লিক, উৎসাহী পাঠক যা থেকে প্রচুর তথ্য পাবেন।২ নাথ ধর্ম একটা এমন যৌগিক বিষয় এবং এখানে এত বিভিন্ন ও বহুমুখী ঐতিহ্যের সমন্বয় হয়েছে, যা অনুসরণে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় বহু লুপ্ত ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এবং অনেক জটিল ও অব্যাখ্যাত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

নাথ সাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে যা বলা যায় তা হচ্ছে এই যে এই ধর্মের উদ্ভব বহু সংস্কৃতির সমবায়ে ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব এই ধর্মে অল্প, এবং নাথ সম্প্রদায় এই স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল বজায় রেখেছিল। সম্প্রতি অবশ্য এই সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিকাশ ঘটেছে, কেউ কেউ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত হতে চাইছেন। তাঁদের আচার অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে যজুর্বেদোক্ত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাথ ধর্ম একান্তই লৌকিক ধর্ম যার প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে যে হিন্দুসমাজের নানা বর্ণের মানুষদের সামনে তা একটি নূতন জীবনাদর্শ

১। G. W. Briggs, *Gorakhnath and the Kanphata Yogis* (1938).

২। কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী (১৯৫০)। এছাড়া দ্রষ্টব্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর হিন্দী গ্রন্থ, নাথ সম্প্রদায় (১৯৬৬)।

উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছিল, জাতিপ্রথাকে অস্বীকার করার প্রয়াস পেয়েছিল। মূলত খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যেই এই ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। ধর্মের তত্ত্বসমূহ গড়ে উঠেছিল মূলত শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত ও বৌদ্ধ তন্ত্রসমূহের লৌকিক ও উদার-পন্থী বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে। এই সকল ধর্মের মানবিক ও মানবকল্যাণমুখী দিকগুলির উপরেই নাথপন্থীরা জোর দিয়েছিলেন।

নাথপন্থা অনুযায়ী চরম সত্তার দুটি দিক, যাদের প্রতীক সূর্য এবং চন্দ্র। সূর্য হচ্ছেন কালাগ্নি যিনি বিনাশের আদর্শ, যিনি মৃত্যু ও ধ্বংসের পদ্ধতির ধারক। পক্ষান্তরে চন্দ্র হচ্ছেন অপরিবর্তনীয়তার আদর্শ। নাথপন্থার চরম আদর্শ হচ্ছে নিজের মধ্যে অদ্বয়ের উপলব্ধি যা সম্ভব অমরত্ব অর্জন ও দিব্য দেহের দ্বারা। এই অদ্বয় অবস্থার প্রতীক সাধারণত শিব, যা চন্দ্র ও সূর্যের সংযোগের দ্বারা সম্ভব। দিব্য এবং অপরিবর্তনীয় দেহ অর্জন হঠযোগের এবং রসায়নের দ্বারা সম্ভব। সেখানে চন্দ্র সূর্যের মিলন ঘটবে। এই মিলনটা যে প্রতীকী বলাই বাহুল্য।

কায়সাধনের দ্বারা দিব্যদেহ লাভ করা যায়। চন্দ্র হচ্ছেন সোম বা অমৃতের উৎস যিনি মানবদেহে অবস্থিত সহস্রার অঞ্চলের (মস্তিষ্ক প্রদেশ) নীচে থাকেন। যে নির্যাস পরিদৃশ্যমান মানবদেহকে টিকিয়ে রাখে তা উৎপন্ন হয় ওই সোম বা অমৃত থেকে। একে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলেই অমরত্ব অর্জন করা যায়। কিন্তু এখানে একটি বিরাট অসুবিধা আছে। দেহের মধ্যে অবস্থিত চন্দ্র বা সোম থেকে ক্ষরিত অমৃতবিন্দু সূর্য শুষে নেন, যে সূর্য বাস করেন মানবদেহের নাভি-মূলে। কাজেই এই অমৃতকে সূর্যের হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। সেটা একটি উপায়ে করা সম্ভব। দেহের মধ্যে একটি আঁকাবাঁকা সর্পাকার নালী আছে (বঙ্ক-নাল), যার দুটি মুখ এবং যা শংখিনী নামেও পরিচিত। এই নালীর মুখটি, যা দিয়ে সোম ক্ষরিত হয়, দশম দ্বার নামে পরিচিত। এই মুখটি বন্ধ করতে পারলেই কাল বা মৃত্যুরূপী সূর্যের গ্রাস থেকে সোম বা অমৃতকে রক্ষা করা সম্ভব। এর জন্য কায়সাধন দরকার। কোন কোন গ্রন্থে তান্ত্রিক কুলকুণ্ডলিনীকে জাগানোর পদ্ধতির দ্বারাই অমৃতক্ষরণ রোধ করা যাবে এমন কথাও বলা হয়েছে।১

৫। শিখ ধর্ম

শিখ ধর্ম নাথ পন্থার মতই ব্রাহ্মণ্যবিরোধী। কিন্তু নাথ সম্প্রদায় প্রতিবাদী হওয়া সত্ত্বেও যেমন বৃহত্তর হিন্দু সমাজের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি, শিখধর্মের ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হয়েছিল। নাথধর্মের মূল অনুপ্রেরণা যেখানে সুপ্রাচীন লৌকিক বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান, শিখধর্মের প্রেরণার সূত্র অন্যত্র। তার মূলে আছে রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি মধ্যযুগীয় উদারপন্থী সাধুসন্তের সাম্য-মূলক ও সরল ধর্মীয় আদর্শ যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ ও আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা পরিত্যক্ত হয়েছে।

তবে আদিম-মধ্য ও মধ্যযুগের সকল ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যেই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা হচ্ছে সহজ সাধনা। শিখধর্ম এর ব্যতিক্রম নয়। 'সহজ' কথাটির অর্থ সহ-জাত (সহজায়তে ইতি সহজ) যা মানুষের সত্তার সঙ্গেই অভিন্ন। উপাস্য দেবতা, তাঁর যে কোন নাম, পরিচয় বা গুণ থাক না কেন, মানুষের হৃদয়ে

১। S. B. Dasgupta, *Obscure Religious Cults* (1969), 211-55.

অবস্থিত, তার নিজস্ব সত্তার সঙ্গে অভিন্ন, এবং এই সহজেরই উপলব্ধি ধর্মচর্যার মূল কথা। এই উপলব্ধির পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সহজযানী বৌদ্ধরা এই সহজের উপলব্ধিকেই মহাসুখ বলেছেন যা শূন্যতা ও করুণা অথবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের দ্বারাই সম্ভবপর। নাথ পন্থীরা সহজ মহাসুখ বলতে বোঝেন কায়সাধনের দ্বারা দেহস্থ চন্দ্র সূর্যের সামরস্য ঘটিয়ে অমৃতের ক্ষরণ রোধ করে অমরত্ব লাভ। ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ নিজ দেহভাণ্ডের মধ্যেই বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ আদর্শের মিলনের প্রতীকী উপলব্ধি তন্ত্রেরও অন্যতম বক্তব্য যা আদি-মধ্য ও মধ্যযুগের প্রায় সকল ধর্মব্যবস্থাকেই কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করেছে। শিখ ধর্মেও এই সহজের ধারণা বর্তমান। আদিগ্রন্থে শিখচর্যার যে পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে—ধরম্ খণ্ড, গিয়ান্ খণ্ড, সরম্ খণ্ড, করম্ খণ্ড, ও সচ্ খণ্ড—তার মধ্যে শেষটি হচ্ছে সচ্ বা সহজ।১

এই সচ্ বা সহজ খণ্ডের সাধনাই হচ্ছে উপাস্য দেবতার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার চরম অদ্বয়বোধের উপলব্ধি যার স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আদিগ্রন্থে বলা হয়েছে যে এই অবস্থা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাতীত চতুর্থ অবস্থা (চৌঠা পদ) যা পরম পদ বা তুরীয় পদ বা সহজ পদ। এই অবস্থাকে অমর পদও বলা হয়, যা চরম শান্তি ও পরিতৃপ্তিকর, অপরিবর্তনীয় কেননা জন্মমৃত্যুচক্রের অতীত, দশমদুয়ারের অতীত (নাথ কল্পনার দশম দ্বার স্মর্তব্য) অনির্বাণ গৌরব ও আলোকের উৎস, যা ব্যক্তিসত্ত্বার জ্যোতিকে ঈশ্বরের জ্যোতির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, যেমন এক ফোঁটা জল সমুদ্রের জলে বিলীন হয়ে যায়, যেখানে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায় এবং সকল দ্বৈত বোধের অবসান ঘটে।২ এই অবস্থাকেই নানক বলেন জীবন্মুক্তি বা সুনি (শূন্য)-সমাধি, সহজ-সমাধি, সহজ-যোগ, আর অভিজ্ঞতাটিকে বলা হয় মহাসুখ পরম-সুখ, পরম আনন্দ। বাস্তবিকই সহজ নিছকই চরম সত্তা নয়, তা একাধারে ঈশ্বর বা প্রভু এবং সকলের শেষ প্রেমময় আশ্রয় যাতে ব্যক্তিসত্তা পুরোদস্তুর বিলীন হয়ে যায়ঃ জাকই অন্তর বসই প্রভু আপি নানক লে জন্ সহজী সমাতি।

গুরু নানক বিরচিত আসা-দি-বার-এর প্রথম কয়েকটি পৌরি বা স্তবকে ঈশ্বর সম্পর্কিত শিখ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। শিখ ধর্ম একেশ্বরবাদী। এই পারমার্থিক সত্তার একত্ব তাঁরা 'এক' সংখ্যাটির দ্বারা ব্যক্ত করেন, বলেন ইক্-ওংকার। শিখ ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে, সদ্বস্তু এক। তাঁকে একমাত্র সত্য নামেই অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি কর্তা, সর্বব্যাপী, নির্ভীক এবং অসূয়াবিহীন। তাঁর সত্তা কাল দ্বারা সীমিত নয়। তিনি অজ এবং স্বয়ম্ভূ। গুরুর কৃপায় তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁকে ঈশ্বর, আল্লা বা রাম যে নামই দেওয়া হোক না কেন তিনি একই নিত্যসত্তা। তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা এবং তাঁর সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শিখ ধর্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিপ্রথার স্থান নেই। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ-সাহিব শুধুমাত্র শিখ গুরুদেরই রচনার সঙ্কলন নয়, তাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদেরও রচনা আছে। কবীর, রবিদাস প্রমুখ মধ্যযুগের উদারপন্থী জাতি-

১। N. R. Ray; *The Sikh Gurus and the Sikh Society* (1970), 117 ff.

২। আদি গ্রন্থ (সাবদারথ্ শ্রীগুরু গ্রন্থ্ সাহিব্ জী) ৭-৮, ২২, ১৫৪, ২২৭, ৬৬১, ৬৮৮, ৭২৫, ৯৪০, ১১১০, ১১১২।

প্রথাবিরোধী ধর্মগুরুরাও শিখধর্মে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান গ্রহণ করেন। শিখ জীবনচর্যায় নারীরাও পুরুষের সমমর্যাদা সম্পন্ন। নানক বলেন "কি করে তাদের তোমরা নীচু বলবে যখন তারা রাজা ও ধর্মগুরুদের জন্ম দেয়? নারী এবং পুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের করুণার সমান অংশীদার এবং তাদের কার্যের জন্য সমভাবেই তারা ঈশ্বরের কাছে দায়ী"।১ গুরু হরগোবিন্দ নারীকে পুরুষের বিবেক বলে উল্লেখ করেছেন। শিখগুরুরা সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন।২

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খৃীঃ) পঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন আগাগোড়াই ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি বিস্তৃত-ভাবে ভ্রমণ করেছিলেন—পূর্বদিকে আসাম, বঙ্গদেশ ও সিকিম পর্যন্ত, দক্ষিণে সিংহল, উত্তরে কাশ্মীর ও হিমালয় অঞ্চল এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান, ঈরান, ইরাক ও আরব। নানকের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। বিশেষ করে নিম্নজাতির মানুষেরাই তাঁর শিষ্য ছিলেন। জাতিভেদ দূরীকরণের জন্য তিনি দুটি আদর্শ স্থাপন করেন—সঙ্গৎ এবং পঙ্গৎ বা লঙ্গর। প্রথমটির দ্বারা বোঝায় সমতার আদর্শ, সকলেই সমান। প্রতিটি ব্যক্তিকে সৎভাবে ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে হবে, এবং এই শ্রম, তা যে ধরনেরই হোক না কেন, সর্বদাই মর্যাদার বিষয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাধারণ রান্নাঘর যা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত। এই লঙ্গরের ব্যয় নির্বাহ হবে প্রতিটি শিখের উপার্জনের অংশ ও দৈহিক শ্রমের দ্বারা। স্ত্রীলোকেরা রান্না করবে এবং পুরুষেরা জোগান দেবে। এই লঙ্গর হচ্ছে সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। নারী ও পুরুষের সমতাও নানক প্রচার করেছিলেন। তিনি সতীদাহ ও পর্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন। নারী-পুরুষ একত্রে ধর্মকার্য ও ব্যবহারিক কার্যের অধিকারী ছিল।

নানকের প্রচারিত ধর্ম গুর্মত বা গুরুর জ্ঞান হিসাবে পরিচিত ছিল। তাঁর রচিত ধর্মীয় সঙ্গীতসমূহ পরবর্তী গ্রন্থসাহিবের আকর। শিখ শব্দটি পরবর্তী-কালের, সংস্কৃত 'শিষ্য' থেকে গৃহীত। তাঁর অনুগামীরা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে নানক পন্থী বা নানক-প্রস্তান নামে পরিচিত ছিলেন। সাম্যমূলক ও শ্রেণী-হীন সমাজ স্থাপনই ছিল নানকের উদ্দেশ্য। তিনি বলেছেন প্রতিটি শিখের গৃহই যেন প্রকৃত ধর্মশালা হয়। নানক পাঁচটি ব্রতের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন—নাম, বা ঈশ্বরের প্রশংসাগান, সিমরণ বা চিরন্তন প্রার্থনা, আস্নান বা দৈহিক শুচিতা রক্ষা, সেবা এবং দান। জীবনের লক্ষ্য কাজ করা, ভজনা করা এবং (অর্জিত) ধন বণ্টন করাঃ কির্‌ত করো, নম্‌ জপো, ওয়ন্দ ছকো।

পরবর্তী গুরু অঙ্গদ (১৫৩৯-৫২ খৃীঃ) লান্দে বর্ণমালাকে সংশোধন করে গুর্মুখী বর্ণমালার প্রচলন ঘটান এবং এই বর্ণমালাতেই নানকের রচনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। নানকের অনুসরণে তিনি লঙ্গর প্রথা বজায় রাখেন যা পরিচালনা করতেন তাঁর স্ত্রী স্বয়ং। নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং অনেকে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। এঁরা উদাসী সম্প্রদায় এই নামে পরিচিত হয়েছিলেন। গুরু অঙ্গদ এটা অনুমোদন করেননি, এবং পরিষ্কার ঘোষণা করেছিলেন যে নানক প্রবর্তিত ধর্মে সন্ন্যাসগ্রহণ ও গৃহত্যাগ অনুমোদিত নয়।

অঙ্গদের উত্তরাধিকারী হন তাঁর ৭৩ বৎসর বয়স্ক শিষ্য অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪) যিনি এতদূর জাতিপ্রথা বিরোধী ছিলেন যে লঙ্গরে একত্রভোজনকে তিনি

১। আসা-দি-বার ১৯। ২। অমর দাস, বারু সূহী ৬।

বাধ্যতামূলক করেন—পহলে পঙ্গৎ পিছে সঙ্গৎ।১ কথিত আছে যে এই বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর লঙ্গর পরিচালনার সুবিধার জন্য কয়েকটি করমুক্ত গ্রাম দান করেন। অমরদাস সতীদাহ ও পর্দাপ্রথা নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি বছরে দুবার শিখ সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাবকে জোরদার করার জন্য। পরবর্তী গুরু হন তাঁর জামাতা রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১ খৃঃ) যিনি অমৃতসরের পত্তন করেন।

পরবর্তী গুরু রামদাসের পুত্র অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬ খৃঃ), গুরুপরম্পরায় যিনি ছিলেন পঞ্চম, শিখধর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করেন। তিনি রাজকীয় ভাবে বাস করতেন, অমৃতসরে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ও তাঁর প্রসংসা করেছিলেন। অর্জুনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে গ্রন্থ্সাহিব সংকলন যা আদি গ্রন্থ বা গুরুগ্রন্থ নামে পরিচিত। গ্রন্থটি গুর্মুখী লিপিতে লিখিত যাতে নানকের ৯৭৪টি স্তোত্র, অঙ্গদের ৬২টি, অমরদাসের ৯০৭টি, রামদাসের ৬৭২টি এবং অর্জুনের বিখ্যাত রচনা সুখ্-মণিসহ ২২১৮টি স্তোত্র ও ১১৬টি শব্দ সঙ্কলিত হয়েছে। এছাড়া শিখ ধর্মের বাইরের ১৬ জন হিন্দু ও মুসলমান ভক্তের কিছু বিশিষ্ট রচনা এতে স্থান পেয়েছে যাঁরা হচ্ছেন ফরিদ, কবির, নামদেব, ধন্ন, সুরদাস, পিপা, রামানন্দ ও মর্দন। সত্ত ও বলবন্দের কিছু চারণগানও এতে স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে তেগ্ বাহাদুরের ১৫০টি স্তোত্র এবং গুরু গোবিন্দ সিং-এর একটি রচনা এতে যুক্ত হয়েছে। নানকের রচনাসমূহ স্থান পেয়েছে গোড়াতে যেগুলি জপজি, সোদর ও কর্তি-সোল এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

অর্জুন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাগভাজন হন এবং পরিণামে তাঁকে নিহত হতে হয়। শিখধর্ম পুরোদস্তুর অরাজনৈতিক হলেও, এমন একটা জায়গায় ওই ধর্মের উদ্ভব, তদানীন্তন রাজনৈতিক উত্তাপ যেখানে ভীষণ ভাবে প্রবাহিত হত। স্বয়ং নানক তাঁর রচনায় দিল্লীর লোদী বংশীয় সম্রাটদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের উল্লেখ করেছেন। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে বাবর পঞ্জাবে যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন নানক ছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্বরচিত রচনার ইংরাজী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

Thou, O Creator of all things,
Takest to Thyself no blame
Thou hast sent Yama disguised
as the great Moghal, Babar.
Terrible was the slaughter,
Loud were the cries of lamenters.
Did this not awaken pity in thee, O Lord?
Thou art part and parcel of all things
equally. O Creator
Thou must feel for all men and all nations.২

১। সুরজ্-প্রকাশ ১, ৩০।
২। আদি গ্রন্থ ৩৬০, *Selections from the Sacred Writings of the Sikhs* (1960) Trilochan Singh and others, 86-87.

দুর্ভাগ্যক্রমে অর্জুন মুঘলদের সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্বের ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। আকবরের পৌত্র খসরু তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ করে কাবুলে পালাবার সময় তরন-তারন নামক স্থানে অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। সরলচিত্তেই অর্জুন তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং পাঁচ হাজার টাকার মত অর্থ সাহায্য করেন।১ জাহাঙ্গীর প্রথম দিকে ব্যাপারটিকে লঘু করে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাক্সবন্দী সম্প্রদায়ের নেতা শেখ আহমদ সিরহিন্দির প্ররোচনায় তাঁকে দু লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় এবং গ্রন্থ সাহেব থেকে কিছু অংশ মুছে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্জুন অসম্মত হলে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তা কার্যকর করা হয় ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে।

'অর্জুনের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া হয় অভূতপূর্ব। মৃত্যুর পূর্বে অর্জুন তাঁর একাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র হরগোবিন্দকে গুরু বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁকে সৈন্যবাহিনী গড়বার নির্দেশ দিয়ে যান। তদনুযায়ী তিনি তাঁর দুপাশে পীরি (ধর্মগুরুত্ব) ও মীরির (রাষ্ট্রনেতৃত্ব) প্রতীক হিসাবে দুটি তরবারি ঝুলিয়ে রাখতেন। তিনি লেবহগড় নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অকাল তখ্তের প্রতিষ্ঠা করেন যা রাজশক্তির প্রতীক। মূলত তাঁর প্রচেষ্টাতেই মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যেই একটি শিখ রাজত্ব গড়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর তাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে কিছুকাল গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন এবং পঞ্জাবের ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের উপদেষ্টার কাজ করেন। শাহ্জাহানের সঙ্গেও গোড়ার দিকে তিনি সদ্ভাব রেখেছিলেন কিন্তু পরে উভয়ের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তিনি ১৬৩৪ থেকে ১৬৪০ পর্যন্ত একনাগাড়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। গোড়ায় তিনি রীতিমত সাফল্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু বিশাল মুঘলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত থেকে এ সাফল্য টিকিয়ে রাখা যাবে না ভেবে তিনি দুর্গম কিরাতপুর অঞ্চলে ঘাঁটি করেন এবং তিব্বত ও খোটান সীমান্তে বহু লোককে শিখধর্মে দীক্ষিত করেন'।২

হরগোবিন্দের গুরুপদ ছিল ১৬০৬ থেকে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরবর্তী দুজন গুরু হর রায় (১৬৪৪-৬১ খ্রীঃ) এবং হর কিষণ (১৬৬১-৬৪), ধর্মীয় বিষয় নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। নবম গুরু তেগ্ বাহাদুরের (১৬৪৬-৭৫ খ্রীঃ) সময় মুঘলদের সঙ্গে শিখদের পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। তেগ বাহাদুরের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের অভিযোগ ছিল যে তিনি কাশ্মীরের বিদ্রোহীদের সাহায্য করছেন এবং অনেক মুসলমানকে শিখধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করায় তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ১৬৭৫-এর ১১ই নভেম্বর তারিখে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি—সর্ দিয় শর্ ন দিয় —প্রবাদ স্বরূপ রয়ে গেছে।

দশম গুরু গোবিন্দ (১৬৭৫-১৭০৮) শিখদের মানসিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন

১। Beni Prasad, *History of Jahangir* (1922), 130.

২। মহসীন ফানী রচিত দবিস্তান্ গ্রন্থে মুঘলদের সঙ্গে হরগোবিন্দের সংঘর্ষের বিশদ বিবরণ আছে।

আনয়ন করেন, এবং ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাঁর সংগ্রাম ছিল মুঘল প্রশাসনের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। তাঁর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পাঠান ছিল অনেক, এমনকি মুসলিম ধর্মগুরু সাধায়ুরার পীর বুধু শাহ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। শাইদ বেগ এবং মইমু খান তাঁর হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। গোবিন্দ রাজপুতদের সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন, কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতিপ্রথার কুফলে শতধাবিভক্ত রাজপুতদের দিয়ে কোন মহৎ আদর্শের সিদ্ধি হবে না। তিনি সমাজের একেবারে নীচুতলার বাসিন্দাদের কাছে গিয়েছিলেন, তাদের উজ্জীবিত করেছিলেন এবং তাদের নিয়ে বাহিনী গঠন করেছিলেন।

গোবিন্দ চেয়েছিলেন উৎপীড়নের অবসান ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। তাঁকে শাক্তধর্ম ও শক্তির আদর্শ বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। দেবী দুর্গার অসুর নিধনের কাহিনী তাঁর কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতীক হয়েছিল। তাঁর চণ্ডী চরিত্রে তিনি বলেছেন দেবী দুর্গার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছে।[১] অবহেলিত ও উৎপীড়িত মানুষদের নিয়ে তিনি যে জঙ্গী বাহিনী গঠন করেন, তাদের সামনে তিনি একটি নূতন আদর্শ তুলে ধরেন যার নাম খালসা। খালসা শব্দটির প্রথম অক্ষর খ্ খুদ বা ব্যক্তির প্রতীক, দ্বিতীয় অক্ষর আকার অকাল্-সুর্খ বা ঈশ্বরের প্রতীক। ল বলতে বোঝায় লব্বইক্ যার অর্থ ঈশ্বরের প্রশ্ন (তুমি কেন আমাকে চাও) ও ভক্তের উত্তর (প্রভু আমাকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দেওয়া হোক)। চতুর্থ অক্ষর স বলতে বোঝায় সাহিব বা প্রভু। গোবিন্দ তাঁর প্রতিটি অনুগামীকে ক-কারান্ত পাঁচটি বিষয় ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কেশ, কাংখা (চিরুণী), কৃপাণ (তরবারি), কারা (লৌহবলয়) এবং কাচ্ছা (যুদ্ধের উপযোগী পরিচ্ছদ)। তাদের প্রার্থনা বাক্যঃ ওহ্-এ গুরু জী কা খালদা, ওহ্-এ গুরু জী কি ফতেহ্ (অর্থাৎ এই খালসা তোমার নিজস্ব, হে প্রভু, এবং সেই রকম বিজয়ও)।

গোবিন্দ সিং দীর্ঘকাল মুঘলসহ নানা অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন যার ইতিহাস উপন্যাসের মত শোনায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি জনৈক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হন, এবং তারই ফলে ৭ই অক্টোবর তারিখে মারা যান মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি গুরুর পদ লোপ করে দেন এবং নির্দেশ দেন যে একমাত্র ঈশ্বর ও আদিগ্রন্থের নির্দেশে পঞ্চায়েৎ দ্বারা গণতান্ত্রিক ভাবে খালসাতন্ত্র পরিচালিত হবে। স্বাধীন শিখরাষ্ট্রের ভিত্তি গোবিন্দ সিং স্থাপন করে যান। গুরু গোবিন্দের প্রভাব শিখ মানসে কতখানি তাঁদের একটি প্রচলিত প্রবাদবাক্যের মধ্যে পাওয়া যায় যা হচ্ছে 'আমি অমুক সিং বা তমুক সিং হিসাবে মাথা নোয়াতে পারি, কিন্তু যে আমার মধ্যে গুরু গোবিন্দ রয়েছেন সে আমি কি করে মাথা নোয়াব?'

কোন কোন পণ্ডিত দেখাতে চান শিখ ধর্ম যথেষ্ট বৈপ্লবিক নয় এবং আর পাঁচজন ভক্তিবাদী উদারপন্থী ধর্মগুরুর সঙ্গে নানকের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই মতের প্রবক্তা ম্যালকম, পাইনে, নারাঙ্গ প্রভৃতি। এদের যুক্তি হচ্ছে নানক হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বর্জন করতে নির্দেশ দেননি, উপবীতের ব্যবহার বজায় রেখেছিলেন, এবং হিন্দু সমাজব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটান নি। এই বক্তব্য একান্তই ভুল। হিন্দু সমাজব্যবস্থার যেটা সবচেয়ে বড় বিষয় সেই জাতিপ্রথা

১। M. Macauliffe, *The Sikh Religion,* (1909), V. 82.

নানক খোলাখ্রলি বাতিল করেছিলেন, শ্রধ্র কাগজে কলমে নয়, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রেও। লঙ্গরে উচ্চ ও নীচবর্ণের একত্র ভোজন হিন্দ্র সমাজব্যবস্থার একান্তই বিরোধী। আমাদেরই বাল্যকালে কোন সামাজিক অন্রষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের প্থক্ সারিতে খেতে দেবার রেওয়াজ ছিল। নারীর অবরোধম্রক্তি সম্প্র্ণভাবে হিন্দ্র স্ম্তিশাস্ত্র বিরোধী। হিন্দ্রসমাজের অবহেলিত নিম্নবর্ণের মান্রষেরাই শিখ ধর্মের মধ্যে মন্রষ্যত্বের আদর্শ খ্রঁজে পেয়েছিল, শ্রধ্র হিন্দ্র নয় ম্রসলমানেরাও। ম্রঘল-সম্রাটদের মধ্যে শাহজাহান এবং ঔরঙ্গজেব ধর্ম বিষয়ে গোঁড়া ছিলেন। শিখদের বির্দ্ধে তাঁদের আক্রোশের একটা বড় কারণ ছিল এই যে দরিদ্র ম্রসলমানেরাও দলে দলে শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তার কারণ ইসলাম জাতিপ্রথাবিরোধী হলেও, ভারতের ম্রসলমান সম্রাটেরা জাতি প্রথার সমর্থক ছিলেন কারণ শাসকেরা চিরকালই পরস্পর বিরোধী বহ্র শ্রেণীবিভক্ত শাসন ব্যবস্থা পছন্দ করে। এদেশে যে সকল নিম্নবর্ণের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন শাসকশক্তির কাছ থেকে তাঁরা উচ্চবর্ণের হাতে নিপীড়িত না হবার নিরাপত্তা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মান্তরের ফলেও তাঁদের তথাকথিত নিম্ন হিসাবে ঘোষিত পেশার পরিবর্তন না হবার দর্রন, সামাজিক মর্যাদালাভ তাঁদের কপালে ঘটেনি। ম্রসলমান শাসকদের কাছে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দ্ররা যে সম্মান পেতেন ইসলামে দীক্ষিত নীচবর্ণের মান্রষ তা পেতেন না। স্বাভাবিক কারণেই এই শ্রেণীর মান্রষেরা ইসলাম ত্যাগ করে শিখ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

ম্লত পাঁচটি কারণে শিখধর্মকে বৈপ্লবিক বলা যায়। রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকগণ পরিবর্তন চাইলেও হিন্দ্রধর্মের কাঠামোটাকে পরিত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। পক্ষান্তরে শিখধর্মীরা সমাজের আম্ল সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই কারণেই হিন্দ্র কাঠামোকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। মনে রাখতে হবে নানকই একমাত্র ধর্মগ্রর্র যিনি মধ্যপ্রাচ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন, মক্কাতেও গিয়েছিলেন এবং এই ব্যাপক ভ্রমণ তাঁকে অনেক বিষয়ে মোহম্রক্ত করেছিল। দ্বিতীয়ত, শিখধর্মের ঈশ্বর অকালপ্রর্খ, যিনি নিরাকার, দেহবিহীন ও কালাতীত। তাঁর কোন অবতার র্প নেই। তৃতীয়ত, শিখধর্মে কোন প্ররাণ নেই, কোন অতীত ঐতিহ্যকে তাঁরা ধরে রাখার চেষ্টা করেন নি বা নিজেদের আদর্শসম্হকে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন নি। চতুর্থত, অপর সকল সংস্কারম্লক ধর্মব্যবস্থায় গ্হত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ অন্রমোদিত, শিখধর্মে তা নিষিদ্ধ। পঞ্চমত, শিখ ধর্মগ্রর্রা কিছ্রটা রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং আত্মরক্ষার্থে সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সংস্কারবাদী অপরাপর ধর্মের সঙ্গে শিখ-ধর্মের একাত্মতা দ্রটি বিষয়ে—গ্রর্বাদে বিশ্বাস এবং শাস্ত্রচর্চার ভাষা হিসাবে স্থানীয় ভাষাকে গ্রহণ।

৬। সংস্কারবাদী ভক্তি আন্দোলনসম্হ, স্মার্ত ঐতিহ্য ও ইসলাম

মধ্যয্গের বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক কোন কোন সম্প্রদায় কয়েকটি সর্বজনগ্রাহ্য ও উদার নীতির ভিত্তিতে প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার সংস্কার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন যাঁরা শ্দ্র ও নারীদের ধর্মীয় অধিকারের জন্য, পার্বত্য উপজাতিসম্হকে হিন্দ্রধর্মে আনার জন্য এবং ইসলামে দীক্ষিত হিন্দ্রদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এরা সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্য নিবন্ধকারদের কাছ থেকে যাঁরা কঠোরতম

স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধানের মধ্যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধি বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বলা হয় যে মুসলমান ধর্মের অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা এই কূর্মবৃত্তির বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। ইসলাম ধর্ম এদেশে হিন্দুদের কোন বিপদের কারণ হয়নি। কোন মুসলমান সম্রাটই হিন্দুজনগণকে ইসলামে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা করেননি, এমনকি ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমান রাজাও স্বপ্নেও তা ভাবেন নি। ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে কাউকে বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে, কিন্তু তা রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এই রীতি মূলত বিদ্রোহী সামন্তরাজাদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হত। এ কথা সত্য, কোন কোন মুসলমান শাসক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, কিন্তু তা লুণ্ঠনের প্রয়োজনে, যেটা সর্বযুগেরই সাধারণ ব্যাপার। মুসলমানেরা এদেশে আসার আগেও অনেক বিদেশী লুণ্ঠনকারী এদেশে এসেছে, পরবর্তীকালে ইংরেজ সাহেবরা যে আন্দাজ লুণ্ঠন করেছে তাতে মুসলমানদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কল্হণের রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায় যে কাশ্মীরের কোন কোন হিন্দু রাজা মন্দির লুণ্ঠনের কাজে বেশ পাকা ছিলেন। যদি নৃশংসতার অভিযোগ করা যায় হিন্দু চোলরা, বা পরবর্তীকালের হিন্দু মারাঠারা যে মুসলমান শাসকদের তুলনায় কম নৃশংস ছিল তার প্রমাণ নেই। আসলে লুণ্ঠন, ধ্বংস, উৎপীড়ন ইত্যাদি মধ্যযুগীয় রীতিনীতিরই অভিব্যক্তি, সমকালীন পৃথিবীর সর্বত্রই যা প্রচলিত ছিল। নৃশংসতা মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। ভারতবর্ষের সে যুগের শাসকেরা ঘটনাচক্রে মুসলমান ছিলেন বলেই শাসকশক্তির নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পণ্ডিতেরা ইসলামকে মিশিয়ে ফেলেছেন, যেটা ভ্রান্ত ঐতিহাসিক পদ্ধতি।

মনে রাখতে হবে ভারতের ইতিহাসে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার তত্ত্বমূলক দিক্‌গুলির চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল মধ্যযুগেই যে যুগটা মুসলমান আমল। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত দার্শনিকদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও বিচারমূলক রচনার কাল মধ্যযুগই—অভিনবগুপ্ত থেকে ভাস্কর রায় পর্যন্ত। এঁদের রচনা পড়ে মুসলমান বলে যে কোন সম্প্রদায় জগতে আছে তা মনে হয় না। মুসলমান ধর্ম যদি সত্যিই হিন্দুদের বিপদের কারণ হত, তাহলে মধ্যযুগ হিন্দু ধর্মীয় তত্ত্বসমূহের বিকাশের স্বর্ণযুগ হয়ে উঠতে পারত না। সর্বদর্শনসংগ্রহের লেখক মাধবাচার্য তৎকালীন প্রচলিত যাবতীয় দার্শনিক মতের সার সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় ইসলামী দর্শনের কোন উল্লেখ নেই। আসলে মুসলমানদের নিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কোন মাথা ব্যথাই ছিল না, এবং যে সকল নিম্নবর্ণের মানুষেরা লোভে পড়ে বা উচ্চবর্ণের উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের জন্য তাঁরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না। মুসলমান শাসন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শ্রেণী স্বার্থে আঘাত করেনি। যদি কোন সমৃদ্ধ উচ্চবর্ণের হিন্দু শাসকশক্তির হাতে অত্যাচারিত হয়ে থাকেন তাঁরই সমগোত্রীয় উচ্চবর্ণের সমৃদ্ধ মুসলমানও তা হয়েছেন, এরকম বহু নজীর আছে।

নিবন্ধকারদের সঙ্গে শাসকশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিবন্ধকার বলতে তাঁদের বোঝায় যাঁরা উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং কঠোর স্মৃতিশাস্ত্রীয় আদর্শের প্রবক্তা। দ্বাদশ শতকের নিবন্ধকার লক্ষ্মীধর, ত্রয়োদশ শতকের হেমাদ্রি এবং চতুর্দশ শতকের চণ্ডেশ্বর যথাক্রমে হিন্দুরাজা গোবিন্দচন্দ্র গাহড়বাল, মহাদেব যাদব ও মিথিলার হরিসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ষোড়শ শতকের রাণী দুর্গাবতী পদ্মনাভ মিশ্রকে দিয়ে সাত খণ্ডে একটি স্মার্ত ব্যবস্থাপত্র রচনা করান যার নাম দুর্গাবতীপ্রকাশ। আকবরের

রাজস্ব মন্ত্রী তোডরমলের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয় তোডরানন্দ। সপ্তদশ শতকে ওর্ছার সামন্তরাজা বীরসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় মিত্রমিশ্র তাঁর বীরমিত্রোদয় রচনা করেন। নীলকণ্ঠের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বুন্দেল রাজা ভগবন্ত। অনন্তদেবের স্মৃতিকৌস্তুভ আলমোড়ার বাজবাহাদুরের প্রেরণায় রচিত হয়। কেশব পণ্ডিত শিবাজীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। অপরাপর বিখ্যাত নিবন্ধকারদের মধ্যে রঘুনন্দন, রমানাথ বিদ্যাবাচস্পতি, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, কমলাকর ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল নিবন্ধকারদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুরোদস্তুর ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা। এদের মধ্যে কালক্রমে রঘুনন্দনের মতবাদই প্রাধান্য লাভ করে। রঘুনন্দন ঘোষণা করেন যে বর্ণ আসলে দুটি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এবং তাঁর প্রতিধ্বনি করেন কমলাকর ভট্ট।১ রঘুনন্দনের ব্যবস্থাপনায় শূদ্ররা কেবলমাত্র একটি সংস্কার অর্থাৎ বিবাহে অধিকারী। দ্বাদশ শতকের লক্ষ্মীধর শূদ্রদের পুরাণপাঠের অধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী নিবন্ধকারেরা এই অধিকার প্রত্যাহার করে নেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস পুরোদস্তুর ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রামচরিতমানসে তিনি কলিযুগের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে শূদ্ররা বলতে শুরু করেছে যে তারা ব্রহ্মাণের চেয়ে ছোট নয়। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের যুগেরই প্রতিচ্ছবি। পরম দুঃখের সঙ্গে তিনি বলেছেন যে শূদ্রেরা শিক্ষাদাতা গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন এবং ব্রাহ্মণেরাও তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে তেলী, কুমোর, চণ্ডাল, কিরাত, কোল, কালোয়ার সকলেই মাথা কামিয়ে গুরু হয়ে বসেছেন, তাঁরা জপ করছেন, ব্রতপালন করছেন, পুরাণ পাঠ করছেন, আর ব্রাহ্মণরা তাঁদের পদধূলি নিচ্ছেন।২ স্পষ্টতই এটা রবিদাস, ধর্ণা, সেনা প্রভৃতি ধর্মগুরুদের জনপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষপাত, পেশায় বা জাতে যাঁরা ছিলেন যথাক্রমে চর্মকার, জাঠ ও নাপিত।

আসলে সংস্কারবাদী ধর্মসমূহের উদ্ভবের ও বিকাশের মূল প্রেরণা হিন্দু সমাজভুক্ত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের থেকেই এসেছে, যাঁরা ছিলেন এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। এই সোজা কথাটাকে এড়িয়ে গিয়ে পণ্ডিতেরা ইসলামী অনুপ্রবেশের একটা বিভীষিকাপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে দেখাতে চান যে ইসলামী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে হিন্দুসমাজকে রক্ষার তাগিদে একদল কঠোর স্মার্ত নিয়মকানুনের প্রবর্তন করেন, অপরদল প্রেম ভক্তি সমন্বয়ের আদর্শকে ভিত্তি করে সংস্কারবাদী পথ গ্রহণ করেন। এই রকম একটা ধারণা পণ্ডিতদের মধ্যে গড়ে ওঠার কারণ এই যে তাঁরা এই বিচারকালে উনবিংশ শতকের সংস্কারবাদী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিলাতী সভ্যতা ও খ্রীষ্টধর্মের চমকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের শিক্ষিত জনমানস যখন বিভ্রান্ত হচ্ছিল তখন এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল বটে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব প্রতিহত করার উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রাহ্ম ধর্মের আবির্ভাব, যার মূল কথা ছিল যে খ্রীষ্টধর্ম এমন কিছু বলে না যা ভারতীয় ঐতিহ্যে নেই। ব্রাহ্মরা ভারতের একেশ্বরবাদী ঐতিহ্যেরই পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় সমবেত

১। রঘুনন্দন, শুদ্ধিতত্ত্ব (বঙ্গবাসী সং) ১৬৬-৬৭; P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, II. 381.

২। রামচরিতমানস (নাগরী প্রচারিণী সভা সং), উত্তরকাণ্ড, ৪৮৩।

উপাসনা রীতির অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এক শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মদের অনুসরণে ভারতের নানাস্থানে অনেক সংস্কার-বাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাশাপাশি আরও একদল ছিলেন যাঁরা পুরোদস্তুর রক্ষণশীল আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন, হিন্দুধর্ম হিসাবে যা কিছু তাঁরা বুঝতেন তার ভালোমন্দ সমেত সব দিকগুলিকেই আঁকড়ে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা নানা যুক্তির সাহায্যে রক্ষণশীল আদর্শের সভ্যতাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। এখন কথা হচ্ছে, এই ব্যাপারটাকে মধ্যযুগের ঘাড়ে চাপানো কতটা সঙ্গত?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবদমিত নীচুতলার মানুষের জমে থাকা ক্ষোভই মধ্যযুগের সংস্কারমূলক বা বৈপ্লবিক ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মূল কারণ। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষের পরিণামে দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যে গিয়েছিল সে কথা আগে বলা হয়েছে। এই দুই ভাগের নাম যথাক্রমে বড়কলই ও তেনকলই। বড়কলইরা ছিল পুরোদস্তুর জাতি প্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক।১ পক্ষান্তরে তেনকলইরা ছিল পুরোদস্তুর জাতি প্রথার বিরোধী। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি তামিল-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বেঙ্কটপতিদেবের রাজত্বকালে একজন শূদ্র পুরোহিত বহু সংখ্যক শূদ্র অনুগামীসহ মুত্তু কৃষ্ণপ্প নায়কের উপস্থিতিতে কণ্ডিয় দেবরকে বৃদ্ধাচলমের রাজা করেছিলেন।২ তেনকলইরা দক্ষিণ ভারতে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন উত্তর ভারতে তার প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের অনুগামী গোপাল ভট্ট তাঁর হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে।৩ ওই গ্রন্থের টীকা রচনা করতে গিয়ে সনাতন গোস্বামী শূদ্রের অধিকারকে আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। শ্রীচৈতন্যের অনেক অব্রাহ্মণ অনুগামী ব্রাহ্মণদেরও দীক্ষা দিয়ে-ছিলেন, যেমন নরহরি সরকার, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি। মহারাষ্ট্রের তুকারাম শূদ্র হয়েও ব্রাহ্মণদের গুরু ছিলেন। আসামের শঙ্কর দেব ও তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের শিষ্যবর্গের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ।

জাতিপ্রথা বিরোধিতা ছাড়া সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা হচ্ছে সংস্কৃতের পরিবর্তে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার, এবং একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে ভারতের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে এই ভাব আন্দোলন সর্বাধিক প্রেরণা জুগিয়েছে। কবীর একস্থলে বলেছেনঃ সংস্কৃত্ কূপ্জল্ ভাষা বহতা নীর্। অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ কবিরা সংস্কৃত্ সনসার্ মে পণ্ডিত করে বাখান্, ভাষা ভক্তি দৃঢ়বাহী নিয়ারা পদ নির্বাণ, অর্থাৎ সংস্কৃত একমাত্র পণ্ডিতেরাই বুঝতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভাষা ব্যতিরেকে দৃঢ়মূল হয় না, বা ভাষা ছাড়া কেউ নির্বাণ লাভ করতে পারে না। ভাষা বলতে এখানে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষাকেই বোঝানো হয়েছে।

এছাড়া আরও একটি বিষয় এখানে বলার আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা যদিও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুই ধর্ম অনেক সময় কাছাকাছি এসেছিল। ইসলাম

১। A. Govindacarya in *Journal of the Royal Asiatic Society* (1910), 1103 ff; also *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, XXIV, 126 ff.; *Indian Antiquary*, XIII, 252 ff.

২। Copper Plate No. 75 of R. Sewell s *Lists* II.

৩। হরিভক্তিবিলাস (বহরমপুর সং) ৫, ৪৯১-৯৩।

ধর্মের যে বিশেষ দিকটি হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলনসমূহকে প্রভাবিত করেছিল তা হচ্ছে সুফী মতবাদ। আরব ও ঈরানের ধ্রুপদী সুফীবাদ দশম-একাদশ শতকেই ভারতে পৌঁছেছিল এবং চতুর্দশ শতকের মধ্যেই তা একান্তভাবে ভারতের মাটির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। আউলিয়া দরবেশদের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। সুফীরা ছাড়াও ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের মধ্যে গুহ্য ও রহস্য সাধনার প্রবণতা ছিল। আমরা এ প্রসঙ্গে গাজী মিঁয়া বা সিপাহ্-সালার মাসুদ গাজীর নাম উল্লেখ করতে পারি যিনি একটি গুহ্য সাধক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন যাঁদের আচার অনুষ্ঠান অনেকটা সহজযানী বৌদ্ধদের অনুরূপ। গাজী মিঁয়া সুলতান মাহমুদের সমকালীন ছিলেন যাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায় সিকন্দর লোদী কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু আকবরের সময় আবার তার পুনরভ্যুত্থান হয়। আরও একটি অনুরূপ সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায় যার প্রবক্তা ছিলেন শাহ মর্দান।১ বিখ্যাত যবন হরিদাস ছাড়াও শ্রীচৈতন্যর কয়েকজন পাঠান শিষ্য ছিলেন যাঁদের নায়ক ছিলেন বিজুলি খান।২ উত্তর ভারতের বৈষ্ণব ধর্মে যে মুসলমানদের আগমনে বাধা ছিল না একথা মহসীন ফানি তাঁর দবিস্তান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বয়ং চতুর্বাপা নামক হিন্দু সাধুর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি নারায়ণ দাস নামক একজন সাধুর সঙ্গে লাহোরে সাক্ষাৎ করেন, যাঁর শিষ্যদের মধ্যে অসংখ্য মুসলমান ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মীর্জা সালেহ এবং মীর্জা হায়দার প্রত্যক্ষভাবেই বৈরাগী হয়েছিলেন।

ধর্ম সম্পর্কে আকবরের ঔদার্যের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর আমলে রচিত আল্লা-উপনিষদের সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য বড় কম নয়। দারা-শিকোহ্ কর্তৃক বাহান্নটি উপনিষদের অনুবাদের কথাও অনেকে জানেন। দাদু (১৫৪৪-১৬০৩ খৃঃ) প্রবর্তিত পরব্রহ্ম সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় আদর্শের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিল। তাঁর দুজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন সুন্দরদাস, অপরজন ছিলেন রজ্জব। বাবা লাল নামক জনৈক সাধকের সঙ্গে দারা শিকোহ্‌র বহুবার কথোপকথন হয়েছিল যা নদু-উন-মিকৎ নামক পারসিক গ্রন্থে লিখিত আছে যেখানে বেদান্তের সঙ্গে সুফী মতবাদের সমন্বয় করা হয়েছে। প্রাণনাথ নামক আর একজন সাধু, যাঁর শিষ্য ছিলেন বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশাল, মহিতারিয়াল নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন যার উদ্দেশ্য বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য প্রদর্শন। তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার একমাত্র শর্ত ছিল যে দীক্ষান্তে হিন্দু এবং মুসলমানকে একত্রে আহার করতে হবে।৩

যাঁরা মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর জানতে ইচ্ছুক, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে একটি সাংঘাতিক মারামারি হয়েছিল, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের নয়, নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বৈরাগীদের, যাতে নাগা সন্ন্যাসীরা বহু বৈরাগীকে হত্যা করেছিল। এ খবর জানিয়েছেন মহসীন ফানি তাঁর দবিস্তান গ্রন্থে।

১। N. R. Ray, *op. cit,* 17-18.

২। চৈতন্যচরিতামৃত, ২, ১৮।

৩। H. H. Wilson, *Religious Sects of the Hindus* (1958 rep), 196.

৭। আন্দোলনের নেতৃবর্গঃ উত্তরভারত

সংস্কারবাদী ভক্তি আন্দোলনের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রামানন্দ। ইনি রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব রচনা বড় একটা পাওয়া যায় না। শিখদের গ্রন্থসাহিবে তাঁর রচিত একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত আছে, যাতে বলা হয়েছে ঈশ্বর কোন বাহ্যবস্তুতে নেই, বেদের মধ্যে তাঁকে অনুসন্ধান করা বৃথা, তিনি আছেন প্রত্যেকের হৃদয়ে। রামানন্দের উপাস্য দেবতার নাম রাম। রামানন্দ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মানুষ।

রামানন্দের অনুগামীদের মধ্যে বারোজন খুবই বিখ্যাত যাঁরা হলেন চর্মকার রবিদাস, জাঠ চাষী ধন্না, তাঁতী কবীর, নাপিত সেনা, রাজপুত পীপা এবং ভবানন্দ, সুখানন্দ, আশানন্দ, সুরাসুরানন্দ, পরমানন্দ, মহানন্দ ও শ্রীআনন্দ। রামানন্দের অনুগামীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নীচজাতীয়, নারীরাও ছিলেন প্রচুর সংখ্যায়।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে রবিদাস জাতিতে ও পেশায় ছিলেন চর্মকার। তাঁর উদার ধর্মমতের জন্য তিনি বহু লোকেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কবীর তাঁর অনেক রচনায় রবিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গ্রন্থসাহিবে তাঁর রচিত তিরিশটির অধিক স্তোত্র আছে। চিতোরের রাণী ঝালি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মেবারের মহারাণা সঙ্গের পুত্রবধূ এবং রতন সিংহের পত্নী বিখ্যাত মীরাবাঈ তাঁর শিষ্যা ছিলেন। রবিদাসের বক্তব্য ছিল ঈশ্বর এক ও অনন্ত। ভারতের চর্মকার সম্প্রদায় সকলেই রবিদাসপন্থী, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই পদবী হিসাবে রবিদাস নামটি ব্যবহার করেন।

রামানন্দের অপর শিষ্য সেনা জাতিতে ছিলেন নাপিত। বন্ধোগড়ের রাজা তাঁর মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধন্না ছিলেন জাতিতে জাঠ ও পেশায় চাষী, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে। পীপা ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আশ্রম ছিল দ্বারকার নিকট পিপাবৎ নামক স্থানে। আনন্দ উপাধিধারী রামানন্দের ছয় শিষ্য গোড়ায় রক্ষণশীল শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, পরে তাঁরা রামানন্দের উদার ধর্মমতের আশ্রয় নেন।

রবিদাস ছাড়া রামানন্দের যে শিষ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তিনি হচ্ছেন কবীর যাঁর জন্ম সম্ভবত ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। একটি মুসলমান তাঁতী পরিবারে তাঁর জন্ম। রামানন্দের কাছ থেকে তিনি জাতিপ্রথা, পৌত্তলিকতা, তীর্থযাত্রা, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়গুলির তাৎপর্যহীনতা উপলব্ধি করেন। তিনি জাতি ও নারী-পুরুষের পার্থক্য করতেন না। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ তাঁর অনুগামী ছিলেন। তাঁর ভক্তিগীতির অনেকগুলি শিখদের গ্রন্থসাহিবে উল্লিখিত হয়েছে। কবীর বিবাহিত ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ। তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল সরল, তাঁত বুনেই তিনি পেট চালাতেন। তাঁর একটি প্রধান বক্তব্য ছিল প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে, অপরকে সাহায্য করার জন্য উপার্জন করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে সঞ্চয় করা চলবে না। তাঁর বক্তব্যঃ সত্যের অনুগামী হও, সহজ হও, নিজের মধ্যেই সত্যকে উপলব্ধি কর, যা প্রেম, বীর্য ও করুণায় প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধর্মমতের পার্থক্য শুধু নামেই। যে নামেই ডাকো না কেন ঈশ্বর ঈশ্বরই। তাঁকে তীর্থে, শাস্ত্রগ্রন্থে ও আচার অনুষ্ঠানে পাওয়া যাবে না।

কবীর রচিত দোঁহাগ্নুলি সাহিত্যের অম্নুল্য সম্পদ। কবীর নিজে কোন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেননি। তাঁর ম্নৃত্যুর পর তাঁর প্নুত্র কামালকে অনেকে অন্নুরোধ করেন কবীরের নামে একটি সম্প্রদায় খোলার জন্য, কিন্তু কামাল উত্তর দেনঃ "আমার বাবা আজীবন সকল সাম্প্রদায়িকতার বির্নুদ্ধে কাজ করে গেছেন। তাঁর প্নুত্র হয়ে আমি কি ভাবে তাঁর আদর্শকে হত্যা করব।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ম্নৃত্যুর পর কবীরের ম্নুসলমান শিষ্যরা মঘর নামক স্থানে একটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন ও একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। তাঁর হিন্দ্নু শিষ্যরা বারাণসীতে স্নুরত গোপালের নেতৃত্বে একটি সম্প্রদায় চাল্নু করেন। এ'দের শাস্ত্রগ্রন্থ বীজক নামে পরিচিত।

রামানন্দের অন্নুগামী হলেও অনন্তানন্দ তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করতেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম জয়প্নুরের নিকটে গলতা নামক স্থানে আজও অবস্থিত। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণদাস পাহাড়ী, যাঁর দ্নুজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে কীল্হ উত্তর-পশ্চিম ভারতে খাকী নামক একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরজন, যাঁর নাম অগ্রদাস, ছিলেন বিখ্যাত ভক্তমাল গ্রন্থের লেখক নাভা-র গ্নুর্নু। নাভা ছিলেন অচ্ছ্নুৎ। তাঁর শিষ্য প্রিয়দাস ভক্তমালের টীকা লেখেন।

রামানন্দের অন্নুগামীচক্রের বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সদন বা সদ্না'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য যিনি জাতিতে ছিলেন কসাই। ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁর বিচিত্র জীবন ও অতি উচ্চ আদর্শের কথা লিখিত আছে। তাঁর রচিত দ্নুটি সঙ্গীত শিখদের গ্রন্থসাহিবে স্থান পেয়েছে। পাঞ্জাবের গ্নুর্নুদাসপ্নুরে নামদেব নামক একজন ধর্মগ্নুর্নুর আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি ওই নামের বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগ্নুর্নু হতে প্নৃথক্। সৈয়দ বংশের শেষ রাজা আলম্ শাহ্ তাঁর নামে একটি মঠ স্থাপন করেন ও তার পরিচালন ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন ১৪৪৬ খ্নুীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় একজন নামদেব ছিলেন ব্নুলন্দ শহরের অধিবাসী যিনি কাপড়ের উপর নক্সা তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তৃতীয় একজন নামদেব ছিলেন মারবারের অধিবাসী যিনি পেশায় বস্ত্র ব্যবসায়ী। ভক্তকবি স্নুরদাসের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যিনি ১৪৮৩ থেকে ১৫৬৩ খ্নুীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

কবীরের শিষ্য ধর্মদাস জাতিতে ছিলেন বানিয়া। তাঁর কেন্দ্র ছিল মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ে। গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই ঈশ্বরোপলব্ধি করা যায় এটাই তাঁর বক্তব্য ছিল এবং তাঁর অন্নুগামীরা বিবাহিত জীবন যাপনে বাধ্য ছিলেন। কবীরের আরও একজন অন্নুগামী ছিলেন মল্নুকদাস (১৫৭৪-১৬৮২ খ্নুীঃ) যাঁর ম্নুল কেন্দ্র ছিল এলাহাবাদ। মল্নুকদাসী সম্প্রদায় সারা উত্তর ভারতেই পরিব্যাপ্ত। ইনিও গার্হস্থ্য জীবনের উপর জোর দিতেন, এবং জাতিভেদসহ সকল বাহ্যিক ব্যাপারের বিরোধী ছিলেন।

কবীরপন্থার অন্যতম অন্নুসারী ছিলেন দাদ্নু (১৫৪৪-১৬০৩ খ্নুীঃ) যাঁর জন্ম রাজস্থানে। তাঁর অন্নুগামীগণ দাদ্নুপন্থী নামে পরিচিত। তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্ব-ধর্মসমন্বয় এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি পরব্রহ্ম সম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তিম্নুলক রচনাসম্নুহের একটি সঙ্কলন তাঁর নির্দেশে প্রস্তুত হয় ১৬০০ খ্নুীষ্টাব্দের কিছ্নু আগে, এবং এইটাই প্নৃথিবীতে এই রকম প্রথম প্রচেষ্টা। এই সঙ্কলনে অনেক ম্নুসলমান সাধ্নুর রচনা আছে যেমন কাজী কদম, শেখ ফরিদ, কাজী মহম্মদ, শেখ বাহ্ওয়াদ, বাখ্না প্রভৃতির। দাদ্নু কোন শাস্ত্রগ্রন্থে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে মন্নুষ্যজীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বর মান্নুষের অন্তরে

বিরাজমান এবং সেই হিসাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। নিজে গৃহী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, গরীব দাস ও মস্কীন দাস এবং দুই কন্যা নানীবাঈ ও মাতাবাঈ অনেক ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন। দাদু সরল হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ লেখার জন্য তাঁর শিষ্যবর্গকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সুন্দরদাস ও রজ্জবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রজ্জব প্রবর্তিত সম্প্রদায় আজও আছে যার আচার্যরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, নির্বাচনের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক যোগ্যতাটাই বড় কথা।

কবীর ও দাদুর অনুরূপ মতামত আরও যে সকল ধর্মগুরু পোষণ করতেন, এবং যাঁরা নিজেদের সম্প্রদায় স্থাপন করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ধরণীদাস, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ছাপরায় ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তাঁর সমসাময়িক লালদাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক লালদাস যিনি রাজস্থানের মেও নামক দস্যু উপজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের পুরাণ-ভগত ও চজ্জুভগত ও বাবালালও কবীর ও দাদুর অনুরূপ মত পোষণ করতেন। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাতে নরসী বা নরসিংহ মেহ্‌তা নামক একজন সাধক বর্তমান ছিলেন যার রচিত ভক্তিগীতিসমূহ ওই অঞ্চলে আজও জনপ্রিয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যেসব উদারপন্থী ধর্মীয় নেতারা বর্তমান ছিলেন তাঁদের মধ্যে ভান সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কবীরপন্থী ছিলেন এবং একটি আধ্যাত্মিক বাহিনী গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে তাঁর পুত্র, অচ্ছুৎ জীবনদাস ও রবি সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। চরণদাস নামক এক সাধক, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলোয়ারের নিকট দেহর নামক স্থানে, আচার অনুষ্ঠান ও জাতিপ্রথা বিরোধী ভক্তিমার্গের প্রচার করেছিলেন। শিবনারায়ণ নামক আরও একজন ধর্মগুরু, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বালিয়া জেলায়, হিন্দু ও মুসলিম ভক্তিবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। কথিত আছে সম্রাট মুহম্মদ শাহ তাঁর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহ্যের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন বুন্দেলখণ্ডের প্রাণনাথ ও রোটন জেলার গরীবদাস। প্রাণনাথের সম্প্রদায় ধামী নামে পরিচিত ছিল। জয়পুরের সন্তরাম বা রামচন্দ্র প্রবর্তিত সম্প্রদায় রামসানেহী নামে পরিচিত। তাঁদের উপাস্য দেবতা রাম; তাঁরা মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন না।

জগজীবন নামক একজন ধর্মগুরু, যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে, সৎনামী বা সত্যনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি এবং গুলাল সাহেব প্রখ্যাত সুফী সাধক ইয়ারী সাহেবের শিষ্য ছিলেন। সৎনামীদের মতে ঈশ্বর পরম সত্যস্বরূপ এক। তাঁরাও হিন্দু ও মুসলমান আদর্শের সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। গুলাল সাহেবের বিখ্যাত শিষ্যের নাম ভিখা, এবং তাঁর শিষ্যপরম্পরায় আরও দুজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, গোবিন্দ সাহেব ও বিখ্যাত ভক্ত কবি পল্টু সাহেব। সৎনামী আরও কয়েকটি সম্প্রদায় ছিল, যেগুলির মধ্যে একটির প্রবর্তক ঘাসিদাস, যিনি জাতিতে ছিলেন চর্মকার। সৎনামীরা সাধারণত মদ্যমাংস ব্যবহার করতেন না, মূর্তিপূজা, অস্পৃশ্যতা ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন না। বিকানীর অঞ্চলে লালগীর বা লালবেগের নেতৃত্বে অলখনামী নামক একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যার সদস্যরা পরস্পরকে অলখ্‌ কহো (অদৃশ্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর) বলে সম্বোধন করেন। এই সম্প্রদায় সৎনামীদেরই অনুরূপ মতবাদ পোষণ করেন।

এ'রা চরমভাবে জাতিপ্রথা বিরোধী। ধর্মস্থানগুলিকেও এ'রা অপবিত্র স্থান বলে মনে করেন।

ইতিপূর্বে আমরা কয়েকজন মুসলমান সাধকের কথা উল্লেখ করেছি। সুফী সাধকদের মধ্যে প্রথমেই সিন্ধুর শাহ্ করিমের নাম উল্লেখ হয় যিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বর্তমান ছিলেন। তাঁর ধর্মচর্চার প্রেরণা একজন বৈষ্ণব গুরু। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা হিন্দুদের ওম্ প্রতীকটি ব্যবহার করতেন। সিন্ধু অঞ্চলেরই দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সুফী সাধকের নাম শাহ্ ইনায়ৎ যিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন শাহ লতিফ, ভিৎ নামক স্থানে যাঁর দরগা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মিলনস্থল। মুসলমানের হিন্দু গুরু বা হিন্দুর মুসলমান গুরু সিন্ধুপ্রদেশে খুবই সাধারণ। সুফী ঐতিহ্য সিন্ধু অঞ্চলে অনেক ভক্ত কবির জন্ম দিয়েছিল যাঁদের মধ্যে বেদিল, বেকশ (মুহম্মদ হোসেন), রোহল, কুতুব প্রভৃতির গান আজও জনপ্রিয়।

সপ্তদশ শতকে দিল্লীতে সুফিবাদের বিকাশ দেখা যায় যার প্রবক্তা ছিলেন বাওরি সাহেব। তাঁর শিষ্য বিরু সাহেব। তাঁর শিষ্য ইয়ারী সাহেব (১৬৬৮-১৭২৫ খ্রীঃ) যিনি আবার সৎনামী সম্প্রদায়ের গুলাল সাহেব ও জগজীবনের গুরু। ইয়ারী সাহেবের রচনায় আল্লার সঙ্গে রাম ও হরির সমীকরণ করা হয়েছে। এ'রা ছাড়া, দরিয়া সাহেব নামে একজন মুসলিম সাধক, কবীর পন্থার প্রচারক ছিলেন। তাঁর উপাস্য ঈশ্বর সৎনাম নামে পরিচিত। তাঁর সম্প্রদায় সমবেত উপাসনায় বিশ্বাসী। প্রার্থনাভঙ্গীর নাম কোর্নিশ এবং সিজদা। এ'রা শাস্ত্র, তীর্থযাত্রা, মন্ত্রপাঠ, মূর্তি, জাতিপ্রথা কোন কিছুতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। অহিংসাবাদী ও মদ্যমাংসের প্রতি বীতরাগযুক্ত ছিলেন।

আরও একজন দরিয়া সাহেবের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মারবারে এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দাদূর সঙ্গে তাঁর মতবাদের সাদৃশ্যের জন্য তাঁকে অনেকে দাদূর অবতার মনে করেন। তাঁর উপাস্য দেবতা রাম পরব্রহ্ম। তিনি যোগচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতসমূহ উত্তর ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বুল্লে শাহ্ নামক একজন সাধক পাঞ্জাবের কসুর নামক স্থানে তাঁর প্রচারের কেন্দ্র করেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং কথিত আছে তিনি এখানে এসেছিলেন সুদূর ইস্তাম্বুল থেকে। তিনি মানবহৃদয়কেই ঈশ্বরের স্থান বলে গণ্য করতেন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের তীব্র সমালোচক ছিলেন। দারা শিকোহ্র গুরু সামাদ অত্যন্ত উদারপন্থী ছিলেন, যিনি ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নিহত হন। দিল্লী অঞ্চলে আজাদ সম্প্রদায় নামক একটি উদারপন্থী ধর্মীয় সংগঠনের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। আগ্রার রসুল শাহীরা তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন।

সংস্কারপন্থী ধর্মীয় আন্দোলনগুলির নেতৃবর্গের যে পরিচয় দেওয়া হল তাতে মধ্যযুগের উত্তর ভারতের যে ধর্মীয় চিত্র ফুটে ওঠে তা হচ্ছে এই যে এই উদার ধর্মমতগুলি গোটা উত্তর ভারতকেই প্লাবিত করেছিল, যে আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ। এই ভাব আন্দোলনে একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মগুলি অপরদিকে গোঁড়া ইসলামপন্থীরা, একদিকে উচ্চ-বর্ণের সমৃদ্ধ মানুষ, অপরদিকে শাসক ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, অবস্থান করছিলেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। একথাও সত্য যে উচ্চবর্ণের বা শাসকশ্রেণীর কোন মানুষ মানবিক

প্রেরণাতেই কিছুটা শ্রেণীচ্যুত হয়ে এই আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন, আবার এও সত্য যে সংস্কারবাদের মুখোশ নিয়ে কোন কোন সম্প্রদায়, যেমন উদাস পন্থীরা যাঁরা কবীরমার্গের বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন, জাতিপ্রথা ও বাহ্য আচার অনুষ্ঠানকে সমর্থন করতেন। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে তা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সমভাবে আকৃষ্ট করেছে, এবং উভয় ধর্মীয় আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। দক্ষিণ ভারত ও মহারাষ্ট্রে যে সব ভক্তি আন্দোলন হয়েছিল সেখানে এতটা হয়নি।১

৮। পূর্ব ভারত

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নব বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যাকে প্লাবিত করেছিল এবং এই ধর্ম, পরবর্তী ধর্মগুরুদের কারো কারো দ্বারা ব্রাহ্মণ্যবাদী পল্লবিতকরণের ধাক্কা সহ্য করেও, মূলত গণভিত্তিক থাকতে পেরেছিল। আসামে শঙ্করদেব (১৪৮৬-১৫৬৮ খৃীঃ) ভক্তিধর্মের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং জাতিপ্রথা, মূর্তিপূজা ও মন্দির নির্মাণের বিরোধী ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণও তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিছু মুসলমানও তাঁর শিষ্য ছিলেন। এছাড়া নাগা উপজাতিদের মধ্যেও তাঁর আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল। শঙ্করদেব অসমীয়া সাহিত্যের জনক। মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম স্থানীয় উপজাতীয় বিশ্বাসগুলির সঙ্গে মিশে একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

বঙ্গদেশ, আসামের রাজ্যগুলি ও উড়িষ্যা শাক্তধর্ম ও তন্ত্রাচারের মস্ত বড় কেন্দ্র ছিল। গৌহাটির কামাখ্যাদেবী আসলে খাসি উপজাতির মাতৃদেবী, যিনি শাক্ত তান্ত্রিক দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে পুরীর জগন্নাথ আসলে উপজাতীয় দেবতা যাঁর উপর বৈষ্ণব আবরণ পড়েছে, অথচ যাঁর পূজার ব্যাপারটা উড়িষ্যার মাতৃদেবীর প্রভাবে শাক্ত তান্ত্রিক রয়ে গেছে। সুভদ্রা আসলে একানংসা যিনি সমলেশ্বরী, খিচিঙ্গেশ্বরী প্রভৃতি স্থানীয় মাতৃকাদেবীদেরই প্রতীক। শাক্ত ধারণা অনুযায়ী শ্রীক্ষেত্রের দেবী বিমলা এবং জগন্নাথ তাঁর ভৈরব। চৈতন্যদেবের উদার ধর্মের প্রভাবে এবং শাক্ত-তান্ত্রিক প্রাধান্যের ফলে, এবং সর্বোপরি উপজাতি-পূর্ণ এলাকা হবার জন্য উড়িষ্যায় কোনদিনই জাতিপ্রথা তীব্র হতে পারেনি। উড়িষ্যায় চৈতন্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব শ্যামানন্দ ও তাঁর শিষ্য রসিকানন্দের।

আসামে শঙ্করদেব ও তাঁর উত্তরাধিকারী মাধবদেবের মৃত্যুর পর (১৫৯৬ খৃীঃ) তাঁদের প্রবর্তিত মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায় কয়েকটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। দামোদরদেব ব্রহ্মসংহতি বা বামুনিয়া নামক একটি উপসম্প্রদায়ের পত্তন করেন। আর একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেন অনিরুদ্ধদেব। এই সম্প্রদায়টি তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করত যার অনুগামীদের অধিকাংশই ছিলেন মৎস্যজীবী যে কারণে সম্প্রদায়টির নাম হয়ে ছিল মোয়া-মারিয়া। শঙ্করদেবের নাতি পুরুষোত্তম ঠাকুর

১। K. M. Sen, *Medieval Mysticism of India* (Eng. tr. from Bengali, M. M. Ghosh 1929); G. H. Westcott, *Kabir and the Kabir Panth* (1907); অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৮৮৮), প্রথম খণ্ড, ১৯-১১২; ক্ষিতিমোহন সেন, দাদু (১৯৩৫); হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, কবীর (১৯৫০); পরশুরাম চতুর্বেদী, উত্তরী ভারত কী সন্ত-পরমপরা (১৯৫১)।

ঠাকুরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর এক অনুচর গোপালদেব কালসংহৃতি নামে একটি গোষ্ঠী তৈরী করেন।

১৫৪৬ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায় যে চৈতন্যের মৃত্যুর কিছু পরে তাঁর সম্প্রদায় অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গাধর এবং অদ্বৈতের অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল।১ নিত্যানন্দের চরিত্রহননের একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়েছিল যা বৃন্দাবনদাসকে ব্যথিত করেছিল। সম্ভবত এই কারণেই রূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস তাঁদের রচনায় তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। পূর্ববঙ্গে চৈতন্যবাদের প্রসার ঘটান নরোত্তম ঠাকুর। চৈতন্যদেবের জাতিপ্রথা বিরোধিতার জন্য অনেক নীচবর্ণের মানুষ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বণিকশ্রেণীও এই ধর্মের অনুগামী হয়েছিলেন। অনেক নিম্নবর্ণের মানুষ অবশ্য শাক্তমতে বিশ্বাসী ছিলেন, যেমন চণ্ডাল বা নমঃশূদ্রেরা।

শাক্তধর্মের প্রভাবে বঙ্গদেশে শৈবধর্মের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়। শিব এখানে নিছকই লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। কোচ উপজাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়েছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনায় কোচ মেয়েদের সঙ্গে শিবের সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে যা রামেশ্বরের শিবায়নে খুবই বিশদভাবে ব্যক্ত হয়েছে। রামেশ্বর শিবকে একেবারে চাষী বানিয়ে ছেড়েছেন। এদেশে শিবের সঙ্গে চাষবাসের গভীর সম্পর্ক তাঁকে কোন কোন স্থানে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে অভিন্ন করেছে। কৃষিজীবী ও নিম্নবর্ণের মানুষদের গাজন, চড়ক প্রভৃতি উৎসব শিবকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আত্মনিগ্রহতার প্রচুর উপাদান থাকে। উচ্চবর্ণের মানুষেরা, বলাই বাহুল্য, এগুলিকে সুনজরে দেখেন না।

নাথ-ধর্মের কথা আলোচনা করার সুযোগ পূর্বে হয়েছে। নাথ পন্থা বঙ্গদেশ, আসাম ও উড়িষ্যাতে যোগী-পন্থা নামেও পরিচিত। গোপীচাঁদের গান শুধু বঙ্গদেশেই নয় সারা উত্তর ভারতেই প্রচলিত। এই গানগুলির লেখকদের মধ্যে মুসলমান বহুসংখ্যায় বর্তমান, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যারা ভর্থারি নামে পরিচিত। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা গৈরিক বসন ধারণ করেন। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় নাথ পন্থা ও নিরঞ্জনী পন্থার প্রচলন দশম-একাদশ শতকেই হয়েছিল। উড়িষ্যায় পরবর্তী-কালে মহিমা পন্থা ও কুম্ভীপটিয়া পন্থার উদ্ভব হয়। সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের প্রভাবে বঙ্গদেশে খুশী-বিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহিনী, বলরামী, নেড়া, আউল-বাউল, দরবেশ সাঁই, সংযোগী, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরা মূলত নাথ ও সহজিয়া পন্থা ও কিয়দংশে ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।২

বঙ্গদেশে শাক্তধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাবের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এখানে শাক্ত আদর্শ ও কালীপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটান বিখ্যাত তন্ত্রসার-লেখক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর লেখক ব্রহ্মানন্দ গিরি ও তৎশিষ্য শ্যামারহস্য লেখক পূর্ণানন্দ ষোড়শ শতকের বাঙালী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের গৌড়ের শঙ্করের নামও উল্লেখযোগ্য, সম্ভবত যিনি শঙ্কর আগমাচার্য

১। চৈতন্য ভাগবত (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং) ২, ২৩; ২, ২৪।

২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম খণ্ড, ১৭১-২৯১।

নামে সর্মাধক পরিচিত ছিলেন। জনজীবনে শাক্ত ভাবধারার ব্যাপক প্রচার ঘটিয়েছিলেন কয়েকজন শাক্ত সাধক, যেমন ত্রিপুরার সর্বানন্দ (ষোড়শ শতক), রত্নগর্ভ বা গোসাঁই ভট্টাচার্য (ষোড়শ শতকের শেষ দিকে), জয়দুর্গা বা অর্ধকালী (সপ্তদশ শতক) প্রভৃতি। শাক্ত পদকর্তাদের অবদানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশের শাক্ত তান্ত্রিক সাধনা ব্রাহ্মণ্য কবলিত হলেও, এবং তান্ত্রিক রচনাবলীতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য কৌশলে প্রচার করা সত্ত্বেও, তন্ত্রের মৌল উদার পন্থী আদর্শটিকে চাপা দেওয়া যায় নি, যার ফলে নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে শাক্ত ধর্ম ও শাক্ততান্ত্রিক ভাবধারাসমূহ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।১

এছাড়া বঙ্গদেশে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এখানকার পুরাতন বৌদ্ধদের একটা বড় অংশ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, এবং এটা বিশ্বাস করার রীতিমত কারণ আছে যে এখানকার মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা ও সমাধিপূজার ব্যাপকতা মূলত ধর্মান্তরিত বৌদ্ধদের প্রেরণায় সম্ভব হয়েছিল।২

৯। দক্ষিণ ভারত

আদিমধ্য ও মধ্যযুগে উত্তর ভারতে ও পূর্বভারতে নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রেরণায় যেমন সংস্কারবাদী নবধর্ম আন্দোলনসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে সেরকম কোন ব্যাপক ব্যাপার ঘটেনি। সেখানে প্রচলিত বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তধর্মকে আশ্রয় করেই কিছু কিছু সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছিল। অনেকেই তত্ত্বের দিক থেকে জাতিপ্রথাবিরোধী ও উদারপন্থী ছিলেন, কিন্তু এই সকল ভাবধারার নেতৃত্ব মূলত উচ্চবর্ণের মানুষদের হাতে থাকার দরুন, ওই সকল আদর্শ বহু ক্ষেত্রেই কেতাবী রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে নীচবর্ণের কোন কোন মানুষ নেতৃত্ব পেলেও, যে কোন কারণেই হোক না কেন, তাঁরা নীচবর্ণের মানুষদের মধ্যে আশানুরূপ প্রেরণার সৃষ্টি করতে পারেননি। ব্যতিক্রম ছিলেন বীরশৈবেরা, কিন্তু তাঁরা বসবের শিক্ষার গুণে এবং নিজেদের মধ্যে প্রচন্ড ঐক্য ও সহযোগিতার কল্যাণে মধ্যযুগেই একটি সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন, এবং সেই কারণে তাঁদের শ্রেণী চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। অবহেলিত উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষকে টেনে তোলবার শক্তি তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন, নিজেদের জীবনচর্যা, সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন, অনেকটা পরবর্তী কালের ব্রাহ্মদের মত, যাদের সঙ্গে বৃহত্তর জনজীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না।

অথচ ঐতিহাসিক বিচারে উদারপন্থী ভাবধারাসমূহের উদ্ভব দক্ষিণ ভারত থেকেই হয়েছিল। সুনির্দিষ্টভাবে জাতিপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তেনকলই গোষ্ঠী। উত্তর ভারতের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান নেতা রামানন্দ এখান থেকেই তাঁর আদর্শের প্রেরণা পেয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বহু বৈষ্ণব ও শৈব আচার্যই জাতিপ্রথাবিরোধী ছিলেন। তাঁদের উদ্ভবের যুগে বীরশৈবরা তো জাতিপ্রথাবিরোধী আন্দোলনই শুরু করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও এটা স্বীকার্য, উত্তর ভারতে যা সম্ভব হয়েছিল, দক্ষিণে তা হয়নি।

১। N. N. Bhattacharyya, *History of the Sakta Religion,* passim.

২। Idem, *Ancient Indian Rituals,* 115-18.

এখানে আমরা দক্ষিণ ভারতের একটিই সংস্কারবাদী আন্দোলনের উল্লেখ করব, যার উদ্ভব কর্ণাটকে কিন্তু যা দক্ষিণ ভারতের অপরাপর অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং এই আন্দোলন দাসক‌ুট নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের ম‌ূল কথা ভক্তি, উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ বা বিঠ্ঠল। মন্ত্রের চেয়ে সঙ্গীত বা ভজনগানের প্রতিই ছিল এ‌ঁদের অধিকতর আগ্রহ। এরা জাতিপ্রথা ও সামাজিক বাধানিষেধ মানতেন না। ধর্মের নামে কোন আচার অন‌ুষ্ঠানে এদের বিশ্বাস ছিল না। নিজেরা দাস বা সেবক উপাধি গ্রহণ করতেন, এবং নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপন করতেন। এ‌ঁদের প্রেরণার উৎস ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাচার্য ও দার্শনিক মধ্ব। তত্ত্বের দিক থেকে এ‌ঁরা ছিলেন বেদান্তবাদী।

দাসক‌ুটদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীপাদরাজ, যিনি মহীশ‌ূরের ম‌ূলবগল নামক স্থানে পদ্মনাভ তীর্থে একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সেই সঙ্গে উ‌ঁচ‌ুদরের কবি ছিলেন। ভ্রমরগীতা, বেণ‌ুগীতা ও গোপীগীতা তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাঁর শিষ্য ও উত্তরাধিকারী ছিলেন বিখ্যাত কবি ও বৈদান্তিক ব্যাসরায়, যিনি ন্যায়াম‌ৃত গ্রন্থের লেখক। ব্যাসরায়ের শিষ্য প‌ুরন্দর দাস কর্ণাটকী সঙ্গীতের জনক। তাঁর অপর শিষ্য কণকদাস জাতিতে ছিলেন ক‌ুর‌ুব (মেষপালক) অথবা বেড় (শিকারী)। তাঁর অত্যন্ত উদারপন্থী মতবাদের জন্য সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা তাঁকে নিগ‌ৃহীত করেন, কিন্তু ব্যাসরায় তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কণকদাসের রচনাবলী—মোহনতরঙ্গিণী, হরিভক্তিসার, রামধ্যয়নমন্ত্র ও নলচরিত—কর্ণাটকে বিশেষ জনপ্রিয়। প‌ুরন্দর ও কণকের সমকালীন ছিলেন য‌ুক্তিমল্লিকা গ্রন্থের লেখক বাদিরাজ। দাসক‌ুটের আরও দ‌ুজন বিখ্যাত অন‌ুগামী ছিলেন বিজয়দাস ও জগন্নাথদাস।

১০। মহারাষ্ট্রীয় সাধকগণ

ভারতের অপরাপর স্থানের মত মহারাষ্ট্রেও ভক্তিবাদী আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ আন্দোলনকে সংস্কারপন্থী বলা যায় না। এই আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন নিব‌ৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেব, পরবর্তীকালে যা নামদেব, তুকারাম ও একনাথের হাতে বারকরী পন্থায় র‌ুপান্তরিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে রামদাস প্রবর্তিত সম্প্রদায় ধারকরী নামে পরিচিত হয়। প্রথমোক্ত পন্থা কর্ণাটকে দাসক‌ুটের দ্বারা প্রভাবিত, উপাস্যদেবতা পন্ধরপ‌ুরের বিঠ্ঠল, দ্বিতীয় পন্থার উপাস্যদেবতা রাম। মতবাদের দিক থেকে দ্বিতীয় পন্থাটি প্রথমটির তুলনায় য‌ুক্তিশীল ও বাস্তবম‌ুখী।

প্রথম পন্থাটির প্রবর্তকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর। তাঁর পিতামহ এবং প্রপিতামহ, গোবিন্দরাও ও ত্রিম্বক পন্ত, নাথপন্থী ছিলেন। তাঁর পিতা বিঠ্ঠল সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি গ‌ৃহী হন, এবং এই অপরাধে তাঁকে কিছ‌ু সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। জ্ঞানদেব ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী ছিলেন যাঁকে অন‌ুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর বড় ভাই নিব‌ৃত্তিনাথ। বিখ্যাত জ্ঞানেশ্বরীর লেখক জ্ঞানদেব, অম‌ৃতান‌ুভব ও চাঙ্গদেব প্রশস্তি নামক আরও দ‌ুটি গ্রন্থ এবং অভঙ্গ পর্যায়ভুক্ত কিছ‌ু ভক্তিমার্গী কবিতা রচনা করেছিলেন। জ্ঞানদেবের সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের রচনাকাল আন‌ুমানিক ১২৯০ খ‌ৃীষ্টাব্দ।

নামদেবের জন্ম একটি দরজী পরিবারে। প্রথম জীবনে তিনি ডাকাত ছিলেন

পরে অনুতপ্ত হবার পর তাঁর মানসিক রূপান্তর ঘটে। তিনি বিসোবা খেচর কর্তৃক ভক্তিমার্গে দীক্ষিত হন এবং জ্ঞানদেবের সঙ্গে বহু স্থান পর্যটন করেন। তাঁর কিছু রচনা শিখদের গ্রন্থসাহিবে স্থান পেয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তিই ছিল নামদেবের শিক্ষার মূল কথা।

একনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রতিষ্ঠান বা পৈঠানে, এবং তিনি বিখ্যাত সাধু ভানুদাসের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি জ্ঞানদেবকৃত জ্ঞানেশ্বরীর একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি নিজে অসংখ্য ভক্তিমূলক কবিতার লেখক ছিলেন। ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি জাতিপ্রথা মানতেন না, এবং একবার তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্ন পারিয়াদের দিয়েছিলেন। কথিত আছে নিজ উপাস্যদেবতাকে উৎসর্গ করার জন্য যে জল তিনি অনেক চেষ্টা করে গোদাবরী থেকে নিয়ে আসছিলেন তা তিনি একটি তৃষ্ণার্ত গর্দভকে দান করেন। তাঁর মৃত্যুকাল ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

তুকারাম চাষী পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি জ্ঞানদেব, নামদেব ও একনাথের রচনাবলী অধ্যয়ন করে ভক্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি অসংখ্য অভঙ্গ বা ভক্তিগীতি রচনা করেন। তুকারামকে সাধকজীবনে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সম্রাট শিবাজী তাঁর অনুরাগী ছিলেন।

রামদাসের জন্ম ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে। বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে তিনি ঈশ্বরের সন্ধানে নানাস্থানে পর্যটন করেন। পরে তিনি কৃষ্ণা নদীর তীরে একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে থাকেন। রাজা শিবাজী তাঁর শিষ্য ছিলেন। রামদাসের উপাস্য দেবতা রাম। তাঁর রচনাসমূহে কিছু রাজনীতির প্রভাবও দেখা যায়। ঈশ্বরোপলব্ধির সঙ্গে তিনি জাগতিক জ্ঞান চর্চারও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রের সর্বত্র মঠাদি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা দাসবোধ।

প্রকৃত সংস্কারপন্থী বা বৈপ্লবিক ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র একটিরই মহারাষ্ট্রে উদ্ভব হয়েছিল। এই সম্প্রদায় মহানুভব-পন্থ নামে পরিচিত। মহানুভবপন্থীরা জাতি-ভেদ, সামাজিক কুসংস্কার, আশ্রমপ্রথা মানতেন না। তাঁরা বেদবিরোধীও ছিলেন। বলাই বাহুল্য মহানুভবপন্থীদের এই সব বৈপ্লবিক প্রবণতাকে শাসকশ্রেণী সুনজরে দেখেনি। ফলে এঁরা রীতিমত অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং এঁদের নানাপ্রকার শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মুসলমান আমলে উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে ও মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্য অধিক ছিল। রাজা শিবাজীও ধর্মমতের দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ও ব্রাহ্মণপন্থী। ব্রাহ্মণদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কারণও তাঁর ছিল, কেননা মূলত তিনি ছিলেন নীচজাতীয়, এবং ব্রাহ্মণদের কৃপায় হিরণ্যগর্ভ মহাদান যজ্ঞ করে তিনি ক্ষত্রিয় হন। রাজশক্তির নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে মহানুভবপন্থীরা তাঁদের রচনাসমূহ সাংকেতিক ভাষায় লিখতে বাধ্য হতেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গোবিন্দপ্রভু ও চক্রধর। নাগদেব এই সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক দিকটি খুবই জোরদার করেন। এই মতের বিশিষ্ট অনুগামীদের মধ্যে ভাস্কর, কেশবরাজ, দামোদর পণ্ডিত, বিশ্বনাথ, নারায়ণ পণ্ডিত, বিখ্যাত মহিলাকবি মহদম্বা, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায় মূলত বৈষ্ণব এবং এদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নাথধর্মের প্রভাব ছিল।

১১

বহিরাগত ধর্মসমূহ

১। গ্রীক, রোমক ও চৈনিক প্রভাব

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর থেকেই ভারতের সঙ্গে গ্রীকভূমির সংযোগ স্থাপিত হয়। মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল, এছাড়া পশ্চিম ঈরান থেকে ভারতের অভ্যন্তরস্থ এলাকাগুলিতে পর্যন্ত বহু গ্রীক বসবাস করত। পরবর্তী কালের রোমক আমলেও কুষাণ ও গুপ্তযুগের ভারতবর্ষের সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় যে সে-আমলের গ্রীকরা তাঁদের হেরাক্লেস ও দিওনিসোসের সঙ্গে কৃষ্ণ ও শিবের বিশেষ প্রভেদ করেননি। যদিও প্রমাণ করার উপায় নেই, পাশুপতদের কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান, এমন কি একালের চড়ক-গাজন প্রভৃতি শিব-ঘেঁসা অনুষ্ঠানের কোন কোন বৈশিষ্ট্য দিওনিসোসের রহস্যময় অনুষ্ঠান-সমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কয়েকটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান আছে যা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের এলিউসীয় রহস্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাদৃশ্য বিস্ময়কর, যদিও একের প্রভাবে অপরটি গড়ে উঠেছিল। এটা অনুমান করা গেলেও প্রমাণ করা যায় না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজাদের মুদ্রায়, শক, পহ্লব ও কুষাণদের মুদ্রায়, গ্রীক দেবদেবীদের মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। বাহ্লীকদেশ বা ব্যাক্ট্রিয়া থেকে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় অসংখ্য গ্রীক বাস করত কাজেই গ্রীক দেবদেবীর বাস্তব পূজা ভারতবর্ষে বর্তমান ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের ধর্মব্যবস্থায় গ্রীক ধর্মের প্রভাব কতদূর পড়েছিল তা বলা, আমাদের বর্তমান যা জানাশোনা, তার ভিত্তিতে সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, ভারতীয় মূর্তিপূজার উপর কিছুটা গ্রীক প্রভাব ছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে আদি বুদ্ধমূর্তিসমূহ অ্যাপোলোদেবের মূর্তির অনুকরণে রচিত। কতদূর সত্য বলা যায় না, তবে গন্ধার শিল্পের যে বুদ্ধমূর্তি, তা তৈরী করার ক্ষেত্রে গ্রীককারিগরদের যে হাত আছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

রোমের নিজস্ব দেবদেবী খুবই কম। রোমক দেবমণ্ডলীর প্রায় সবটাই গ্রীক ধর্ম থেকে নেওয়া, এছাড়াও সিরিয়া, মিশর, ফ্রিজিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক দেবদেবী, বিশেষ করে দেবী, রোমকরা আমদানী করেছিল। যেসব দেশের সঙ্গে রোমের সংযোগ হয়েছে, সেই সব দেশ থেকেই রোমকরা দেবতা নিয়ে নিজেদের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেমন মিশর থেকে সেখানে গিয়েছিলেন দেবী আইসিস, ফ্রিজিয়া থেকে দেবী সিবিলী প্রভৃতি। ভারতবর্ষ থেকে এই রকম কোন দেবতা রোমে যাননি, যদিও পম্পইতে প্রাপ্ত একটি ছোট ফলকে একজন ভারতীয় দেবীকে উৎকীর্ণ দেখা যায়। রোমক ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে যা হচ্ছে বিভিন্ন দেবীকে নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। গুপ্তযুগ থেকে ভারতবর্ষে দেবীপূজার যে বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়, যার জন্য আলাদাভাবে দেবীকেন্দ্রিক একটা ধর্মই গড়ে উঠল যার নাম শাক্তধর্ম, তার মূলে হয়ত রোমক দেবীপূজার প্রভাব আছে, কেননা রোমের সঙ্গে এদেশের নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

এখানে একটি বিশুদ্ধ অনুমানের উল্লেখ করছি, এবং বিচক্ষণ পাঠকেরা এই অংশটুকু সকৌতুকে উপেক্ষা করতে পারেন। হ্যানিবলের আক্রমণে যখন রোম বারবার পর্যুদস্ত হচ্ছিল, তখন রোমক পুরোহিতগণ বললেন ওই ভয়ঙ্কর শত্রুকে পরাস্ত করা রোমক দেবদেবীর কর্ম নয়, নূতন দেবতা আনতে হবে। তদনুযায়ী ফ্রিজিয়া থেকে আমদানী করা হল সিংহবাহিনী দেবী সিবিলীকে, যিনি যুদ্ধ ও ফসলের দেবী। বিশেষভাবে নির্মিত রথে দেবী এলেন, এটা ২০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ঘটনা। তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হল নগ্না মহিলাদের একটি মিছিলের দ্বারা, যার নেতৃত্ব করলেন সেনাপতি সিপিওর স্ত্রী। দেবী আসামাত্রই কাজ শুরু করে দিলেন। সেই বারেই রোমে হল রেকর্ড পরিমাণ শস্য আর সেই বছরেই হ্যানিবল রোম পরিত্যাগ করলেন। কল্পনা করতে কৌতুহল হয়, যে সিংহবাহিনী দেবী ফ্রিজিয়া থেকে রোমে গেলেন, তাঁর পক্ষে কি রোমক বণিকদের জাহাজে চেপে বঙ্গ দেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরে নামা একান্তই অসম্ভব? এও কি হতে পারে, এই দেবীর পূজো এমন কোন স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল যাদের টোটেম মহিষ, যা মহিষমর্দিনী প্রতীকের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে? এমন কি হতে পারে, যে ফ্রিজিয়ার শস্য ও যুদ্ধদেবীর সমীকরণ হয়েছিল ভারতীয় শস্য ও যুদ্ধদেবী দুর্গার সঙ্গে?

ভারতীয় ধর্মে চৈনিক প্রভাবের কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে, এখানে নূতন করে আর কিছু বলার নেই।

২। ভারতে যিহুদি প্রভুবাদ

বাইবেলের পুরাতন বিধি অংশে যিহুদি জাতির যে ধর্মব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় তা পুরোদস্তুর একেশ্বরবাদী। এই দেবতার কোন নাম নেই, তাঁকে সম্বোধন করা হয় আদোনাই অর্থাৎ 'আমার প্রভু' বা 'মহাপ্রভু' বলে। পশ্চিম এশিয়ায় তম্মুজ বলে যে দেবতাটি পূজিত হতেন দেবী ইস্তারের প্রণয়ী রূপে, গ্রীসে তিনিই হয়েছেন আদোনিস, যিনি গ্রীক দেবী আফ্রোদিতির প্রণয়ী। নামের দিক থেকে মিল থাকলেও চরিত্রের দিক থেকে হিব্রু আদোনাই ও গ্রীক আদোনিসের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। আদোনাই সর্বশক্তিমান একেশ্বর যিনি জগত সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি মানুষের কার্য যিনি পর্যবেক্ষণ করেন। এই প্রভুবাদী ধর্মের প্রবর্তন করেন মোশি, যে ধর্মের তত্ত্ব লিখিত আছে বাইবেলের পুরাতন বিধি অংশে এবং যা ব্যাখ্যাত হয়েছে হিব্রু তালমুদ ও মিদ্রাস গ্রন্থমালায়। মোশি প্রবর্তিত প্রভুবাদ যিহুদি জাতির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল এ ইঙ্গিত বাইবেলের পুরাতন বিধি অংশে পাওয়া যায়, যদিও ঐতিহাসিক ভাবে সুপ্রাচীন কালে কোন সুনির্দিষ্ট যিহুদি জাতি ছিল এমন কথা বলা যায় না। তৎসত্ত্বেও প্রভুবাদ কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে যিহুদি প্রভুবাদের আগমন ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে, এবং যিহুদিরা কোচিনে তাদের ঘাঁটি ও ধর্মস্থান তৈরি করেছিল। কেরলে যিহুদিদের একটি বিরাট সিনাগগ বা দেবস্থান আজও বর্তমান। ভারতের অন্যত্রও যিহুদি সিনাগগ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ভারতের নানা অঞ্চলে যিহুদিরা বসতি স্থাপন করেছিল, এবং তাদের ধর্মচর্চা তারা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল, বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে তা প্রচারের কোন চেষ্টা করেনি।

৩। ভারতে ঈরানীয় জরথুস্ত্রবাদ

বৈদিক যুগে ভারতের সঙ্গে ঈরানীয় ধর্মীয় সম্পর্কের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আদি ঈরানীয় ধর্ম বৈদিক যুগের ভারতীয় ধর্মের অনুরূপ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ জরথুস্ত্র প্রাচীন ঈরানীয় ধর্ম ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটান। জরথুস্ত্র (সং=জরদ্-উষ্ট্র) রয়ে বা রঘ নামক শহরে একটি রাজকীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পৌরুষ্প, মাতার নাম দুঘোবা। কথিত আছে তাঁর জন্মলগ্নে ঈরানীয় শাসকবর্গ ও সামন্ত শ্রেণী স্বপ্নে জেনেছিল যে এই শিশু একদিন তাদের কাল স্বরূপ হবে, ফলে তারা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল বারবার। জরথুস্ত্রের আসল নাম স্পিতম। বিবাহ এবং কিছুকাল গার্হস্থ্য জীবন যাপনের পর জরথুস্ত্র বুদ্ধের মতই গৃহত্যাগ করেন। মার যেমন বুদ্ধকে প্রলোভিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেইভাবেই অন্যায় ও কুশক্তির প্রতীক আহির্মন (অংগ্র-মইন্যু) তাঁকে প্রলোভিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অবশেষে স্পিতম পরম জ্ঞান লাভ করেন এবং জরথুস্ত্র (জরথ=সুবর্ণময়, উষ্ট্র=আলোক) নামে পরিচিত হন। অতঃপর তাঁর প্রচারক জীবন শুরু হয়। তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা মৈদ্যোইমাওংঘ তাঁর প্রথম শিষ্য হন। পরে ব্যাক্‌ট্রিয়ার (বাক্‌ধি) শাসক বিস্তস্প তাঁর ধর্ম অবলম্বন করেন, এবং ঈরানের কুশাসকবর্গকে যুদ্ধে নিহত করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের সাফল্য জরথুস্ত্র নিজের জীবনে দেখে যেতে পেরেছিলেন।

জরথুস্ত্রের মতবাদ তাঁর নামে আরোপিত গাথাসমূহে বর্তমান। অবেস্তার যে অংশটাকে বলা হয় যশ-ন, তার ৭২টি হাস্ বা অধ্যায়ের কয়েকটিতে জরথুস্ত্রের গাথাগুলি বর্তমান। এগুলির সংখ্যা পাঁচটি—অহুনবৈতি, উষ্টবৈতি, স্পেন্তা-মৈন্যু, বোহু-খষথ্র, ও বহিষ্টা-ইষ্টি। পহলবী সাহিত্যে জরথুস্ত্রীয় ধর্মের অজস্র ব্যাখ্যা-মূলক গ্রন্থ বর্তমান।

জরথুস্ত্রীয় ধর্মে চরম সত্তা হচ্ছেন বরুণ বা অহুর-মজদা (অসুর মেধস)। তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্য (অমেষা-স্পেন্তা) আছে—অষ-বহিষ্ট (আর্দিবেহেস্ত্), বোহু মনো (বহ্‌মন) খষথ্র-বৈর্য (ষহ্‌রিবর) স্পেন্তা-অর্মইতি (স্পেন্দারমদ্) হউর্বতাৎ (খার্দাদ্) এবং অমেরেতাৎ (অমর্দাদ্)। বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি আধুনিককালে ব্যবহৃত হয়। অষ-বহিষ্ট হচ্ছে অসুর মজদার নিয়মরক্ষাকারী শক্তি। অষ-এর বৈদিক প্রতিশব্দ ঋত যার অর্থ নিয়মশাসিত বিশ্বচরাচর। বোহু-মনো তাঁর মানস সত্তা, যা পরম কল্যাণময়, যা বিশ্বের ভরণ পোষণ করে, এটি তাঁর চিদ্‌শক্তি। খষথ্র বৈর্য তাঁর ক্রিয়া শক্তি। এই তিনটি তাঁর পুরুষ-বৈশিষ্ট্য, অবশিষ্ট তিনটি তাঁর নারী বৈশিষ্ট্য। স্পেন্তা-আর্মইতি তাঁর নারী রূপ যাতে সকলের উদ্ভব এবং যেখানে মৃত্যুর পর সকলে ফিরে আসে। হউর্বতাৎ তাঁর পূর্ণতার প্রতীক, অমেরেতাৎ তাঁর অমরত্বের।

অহুর মজদা দুটি পরস্পরবিরোধী আদর্শের (মৈন্যু) স্রষ্টা—সত্য, ন্যায় ও আলোকের প্রতীক স্পেন্ত-মৈন্যু, অসত্য, অন্যায়, পাপ ও অন্ধকারের প্রতীক অংগ্র-মৈন্যু (অহির্মন)। এই উভয় শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়েই জগৎ ও জীবনের বিকাশ ঘটছে এবং অংগ্র-মৈন্যুকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার মধ্যেই মানবজীবনের পরম সার্থকতা, যা একদিন না একদিন সম্ভব হবেই অনেক অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে। এটা সম্ভব হবে যদি মানুষ তিনটি মূল নীতি মেনে চলে—সুমত বা সৎ চিন্তা, হূখ্‌ত বা সদ্বাক্য (সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলবে না, যা মনু

৪।১৩৮-কে স্মরণ করিয়ে দেয়)। এবং হুবর্ষ্ট বা কর্মযোগ। অসুর-মজদার প্রতীক অগ্নি।

ঈরানে ইসলাম ধর্মের আগমন ও বিকাশের ফলে জরথুষ্ট্রীয় মতবাদ রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমান ঈরানে জরথুষ্ট্রীয় পন্থীর সংখ্যা কুড়ি-হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু ভারতবর্ষে জরথুষ্ট্র-পন্থীদের সংখ্যা দু'লক্ষের মত যাঁরা প্রধানত বোম্বাই অঞ্চলে এবং ভারতের অপরাপর শহরে বাস করেন। এ'দের পূর্বপুরুষরা ধর্মরক্ষার তাগিদে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, এবং মুম্বাই শহর থেকে ৮০ মাইল উত্তরে উদওযাদা নামক স্থানে অহুর মজদার পুত্র ও প্রতীক-রূপী পবিত্র-অগ্নি স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়ায়, এবং আর্থিক দিকে সমৃদ্ধ হওয়ায়, কোন প্রকার সাংস্কৃতিক সংকটে পতিত হননি, এবং নিজেদের ঐতিহ্যকে আজও পর্যন্ত অবিকৃত রাখতে পেরেছেন।

৪। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম: প্রথম পর্যায়

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই ভারতে খ্রীষ্টধর্মের পত্তন হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত একটি গ্রন্থ Acts of Judas Thomas থেকে জানা যায় সাধু টমাস (মার থোমা) উত্তর-পশ্চিম ভারতের পহ্লব বংশীয় রাজা গণ্ডোফারেসের সভায় এসেছিলেন এবং তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কিংবদন্তী হিসাবেই কাহিনীটিকে আগেকার দিনের ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী-কালের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার গণ্ডোফারেস নামক পহ্লব বংশীয় একজন রাজার অস্তিত্ব সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ করায় কিংবদন্তীটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। কিংবদন্তীটি হয়ত সত্য।১ সাধু টমাস পরে জলপথে মালাবার উপকূল বেয়ে ক্র্যাঙ্গানোরে আসেন ৫২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এবং সেখানে কয়েকটি গীর্জা২ স্থাপন করেন। পালুর (বর্তমান চৌঘাট) অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন, এবং এরাই ভারতের প্রথম খ্রীষ্টীয় যাজক শ্রেণীতে পরিণত হন। পরে টমাস পূর্ব উপকূলে গমন করেন, এবং মাদ্রাজে তিনি ধর্মের কারণেই নিহত হন। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে এই ঘটনার সত্যতা অনুমান করা যায়।৩

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে মালাবার অঞ্চলে খ্রীষ্টান বাসিন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ৩৪৩ থেকে ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঈরান ও মেসোপটেমিয়া থেকে বহু খ্রীষ্টান মালাবার অঞ্চলে আসেন, রাজা দ্বিতীয় শাপুরের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। সেখানকার হিন্দুরাজা, সম্ভবত চেরমন পেরুমল তাঁদের

১। J. N. Farquhar, *The Apostle Thomas in North India,* 29.

২। গীর্জা বা চার্চ বলতে যদিও আমরা ধর্মস্থান বুঝি, খ্রীষ্টধর্মে চার্চ একটি তত্ত্ব, এবং বেশ জটিল তত্ত্ব। একটি অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যার সাহায্যে বলা যায় যে মানব হৃদয় ঈশ্বরের আসন, এবং সেই হিসাবে চার্চ প্রতিটি খ্রীষ্টানেরই মানস সত্তার—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত—প্রতীক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি একাধিক অর্থ-যুক্ত। উপাসনা মন্দির ছাড়া শব্দটির দ্বারা গোষ্ঠী, সম্প্রদায় প্রভৃতি বোঝায়। বঙ্গদেশের বর্তমান খ্রীষ্টানগণ চার্চ বা গীর্জার প্রতিশব্দ হিসাবে 'মণ্ডলী' কথাটি ব্যবহার করেন।

৩। Farquhar in *Bulletin of John Rylands Library* (1927) 32 ff ; D. Ferroli, *The Jesuits in Malabar* (1939), I. 58.

আশ্রয় দেন এবং সুযোগ সুবিধা দেন। তাঁদের নেতা ছিলেন কনে থোম্মান (টমাস কানানাউস) বা বণিক টমাস। এখানেই গড়ে ওঠে কার্যত প্রথম সমৃদ্ধ খৃষ্টান বসতি। মালাবার অঞ্চলের এই আদি খৃষ্টানরা ছিলেন সিরীয় গীর্জার অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের শাস্ত্রের ভাষা ছিল প্রাচীন সিরীয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের আলেকজান্দ্রীয় বণিক কোসমাস ইণ্ডিকোপ্লেউস্টেস (ভারত-ভ্রমণকারী কোসমাস) দক্ষিণ ভারতে একটি গীর্জা ও তার যাজকের উল্লেখ করেছেন।১ পশ্চিম এশিয়া থেকে মালাবার অঞ্চলে যে ঝাঁকে ঝাঁকে খৃষ্টানরা এসেছিলেন, তার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। নবম শতকের কতিপয় তাম্রশাসনে খৃষ্টানদের জমি বিলি করার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মাদ্রাজের সেণ্ট টমাস পাহাড়ে প্রোথিত কতিপয় ক্রসে এবং কেরলের কোট্টায়ামে একটি গীর্জায় কয়েকটি লেখের সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে মালাবার গীর্জার সঙ্গে ইরানীয় গীর্জার কিছু সম্পর্ক ছিল। এই গীর্জা যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা কালক্রমে পূর্ব সিরীয় বা নেস্টোরীয় বা নিছক পূর্বদেশীয় সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত।

মালাবার গীর্জায় যে সকল বিদেশী পর্যটক এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত ভিনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো, ফ্রান্সিস্কীয় সন্ন্যাসী মণ্টে কর্ভিনোর জন ও ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত তুলুসের ফ্রায়ার জর্ডান এবং চতুর্দশ শতকের জন দে মারিগ্নোল্লি। শেষোক্ত জন লিখেছেনঃ

On Palm Sunday (1348), we arrived at a very noble city of India called Quilon, where the whole world's pepper is produced··· Nor are the Saracens the proprietors, but the Christians of St. Thomas, and these latter are the masters of the public weighing office from which I derived, as a perquisite of my office as Pope's Legate, every month a hundred gold *fanams* and a thousand when I left.২

সিরীয় খৃষ্টানরাই এদেশের আদি খৃষ্টান যাঁরা খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছেন। ভারতের মাটিতে খৃষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের অনেক শাখার থেকেই প্রাচীন। কাজেই সঙ্গত ভাবেই একটা প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় ধর্মের উপর খৃষ্টধর্মের কি কোন প্রভাব থাকতে পারে না? শঙ্করাচার্য কেরলের মাটিতে নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটা কি সম্ভব, তিনি খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে (এবং ইসলাম সম্পর্কে) খোঁজখবর রাখতেন না? খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে রচিত তামিল কবিতা তিরুক্কুরলের বহুস্থলেই বাইবেলের প্রভাব দেখা যায়। কুরল কাব্যের ইংরাজী অনুবাদক ডঃ পোপ তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেনঃ The Christian Scriptures were among the sources from which the poet derived his inspiration.৩

১। Cosmas Indicopleustes, *Christiana Topographia* III (Mgine, *Patrologia Graeca* cols. 169-70); cf. J. Richter, *A History of Missions in India* (Eng tr. S. H. Moore), 31-32.

২। Quoted in D. Ferroli, *op. cit*, 66.

৩। G. U. Pope, *The Sacred Kurral of Tiruvalluva-Nayanar* (1886), intro. IV.

ভগবদ্গীতায় কয়েকটি শ্লোকের সঙ্গে যোহন কথিত সুসমাচারের সাদৃশ্য বর্তমান। খৃীষ্টীয় প্রেম (*agape*) এবং বিশ্বাসের (*pistis*) ধারণা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের ভারতীয়, বিশেষ করে বৈষ্ণব, ভক্তিবাদকে প্রভাবিত করলেও করতে পারে। এই প্রসঙ্গে গ্রীয়ারসন লিখেছেন:

But it was in Southern India that Christianity as a doctrine, exercised the greatest influence on Hinduism generally. Although the conception of the fatherhood of God and *bhakti* were indigenous, they received an immense impetus owing to the beliefs of Christian communities reacting upon the medieval Bhagavata reformers of the South.[১]

হপকিন্স, ভাণ্ডারকর, গার্বে, ম্যাকনিকল প্রমুখ পণ্ডিতেরা উপরি উক্ত ধারণা সমর্থন করেন। হপকিন্সের মতে কৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে খৃীষ্টের জীবনকাহিনীর মিল আছে।[২] এই মতের বিশেষ কোন ভিত্তি নেই, কেননা খৃীষ্ট-জীবনীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কৃষ্ণকাহিনীর ইঙ্গিত প্রাক্-খৃীষ্টীয় ভারতীয় রচনায় পাওয়া যায়। ভাণ্ডারকরের মতে গোপজাতীয় আভীরেরা, যারা আগে ভারতের বাইরের অধিবাসী ছিল, খৃীষ্টীয় কাহিনীসমূহকে এদেশে আমদানী করেছিল যা পরবর্তীকালে গোপাল-কৃষ্ণের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৩] এই বক্তব্যকেও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু মনগড়া তত্ত্বেরও যে সৃষ্টি পণ্ডিতেরা করেননি তা নয়। কিন্তু সে কথা এখানে বিবেচ্য নয়। কৃষ্ণের সঙ্গে খৃীষ্টের সমীকরণ সম্ভব না হলেও, ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তায় খৃীষ্টধর্মের অবদান অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতীয় ভক্তিবাদ খৃীষ্টধর্মের কাছ থেকে অত্যন্ত বড় ধরনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। ম্যাকনিকল যথার্থই বলেছেন:

It seems highly probable, when we consider the region in which the revival of *bhakti* in the time of Ramanuja took place, and its nearness to the Nestorian Christians of South India, that he had some acquaintance with the Christian truth···R. G. Bhandarkar is probably on surer ground when he suggests that "some of the finer points in the theory of *prapatti* may be traced to the influence of Christianity"···This is in agreement with our view that the whole intensification of the spirit of *bhakti*, of which the doctrine of *prapatti* is an instance, may be due to Christian sentiment making itself felt in the South.[৪]

১। *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, II. 550.
২। E. W. Hopkins, *Religions of India* (1895) 430.
৩। R. G. Bhandarkar, *op. cit.*, ch IX ; cf. *Indian Antiquary* (1912), 15.
৪। N. Macnicol, *Indian Theism* (1915), App. E.

৫। ভারতে খ্রীষ্টধর্মঃ দ্বিতীয় পর্যায়

এদেশে খ্রীষ্টান অনুপ্রবেশ ঘটেছিল মোটামুটি দু'দিক থেকে, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম। প্রথমটি সোজা পশ্চিম এশিয়া থেকে ঈরান, দ্বিতীয়টি আর্মেনিয়া থেকে ঈরান। ঈরান থেকে একদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারত, অপর দিকে জলপথে মালাবার উপকূল। ইউফ্রাতেস ও তাইগ্রিস নদীর ঠিক উত্তরে আর্মেনিয়া সাধু গ্রেগোরীর (Gregory the Illuminator, ২৫৭-৩৩১ খ্রীঃ) প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টধর্মের একটি বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। আর্মেনিয়া ও ঈরানের মাঝখানে অবস্থিত এডেসা সিরীয় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের একটা বড় ঘাঁটি হয়ে ওঠে, এবং এখানেই বাইবেলের পেশিটো সংস্করণ রচিত হয়। এডেসা ছাড়া আরও একটি ঘাঁটি ছিল, তাইগ্রিসের পূর্বে আডিয়াবেন প্রদেশ এবং তার রাজধানী আরবেল। ২২৫ খ্রীষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়া ও ঈরানে ২০টির অধিক বিভিন্ন বিশপাধীন কেন্দ্র ছিল।১ ঈরান খ্রীষ্টধর্মের একটি বড় ঘাঁটি হয়েছিল। রোমের সঙ্গে বিবাদের জন্য ঈরানের রাজারা রোম বিরোধী খ্রীষ্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ঈরানের খ্রীষ্টানরা ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত চালসেডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি মানতে অস্বীকার করেন এবং ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের নেস্টোরীয় বলে ঘোষণা করেন। চতুর্থ শতকের ঈরানীয় সম্রাট দ্বিতীয় শা'পুর খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী হওয়ায় স্থানীয় খ্রীষ্টানদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করেন, যার ফলে অজস্র খ্রীষ্টান জলপথে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে পালিয়ে আসেন, যে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে কিছু খ্রীষ্টান ছিলেন, যে জায়গাটা ঈরান থেকে খুব দূর নয়। মালাবার উপকূলের বর্ধিষ্ণু খ্রীষ্টানদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতে একজন মেট্রোপলিটান ছিলেন এবং তাঁর অধীনে যে দশজন বিশপ ছিল তার প্রমাণ আছে।২ সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, পিকিং-এর নিকটবর্তী সি-গান-ফুতে অষ্টম শতকের একটি নেস্টোরীয় স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থিতি যার প্রমাণ। চতুর্দশ শতকের একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে তখন ভারতবর্ষে ১৩ জন, চীনে ১২ জন, সমরকন্দে ১৮ জন, তুর্কীস্তানে ১৯ জন এবং খান-বালিকে ২৩ জন মেট্রোপলিটান ছিলেন।৩ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ শতকে পাটনায় একজন মেট্রোপলিটানের অবস্থিতির প্রমাণ আছে। মার্কো পোলো মধ্য ভারতের ছয়জন সীমান্ত রাজার উল্লেখ করেছেন, যাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন খ্রীষ্টান।৪ বোম্বাই-এর নিকট থানা এবং কল্যাণে এবং পাঞ্জাবের গণ্ডিসপুরে (বর্তমান শাহাবাদ) খ্রীষ্টান বসতির অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। চারজন ফ্রান্সিস্কীয় সাধু (ভারতবর্ষের এঁরাই প্রথম ইউরোপীয় সাধু) ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে ওই অঞ্চলের শাসকের প্ররোচনায় নিহত হয়েছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ওই শাসকের প্রাণদণ্ডের বিধান করেন। মুহম্মদ তুঘলক খ্রীষ্টানদের বিরোধী ছিলেন। তৈমুরের আক্রমণে অনেক গীর্জা ধ্বংস হয়েছিল, এবং উত্তর-পশ্চিমে খ্রীষ্টধর্মের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ভারতের এই হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস।

১। A. Mingana, *Early Spread of Christianity*, 4.

২। *Ibid.* 6.

৩। B. J. Kidd, *Churches of Eastern Christendom*, 92.

৪। Codiers, *Marco Polo*, II. 437.

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে ভাস্কো-ডা-গামার আগমন রোমান ক্যাথলিক গীর্জা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক গোয়া দখল করে এদেশে পর্তুগীজ উপনিবেশের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। পোপ পঞ্চম নিকোলাসের নির্দেশে পর্তুগালের সম্রাট অধিকৃত এলাকাগুলিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং এই সূত্র ধরেই ভারতবর্ষে ফ্রান্সিস্কান, ডোমিনিকান ও জেসুইট মিশনারীরা আসেন। তারপর আসেন অগাস্টিনিয়ান এবং কারমেলাইটিস মিশনারীরা। প্রথমে আসেন ফ্রান্সিস্কানরা (১৫১৭ খ্রীঃ) এবং তাঁদের থেকেই গোয়ার প্রথম বিশপ দোম জন দে আলবুকার্ক (১৫৩৮-৫৩ খ্রীঃ) নিযুক্ত হন। জেসুইটদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ফ্রান্সিস জেভিয়ার (১৫০৬-৫২ খ্রীঃ) যিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রাণপাত করেছিলেন। অগাস্টিনিয়ানরা হুগলীর ব্যান্ডেলের বিখ্যাত গীর্জা তৈরী করেন ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তাঁদের এলাকা ছিল উড়িষ্যার সমুদ্রতীরবর্তী পিপ্‌লি থেকে শুরু করে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। কার্মেলাইটিসরা সুরাট, বোম্বাই ও কোচিনে ঘাঁটি করেছিলেন। এদেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইতালীর রোবার্ত দে নোবিলির (১৫৭৭-১৬৫৬ খ্রীঃ) অবদানও উল্লেখযোগ্য। ইনি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পোষাক পরিধান করতেন। ইতালীয় কাপুচিনরা চন্দননগর ও পাটনায় রোমান ক্যাথলিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। রোমান ক্যাথলিক ছাড়া আরও একটি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় এদেশে গীর্জা স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন আর্মেনীয়। সম্ভবত চুঁচুড়ার আর্মেনীয় গীর্জা হচ্ছে সর্বপ্রাচীন টিঁকে থাকা আর্মেনীয় গীর্জা, যেটি স্থাপিত হয়েছিল ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

রোমান ক্যাথলিক গীর্জার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সিরীয় মণ্ডলীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার আর্চ বিশপ আলেক্‌সিও দে মেঞ্জেসের আগমন উপলক্ষে এই বিরোধ তীব্রতর হয়। ঘটনাচক্রে, ডায়াম্পোয় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে সিরীয় গীর্জা রোমান ক্যাথলিক প্রাধান্য মানতে বাধ্য হয়, কিন্তু পরে ডাচদের প্রভাবে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সিরীয় গীর্জা পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই ঘটনাটি কুনেন্‌ক্রশ ঘোষণা নামে খ্যাত। আন্তিয়োখের জাকোবাইট প্রধান (প্যাট্রিয়ার্ক) প্রেরিত বিশপদের অধীনে সিরীয় গীর্জা নূতনভাবে সংগঠিত হয়।[১] জেসুইটরা মুঘল দরবারে স্থান করে নেন এবং আকবর ও জাহাঙ্গীরের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পান। শাহজাহানের ও ঔরঙ্গজেবের সময়ও এই পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকে, যদিও পর্তুগীজ শক্তির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেসুইটদের প্রাধান্যও বিলুপ্ত হয় এবং তাঁদের স্থান গ্রহণ করেন কার্মেলাইটি এবং কাপুচিনেরা।[২] এঁরাই শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক গীর্জার ধারক হন।

১। বর্তমানে কেরল ও মালাবার উপকূলের বিশ লক্ষের উপর সিরীয় খ্রীষ্টান পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—(১) যাঁরা পোপের আনুগত্য মানেন এবং রোমক-সিরীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করেন; (২) যাঁরা আন্তিয়োকের প্যাট্রিয়ার্কের আনুগত্য মানেন (এঁরা হলেন জাকোবাইট অর্থোডক্স সম্প্রদায়); (৩) যাঁরা সর্বরকম বৈদেশিক সংশ্রব বর্জনের পক্ষপাতী (এঁরা মারু থোমা সিরীয় নামে পরিচিত); (৪) যাঁরা নেস্টোরীয় মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, (এঁদের সদর দপ্তর আমেরিকায়) এবং (৫) যাঁরা বৃহত্তর দক্ষিণ ভারতীয় মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।

২। শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে হুগলীর পর্তুগীজরা পরাজিত হয় যার ফলে কার্যত বঙ্গদেশ থেকে পর্তুগীজরা উৎখাত হয়ে যায়।

বঙ্গদেশে কাপুচিনরা কৃষ্ণনগরে একটি ঘাঁটি তৈরী করেন যেখানে আজও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য রোমান ক্যাথলিক বসতি বর্তমান। চন্দননগর ও শ্রীরামপুরেও এঁরা গীর্জা তৈরী করেন। পাটনা এবং আগ্রাতেও এঁরা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিকদের নেতৃত্ব আসে কর্মেলাইটিদের হাতে।

দক্ষিণের রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মিশনারীরা কিছু কিছু সামাজিক কাজও করেছিলেন। গোয়া, কোচিন এবং ক্রাঙ্গানোরে তাঁরা কয়েকটি সেমিনারি স্থাপন করেন যেখানে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাদানও চলত। জেসুইটরা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপাখানা এদেশে নিয়ে আসেন। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের প্রচেষ্টায় মালয়লম ভাষায় একটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেটি সম্ভবত প্রথম ভারতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ। মালয়লম হরফ তৈরী করেছিলেন জন গঞ্জালভেস, যিনি জাতিতে ছিলেন স্প্যানিশ। বঙ্গদেশেও রোমান ক্যাথলিক মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে পূর্ববঙ্গের শ্রীপুর থেকে ফ্রান্সিস্কো ফার্নাণ্ডেজ লিখিত একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে তাঁর রচিত দুখানি খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং কথোপকথনমূলক একটি পুস্তিকা অপর একজন মিশনারী অনুবাদ করেছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থ হয়ত আরও অনেক ছিল, কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র দুটি গ্রন্থ— 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ।' প্রথম গ্রন্থটির লেখকের পিতা ভূষণা নামক পূর্ববঙ্গের একটি স্থানের শাসক ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের মগ জলদস্যুরা তাঁকে অপহরণ করে পর্তুগীজ মিশনারী মানুয়েল দ্য রোজারিওর নিকট বিক্রয় করে। ওই শাসকপুত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে দোম আন্তোনিও নাম গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টধর্ম যে হিন্দুধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থটি রচনা করেন। বইটি ধর্মপ্রচারের খুবই উপযোগী ছিল এবং সেই কারণে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বইটি লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয় এবং তার বঙ্গানুবাদ করেন মনোয়েল দ্য আসুম্পসাও নামক আর একজন মিশনারী। শেষোক্তজন দ্বিতীয় গ্রন্থটি অর্থাৎ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' গ্রন্থটির লেখক, যেটি রচিত হয় ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল শহরে ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৬। ভারতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব

৬১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুহম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু করেন এবং ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তা আরবের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম ধর্ম এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকটা অঞ্চলে এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে প্রাধান্যলাভ করতে সমর্থ হয়। ইসলাম আরবের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনতে সক্ষম হয়, এবং তারই পরিণামে গড়ে ওঠা আরবের রাষ্ট্রশক্তি ইসলামের বাণীকে দিকে দিগন্তে প্রসারিত করার দায়িত্ব নেয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব বণিকেরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে সিন্ধুতে আরব বসতির পরিচয় পাওয়া

ব্যাণ্ডেলের গীর্জাটি ছিল, জেসুইটদের নয়, অগাষ্টিনিয়ানদের। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এই গীর্জার পুনর্গঠনে শাহজাহান কিছু সাহায্য করেছিলেন।

যায়। সিন্ধুর রাজা দাহরের সৈন্যবাহিনীতে ৫০০-র মত আরব ছিল, একথা চচ্‌নামা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ইব্‌ন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের ফলে ভারতের একপ্রান্তে একটি ছোট মুসলিম রাজত্বের পত্তন হয়।

সিন্ধুতে আরব অধিকার দীর্ঘকাল বজায় থাকে নি তার কারণ মঙ্গোলদের হাতে কেন্দ্রীয় আরবশক্তির বিপর্যয়। ইসলামধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবীয় সংস্কৃতির চরিত্র ছিল একেবারেই উপজাতীয়। শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরবরা যুগোপযোগী জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, এবং সেই হিসাবে গ্রীক-রোম-আলেকজন্দ্রিয়ার জ্ঞানভাণ্ডার তারা আত্মস্থ করেছিল। প্লেটো, আরিস্টটল প্রমুখ চিন্তানায়কদের রচনা তারা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেছিল। ভারতে তাদের স্বল্পকালীন অবস্থিতিতে তারা খুব বেশি কিছু নেবার সুযোগ পায়নি, তা সত্ত্বেও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেকটাই তারা গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় গণিত ও দর্শনশাস্ত্রের কোন কোন দিক্‌ আরবের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এদেশে আরব অধিকার দীর্ঘকাল বজায় থাকলে, এবং ঘটনাচক্রে আরবের পতন না হলে, হয়ত ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসটা অন্যরকম হত।

পরবর্তীকালে কার্যত যাদের দ্বারা এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটল, তারা কিন্তু আরব নয়, তুর্কী বা তুর্কো-আফগান। এরা ছিল ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা ট্রাইবের দল, যারা ইসলামে সদ্য-দীক্ষিত, যারা তাদের উপজাতীয় সংস্কৃতির উপর ইসলামী প্রভাবে কিছুটা আরবীয় প্রলেপ লাগিয়েছিল কিন্তু আরবীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পারেনি। আরবের কাছ থেকে যেটুকু তারা পেয়েছিল সেটুকুই তারা ধরে রাখতে চেয়েছিল। তারা তা ভারতের উপর চাপিয়েও দিতে পারেনি বা ভারতীয় ঐতিহ্যের সহায়তায় তার পুষ্টিসাধনও করতে পারেনি। ফলে তারা গোড়ার দিকে নিজেদের একপ্রকার মানসিক কূর্মবৃত্তির মধ্যেই আবদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই অবস্থা বজায় রাখা দীর্ঘকাল তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। ক্রমশঃ তাদের ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন, শাসনকার্য প্রভৃতি বিষয়ে তাদের হিন্দুদের উপর নির্ভর-শীল হতে হয়েছিল। ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন মুসলমান গোষ্ঠীর পারস্পরিক লড়াই-এর জন্য বিবদমান পক্ষগুলিকে সামন্ত হিন্দুরাজা ও জমিদারদের উপর নির্ভর করতে হত। আর্থিক প্রয়োজনে হিন্দু বণিকশ্রেণীর দ্বারস্থ হতে হত। ব্যবহারিক জীবনে এই সহাবস্থানটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, ধর্মটা গৌণ।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ, রাজ্যের স্বার্থ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা থেকে আগত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের মানসিকতা, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে ব্যবহার, প্রভৃতির জটিলতার ফলে মাঝে মাঝে নির্যাতন, রক্তপাতসহ প্রচণ্ড মত-সংঘাত প্রভৃতি সত্ত্বেও, খাদ্য পরিধেয়, জীবনযাত্রা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা ব্যাপারে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এই আগন্তুকেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছিল। এদেশে তুর্কীদের আগমন ঘটেছিল ভাগ্যান্বেষী ও শাসক হিসাবে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল একান্তভাবেই গৌণ। বৈষম্যমূলক সমাজের অস্তিত্ব শাসকদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে সর্বদাই অনুকূল থাকে, কাজেই প্রচলিত ভারতীয় ব্যবস্থা তাদের খুব খারাপ লাগেনি, বরং এক ধরনের জাতিপ্রথা স্বধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও তারা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যেসব নিম্নবর্ণেরা হয়ত সামাজিক ন্যায় বিচারের আশাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা তা পায়নি। ধর্মবদল করলেও পেশার বদল হয়নি, মর্যাদারও বৃদ্ধি হয়নি, শাসকদের

চোখেও নয়। এমন কি উচ্চদের ক্ষেত্রেও ভারতে দীক্ষিত মুসলমান ও বহিরাগত মুসলমানদের মর্যাদার পার্থক্য ছিল।

ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার হয়েছিল মূলত চারভাবে। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের কিছু ঘটনা ভারতের ইতিহাসে আছে, কিন্তু এগুলি ঘটেছিল একান্তই স্থানীয় ও বিচ্ছিন্নভাবে। কোন মুসলমান রাজাই হিন্দু জনগণকে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করার পরিকল্পনা নেননি, এবং আমরা আগেই দেখেছি ইসলামের প্রসারে হিন্দুরা বিশেষ কোন বিপদের ঘ্রাণ পাননি। হিন্দু ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারায় বহুমুখী বিকাশ মুসলমান যুগেই ঘটেছিল। রাজকীয় প্রচেষ্টায় যে সব ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটেছে সেগুলি মূলত বিদ্রোহী সামন্ত রাজাদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়েছে, সকলের ক্ষেত্রে নয়। ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমান ও সর্বশক্তিমান সম্রাটও শিবাজীর পৌত্র শাহুকে ইসলামে দীক্ষিত করেননি, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহী প্রভুর ভবিষ্যৎ আনুগত্যমূলক আচরণের গ্যারাণ্টির হিসাবে তাঁর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রভুর হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন, এমন উদাহরণ আছে। ব্যাপারটা রাজনৈতিক। অধিকাংশ লোকের ইসলামে দীক্ষিত হবার পিছনে কোন জবরদস্তি ছিল না। প্রচলিত হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, উচ্চবর্ণের উৎপীড়ন এই সকল কারণে অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ নিছকই শাসকশ্রেণীর কৃপাভাজন হবার জন্য এবং ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, এবং কেউ কেউ নিছকই আদর্শের খাতিরে।

প্রকৃতপক্ষে বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার চাপে এবং গোষ্ঠী ও দলগত আনুগত্যের ঘাতপ্রতিঘাতে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়, শাসকের ব্যক্তিগত উদারতা বা ধর্মান্ধতা দিয়ে নয়, কাজেই ঐতিহাসিকের কাছে আকবরের উদারতা বা ঔরঙ্গজেবের সংকীর্ণতার বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকার কথা নয়, যদিও সচরাচর ঐতিহাসিকেরা এই ভুল জায়গাটির উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। কোন মুসলমান শাসকই সর্বস্তরে পুরাতন ব্যক্তিদের ছাঁটাই করে তাঁদের নিজেদের লোক নিয়োগ করেননি। পুরোনো আমলের রাজা, রাণা, জমিদার, চৌধুরী প্রভৃতি সকলেই স্বপদে ও স্বমর্যাদায় বহাল ছিলেন, সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে ও নির্দিষ্ট কর দিয়ে। মুসলমান যুগে শাসনব্যবস্থার নিম্নস্তরে সার্বিকভাবে এবং উচ্চস্তরে ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দুরাই সর্বেসর্বা থেকে গিয়েছিল, এটাই ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দুদের জিজিয়া কর দিতে হত, এও যেমন সত্য, মুসলমানদেরও জাকৎ কর দিতে হত, এটাও তেমনি সত্য। আরও মজার কথা, ব্রাহ্মণেরা জিজিয়া করের আওতা থেকে বাদ পড়ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সপ্তদশ শতকে যখন মারাঠা, শিখ ও জাঠ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল এবং মুঘলদের সঙ্গে যখন মারাঠা ও শিখদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল, তখনও কিন্তু সামাজিক জীবনে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।

ভারতবর্ষের মুসলমান সুলতানগণ এক ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদকে মেনে নিয়েছিলেন। এদেশে বসবাসকারী মুসলমান ধর্মীয় পদাধিকারীরা ব্রাহ্মণদের মতই একটি স্বতন্ত্র সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে বিরাজ করতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সংস্কৃত জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে যেমন সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন, মুসলমান ধর্মীয় পদাধিকারীরাও তাঁদের আরবী জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে অনুরূপ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। শাসক শ্রেণীর সঙ্গে যেমন ব্রাহ্মণশ্রেণী সুনিবিড় যোগাযোগ রেখে চলতেন, এবং তাঁদের স্বার্থের অনুকূলে বিধান দিতেন, এঁরাও ঠিক তাই করতেন। সম্রাট আকবরের নয়জন স্ত্রী ছিলেন! আকবর উলেমাদের

এক সভায় প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন, কারণ চারটির অধিক স্ত্রী রাখার বিধান ইসলামে নেই। তৎক্ষণাৎ একজন উলেমা স্বরচিত একটি শ্লোক শুনিয়ে বিধান দিলেন যে সম্রাট ইচ্ছা করলে আঠারোজন পত্নী রাখতে পারেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর একজন ওই শ্লোকেরই একটি মনগড়া ব্যাখ্যা করে বললেন যে ওটা আসলে নয়জনই হবে। নিম্নশ্রেণীর দীক্ষিত মুসলমানরা শূদ্ররূপেই গণ্য হতেন। জিয়াউদ্দীন বারৌণি একটি ফরমানের উল্লেখ করে বলেছেন, "ধর্মগুরুর নির্দেশ হচ্ছে যে তাঁরা যেন শূকর ও ভল্লুকদের গলায় সোনার শিকল না পরান...ক্ষুদ্র ও সামান্য ব্যক্তিদের, দোকানদার ও নিম্নবর্ণের লোকদের তাঁরা যেন প্রার্থনা, উপবাস ইত্যাদি ব্যাপারের নিয়ম ছাড়া অন্য কিছু না শেখান।" এটা মনুর বিধানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভবত এই কারণেই দীক্ষিত অনেক নিম্নবর্ণের মুসলমান মধ্যযুগের সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলনগুলির শরিক হয়েছিলেন, এবং তার নেতৃত্বও দিয়েছিলেন।

৭। ইসলাম ধর্মের মূলকথা

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের যুগে জনজীবনে সত্যকার ইসলাম কতদূর প্রতিফলিত হয়েছিল, সে বিষয়ে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ধর্মমত হিসাবে ইসলাম অত্যন্ত প্রগতিশীল। ইসলামী একেশ্বরবাদী তত্ত্বের মধ্যে সাম্যনীতি নিহিত। যদি ঈশ্বর এক হন যদি তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে সকলেই সমান। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের সমান, যা থেকে মিল্লাৎ বা মুসলমান সৌভ্রাত্রের ধারণাটি গড়ে উঠেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামধর্মে কোন সঙ্কীর্ণ শাসকগোষ্ঠী এবং কোন সঙ্কীর্ণ পুরোহিতগোষ্ঠীর স্থান নেই।১

ইসলাম ধর্ম জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটি মূল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোরানে মুহম্মদ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ জ্ঞান অর্জন কর, যা তোমাকে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের ভেদ করতে সাহায্য করবে, তোমার স্বর্গের পথ আলোকিত করবে, মরুভূমিতে তোমার বন্ধু হবে, নির্জনে তোমার সমাজ হবে, একাকীত্বে তোমার সঙ্গী হবে, তোমার সুখের নির্দেশক, তোমার দুঃখের মুক্তিদাতা, তোমার বন্ধুদের অলঙ্কার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্মস্বরূপ হবে। আল্লাহ্-র প্রতি পরম নির্ভরতাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্তব্য।২ আরবী ইবদুন শব্দটির দ্বারা নিজেকে পুরোদস্তুর ঈশ্বরের সেবকে রূপান্তরিত করা বোঝায়।

আল্লাহ্ বিশ্বস্রষ্টা৩ যিনি একই সঙ্গে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত। তিনি দৃষ্টির অতীত৪, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সর্বদা স্মরণীয়। তুমি তাঁকে স্মরণ করলে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন; তুমি তাঁকে ডাক দিলে তিনি অবশ্যই সাড়া দেবেন।৫ এই স্মরণকে

১। সপ্তম-অষ্টম শতকে যখন ইসলাম ধর্ম একটা বিরাট ভূখণ্ডের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তখন থেকে স্বৈরতান্ত্রিক রাজারা, ঈশ্বরদত্ত অধিকারের দাবিতে, রাজ্যশাসন শুরু করেছিলেন এবং তাঁদের অধীনস্থ সংকীর্ণ শাসকগোষ্ঠীগুলির, এবং তারই সঙ্গে তাল রেখে পুরোহিত গোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব হয়েছিল।

২। ৫১, ৬৭। ৩। ৪২, ১১। ৪। ৬, ১০৪।

৫। ২, ১৫২; ২০, ১২৪-২৬; ৪০, ৬০; ৪৩-৯।

বলা হয় ধিক্‌র্‌, এবং একাগ্রভাবে তাঁকে যিনি স্মরণ করেন তিনি মজ্‌দুব যাঁর সামনে তাঁর মহিমার প্রকাশ ঘটে। আল্লাহ্‌-র মহিমা যুক্তিসিদ্ধ, নতুবা এই বৈচিত্র্যময় জগতের অস্তিত্ব কিভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?১

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্‌ ছাড়াও তাঁর প্রেরিত পুরুষ বর্তমান। ইসলামের সারাৎসার লা-ইলাহ ইলল্লহ্‌ মুহম্মদ-উর-রসুলল্লাহ। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন পরম সত্তা নেই, এবং মুহম্মদ তাঁর দূত। প্রথম অংশটি একই সঙ্গে একটি অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতি—অস্বীকৃতিটি হচ্ছে যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী অন্য কোন কিছুর উপর আরোপ করা যায় না এবং স্বীকৃতিটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণাবলী একমাত্র তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অংশটিতে প্রেরিত পুরুষের কথা বলা হয়েছে। যাঁর নির্দিষ্ট পথ এবং নিয়মাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন আল্লাহ্‌র মহিমাকে উপলব্ধি করার জন্য। মুহম্মদ সেই প্রেরিত পুরুষ।

এখানে ব্যাপারটাকে যতটা সরলভাবে লেখা গেল, ইসলামের ধর্মীয় তত্ত্বগুলি কিন্তু তত সরল নয়, ইসলামীয় দর্শন নিয়ে আলোচনাকালে আমরা যা দেখব। কোরানে মানবসমাজকে যে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়েছে সেগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ (১) তত্ত্বজ্ঞান বা মারফাতে এলাহী, (২) পরলোকতত্ত্ব বা এলমুল মা' আদ এবং (৩) অদৃষ্টবাদ ও কর্মবাদ।

কোরানে মারফাতে এলাহী বা তত্ত্বজ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে পেতে গেলে প্রথমেই তাঁর নাম জপ করতে হবে, নামের মধ্যে নিহিত ভাবের যথাসাধ্য ধারণা করার সঙ্গে মুখে সেই নামের উচ্চারণ। সুরা বকর-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অভিভাবক, তাদের তিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসেন। এই জ্যোতি বা আলোককে কোরানের নুর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিশ্চিত সত্তা, সকল গুণের আকর, সকল ত্রুটি বর্জিত, মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকট বন্ধু যে আল্লাহ্‌ তাঁর মহিমার সম্যক্‌ ধারণার জন্য সাধকের প্রথম যে প্রয়োজন তা হচ্ছে নাম জপ। আল্লাহ্‌ স্বভাবতই প্রেমময়। সুরা মরয়মের একটি আয়াতে (শ্লোক) বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসবান বা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্‌ তাদের অবিলম্বে প্রেম প্রদান করেন।

কোরানের এলমুল মা' আদ বা পরলোকতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে যে দেহের বিনাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না। মানুষ জীবনে সৎ বা অসৎ যা কর্ম করে তার অনুরূপ সুফল বা কুফল তাকে ভোগ করতে হবে। জন্মান্তরবাদ কোরানে স্বীকৃত নয়, কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষকে নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি, এবং নিজের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তা সম্পাদনা করার নাম আমল বা এবাদত। এই এবাদত বা দাসরূপেই আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ মানষের কর্মজীবনের প্রধান সাধনা।

কোরানে বলা হয়েছে, মানুষ ইচ্ছা ও শক্তিশূন্য অচল জড় পদার্থের ন্যায় সম্পূর্ণ অক্ষম নয়, পক্ষান্তরে সে সর্বশক্তিমান এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়। তার শক্তি আছে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ, জ্ঞান আছে কিন্তু তা মায়াপ্রপঞ্চে আচ্ছাদিত, ইচ্ছা আছে কিন্তু তা রিপু ও প্রবৃত্তির প্রভাবে আবিষ্ট। তাই তার জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছার সার্থকতার জন্য সে একান্ত ভাবেই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল।

১। ৩, ১৯০-৯১; ৬, ৯৮-৯৯।

৮। ইসলামীয় দর্শন

হজরত মুহম্মদের যাঁরা প্রত্যক্ষ সাহচর্য পেয়েছিলেন তাঁরা সাহাবা নামে পরিচিত। এঁদের মতে কোরানের বাণীকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই কেননা সেগুলি স্বয়ংসিদ্ধ। তাঁর পরবর্তীকালের অনুগামীরা তবিয়ুন নামে পরিচিত, এবং এঁরা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও মানবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে নানা রকম প্রশ্ন তুলেছিলেন। কালক্রমে এই শেষোক্তেরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, একদল যাঁরা ঈশ্বরের শাশ্বত নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী, যাঁদের বলা হত জবরীয়া, এবং অপরদল যাঁরা মানব ইচ্ছার স্বাধীন কর্তৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, যাঁদের বলা হত কদরীয়া। পূর্বে আমরা বিভিন্ন হিন্দু একেশ্বরবাদী বেদান্তভিত্তিক ধর্মীয় দর্শনসমূহ আলোচনাকালে দেখেছি যে ব্রহ্মের সঙ্গে জড়জগতের সম্পর্ক নির্ণয়ের সমস্যাটাই ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। অনুরূপ সমস্যা ইসলামীয় চিন্তাবিদ্‌দেরও সামনে উপস্থিত হয়েছিল। জবরীয়ারা এটিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কদরীয়ারা এই সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এঁদের থেকেই মুতাজীলা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

মুতাজীলারা ছিলেন পুরোদস্তুর অদ্বৈতবাদী যাঁরা ঈশ্বরকেই একমাত্র শাশ্বত সত্তারূপে গণ্য করেন এবং পরিদৃশ্যমান জগৎকে তাঁরই স্বরূপশক্তির বিক্ষেপ হিসাবে মনে করেন। এই বক্তব্যকে তাঁরা যুক্তি দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন, এবং তাঁদের বক্তব্য ছিল কোরানের শিক্ষা যুক্তির নির্দেশকে অতিক্রম করেনি। এঁদের প্রেরণায় তিনটি তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল—মুতাকাল্লামীন, যাঁরা শাস্ত্র-প্রমাণবাদী ছিলেন এবং শাস্ত্রীয় মতকেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করার প্রয়াসী ছিলেন, ফলাসীফা বা হুকামা যাঁরা প্রচলিত দার্শনিক বিচার পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং যাঁরা গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, এবং সুফী যাঁদের কথা আমরা পরে বলব।

মুতাজীলারা যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন তা হচ্ছে, বস্তুজগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের প্রসাদেই বস্তুর অস্তিত্ব, সুতরাং বস্তু (জওজর্) কোন চিরন্তন সত্তা নয়, এবং বস্তুরূপও চিরন্তন কিছু নয়। কার্যত বস্তু কতকগুলি গুণের (আরজ) সমবায় মাত্র। পরবর্তীকালের আশ্‌রী-পন্থীরা এই যুক্তিরই ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন এইভাবেঃ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব শর্তাধীন। সকল গুণই চৈতন্যাশ্রিত সম্বন্ধ মাত্র, এবং যেহেতু গুণসংশ্লেষ ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়, সেই-হেতুই বস্তুজগৎ মায়াপ্রপঞ্চময়। বস্তু এবং তার অনিত্য গুণাবলী গঠিত হয় অদৃশ্য উপাদান বা প্রাথমিক বস্তু উপাদান বা পরমাণুর (জওহার্-উল্-ফারদ্) সমবায়ে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুলির প্রতিনিয়তই সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে। অনিত্য গুণাবলী থেকে অবিচ্ছিন্ন, ব্যাপ্তিহীন ও পরিমাণহীন পরমাণুসমূহ আসলে কতকগুলি সম্ভাবনামাত্র এবং তাদেরই কার্যরূপের আভাস, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যারা সংগঠিত হয়। এই পরমাণুসমূহ, যা ব্যোম ও কালেরও উপাদান-কারণ, কিন্তু কোন দ্বৈত সত্তা নয়, কেননা ঈশ্বর যেখানে সর্বাত্মক, এবং ঈশ্বর হতে ভিন্ন সত্তা যেখানে আর কিছু নেই, সেখানে তাঁর ইচ্ছাই উপাদানের স্রষ্টা, এই ইচ্ছাও তাঁর অখণ্ড স্বরূপের অঙ্গীভূত।

ঈশ্বর অদ্বয়, এটাই কোরানের উপদেশ। তাহলে তাঁর ঐশ্বর্য বা বিশেষণগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব কি? যে বিশেষণ বা গুণাবলী দিয়ে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়

সেগুলি কিন্তু একথা প্রমাণ করে না যে ঈশ্বর প্রকৃতি একটি যৌগিক বিষয়। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির বাইরে তাঁর কোন ঐশ্বর্য বা গুণাবলী নেই। তিনি অনির্ণেয় এবং অবিভাজ্য। অদ্বয়ত্বই তাঁরই স্বরূপ। কিন্তু সত্য যদি অদ্বয় হয় তবে বিশ্বের বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা কি? এর উত্তরে বলা হয় বিভিন্নতাধর্মী এই জগৎ ঈশ্বরেরই প্রসাদ (ফয়জ)। একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই স্বরূপ ও সত্তা অভিন্ন, অন্য ক্ষেত্রে তা ভিন্ন হতে পারে। ঈশ্বরের অনাদি চিদ্-শক্তিই তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকল সত্তার সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট সত্তাসমূহের দ্বৈত অস্তিত্ব—সম্ভাব্য ও নিশ্চয়াত্মক—আর এটাই হচ্ছে বহুত্বের উৎস।

আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরম সত্যের তিনটি আকার আছে। প্রথমটি হচ্ছে পরিদৃশ্যমান জগৎ, যেখানে পরম সত্য চিদ্ ও অচিদ্ বিষয়রূপে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় পরম সত্য হচ্ছে অবভাসের জগৎ, যার অস্তিত্ব অনুমান সিদ্ধ। অবভাসের জগৎ বহু যেখানে ঈশ্বর নিজেকে দেখেন আকারসমূহের অনন্ততার মধ্যে, আপন চিত্ত এবং স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রসুপ্ত অবস্থানসমূহের মধ্যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবসমূহের মধ্যে এবং ইহজাগতিক বিকারসমূহের মধ্যে। এই স্থির নির্দিষ্ট প্রতিরূপগুলি বা অবস্থাগুলি নিছক সম্ভাব্য সত্তা মাত্র, তাদের বাহ্য অস্তিত্ব নেই। কিন্তু পরমতম সত্য তিনি যাঁর সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোন বিধেয় আরোপ করতে পারি না। এখানে বহুত্বের অবকাশ নেই।

৯। সুফী মতবাদ

শাস্ত্রপন্থা (কলাম), দর্শন (হিক্মৎ) এবং মরমিয়াবাদ (তমব্বুফ)—ইসলাম ধর্মতত্ত্বের তিনটি ধারারই মূল উৎস কোরান। তৃতীয় ধারাটি সুফী মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের উৎস কোরানের কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। সুফীরা ছিলেন বৈরাগ্যধর্মী সম্প্রদায়, যাঁরা বাহ্য সুখদুঃখ সম্পর্কে উদাসীন, যাঁরা প্রবল আধ্যাত্মিক আবেগের দ্বারা চালিত হতেন, এবং ধর্মীয় নির্দেশের ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অন্তরের পবিত্রতার উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের কয়েকজন সঙ্গীও এই পথের পথিক ছিলেন। ইসলামের সুফীবাদের উদ্ভব আরবে হলেও, এই ভাবধারাটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ঈরানে।

সুফীবাদের উদ্ভব সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে, কেউ কেউ এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন, কেউ বেদান্তের, কেউ আবার নব্য প্লেটোবাদের। ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে সর্বদেশে এবং সর্বকালে এমন এক শ্রেণীর মানুষ থাকেন, যাঁরা প্রচলিত কোন ধর্মীয় আচারের মধ্যেই সন্তোষ পান না, যাঁরা সর্বরকম গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী, যাঁরা মনে করেন মানব হৃদয়েই ঈশ্বরের আসন এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক একান্তই ব্যক্তিগত, এবং সেটার জন্য কোন ধর্মীয় নিয়মকানুন বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয়, যারা সহজমার্গে বিশ্বাসী, যাঁরা মনে করেন দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের আধার। এইরকম আদর্শে বিশ্বাসী বহু মানুষ জগতের সর্বত্রই আছেন এবং ছিলেন। ইসলামে যা সুফীবাদ নামে পরিচিত, তদনুরূপ মতবাদ সর্বধর্মেই আছে, যে কারণে মুসলিম সুফী সাধকেরা সহজেই ভারতের সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলনগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন।

বলাই বাহুল্য কোন সুসংবদ্ধ ধর্মব্যবস্থার গোঁড়া সমর্থক এই সকল বৈপ্লবিক মানসিকতাকে সুনজরে দেখবেন না। জালালুদ্দিন রুমী এবং মনসুর অল্-হল্লাজের

মত মরমীয়া সাধকদেরও বলি হতে হয়েছে। শেষোক্ত, যিনি ইসলামের অদ্বয়বাদের অন্যতম মহৎ প্রবক্তা, নাস্তিক হিসাবে ঘোষিত হয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন অন'ল হক্'ক্ 'আমিই সত্য'। বায়াজিদ বিস্তামি বলেছিলেনঃ আমি অতল মহাসমুদ্র, অনাদি এবং অনন্ত। আমিই ঈশ্বরের সিংহাসন। ফরিদুদ্দীন অত্তার লিখেছিলেনঃ প্রকৃতই আমি ঈশ্বর, আমি ব্যতিরেকে কোন ঈশ্বর নেই। জুনাইদ বলেছিলেনঃ ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে তাঁরই মুখ দিয়ে কথা বলেছেন, যদিও তিনি তখন সেখানে ছিলেন না, তাই মানুষ তা জানে না। এই জাতীয় উক্তি স্বভাবতই গোঁড়া মুসলমানদের বিরক্তি উৎপাদন করত।

সুফীবাদে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষের মানস-সত্তার উপর। অন্তরের বাইরে অন্যত্র ঈশ্বর নেই। দুটি প্রশ্নের উপর সুফীবাদ নির্ভরশীল, কিভাবে মানুষ তার নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবে? ব্যক্তিমানুষ ও বস্তু-জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি? প্রশ্ন দুটির উত্তর হিসাবে দুটি ধারণাতে উপস্থাপিতঃ তরীকৎ বা মার্গ এবং মরীফৎ বা জ্ঞান। মার্গ সাত প্রকারঃ সেবা, প্রেম, ত্যাগ, ধ্যান, যোগ, সংযোগ এবং সমীকরণ। জ্ঞান হচ্ছে সেই বস্তু যা ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটায়। সুফীরা বহুক্ষেত্রেই গুরুবাদী। গুরু হচ্ছেন পীর বা মুর্শিদ। তাঁদের জীবনচর্যার মূল কথা হচ্ছে প্রেম। পরম এবং একমাত্র সত্তা ঈশ্বর। সুফীবাদে জ্ঞান দুইশ্রেণীর, ইল্‌ম্ বা বুদ্ধি আশ্রিত জ্ঞান এবং মরিফৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞান। প্রথম প্রকার জ্ঞানের উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ ও বুদ্ধি। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান ঈশ্বরের প্রসাদে লাভ করা যায়। কাশ্‌ফ-অল্-মহজুব গ্রন্থে সুফীতত্ত্ব ও সাধন-প্রক্রিয়া, সুফীবাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং প্রধান প্রধান সুফীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থের লেখক উসমান বিন্ আলি অল্ হুজীরী ভারতের বাসিন্দা ছিলেন।

১০। সুফীবাদ ও ভারতবর্ষ

সুফীবাদ আগন্তুক মুসলমানদের সঙ্গেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। ভারতবর্ষে সুফীবাদের প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল সিন্ধুপ্রদেশ, সেখান থেকে সমগ্র উত্তর ভারতেই এই মতবাদের প্লাবন ঘটে। যদিও সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে মুসলমান পণ্ডিতদের খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না, সুফী ও দরবেশগণের ব্যাপক জনসংযোগ হিন্দু ভাবুকদের তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। তাঁরাও ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত তাঁদের অনুরূপ ধ্যানধারণার পরিচয় পেয়েছিলেন। এই আদানপ্রদানের ফলে, অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবধারার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সাধকেরা কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। মুসলমান সুফীগণ এবং তাঁদের সম্প্রদায়গুলি কিছু কিছু হিন্দু আচার গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের উপরও সুফীবাদের প্রভাব পড়েছিল।

প্রাচীনতর সুফীদের মধ্যে যাঁরা ভারত ভ্রমণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্‌সুর অল্ হল্লাজ। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এখানে অনেকগুলি মঠকেন্দ্রিক সুফী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যাদের নিজস্ব সাধনপন্থা, আচরণবিধি, নিয়মশৃঙ্খলা ও নীতিশাস্ত্র ছিল। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে চারটি বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল যেগুলি হল যথাক্রমে চিশ্‌তীয়, কাদরীয়, সুহরাবর্দীয় ও নক্‌শ্‌বন্দীয় সম্প্রদায়। প্রতিটি সম্প্রদায়ের থেকেই অনেক শিক্ষাদাতার উদ্ভব

হয়েছিল যাঁরা সমসাময়িক কালে যথেষ্ট প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। হুজীরী লিখেছেন যে সংযম (মুজহদাহ্) ও ধ্যান (মুশহ্দাহ) সম্বন্ধে তাঁদের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠান ও বৈরাগ্যচর্চায় তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ছিল, যদিও সকল সম্প্রদায়েরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যলাভের পথে মানুষকে পরিচালিত করা।

ভারতীয় সুফী সম্প্রদায়গুলিকে তত্ত্বের দিক থেকে দু'ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। একদল চরম অদ্বয়তত্ত্বকে (য়ুজুদীয়া) সমর্থন করতেন, অপর দল সংশোধিত আকারে অদ্বয়তত্ত্ব (শুহুদীয়া) মানতেন। প্রথম দল ইব্‌ন্ এল্-আরবী এবং আব্দুল করিম জীলীর অনুগামী। এদের মধ্যে আবদার রহমান জামী ভারতবর্ষে বহুদিন ছিলেন এবং সুফী দর্শনের একটি সারগ্রন্থ রচনা করেছিলেন চরম অদ্বয়-বাদের ভিত্তিতে। এরা সকলেই তত্ত্বজ্ঞানকে (মারীফৎ) ধর্মবিধির (শরিয়ৎ) উপরে স্থান দিতেন। তত্ত্বের দিক দিয়ে ভারতের মুসলিম সুফী সাধকগণ দুইটি সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন—ঐজুদীয়া ও শুহুদিয়া। প্রথমোক্ত দল বিশ্বাস করতেন যে সকলই ঈশ্বরময় (হামা ওসৎ) এবং শেষোক্ত দল বিশ্বাস করতেন যে সকলই ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত (হাসা আজব ওসৎ)। বিভিন্ন সুফী সম্প্রদায় এখানে মঠ স্থাপন করেছিলেন যেখানে পীর, মুর্শিদ বা শেখগণের অধ্যক্ষতায় মুরীদ বা শিষ্যগণকে আত্মোপলব্ধির পথে (তরীকা) চালিত করা হত।

সুফীবাদের একটি তত্ত্বরূপ ও একটি সাধনরূপ ছিল। শেষোক্তটিতে চিত্তসংযম, বৈরাগ্য-সাধন, ধর্মচর্চা, ধ্যান প্রভৃতির স্থান ছিল। ভারতবর্ষ থেকেও সুফীবাদ অনেকটা প্রেরণা পেয়েছিল। হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদী সাধক ও সুফীদের ধ্যানধারণা ও সাধন পদ্ধতির মধ্যে চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়েরই লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি, পদ্ধতি, ধ্যান (মরাকুবাহ্) ও সংযম (মুজাহিদা)। মনঃ প্রক্রিয়ার চারটি স্তরে দু' তরফই সমভাবে বিশ্বাসী যেগুলি হল জাগ্রত (নাসূৎ), স্বপ্ন (মালাকুৎ), সুষুপ্তি (জবরুৎ) এবং তুরীয় (লাহুৎ)। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে যে ভক্তি আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল বৈধীমার্গ ও বহিরঙ্গ আনুষ্ঠানিকতার প্রতিবাদ। সমস্ত জাগতিক বাসনার নিবৃত্তির মধ্য দিয়ে হৃদয়ের পবিত্রতা সাধনে এবং মানব ইচ্ছাকে ঈশ্বরের নিকট সমর্পণে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মানুষের মূলগত সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং জাতিপ্রথা বর্জন করেছিলেন। শিষ্যকে আলোকপ্রদানের জন্য গুরুর প্রয়োজনে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রবিদ্ পুরোহিতদের প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার করেন নি। সর্বপ্রকার বহিরঙ্গতার তাঁরা নিন্দা করেছেন। এই ভাব আন্দোলনের মূলে মুসলিম সুফী-বাদেরও যে কিছু অবদান ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

১২

আধুনিক পরিণতি

১। ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে মধ্যযুগের ধর্মব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই লৌকিক উপাদানসমূহের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ ও সংস্কারপন্থী সম্প্রদায়সমূহের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি বিষয় সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সুপ্রাচীন যুগ থেকেই লৌকিক দেবদেবীরা ও তাঁদের কেন্দ্র করে নানাধরনের আচার অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের ধর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছে। এই সকল দেবদেবীরা কোন বৃহৎ তত্ত্ব বা ধারণার প্রতিনিধি নন, তাঁরা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন কৃষি, সন্তান-উৎপাদন, রোগ, হিংস্রপশু, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কারো কারো অস্তিত্ব নিছক লোক মুখেই, কেউ কেউ আঞ্চলিক সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন—যেমন মারী-আম্মা, বনবিবি, দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাজী প্রভৃতি—আবার কেউ কেউ সংস্কৃত পুরাণেও স্থান করে নিয়েছেন, যেমন মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি। এই সকল লৌকিক দেবদেবী এবং সেই সঙ্গে দু'চারজন শাস্ত্রীয় দেবদেবী—যেমন কালী, মনসা, শীতলা, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি—মুসলমানদেরও ভয়ভক্তির পাত্র ছিলেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ স্থানীয় হিন্দুদেবতা মুসলমান রাজা বা জমিদারদের প্রেরিত বিশেষ পূজা পেতেন। অনুরূপ ভাবে মুসলমান ধর্মস্থানসমূহ হিন্দুদের শ্রদ্ধার ক্ষেত্র ছিল। গাজী, পীর প্রভৃতিরা হিন্দুদেরও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করতেন। অবশ্য এই মনোভাব সমাজের নীচুতলার অধিবাসীদের ক্ষেত্রেই—কি হিন্দু কি মুসলমান—অধিকতর প্রযোজ্য এবং সুখের বিষয় তারাই জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

লৌকিক দেবদেবীরা ছাড়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি সংস্কারপন্থী আন্দোলন-সমূহের দ্বারা রীতিমত প্রভাবিত হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থী আন্দোলনসমূহ বিশেষ বিশেষ পেশাগত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল, যেমন রবিদাস-সম্প্রদায় চর্মকারদের মধ্যে, নাথ-সম্প্রদায় তন্তুবায়দের মধ্যে, এই রকম। সংস্কারপন্থী নেতারা জাতিভেদ, সঙ্কীর্ণতা, আনুষ্ঠানিকতা প্রভৃতি বর্জন করে মানবহৃদয়কেই ঈশ্বরের আবাসরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে তত্ত্ব ও আচরণের সামঞ্জস্য ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মকে কাছাকাছি আনার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অসামান্য। মধ্যযুগের সংস্কার ও সমন্বয়পন্থী সাধক ও ধর্মগুরুদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের এই ধারাটির যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের মধ্যে বুল্লে শাহ্, পল্টু সাহেব, তুলসী সাহেব, দেধরাজ, সহজানন্দ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য যাঁরা রামমোহনের সমকালীন ছিলেন। যাঁরা সংস্কার-পন্থী আন্দোলনসমূহের নেতৃত্ব করতেন, তাঁরা কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে উপরতলার মানুষদের কাছেও শ্রদ্ধেয় হতে পেরেছিলেন। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও উপরতলার রীতিনীতি অনুসরণের একটা প্রবণতা ছিল। তৎসত্ত্বেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ছিল।

উপরতলার লোকেদের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের রক্ষণশীল দিক্‌গুলির ভূমিকাই অধিকতর সক্রিয় ছিল। এঁরা বহুলাংশেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, এবং এ যুগের মতই নিজের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এঁরা এই মনোভাবটিকে উৎসাহ দিতেন। এদেশের মুসলমান শাসকেরা নিজেদের অস্তিত্বরক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং শাসন পরিচালনার খাতিরে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা মিশিয়ে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঔরঙ্গজেবের মত যাঁরা মিশিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরাই বিপদে পড়েছিলেন। শেখ আহমদ সিরহিন্দির মত ধর্মীয় নেতারা শাসক শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষতা পছন্দ করতেন না। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছাড়াও শিক্ষিত উচ্চবর্গের নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, যা ছিল ধর্মের তাত্ত্বিক দিক্ ও ব্যবহারিক দিকের দ্বন্দ্ব, এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত বচন ও মুক্তবুদ্ধির দ্বন্দ্ব। যাঁরা চুলচেরা বিচারে বরাবর অভ্যস্ত তাঁদের পক্ষে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বাঁধা সমাধান নির্বিচারে হজম করা সহজ ছিল না। স্বভাবতই তাঁরা নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন, যার প্রভূত নিদর্শন মধ্যযুগের রচনাবলীতে পাওয়া যায়, এবং তৎপরবর্তী যুগেও।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মূলত তিনপ্রকার আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়—রক্ষণশীল, প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থী। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল অংশটি তাঁদেরই নিয়ে গঠিত ছিল যাঁরা মূলত শাস্ত্রীয় পঞ্চোপাসনা ও স্মার্ত জীবনাদর্শ মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রগতিশীলদের দলে ছিলেন মুখ্যত তান্ত্রিক ও সংস্কার-পন্থী সম্প্রদায়সমূহ। বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়সমূহ মূলত ছিলেন মধ্যপন্থী, যদিও কালক্রমে তাঁরা রক্ষণশীলে পরিণত হয়েছিলেন। তান্ত্রিকদের ক্ষেত্রেও এই রকম রূপান্তর ঘটেছিল যদিও সামগ্রিকভাবে তান্ত্রিকেরা প্রগতিশীল ধারাটিকেই পুষ্ট করেছিলেন। রামমোহনের চিন্তাধারা গঠনে গোড়ার দিকে ইসলামের এবং পরবর্তীকালে খ্রীষ্টধর্ম ও বেদান্তের প্রভাব থাকলেও, সমাজসংস্কারের মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তন্ত্রশাস্ত্র চর্চার ফলে, যদিও তাঁর সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা খুব একটা সাফল্যলাভ করেনি, যার কারণ আমরা অন্যত্র আলোচনা করব। ইসলাম-ধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ তিনপ্রকার আদর্শের বিকাশ হয়েছিল। রক্ষণশীল মার্গের প্রবক্তা ছিলেন শেখ আহ্‌মদ সির্‌হিন্দি, প্রগতিশীলদের প্রতিনিধি ছিলেন দারা শিকোহ্‌, মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌। এঁদের সম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হবে।

একটা গুজব ইংরাজ ঐতিহাসিকরা সুকৌশলে ছড়িয়েছিলেন যে আটশো বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি অবস্থান করেছে, কিন্তু একে অপরের সম্পর্কে এত শোচনীয়ভাবে অজ্ঞ যে এর অনুরূপ নিদর্শন পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। বিশ শতকের শুরু থেকে যখন ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরবিরোধী শক্তিরূপে আবির্ভূত হচ্ছে তখন এই জাতীয় ধারণাই ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করেছিল। বাস্তবে ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মধ্য ও শেষ মধ্য যুগে উভয় সম্প্রদায়ই উভয়ের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে উভয় ধর্মই খুব কাছাকাছি ছিল যেকথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সমাজের উপরতলার লোকেরা, বিশেষ করে পণ্ডিতবর্গ, পারস্পরিক তত্ত্ব-সমূহের ক্ষেত্রে খোঁজখবর রাখতেন। যদিও মধ্যযুগের হিন্দু তত্ত্বমূলক গ্রন্থসমূহে ইসলামের উল্লেখ নেই, কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে হিন্দু পণ্ডিতেরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। বহু হিন্দুই আরবী ও পার্শী উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন,

বিশেষ করে পার্শী ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দুদের অবদান মুসলমানদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এদেশে মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে আরবীতে এবং মুঘল যুগে পার্শীতে ধর্মগ্রন্থসহ বহু হিন্দু রচনারই অনুবাদ হয়েছিল, যা মোটেই হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের অনাগ্রহের পরিচায়ক নয়। দর্শন, গণিত, চিকিৎসা, রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বহু সংস্কৃত গ্রন্থেরই আরবী অনুবাদ হয়েছিল। মুঘল যুগে পরিকল্পনামাফিক হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতদের সমবেত প্রচেষ্টায় রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতাসহ সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ শুরু হয় পার্শী ভাষায়।১

হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে অষ্টাদশ শতকের সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাঁর সিয়ার-উল-মুতাখেরিন গ্রন্থে যা লিখেছেন তার ইংরাজী তর্জমা নিম্নে দেওয়া হলঃ

And although the Gentoos seem to be a generation apart and distinct from the rest of mankind, and they are swayed by such differences in religion, tenets and rites, as will necessarily render all Musulman aliens and profane, in their eyes; and although they keep up a strangeness of ideas and practices, which beget a wide difference in customs and actions; yet in process of time, they drew nearer and nearer; and as soon as fear and aversion had worn away, we see that this dissimilarity and alienation have terminated in friendship and union, and that the two nations have come to coalesce together into one whole, like milk and sugar that have received a simmering. In one word, we have seen them promote heartily each other's welfare, have common ideas, like brothers from one and the same mother, and feel for each other, as children of the same family.২

২। শেষ-মধ্যযুগে ইসলামধর্ম

পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করে চিশ্‌তীর সুফী সম্প্রদায়ের কেন্দ্র (জবাউইয়া) গড়ে উঠেছিল। প্রায় প্রতিটি সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারেই কোন সুফী ধর্মগুরু বা পীরের আশ্রিত ছিল। সুফী গুরুপরম্পরাও (সিল্‌সিলা) বর্তমান ছিল। রক্ষণশীল মুসলমানদের নিকট কিন্তু সুফী-পন্থীরা খুব সমাদরের পাত্র ছিলেন না। কেন না সুফীপন্থা বা তারীকৎ-এর সঙ্গে ইসলামীয় বিধিব্যবস্থার (শরীয়ৎ) প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত দ্বন্দ্ব বরাবর ছিল। সুফী ছাড়া মাহ্‌দী-পন্থীরাও সংখ্যাল্প হলেও, স্থানে স্থানে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। এই মতবাদে অল্‌-মাহদী একজন সংস্কারকরূপে গৃহীত যাঁকে কেন্দ্র করে জৌনপুরের সৈয়দ মহম্মদ একটি

১। Abul Fazl, *Ain-i-Akbari* (Blochmann's tr. 1927), 122-23; *Indo Iranica*, X. No. 2 (1957) 12.

২। *Siyar-ul-Mutakherin* (tr. published by R. Cambray & Co.) III. 188-89.

উপসম্প্রদায় গড়ে তোলেন এবং বহু শিক্ষিত ও নামকরা ব্যক্তিকে তাঁর অনুগামী করতে সক্ষম হন যাঁদের মধ্যে জালোরের শাসনকর্তা ওসমান খান এবং দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল-মুল্ক ছিলেন। তাঁদের উৎকট শুদ্ধি আন্দোলন বৃহত্তর সুন্নী সম্প্রদায় মেনে নিতে পারেননি।

এছাড়া ছিল শিয়া-সুন্নীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। মুঘল সম্রাটরা সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও, এক ঔরঙ্গজেব ছাড়া আর কেউ শিয়াদের প্রতি উৎপীড়নমূলক ব্যবহার করেননি। বাবরের অনেক বন্ধু ও অনুগামী ছিলেন শিয়া। কথিত আছে তাঁর আশ্রয়দাতা ঈরানের শাহ তহ্মাস্প সফাবীর প্রেরণায় হুমায়ুন শিয়ামতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এটা যদি সত্য নাও হয়, তাহলেও হুমায়ুনের আস্থাভাজনদের মধ্যে অনেক শিয়ামতাবলম্বী ছিলেন, যেমন বৈরাম খান। ঈরানের সঙ্গে মুঘল দরবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং সেখানে ঈরানী ওমরাহ্দের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। এদেশে শিয়া-সুন্নী বিরোধটা ততটা ধর্মীয় কারণে নয়, যতটা রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণে। ঈরানাগত ওমরাহ্রা যে মর্যাদা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি ভোগ করতেন, তা নিয়ে স্থানীয় আমীর-ওমরাহ্ ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, আর সেখানেই ছিল শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের মুখ্য অনুপ্রেরণা।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে আকবর ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদৎখানা স্থাপন করেছিলেন ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে সকল ধর্মের প্রতিনিধিরাই একত্র হয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তিনি শাসনকার্যে উলেমাদের প্রভাব চূর্ণ করেন এবং নিজেকেই ধর্ম ও রাষ্ট্র বিষয়ে সর্বেসর্বা বলে ঘোষণা করেন ও নিজেকে মুজতাহিদ্-ই-আস্র্ বলে পরিচিত করেন। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তাঁর নিজস্ব ধর্মমত দীন-ই-ইলাহী প্রতিষ্ঠা করেন যার মূল আদর্শ ছিল সর্বধর্ম-সমন্বয়। দীন-ই-ইলাহী অবশ্য সফল হয়নি, তবে আকবরের ধর্মনীতির একটি ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ইসলামের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দ্বিমুখী, একটি রক্ষণশীল ও অপরটি প্রগতিশীল, কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ায় যারা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তারা ছিল মুখ্যত দুটি সুফী সম্প্রদায়, নকশ্বন্দীয় ও কাদরীয়; সাধারণ মুসলিম সমাজে অবশ্য এ নিয়ে খুব একটা আলোড়ন হয়নি। দ্বন্দ্বের মূল বিষয়টি ছিল মারীফাৎ 'ও শরীয়ৎ-এর পারস্পরিক অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে। মারীফাৎ বলতে বোঝায় তত্ত্বজ্ঞান, শরীয়ৎ বলতে বোঝায় ধর্মবিধি। কয়েকটি উপসম্প্রদায় একেবারেই শরীয়ৎ-কে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল যারা বে-শারা নামে পরিচিত। নকশ্বন্দীয় সম্প্রদায়ের শেখ আহ্মদ সিরহিন্দি রক্ষণশীল ভাবধারার প্রতিনিধি ছিলেন যিনি ব্যবহারিক ধর্মবিধিকেই তত্ত্বজ্ঞানের উপর স্থান দেবার চেষ্টা করেছিলেন। পক্ষান্তরে কাদরীয় সম্প্রদায়ের মীর মহম্মদ ও মুল্লা শাহ, যাঁর শিষ্য দারা শিকোহ্, মূলত উদারপন্থী ছিলেন। বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন আছে।

৩। শেখ্ আহ্মদ সিরহিন্দি

আগেই বলেছি শেখ্ আহ্মদ সিরহিন্দি (১৫৬৩-১৬২৪ খ্রীঃ) রক্ষণশীল ভাবধারার প্রতিনিধি ছিলেন যিনি দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ইৎবা-ই-সুন্নৎ (বিধি, নির্দেশ ও ঐতিহ্যের অনুসরণ) এবং রাফা-ই-বিদ্‌ৎ (নূতনত্বের আমদানী পরিহার)। তাঁর মতে সাধারণ বুদ্ধিজাত যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের উপলব্ধি

অসম্ভব।১ তাঁর নিজস্ব মতবাদ ওয়াহদাৎ-ই-শুহুদিয় নামে পরিচিত যা অনুযায়ী ঈশ্বর একান্তই পরাৎপর, বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। অতীন্দ্রিয় সমাধি বা বিশুদ্ধ মুক্তচিন্তার দ্বারা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, কেননা এই সকল পদ্ধতিলব্ধ জ্ঞান একান্তই ব্যক্তি নির্ভর যেখানে সংশয়ের অবকাশ থাকে। একমাত্র প্রেরিত পুরুষের নিকট ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মত সিরহিন্দি বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের বিভূতিসমূহের প্রকাশরূপ নয়, তার ছায়ামাত্র, যদিও এই ছায়াকে তিনি মিথ্যা, মায়া, ভ্রম বলে উড়িয়ে দেবার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ পৃথক্, কেননা ঈশ্বর ত্রুটিহীন ও পূর্ণ, বিশ্বজগৎ ত্রুটিযুক্ত ও অপূর্ণ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আবশ্যিক ও শাশ্বত, বিশ্বজগৎ সম্ভাব্য ও কালাধীন। তৎসত্ত্বেও জগৎ সত্য, এবং তা সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, সাধারণ বুদ্ধিতে যা জানা সম্ভব নয়।

যে কোন নূতন তত্ত্ব বা আচরণের উপস্থাপনা তাঁর মতে নীতিবিরুদ্ধ, এক্ষেত্রে ভাল-মন্দের দোহাই দেওয়া চলবে না।২ যেহেতু শিয়াবাদ একটি নূতনত্ব, তা পৌত্তলিকতার চেয়েও খারাপ। শেখ ফরিদকে একটি পত্রে তিনি লিখেছেনঃ "এটা নিশ্চিত যে কোন নূতনত্ববাদীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা পৌত্তলিকদের সঙ্গে মেলামেশার চেয়েও খারাপ। সবচেয়ে কুৎসিত নূতনত্ববাদী তারা যারা প্রেরিত পুরুষদের সঙ্গীদের সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করে, এবং পবিত্র কোরানেও তাদের বিধর্মী বলা হয়েছে।"৩ এটা শিয়াদের সম্পর্কে বলা হয়েছে কেননা শিয়ারা হজরত আলিকে প্রেরিত পুরুষের সবচেয়ে গুণবান সঙ্গী হিসাবে গণ্য করে। সিরহিন্দি প্রচণ্ড রকমের হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, এবং শাসকবর্গ তাদের কেন প্রচণ্ডভাবে নিপীড়ন করে না, এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মুসলমানরা হিন্দু রীতিনীতি ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, সিরহিন্দি এটা নিবারণ করতে চেয়েছিলেন। ধর্মকার্যে সঙ্গীত ও নৃত্যকে (সামা ওয়া রাক্স) তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি নিজে নাক্শবন্দীয় সুফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও সুফীবাদের উপর শরীয়ৎ-এর প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। পরমজ্ঞানপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষের ধারণা, সুফী পরিভাষায় যাকে বলা হয় ওয়ালি, তিনি বাতিল করেছিলেন।

সিরহিন্দি কিন্তু নিজেকে বিধিনির্দিষ্ট পুরুষ হিসাবে এবং ইসলামের নবজীবন-দাতা হিসাবে দাবি করতেন। এতে মুসলিম উলেমা সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট প্রতিকার দাবি করেন। ফলে সিরহিন্দি জাহাঙ্গীর কর্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ হন। পরে অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর পুত্র মহম্মদ মাসুম। ঔরঙ্গজেব যখন মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন মাসুম তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করেন যে তিনি বিজয়ী হবেন। তাঁর মতে শাসনকর্তার কর্তব্য জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালানো এবং তার ফল দরবেশদের উপবাস প্রার্থনাদির চেয়ে অনেক বেশি।৪ তাঁর পুত্র শেখ সৈফুদ্দীন ঔরঙ্গজেবের গুরু ছিলেন, এবং ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি তাঁরই প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এতে ইসলামীয় বিশুদ্ধি ফিরে

১। মক্তুবৎ-ই-ইমাম-ই-রববানি, ৩য় খণ্ড, পত্র ২৩।
২। মহম্মদ মিয়াঁ, উলামা-ই-হিন্দ কা সহন্দর মাজুবী, ১, ১৭৪।
৩। মক্তুবৎ-ই-ইমাম-ই-রববানি, ১ম খণ্ড, পত্র ৫৪।
৪। উলামা-ই-হিন্দ কা সহন্দর মাজুবী ১, ৩৪০।

আসেনি তার কারণ শেষ মধ্যযুগে যে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, নিছক কয়েকটি আদর্শের পুনরুক্তিই তা দূর করতে পারে না, যদি না বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হয়, যেটা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। সিরহিন্দি প্রবর্তিত আন্দোলন সম্পর্কে শেখ মহম্মদ ইক্রাম যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "বিধি ও আচরণের প্রতি অতি আগ্রহ ভিতরকার গণ্ডোগোল দূর করতে পারে না, কেননা সেগুলি বাইরের দিক্গুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। তাঁরা ইসলামের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন—যেমন জুয়াখেলা ও মদ্যপান নিবারণ, নূতন মন্দির নির্মাণে বাধাদান, প্রধান ও অপ্রধান অপরাধসমূহের শাস্তি—কিন্তু তাঁরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের চিকিৎসা করতে পারেন নি, যেগুলি তাঁদের কর্তৃত্বের বাইরে।"১

৪। দারা শিকোহ্

প্রগতিশীল ধারাটির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মুঘল রাজকুমার দারা শিকোহ্ (মৃত্যু ১৬৫৯ খ্রীঃ) যিনি কাদ্রীয়পন্থী সুফী সাধক মোল্লা শাহ্ বাদক্শানীর শিষ্য ছিলেন। শেষোক্তজন ছিলেন মিয়াঁ মীরের শিষ্য। এঁদের মূল প্রেরণা ছিলেন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ইব্ন আরাবী যিনি শাস্ত্রীয় পন্থার অন্তর্দর্শনের উপর গুরুত্ব দিতেন বেশি। তাঁর মতে ঈশ্বর নির্বিশেষ, গুণাতীত ও সম্পর্কমুক্ত। স্থান, কাল ও কারণাধীন বিশ্বচরাচর সেই এক সদ্বস্তুর প্রকাশমাত্র। অচিৎ জগৎ ও চিদ্স্বরূপ ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রথাগতভাবে বিচার করা যায় না, একমাত্র অন্তর্দর্শনের দ্বারাই এই সম্পর্কের উপলব্ধি ঘটে। তাঁর রচিত তর্জুমানুল আসহ্ওয়ক গ্রন্থে যা তিনি বলেছেন তার ইংরাজী তর্জমা নিম্নরূপ:

My heart is receptive of all forms; it is a pasture for gazelles, i.e. objects of love, and a convent for Christian monks, and a temple for idols, and the pilgrim's *Kaba*, the tablet of the Jewish Law and the Quran. I follow the religion of love; whatever way Love's camels take, that is my religion and my faith is love.২

দারা শিকোহ্র গুরু মল্লা শাহ্ প্রার্থনা উপবাসাদির চেয়ে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দারা শিকোহ্ এই ধারাটিকেই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর বহু রচনার মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মাজ্মা-অল-বহ্রইন (দুই মহাসাগরের মিলন) এবং সির্র্-ই-আকবর (বাহান্নটি উপনিষদের অনুবাদ)। তাঁর রচনাবলীতে সুফীতত্ত্বের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ইসলামীয় পরিভাষার পাশাপাশি হিন্দু দার্শনিক পরিভাষার উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। মূলত জ্ঞানতত্ত্বের উপরই তিনি আলোকপাত করেছেন। অবশ্য হিন্দু তত্ত্বসমূহ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি মূলত উপনিষদ ও তদনুসারী বেদান্তকেই আশ্রয় করেছিলেন, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতিকে

১। শেখ মহম্মদ ইক্রাম, রুদি কৌথের (উর্দু) মার্কেন্টাইল প্রেস, লাহোর, ৩০৯৮
২। R. A. Nicholson, *Literary History of the Arabs*, 1930, 403.

হিসাবের মধ্যে আনেন নি। হিন্দু জ্ঞানতত্ত্বের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সৎকার্য-বাদ বা পরিণামবাদ যা অনুযায়ী কার্য কখনও কারণ-নিরপেক্ষ নয়, কারণও কার্য-নিরপেক্ষ নয়, যা প্রথমটিতে ব্যক্ত তা দ্বিতীয়টিতে অব্যক্তরূপে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে বৈদান্তিক জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা সৎকারণবাদ, যেখানে কারণই একমাত্র সত্য, যা চেতন-কারণ বা ব্রহ্ম, যা পরিণামহীন। দারা শিকোহ্ মূলত এই ধারাটি অবলম্বন করে দেখাতে চেয়েছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেই সত্য অখণ্ড ও অদ্বয়াত্মক (তৌহিদ্) নির্বিশেষ (মুৎলাক্), পরম (হকীকৎ উল্ হকীকৎ) এবং জ্যোতিস্বরূপ সর্বব্যাপী (নূর্ অল্ নূবীন্), অভিধা (ইস্ম্) ও আকার (সিফ্ৎ) বিহীন, এবং পরিণামহীন। এতদ্ব্যতীত যা কিছু তা অবভাস বা মায়া (মালুমে মা'দুম মাওজুদে মাওহম্)।

ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক নির্ণয়ের সমস্যাটিকে পূর্বসূরীদের মতই দারা শিকোহ্ জ্ঞানের নিজস্ব সমস্যার কথা তুলে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যে একমাত্র অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই তা বোঝা সম্ভব, বুদ্ধি আশ্রিত জ্ঞান যেখানে অপারগ। প্রত্যক্ষ ও যুক্তির সাহায্যে অর্জিত জগদ্বিষয়ক জ্ঞানকে বেদান্তে অপরাবিদ্যা বলা হয়, সুফীতত্ত্বে যার নাম ইলম্। যেহেতু এই জ্ঞান শর্তাধীন সত্যকেই প্রকাশ করে সেইহেতু তা অপ্রামাণ্য। যে জ্ঞান ধ্রুবসত্যকে প্রকাশ করে, যা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ, বৈদান্তিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় পরাবিদ্যা এবং ইসলামীয় পরিভাষায় যার নাম মারিফাৎ, দারা শিকোহ্র মতে একমাত্র সেই জ্ঞানই ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে পারে। এই অপরোক্ষানুভূতি লাভের উপায় ধ্যান (মরাকুবাহ্), সংযম (মুজাহিদা) এবং অন্তর্দর্শন (মুসাহিদাহ্) যা ব্যক্তিমানসে যথাক্রমে চারটি স্তরের (মঞ্জিল) উদ্ভব ঘটায় যেগুলি হল জাগ্রৎ (নাসুৎ), স্বপ্ন (মালাকুৎ), সুষুপ্তি (জবরুৎ) এবং তুরীয় (লাহুৎ)। প্রথমটি সাধারণ সজ্ঞানতা, দ্বিতীয়টি ভাবধ্যান, তৃতীয়টি বহুত্বের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং চতুর্থটি পরিপূর্ণ অদ্বয়বোধ।

৫। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্

অষ্টাদশ শতকের ইসলামধর্ম ও সমাজদর্শনের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাতা ছিলেন দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬৩ খৃঃ)। তিনি প্রথম ভারতীয় মুসলিম লেখক ও তত্ত্বজ্ঞ যিনি আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ ভারতীয়দের জন্য কোরানের পার্শী অনুবাদ করেন। তিনি বিষয়বস্তু ও কালানুক্রমের নিরিখে ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহকে বিভক্ত করেন, এবং প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য গ্রন্থগুলির ভেদ করেন। শরীয়ৎ ও মারীফাৎ-এর, অর্থাৎ ধর্মবিধি ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে তিনি কয়েকটি মূলনীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনার নাম হুজ্জৎ-উল আল্লাহ্-অল্‌বালিঘা, যে গ্রন্থে তিনি সামগ্রিকভাবে ইসলামীয় চিন্তাধারা ও আচরণবিধির বুদ্ধিদীপ্ত পর্যালোচনা করেছেন।

কিন্তু ওয়ালিউল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর সামাজিক আদর্শ। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির আদর্শহীনতা ও অবক্ষয়ের কারণ সম্পর্কে তিনি রীতিমত গবেষণা করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, সেযুগে তিনি শ্রেণীসমাজ ও ধনবণ্টনের বৈষম্যকেই মানব-সভ্যতার মূল ব্যাধি বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি ইসলামধর্মের উদ্ভবেরও একটি

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যার মূল কথা শ্রেণীবিভক্ত, পীড়নমূলক এবং ধনবৈষম্যমূলক সমাজে ধনসাম্য ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই মহম্মদের আবির্ভাব। ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে শাসকবর্গের প্রেরণায় ভারতবর্ষে এমন একটি পরগাছাসুলভ ধনিক্ শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা দেশের সমস্ত সমৃদ্ধি শোষণ করে নিজেরা স্ফীত হচ্ছে এবং জনসাধারণ দারিদ্র, বঞ্চনা ও অত্যাচারের চরমতম শিকারে পরিণত হচ্ছে। এখানে ধনীরা তাদের স্বভাবের জন্যই নীতিহীন, দরিদ্ররা অভাবের জন্য।

ওয়ালিউল্লাহ্‌র মতে ধনের সাম্যমূলক ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং সুসমঞ্জস সমাজগঠনের দ্বারাই অবস্থার প্রতিকার হতে পারে। তাঁর মতে সামাজিক ন্যায়-প্রতিষ্ঠার তিনটি পূর্বশর্ত থাকা উচিত—(১) আদব, অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, বাক্যে, আচরণে ও বেশভূষায় সারল্য ও ভদ্রতা; (২) কিফায়ৎ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মিতব্যয়িতা এবং (৩) হুমুনে মা আশারাৎ, অর্থাৎ পারস্পরিক মৈত্রীবোধ। তাঁর মতে নৈতিকতার দুটি দিক্ বর্তমান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শেষোক্তটির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কর্তব্য হওয়া উচিত সামাজিক মঙ্গলসাধন ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা। কৃষক, শ্রমিক, বণিক ও কারিগরদের শ্রমেই সম্পদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় এই সম্পদ মুষ্টিমেয়ের ভোগে লাগে। এই সমাজব্যবস্থার বিলোপ প্রয়োজন (ফক্কী কুল্লি নিজাম)।

বস্তুত ওয়ালিউল্লাহ্‌ই প্রথম মুসলিম চিন্তানায়ক যিনি নূতন পথের অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাস্তব প্রচেষ্টাগুলি সফল হয়নি। তাঁর এই ইসলামীয় সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নাজিব-উদ্দৌলা, নিজাম-উল-মুল্ক এবং আহমদ শাহ্ আবদালীর উপর নির্ভর করেছিলেন, যাঁরা নিজেরাই ছিলেন দুর্নীতি ও অসাধুতার মূর্ত প্রতীক। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও ওয়ালিউল্লাহ্‌র কোন বাস্তব ধারণা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর পুত্র এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী শাহ্ আব্দুল আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩ খ্রীঃ) দিল্লীতে ইংরাজ অধিকার প্রত্যক্ষ করেছিলেন যেটা ঘটেছিল ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত পিতার মত তিনিও এই ঘটনাটির তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হয়েছিলেন।

৬। বুল্লে শাহ্, পল্টু সাহেব প্রভৃতি

ওয়ালিউল্লাহ্‌র সমকালীন বুল্লে শাহ্ একটি বিপরীত ধারার অনুসারী ছিলেন যিনি শাস্ত্র প্রামাণ্যে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। মধ্যযুগের সংস্কারপন্থী সাধকদের মত তিনিও মনে করতেন মানবহৃদয়ই ঈশ্বরের আবাসস্থল, এবং তাঁকে খোঁজার জন্য কোন বিশেষ ধর্মমতের অন্তর্গত হওয়া অর্থহীন। এই বুল্লে শাহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইস্তাম্বুলে এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত কসুর নামক স্থানে দেহরক্ষা করেন।

পল্টু সাহেব, তুলসী সাহেব, দেধরাজ ও সহজানন্দ রামমোহনের সমকালীন ছিলেন। এঁদের অনুগামীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশেষভাবে নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে এঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এঁরা হিন্দু ও মুসলমান কোন শাস্ত্রগ্রন্থকেই প্রামাণ্য মনে করতেন না, ধর্মীয় বিধিসমূহের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাহীন, এবং জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম

করেছিলেন। পল্টুসাহেব ছিলেন গোবিন্দসাহেবের শিষ্য যিনি ১৭৫৭ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে জীবিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় কবীর নামে পরিচিত ছিলেন। তুলসীসাহেব ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের একটি পেশবা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাথরাসে বসবাস করতেন বলে তাঁকে হাথরাসী বলা হত। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়। দেধরাজ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে নার্নাউল জেলায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি বেনের মেয়েকে বিবাহ করেন। নাস্তিকতার অপবাদে তিনি ঝজ্‌হরের নবাব নজাবৎ আলি কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। দীর্ঘকাল অন্তরীণ থাকার পর একটি রাজনৈতিক বিদ্রোহের সুযোগে তিনি মুক্ত হন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। স্বামী নারায়ণী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সহজানন্দ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে গোন্ডা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের খুব একটা প্রসিদ্ধি হয়নি তার কারণ এঁদের প্রভাবের মূল ক্ষেত্র ছিল সমাজের নিম্নস্তর। কিন্তু এঁদের চিন্তাভাবনার বলিষ্ঠতা অসংখ্য মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে।

৭। খ্রীষ্টধর্মের প্রসার

এদেশে খ্রীষ্টধর্মের আগমন ও তার প্রাথমিক বিস্তৃতির ইতিহাস আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সম্রাট আকবরের দরবারে গোয়া থেকে জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত যাজকেরা তিনবার উপস্থিত হয়েছিলেন যথাক্রমে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীতে, এবং ১৫৯১ ও ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে। আকবর তাঁদের সম্পর্কে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন যার ফলে লাহোরে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার কিছু পরে আগ্রায় গীর্জা স্থাপিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর খ্রীষ্টানদের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজের কয়েকজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে খ্রীষ্টান হবার অনুমতি দান করেন। তাঁর সময়েই ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার আন্তনি দে আন্দ্রাদে তিব্বত যাত্রা করেন এবং পথে শতদ্রু নদীর উত্তরাঞ্চলে একজন স্থানীয় হিন্দু রাজাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। শাহ্‌জাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল দরবারে জেসুইটদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মুঘলদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পাঁচটি জেসুইট গীর্জা ছিল, দুটি দিল্লীতে, এবং মারবার, জয়পুর ও আগ্রায় একটি করে। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইটরা পর্তুগীজ এলাকাগুলি থেকে নির্বাসিত হলে, তাঁদের কাজকর্ম দেখার দায়িত্ব নেন বোম্বাই-এর কার্মেলাইটি এবং পাটনা ও চন্দননগরের কাপুচিন সম্প্রদায়। কার্মেলাইটিরা ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতে কাজকর্ম শুরু করেন। তাঁদের কেন্দ্র ছিল সুরাট, বোম্বাই এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। ১৭০৭ থেকে ইতালীয় কাপুচিনদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। তাদের মূল ঘাঁটি ছিল চন্দননগর ও পাটনা, এবং তাঁরা আগ্রা গীর্জারও দেখাশোনা করতেন। অগাস্টাইনীরা ষোড়শ শতকরে শেষ দিকে এবং সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে হুগলীতে তাঁদের প্রধান কেন্দ্র করেছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা উড়িষ্যার পিপ্‌লি থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনেকগুলি গীর্জা চালু করেন। বঙ্গদেশে রোমান ক্যাথলিকদের বড় কেন্দ্র ছিল হুগলী (ব্যাণ্ডেল), চন্দননগর ও কৃষ্ণনগর। শেষোক্ত স্থানে তাঁরা আজও একটি প্রধান খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়। এছাড়া সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পূর্ব ইউরোপীয় কয়েকটি সম্প্রদায়ও গীর্জা স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে চুঁচুড়ার আর্মেনীয় গীর্জা স্থাপিত হয় ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে নদীয়া জেলার চাকদহে এবং কলিকাতায় আর্মেনীয় গীর্জা স্থাপিত হয়।

প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদের সর্বপ্রথম প্রবেশ ঘটে ভারতের দুটি স্থানে—ত্রিচিনোপোলির নিকট ট্রাঙ্কুয়েবার এবং কলিকাতার নিকট শ্রীরামপুরে—উভয়ক্ষেত্রেই ডেনদের মারফৎ। এক্ষেত্রে যিনি পুরোধা হয়েছিলেন তাঁর নাম ৎসাগেনবালগ যিনি ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাঙ্কুয়েবারে কাজ শুরু করেন। এ দেশের বসবাসকারী খ্রীষ্টানদের জীবনচর্যায় তিনি প্রীত হননি, এবং স্থানীয় মিশনগুলির কার্যকলাপও তাঁকে খুশি করতে পারেনি।১ তিনি চারটি সুসমাচারের তামিল অনুবাদ করেছিলেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই অনুবাদগুলি আধুনিক তামিল গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ৎসাইগেনবালগের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন সি· এফ· সোয়ার্ৎস (১৭২৬-৭৯) যাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল ট্রাঙ্কুয়েবার, ত্রিচিনোপলী এবং তাঞ্জোর। জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ'দের ডেনীয় মিশন অষ্টাদশ শতকে যে সাফল্যলাভ করে তারই সূত্র ধরে অপরাপর ইউরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট মিশনের আবির্ভাব হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীদের উৎসাহ তো দিতই না উল্টে তাঁদের কাজে বাধা আরোপ করত। ইংলণ্ডের অধিবাসী ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের চাপে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদে এদেশে মিশনারীদের প্রচারকার্য আইনসিদ্ধ করা হয় এবং তদনুযায়ী কলকতায় চার্চ অফ ইংলণ্ডের একটি শাখা স্থাপিত হয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩৩-এর সনদে অ-বৃটিশ মিশনারীদেরও উৎসাহ দেওয়া হয় যার ফলে আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট ও লুথেরীয়রা নেলোর ও রাজমহেন্দ্রীতে ঘাঁটি করেন যথাক্রমে ১৮৪০ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এদেশে ধর্মান্তরকরণে কতকগুলি বিশেষ সমস্যা ছিল যেগুলি বিচক্ষণ মিশনারীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। উচ্চবর্ণের লোকেদের দীক্ষিত করার প্রচুর অসুবিধা ছিল। এই প্রসঙ্গে টমাস লিখেছেন:

In a notable debate held under the auspices of the Dutch in Negapatam, Ziegenbalg disputed with a Brahmin for five hours, and far from converting the Brahmin, the missionary came away with an excessive admiration for the intellectual gifts of his adversary.২

এই প্রসঙ্গে আবে দুবোয়া (১৭৫৬-১৮৪৮) মন্তব্য করেছিলেন:

Under existing circumstance thert was no human possibility of overcoming the invincible barrier of Brahmanical prejudice as to convert the Hindus as a nation to any sect of Christianity. He acknowledged that low castes and outcastes might be converted in large numbers, but of the higher castes he wrote: 'Should the intercourse between individuals of both nations, by becoming more intimate and more friendly, produce a change in the

১। K. S. Latourette, *History of the Expansion of Christianity* (1940) III. 283.

২। P. Thomas, *Christians and Christianity in India and Pakistan* (1954), 153-54.

religion and usages of the country, it will not be to turn Christians that they will forsake their own religion, but rather...to become mere atheists'.১

আসলে ভারতীয় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে এদেশীয় বৃটিশ শাসকশ্রেণী, ইংরাজ বাসিন্দা এবং মিশনারীদের নিজেদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। আমরা ইতিপূর্বে সংস্কৃতভাষায় রচিত যে সুবিশাল ধর্মতত্ত্বমূলক রচনাসমূহের উল্লেখ করেছি, সেগুলি সম্পর্কে যারা কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-বর্ণের লোকেদের যে কোন বহিরাগত ধর্মে দীক্ষিত করা দুঃসাধ্য ছিল। পরবর্তী-কালে অবশ্য উচ্চবর্ণের কিছু মানুষ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এঁরা ইংরাজশাসনে সৃষ্ট নব্যমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যাঁদের বাপ-ঠাকুর্দা কোম্পানীর দালালি, বেনিয়ানগিরি, মুৎসুদ্দিগিরি করে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরা বিভিন্ন জাতি থেকে এসেছিলেন, ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, এবং ঐতিহ্যগত শিক্ষা এঁদের বিশেষ ছিল না। সাহেবীয়ানার চাকচিক্যই এঁদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছিল। এঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাফল্যের পরিমাণ তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের সমকালীন ইউরোপীয় লেখকেরা খুবই ছোট করে দেখেছেন, যদিও আসলে তাঁদের ভূমিকাটা মোটেই ছোট নয়। নীচবর্ণের অসংখ্য মানুষকে তাঁরা দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন এবং আরও উল্লেখযোগ্য সাফল্য হয়েছিল আদিবাসীদের মধ্যে। নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে সমাজের এই নিম্ন ও অবহেলিত স্তরগুলিতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ শুধু অনন্য-সাধারণ নয় পরম অভিনন্দনযোগ্য। লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত ও অবহেলিত ব্যক্তিকে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদা দিয়েছিলেন। অথচ এই বিপুল সাফল্যের দিক্‌টা তাঁরা এবং তাঁদের স্বধর্মী লেখকেরা এড়িয়ে গেলেন কেন?

ঐতিহাসিকভাবে এর একটিই জবাব হয়, এদেশের শাসক শক্তি এবং বসবাসকারী ইউরোপীয়দের বৈষয়িক স্বার্থের ভাবনাটাই বড় ছিল। জাতিবর্ণ ভিত্তিক হিন্দু (এবং কতকাংশ মুসলিম) সমাজ চিরকালই সুবিধাভোগীদের অনুকূল ছিল। সেই প্যাটার্ণটা মুসলমান শাসকদের মত ইংরাজ শাসকেরাও ভাঙতে চায়নি। টমাস এই প্রসঙ্গে দুটি মতামত উল্লেখ করেছেন, একজন চায়ের কারবারী মিঃ টুইনিং, অপরজন এখানকার একজন ব্যবসায়ী বাসিন্দা মণ্টোগোমারী। টুইনিং-এর মতেঃ

As long as we continue to govern India in the mild, tolerant spirit of Christianity, we many govern it with ease; but if ever the fatal day should arrive, when religions innovation shall set her foot in that country, indignation will spread from one end of Hindustan to the other, and the arms of fifty millions of people will drive us from that portion of the globe, with as much ease as the sand of the desert is scattered by the wind.২

১। On Dubois's *Letters on the State of Christianity in India,* in *Encyclopaedia Britannica,* 11th. ed., VIII. 624.

২। P. Thomas, *op. cit.,* 178.

মন্টোগোমারীর মত উদ্ধৃত করে টমাস লিখেছেনঃ

He declared that Christianity had nothing to teach Hinduism, and no missionary ever made a really good Christian convert in India. He too, like the tea-dealer, had a sound respect for the martial powers of the Indians and concluded that he "was more anxious to save the 30,000 of his country-men in India than to save the souls of all the Hindus by making them Christians at so dreadful a price".১

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের হৃদয় এ-ব্যাপারে একেবারে পরিষ্কার ছিল। তাঁরা শুধু বুঝতেন টাকার থলি, দিনের পর দিন পরিস্ফীত থলি। পাছে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করলে এদেশে তাঁদের থলিস্বার্থের ক্ষতিকর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেই আশংকায় তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনারীদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর কলকাতা আগমন বঙ্গদেশের খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যদিও কেরী সাত বছর পরিশ্রম করে একজনকেও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেননি। কেরীর আমন্ত্রণে চারজন মিশনারী ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ তাঁদের কলকাতাবাসের অনুমতি না দেওয়াতে তাঁরা শ্রীরামপুরের ডেনীয় উপনিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লর্ড ওয়েলস্‌লী বিলাতে ফেরৎ পাঠানোর জন্য তাঁদের দাবি করলে শ্রীরামপুরের ডেনীয় গভর্ণর তা অগ্রাহ্য করেন। অতঃপর কেরীও কলকাতার পাট চুকিয়ে শ্রীরামপুরে চলে যান। সেখানে বসবাসকারী চারজন মিশনারীর মধ্যে দুজন ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। অবশিষ্ট দুজন, উইলিয়ম ওয়ার্ড ও জোসুয়া মার্শম্যানকে নিয়ে কেরী বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন যার খ্যাতি শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলার বাহিরেও প্রসারিত হয়েছিল।

১৮১৩-র নূতন সনদে এদেশে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এলাকায় মিশনারীদের আগমন ও ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়ার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এরই সূত্র ধরে ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে অজস্র মিশনারী এদেশে আসতে শুরু করেন, এবং তাঁদের প্রথম কাজ ছিল কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের পৌত্তলিকতা দূর করা।২ শাসনকার্যের উত্তরাধিকারের সূত্রে কোন কোন মন্দিরে যৎকিঞ্চিৎ দানধ্যান, ব্রাহ্মণদের শুভাশুভ জানার কাজে নিয়োগ, সরকারী দলিলপত্রে শ্রী ও গণেশের উল্লেখ, নিম্নজাতীয় লোকেদের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, হিন্দু এবং মুসলমান উৎসবসমূহে যোগদান, প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য হল। ক্রমশ মিশনারীরা শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন এবং তাঁদের প্রভাবের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ল। এছাড়া তাঁরা শাসক শক্তির সাহায্যও ক্রমে ক্রমে পেতে শুরু করলেন, এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু কিছু উচ্চবর্ণের ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। অনেক ক্ষেত্রে অতি উৎসাহী প্রচারকেরা কৌশল ও জবরদস্তির সাহায্যে দীক্ষিতকরণের নীতি নিয়েছিলেন যা নিয়ে বোম্বাই শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম হয়েছিল।

কেরী সাহেব ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, সাংবাদিকতার প্রসার ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণে তাঁর

অবদান অতুলনীয়। ১৮১৩-র সনদ অনুযায়ী বিশপ মিড্‌লটন (১৮১৫-২২) প্রথম কলকাতার বিশপ হন, যিনি ভারতীয় খ্রীষ্টানদের ধর্মীয়তত্ত্ব ও ক্রিয়াকলাপ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যাতে তাঁরা প্রচারক জীবন অবলম্বন করতে পারেন, বিশপ্‌স্‌ কলেজ স্থাপন করেন। এখানেই বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। মিডলটনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন রেজিনাল্‌ড্‌ হেবার (১৮২৩-২৬) এবং ড্যানিয়েল উইলসন (১৮৩২-৫৮) যিনি ভারতের প্রথম মেট্রোপলিটান। অপরাপর দেশ থেকেও নানান খ্রীষ্টান মিশন ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার পায় যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেথডিস্ট এপিস্কোপাল চার্চ যার পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়ম টেলর (১৮২১-১৯০২) জে. এম. থোবার্ণ (১৮৩৬-১৯০২) এবং ডঃ ক্লারা সোয়েন, প্রথম নারী চিকিৎসক-মিশনারী যিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। আমেরিকান কংগ্রীগেশনালিস্টরা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ কাজ আরম্ভ করেন। আমেরিকান প্রেসবিটারিয়ান মিশন পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় কাজ শুরু করেন ১৮৩৫ থেকে।

চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের তরফ থেকে আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় আসেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতের সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে ডাফের মনোভাব ছিল অবিমিশ্র ঘৃণার।[১] এ মনোভাব কতদূর সমর্থনযোগ্য সে প্রসঙ্গের অবতারণা না করেও বলা যায় যে এদেশে পশ্চিমী শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যে শুধু স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তাই নয়, বহু ছাত্রকেই তিনি হিন্দুসংস্কারসমূহের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সাফল্যের ভিত্তিতে চার্চ অফ স্কটল্যান্ড বঙ্গদেশে ও বাংলার বাইরে অনেকগুলি স্কুল-কলেজ স্থাপন করে। অপরাপর খ্রীষ্টীয় মিশনগুলিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে যার ফলে মাদ্রাজে খ্রীষ্টান কলেজ, বোম্বাই-এর উইলসন কলেজ, কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, আগ্রার সেন্ট জন্‌স কলেজ, এলাহাবাদের এউইং খ্রীষ্টান কলেজ, মাদুরার আমেরিকান কলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক তত্ত্বাবধানে ৪২টি কলেজ ৪৭৪টি উচ্চবিদালয় এবং ৪০৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯৫৪-য় জাতীয় খ্রীষ্টীয় সংসদের অধীনে ৪৬টি কলেজ, ৪৪৮টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫৫৩টি মধ্য বিদ্যালয় এবং ১০৩টি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালের সংখ্যা ৫০০-র বেশি।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গীর্জা ও মিশনগুলি ছিল প্রত্যক্ষভাবে তাদের পাশ্চাত্য মূল কেন্দ্রগুলির দ্বারা পরিচালিত। ধীরে ধীরে এইগুলির ভারতীয়ত্বকরণ শুরু হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ অফ ইংলন্ড স্বয়ংশাসিত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, চার্চ অফ ইন্ডিয়া, বার্মা এন্ড সিলোন এই নামে। ক্রমশ পরিচালন ব্যবস্থাও পুরোপুরি ভারতীয় খ্রীষ্টানদের হাতে আসা শুরু করে। প্রচারের ক্ষেত্রেও ভারতীয় ভঙ্গী ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মিশনারী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদেশে জাতীয় খ্রীষ্টীয় সংসদ গড়ে ওঠে, এবং একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে গীর্জাগুলিকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়। রোমান ক্যাথলিক গীর্জাগুলির ক্ষেত্রেও ভারতীয়ত্বকরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

১। J. Smith, *Life of Alexander Duff,* 125; G. D. Bearce, *British Attitude towards India* (1961), 227.

৮। রামমোহন রায়

রামমোহন রায় (১৭৭৪?—১৮৩৩) এক অর্থে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী ছিলেন, কেননা তিনিও তাঁর বিখ্যাত পূর্বসূরীর মত ধর্মকে বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, কিন্তু তিনি অধিকতর সাফল্যলাভ করেছিলেন কারণ সমকালীন যুগের চাহিদা তিনি স্পষ্টতরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে।

রামমোহনের গোড়ার জীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য খুবই কম। তদানীন্তন রীতি অনুযায়ী তিনি প্রথম জীবনে পাটনায় পার্শী ও আরবী চর্চা করেছিলেন যার মাধ্যমে ইসলামীয় ধর্মতত্ত্বে তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল, এবং কাশীতে কিছুকাল সংস্কৃত চর্চা করেছিলেন। তিনি মূল কোরান পড়েছিলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন এবং উত্তরকালে উপনিষদ ও বেদান্তের উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁর একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজাবিরোধিতার প্রেরণা হিসাবে মূলত তাঁর ইসলামী শিক্ষাকেই দায়ী করেন, কেননা পাটনা থেকে ফিরে মাত্র ষোল কি সতের বছর বয়সেই তিনি মূর্তিপূজাবিরোধী একটি পুস্তিকা লেখেন। কিন্তু তাঁর যে কল্পিত ঈশ্বর, তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে যা মনে হয়, ন্যায়-বৈশেষিক ধারণার ঈশ্বরের কাছাকাছি। মনে হয় কাশীর টোলে তিনি ন্যায়েরও চর্চা করেছিলেন। এছাড়া তান্ত্রিকদের কুসংস্কারবিরোধী সামাজিক ক্রিয়াকলাপও তাঁকে আকৃষ্ট করে থাকবে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি রংপুরের কালেক্টর মিঃ ডিগবীর নিকট কর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮০৯ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত রংপুরে বাস করেন। ওই সময় তিনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করেন। তন্ত্রের জাতিপ্রথাবিরোধিতা এবং নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব তাঁকে সমাজসংস্কারে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, বিশেষ করে মহানির্বাণতন্ত্রে সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে যে বক্তব্য আছে তাকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। রংপুরে থাকাকালীন তিনি ইংরাজী শিখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে পরিচিত হয়েছিলেন, তবে তা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। আমরা আগেই বলেছি যে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডার এমন কিছু আহামরি ছিল না, তবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শিল্প-বিপ্লব হওয়াতে ইউরোপ কিছুটা বর্ধিত কারিগরী বিদ্যার অধিকারী হয়েছিল। তাই রামমোহন যথার্থই লিখেছিলেন ঃ

If by the Ray of Intelligence which the *Christian* says, we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my gratitude; but with respect to *Science*, *Literature* or *Religion* I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to History it may be proved that the World was indebted to *our ancestors* for the first dawn of knowledge which sprung up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distin-

guishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners.১

রামমোহনের যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও তাঁর ইংরাজী শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তুহ্ফতু মুওহ্হিদিন গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেনঃ

প্রতিটি বিষয়ে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বিচারের ক্ষেত্রে জ্ঞান থেকে উদ্ভূত যুক্তির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, কেননা এটা হচ্ছে ঈশ্বরপ্রসাদে প্রাপ্ত জ্ঞানের আশীর্বাদ, যা কখনও অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে না।২

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে আসার পর তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন। হিন্দুধর্মের কুসংস্কারসমূহের তাঁরা যে সমালোচনা করতেন তার সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছিলেনঃ

The Hindu society with caste, polygamy, Kulinism, Suttee, infanticide and other evils was rotten to its core. Morality was at a very low ebb. Men spent their time in vice end idleness, and in social broils and party quarrels. There was darkness over the land and no man knew when it would be dispelled.৩

তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের উপর ব্যাপক পড়াশোনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষাও শেখেন। তিনি খ্রীষ্টের উপদেশসমূহের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল হতে পেরেছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের অলৌকিকতার প্রতি ঝোঁকসমূহ এবং খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র এবং তৎসমর্থক উপনিষদ্-গুলি প্রকাশ করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর মানিকতলার বাগান বাড়ীতে আত্মীয় সভা নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যার লক্ষ্য ছিল একত্ববাদের (Unitarianism)—খ্রীষ্টীয় Trinitarianism বা ত্রিত্ববাদের বিরোধী—চর্চা, যে সভার সদস্য হয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণ বসুর পিতা), বৃন্দাবন মিত্র (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ) প্রভৃতি। পূর্বোক্ত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী এবং শিবপ্রসাদ মিশ্রও এই সভার সদস্য ছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত দক্ষিণী পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে বিতর্কে পরাস্ত করেন এবং এই বিতর্কে তাঁর মূর্তিপূজা বিরোধী অভিমতই জয়যুক্ত হয়।

রামমোহনের ইংরেজী রচনাবলীর বিলাতে প্রকাশের দায়িত্ব নেন তাঁর পূর্বতন মনিব জন ডিগবী ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি *Precepts of Jesus* নামে বই লেখেন যেটি লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান সোসাইটি কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হয় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং আমেরিকা থেকে তার পুনর্মুদ্রণ হয় ১৮২৮-এ।

১। *The English Works of Raja Ram Mohan Roy* (ed. J. C. Ghose 1901), III, 148.

২। Ram Mohan Roy, *Tuhfatul Muwahhidin* (1950), 13.

৩। *The English Works*, I, vii.

এই বইটি শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের ক্রুদ্ধ করে এবং তারই সূত্র ধরে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদকে কেন্দ্র করে রামমোহনের সঙ্গে মিশনারীদের তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় যার ফলে তিনি *Appeal to the Christian Public* নামে তিনটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আত্মীয় সভা ১৮১৯ সালে বন্ধ হয়ে যাবার পর রামমোহন ১৮২১-এ ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন করেন। উইলিয়ম অ্যাডাম নামক একজন ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী ইউনিটারিয়ান মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামমোহনের ইউনিটারিয়ান কমিটি বিলাতের ইউনিটারিয়ান সোসাইটির শাখা হিসাবেই কাজ করত যা ঈশ্বর সত্তার পূর্ণ অদ্বয়ত্বে বিশ্বাসী। এই কমিটিতে কিছু গণ্যমান্য ইংরাজ ছাড়াও দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় মৃত্তিকায় পাশ্চাত্য ইউনিটারিয়ান মত শিকড় গাড়তে না পারায়, পুরোদস্তুর ভারতীয় সাজসজ্জায় ঔপনিষদিক একত্ববাদকে ভিত্তি করে একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট তারিখে ৪৮নং চিৎপুর রোড জোড়াসাঁকোয় রামমোহন ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মসভার পত্তন করেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী হন সম্পাদক। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এই সভার বৈঠক বসত, দুজন তেলুগু ব্রাহ্মণ আড়াল থেকে বেদপাঠ করতেন, উৎসবানন্দ উপনিষদের শ্লোক পড়তেন এবং পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (হরিহরানন্দের ভাই) তার বাংলা ব্যাখ্যা করতেন। রামমোহনের রচনা থেকেও পাঠ হত, এবং সর্বশেষে সঙ্গীতের দ্বারা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটত। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ১৮২৯-এর মধ্যে সভার জন্য নিজস্ব গৃহের ব্যয় চাঁদা মারফৎ উঠে আসে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এতে ক্ষুব্ধ হয় এবং রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা নামে একটি পাল্টা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উভয় তরফের বাদানুবাদ সমাচার কৌমুদী এবং সমাচার চন্দ্রিকায় নিত্য প্রকাশিত হতে থাকে যা নিয়ে কলকাতা শহরে বেশ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখা যায়।

দেশ জোড়া উত্তেজনার মাঝে ২৩শে জানুয়ারী ১৮৩০-এ রামমোহন তাঁর উপাসনা মন্দিরের উদ্বোধন করেন পাঁচ শতেরও অধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং কয়েকজন ট্রাস্টির হাতে তার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ট্রাস্ট দলিলে পরিষ্কারভাবে লেখা হয় যে এই মন্দির বিশ্বচরাচর স্রষ্টা ও পালক সেই চিরন্তন, সন্ধানাতীত অপরিবর্তনীয় সত্তার—যাঁকে কোন নাম বা উপাধি দ্বারা ভূষিত করা চলবে না এবং যাঁর কোন প্রতিকৃতি বা মূর্তি থাকবে না—উপাসনার উদ্দেশ্যে যে কেউ ব্যবহার করতে পারবেন। এটি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ মিলনক্ষেত্র যাঁরা একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী। রামমোহন কোন বিশেষ ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন নি, তবে তাঁর আদর্শ অবলম্বনে পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজ একটা পৃথক্ ধর্মমতের 'চেহারা' নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

৯। ডিরোজিও পন্থীগণ

হিন্দু কলেজের প্রথমদিকের ছাত্রগণ ইউরোপীয় সভ্যতার চমক এবং ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে একটি অত্যন্ত উগ্র, হিন্দু ঐতিহ্যবিরোধী ভাবধারায় দীক্ষিত হন। ইউরোপীয় যুক্তিবাদ তাঁদের তরুণ চিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল এবং তার বীজ যিনি ছাত্রদের মনে প্রবেশ করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর নাম হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডিরোজিওর পিতা ছিলেন পোর্তুগীজ বংশোদ্ভূত, মাতা এতদ্দেশীয় মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে ভারতীয় মনে করতেন সর্বান্তকরণে। ১৮২৭ সালে কলকাতায় এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে সংশিলষ্ট ছিলেন, যেগুলির নাম যথাক্রমে ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট, বেঙ্গল অ্যানুয়াল এবং কালেইডোস্কোপ, এবং ওই বছরেই স্বরচিত কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে যোগদান করলেও, পরিপূর্ণ অধ্যাপক হিসাবে ১৮২৮ থেকে কাজ শুরু করেন। তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল, যে কারণে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে কেন্দ্র করে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বাইরেরও প্রসিদ্ধ লোকেরা থাকতেন, যেমন ডেভিড হেয়ার, সার এড্উইন বায়ান, ডঃ মিল প্রভৃতি।

ডিরোজিওর যুক্তিবাদ কলেজ কর্তৃপক্ষের পছন্দ না হওয়ায়, ছাত্রদের তিনি বিপথচালিত করছেন, এই অজুহাতে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর তিনি বেশি দিন বাঁচেন নি। ছাত্রদের তিনি স্বাধীন চিন্তা ও দেশপ্রেমে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত হন, এবং তাঁদের মুখপত্র হিসাবে দুটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, পার্থেনন বা এথেনিয়াম এবং বেঙ্গল স্পেক্টেটর। এই দুটি পত্রিকায় একদিকে যেমন সরকারবিরোধী রচনা প্রকাশিত হত অপরদিকে, তেমনি হিন্দুধর্মের অযৌক্তিক ও কুসংস্কারপূর্ণ দিকগুলির তীব্র সমালোচনা করা হতো। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধগুলি লঙ্ঘন করতেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন, কেউ কেউ পুরোদস্তুর নাস্তিক। তাঁরা জমিতে রায়তের স্বত্ব দাবি করেছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বড় দিনের দিন তাঁরা মনুমেণ্টের চূড়ায় ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।১

১০। ব্রাহ্ম সমাজ

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সভার অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে কেননা এই সভার সামনে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। সভার মঞ্চ থেকে রামচন্দ্রের অবতারতত্ত্বের মত বিষয়েরও ব্যাখ্যা হত। জনসমাগমও বিশেষ হত না। একমাত্র পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কোন মতে কাজ চালিয়ে যেতেন। তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেনঃ

> Most of those who attended the services were idolators at home. There was no organisation, no constitution, no membership, no covenant, no pledge.২

১। B. B. Majumdar, *History of Political Thought from Rammohan to Dayananda*, (1934), 83-84.

২। S. Sastri, *History of the Brahmo Samaj* (1911), 88-89.

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সভায় যোগদান করার পর অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। তাঁর প্রচেষ্টায় সমাজের নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রামমোহনের আদর্শ অনুযায়ী স্থির হয় যে সমাজে দীক্ষাগ্রহণ আবশ্যক এবং দীক্ষিতকে বেদান্তানুমোদিত ধর্মীয় জীবনচর্যা মেনে চলতে হবে এবং প্রত্যহ গায়ত্রীমন্ত্র সহকারে ঈশ্বরোপাসনা করতে হবে। দীক্ষাপদ্ধতি হবে মহানির্বাণ-তন্ত্রানুসারী। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কুড়িজন বান্ধবসহ দেবেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং সেদিন থেকেই কার্যত ব্রাহ্ম সমাজ একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতের রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার স্থাপন করেছিলেন, এবং এই সভাকে কেন্দ্র করে পরে ব্রাহ্ম প্রচারকদের শিক্ষা দেবার উদেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। রামমোহনের বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। অল্পকালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষিত শ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে, শুধু বাংলায় নয় বাংলার বাইরেও। দেবেন্দ্রনাথ বেদকেই ব্রাহ্ম-ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, যার অভ্রান্ততায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁর এই অভিমত যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত মেনে নিয়ে পারেননি।[১] ফলে বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চারজন ব্রাহ্মণ যুবককে কাশী পাঠান, এবং নিজেও ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে যান বেদ সম্পর্কে সঠিক খবর জানার জন্য। বেদের অভ্রান্ততায় তিনিও সন্দিহান হন, এবং বেদে একেশ্বরবাদিতা সুপ্রতিষ্ঠিত নয় বলেই তাঁর ধারণা জন্মায়। অনন্তর তিনি উপনিষদসমূহ থেকে একেশ্বরবাদী অংশগুলি বেছে নিয়ে একটি সঙ্কলন প্রস্তুত করেন, এবং ব্রাহ্মদের উপাস্য পরমব্রহ্মকে "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের" সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে উদার ও যুক্তিশীল হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে মান্য করে চলতেন। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের তরুণতর সদস্যরা প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ রোধ প্রভৃতিকে ব্রাহ্মদের ঘোষিত সামাজিক আদর্শ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য যিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমাজে যোগদান করেন, ১৮৬১-তে পুরোদস্তুর প্রচারক হন এবং ১৮৬২-তে আচার্যপদে বৃত হন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাঁর সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা, অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রচণ্ড সমর্থন, পর্দা-প্রথার বিলুপ্তির জন্য আন্দোলন, প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাচীনেরা পছন্দ করেননি। এছাড়া আচার্যের বেদীতে অব্রাহ্মণদের বসার অধিকার নিয়েও মতবিরোধ শুরু হয়। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের দাবিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন-পন্থীদের চাপে পুরাতন হিন্দু ঘেঁসা নীতিকেই বজায় রাখতে চাইলেন। ফলে ব্রাহ্মরা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি কেশবচন্দ্রের দল 'ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ' নাম দিয়ে পৃথক্ সংস্থা গঠন করলেন। যাঁরা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রইলেন তাঁরা 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত রইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-

১। *ibid*, 99.

সমাজকে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে রাজি ছিলেন না, পক্ষান্তরে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে সর্বজাগতিক এবং উদার ধর্মের ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল পৌত্তলিকতার মত জাতিপ্রথার বিরোধিতা ব্রাহ্মদের অবশ্য কর্তব্যসমূহের একটি।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে একটা গতিশীল সংস্থায় পরিণত করতে পেরেছিলেন। প্রেম, আন্তরিকতা ও স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি বোম্বাই (১৮৬৪), মাদ্রাজ (১৮৬৪) ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (১৮৬৮) ধর্মপ্রচার অভিযানে পরিভ্রমণ করেছিলেন যার ফল বোম্বাই-এ প্রার্থনা সমাজ ও মাদ্রাজে বেদ সমাজের (পরে ব্রাহ্মসমাজ নামই হয়েছিল) সৃষ্টি। কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই ইংরাজ সরকার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মবিবাহ বিধি আইনসঙ্গত করে। এই আইনই সাধারণভাবে সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট নামে পরিচিত। আদি ব্রাহ্মসমাজ এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কারণ তারা নিজেদের হিন্দু হিসাবেই ঘোষণা করত। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদের একাধিক পত্নীগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন, এবং পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স যথাক্রমে ১৮ এবং ১৪-তে নির্দিষ্ট করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কেশবচন্দ্র ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন নামক একটি সংস্থা গঠন করেন, যার কাজ ছিল মূলত পাঁচ ধরনের—নারীজাতির উন্নতি, শ্রমজীবীদের কল্যাণ ও শিক্ষাদান, সুলভ সাহিত্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও জনকল্যাণমূলক কর্ম। তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন যা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে একটি বৈপ্লবিক ও গতিশীল সংগঠনে পরিণত করেছিলেন, কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় যার ফলে ব্রাহ্মসমাজে আবার ভাঙন ধরে। সমাজের মধ্যে বিক্ষোভের নানা কারণ ছিল, কিন্তু একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তা ফেটে পড়ে! কেশবচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে কোচবিহারের রাজকুমারের বিবাহ দেন। এক্ষেত্রে ব্রাহ্ম বয়সবিধি মানা হয়নি, বর ও বধূ উভয়েই নাবালক ছিল, এবং বিবাহ ঘটেছিল হিন্দু-রীতি অনুযায়ী শালগ্রামশিলাকে সাক্ষী করে। নেতার পক্ষে আচরণবিধি ভঙ্গের ব্যাপারটা ব্রাহ্ম-সমাজের তরুণ সদস্যগণ বরদাস্ত করেননি, যার ফলে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি পৃথক্ সংস্থা গড়ে ওঠে।

১১। প্রার্থনা সমাজ

কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ গঠিত হয় যার আদর্শ মোটামুটি ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ ছিল। কেশবচন্দ্র প্রথম বোম্বাই যান ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁরই প্রেরণায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দ্বিতীয়বার বোম্বাই যান এবং প্রার্থনা সমাজের পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডাকর এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে প্রার্থনা সমাজে যোগদান করায় প্রার্থনা সমাজের শক্তি রীতিমত বৃদ্ধি পায়।

প্রার্থনা সমাজ হিন্দু ঐতিহ্য অস্বীকার করেনি, এবং দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজের মতই হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদী দিক্‌টির উপরই সমস্ত গুরুত্ব আরোপ

করেছিল। প্রার্থনা সমাজ পৌত্তলিকতাবিরোধী ছিল এবং বেদের অভ্রান্ততার আস্থাশীল ছিল না। আবার কেশবচন্দ্রের সমাজবিপ্লবের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিল, যেগ্লির মধ্যে ছিল জাতিপ্রথাবর্জন, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পর্দাপ্রথার বিল্প্তি এবং বাল্যবিবাহ রোধ।

প্রার্থনা সমাজের উৎসাহী সদস্যেরা, যেমন মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে, উক্ত আদর্শসম্হের জন্য প্রাণপাত করলেও, সাধারণভাবে প্রার্থনা সমাজ বিশেষ বৈপ্লবিক হয়ে উঠতে পারেনি। প্রার্থনা সমাজ সম্পর্কে ফার্কুহার যথার্থই মন্তব্য করেছেন:

The Prarthana Samaj may be said to be composed of men paying allegiance to Hinduism and to Hindu society with a protest. The members observe the ceremonies of Hinduism, but only as mere ceremonies of routine, destitute of all religious significance. This much sacrifice they make to existing prejudices. Their principle, however, is not to deceive anyone as to their religious opinions, even should an honest expression of views ential unpopularity.[১]

১২। আর্য সমাজ

ব্রাহ্মসমাজ ভারতের অপরাপর অংশেও নবধর্ম আন্দোলনের প্রেরণা দিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যে আর্য সমাজের পত্তন করেন সেখানেও ব্রাহ্মসমাজের কিছ্ কিছ্ ভাবধারা অন্প্রবিষ্ট হয়। দয়ানন্দ কিছ্কাল কলকাতায় ছিলেন এবং ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে বিশেষভাবে লাভবান হন। তবে ব্রাহ্মদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে দয়ানন্দের মৌলিক পার্থক্য ছিল, যেমন দয়ানন্দ বেদের অভ্রান্ততা, গাভীর পবিত্রতা, দৈনিক আহ্তি, প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেন। দয়ানন্দ বহ্ দেবতায় বিশ্বাস করতেন না, এমন কি খ্রীষ্টান বা ইসলামী ধরনের একেশ্বরবাদের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল না। পশ্চিমী ভাবধারাসম্হের সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না, ইংরাজীও তিনি জানতেন না। কেশবচন্দ্র সেনের কাছে এইটি কিন্তু পরম গ্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তিনি তাঁকে জনগণের ভাষায় প্রচার করতে উপদেশ দেন। দয়ানন্দের জীবনে এই শিক্ষা কার্যকর হয়েছিল যা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক আদর্শগ্লিও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

দয়ানন্দের জন্ম ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্জরাতের মোর্বি অঞ্চলে তঙ্কারা নামক একটি ছোট শহরে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে এবং অল্প বয়সেই তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহ ত্যাগ করেন। ১৮৪৫ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত দীর্ঘ পনের বছর তিনি ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করেন। অবশেষে স্বামী বিরজানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে তাঁর নিকট শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভ করেন। গ্র্দক্ষিণা হিসাবে বিরজানন্দ তাঁর কাছে

১। J. N. Farquhar, *Modern Religious Movements in India* (1918), 79; M. G. Ranade, *Religion and Social Reforms* (Collection of Essays and Speeches by M. B. Kolaskar 1902); Ramabai Ranade (ed), *Miscellaneous Writings of the Late Hon'ble Mr. Justice M. G. Ranade* (1915).

এই আশ্বাস চান যে উত্তরকালে দয়ানন্দ তাঁর সারা জীবন হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিক্‌গুলির উৎসাদনে আত্মনিয়োগ করবেন। দয়ানন্দ গুরুর এই নির্দেশ সারাজীবন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন।

অতঃপর দয়ানন্দ বহু জনসভায় হিন্দুধর্মের কুসংস্কারমূলক দিক্‌গুলিকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। কাশীর গোঁড়া পণ্ডিতদের তিনি চ্যালেঞ্জ করেন এবং কাশীর রাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি বিতর্কসভায় তাঁদের মুখোমুখি হন। এই বিতর্কে যদিও কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করেননি, দয়ানন্দের বাগ্মিতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় এতে পাওয়া গিয়েছিল, জনমনে যার প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল। অতঃপর দয়ানন্দ ব্রাহ্ম ও প্রার্থনা সমাজীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

দয়ানন্দ তিনটি গ্রন্থ হিন্দীতে রচনা করেন—সত্যার্থপ্রকাশ, বেদভাষ্যভূমিকা ও বেদভাষ্য। তাঁর মতে বেদ অভ্রান্ত ও একমাত্র প্রামাণ্য। বেদের প্রকৃত আদর্শ একেশ্বরবাদ এবং বেদ মূর্তিপূজাবিরোধী। প্রত্যেককেই বেদ পাঠ করতে হবে। দয়ানন্দ জাতিপ্রথার বিরোধী ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহেরও তিনি ছিলেন পরম সমর্থক। তাঁর মতে পুরুষ ও নারীর বিবাহযোগ্য সর্বনিম্ন বয়স হওয়া উচিত যথাক্রমে ২৫ এবং ১৬। দয়ানন্দ ব্যাপক বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন না, তবে সন্তানহীনা বিধবা ও বিপত্নীকদের পারস্পরিক বিবাহ তিনি অনুমোদন করতেন। সন্তানহীনা বিধবারা ইচ্ছা করলে প্রাচীন নিয়োগপ্রথা অনুসরণ করে সন্তান ধারণ করতে পারবে এই ছিল তাঁর অভিমত।

দয়ানন্দের আর্যসমাজ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাতে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর জীবন কালেই আর্য সমাজীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল কুড়ি হাজারের কাছাকাছি। প্রতিটি আর্য সমাজীকেই তাঁদের উপার্জনের একশো ভাগের এক ভাগ সমাজকে দিতে হত যাতে আর্য সমাজের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তাদের মুখপত্র আর্য প্রকাশের ব্যয় নির্বাহ হত। আর্য সমাজের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তন, যাতে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতরা পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে পারে। শিক্ষা বিস্তার ও ত্রাণকার্য সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক স্কুল (যা পরে কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল) আর্য সমাজীদের বিশেষ কীর্তি, যে প্রতিষ্ঠান পাঞ্জাবের জাতীয় জীবনে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি দয়ানন্দের মৃত্যুর (১৮৮৩ খ্রীঃ) তিন বছর পর খোলা হয়েছিল। এখানে অবশ্য মূলত আধুনিক শিক্ষাই দেওয়া হত, যার ফলে রক্ষণশীলেরা দয়ানন্দের মূল আদর্শ অনুযায়ী বেদাদি শিক্ষাদানের জন্য হরিদ্বারে গুরুকুল নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যার শাখা এখন নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছে।

পরবর্তীকালে আর্য সমাজীদের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি হয় যার তিনটি মূল কারণ ছিল—মাংস ভক্ষণের প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক, শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক এবং আর্য সমাজের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে বিতর্ক। শেষেরটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ বেদ প্রকৃতপক্ষে একেশ্বরবাদী নয় এবং দয়ানন্দের সমস্ত আদর্শের মূলই বেদ নয়। দয়ানন্দ বহু ক্ষেত্রেই বেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করেছিলেন, যার কারণ, বিপিনচন্দ্র পালের মতেঃ

Modern Hinduism suffered in some sense from a great

disability, as compared to Christianity and Islam, owing to the universal character of their scriptures, particularly of the Veda. Dayananda Saraswati recognised this disadvantage and was evidently moved by the militant spirit of evangelical Christianity and Islamic missionary propaganda to create and foster a similar militancy in Hinduism itself. He was therefore moved to advance for the Vedas exactly the same kind of supernatural authority and exclusive revelation, which was claimed by the Christians for their Bible and by the Muslims for their Quran. In this Dayananda practically made a new departure from the line of ancient Hindu Fathers, from Jaimini and Vyasa to Raja Rammohan; and at the same time practically denied the very fundamentals of modern world thought. But even by thus deviating from the ancient line of Hindu evolution, he rendered an immense service to the new nationalist movement in India.১

দয়ানন্দের আন্দোলন সম্পর্কে খ্রীষ্টান মিশনারী ডঃ গ্রিসবোল্ড যা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

It is evident from all this that Pandit Dayananda Saraswati was a man of large views. He was a dreamer of splendid dreams. He had a vision of India purged of her superstitions, filled with the fruits of science, worshipping one god, fitted for self-rule, having a place in the sisterhood of nations and restored to her ancient glory.২

১৩। বেদ সমাজ

তামিলনাড়ু অঞ্চলে ব্রাহ্ম সমাজের অনুরূপ একটি সংস্থা গড়ে ওঠে যা বেদ সমাজ নামে পরিচিত। বেদ সমাজীরা নিজেদের ব্রাহ্মও বলে থাকেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন মাদ্রাজের বিভিন্ন বিদ্দজ্জন সভায় যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা সেখানকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের আকর্ষণ করেছিল, বেদ সমাজের প্রতিষ্ঠা যার পরিণতি।

এই সমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন শ্রীধরলু নাইডু যিনি কলকাতায় ব্রাহ্ম ধর্মের চর্চা করেন এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে ফিরে বেদ সমাজের নাম পরিবর্তন করে ব্রাহ্মসমাজ রাখেন। ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থসমূহ তিনি তামিল ও তেলুগুতে অনুবাদ করেন। শ্রীধরলু কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ ভাঙন ও বাদপ্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া দক্ষিণ ভারতেও

১। B. C. Pal, *Memoirs of My Life and Times*, 2, xxxvi.

২। *Indian Evangelical Review*, January 1892, quoted by J. N. Farquhar, *op. cit.*, 112.

দেখা গিয়েছিল, বিশেষ করে শ্রীধরলুর মৃত্যুর পর। কেশব সেনের সম্প্রদায় যা পরে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ নামে খ্যাত হয়েছিল, যার বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মসমন্বয় ভক্তিবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ, দক্ষিণ ভারতে শ্রীধরলুর মৃত্যুর পর গতি হারিয়ে ফেলে। আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং দক্ষিণে তার কোন চিহ্নই ছিল না। দক্ষিণী ব্রাহ্মরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শই অনুসরণ করতেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ভি· রাজগোপাল চারলু ও পি· সুব্রয়ল চেট্টি যাঁরা ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং সুবিখ্যাত তেলুগু লেখক বিশ্বনাথ মুদালিয়র।

১৪। থিওসফিক্যাল সোসাইটি

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় মাদাম এইচ· পি· ব্লাভাট্স্কি এবং কর্ণেল এইচ· এস· ওলকট থিওসফিকাল সোসাইটির পত্তন করেন মূলত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে। যেগুলি হল পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন, প্রাচীন ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা, এবং মানুষের মধ্যে সুপ্ত দৈবী শক্তির গতি প্রকৃতি উপলব্ধি করা। তাঁরা তাঁদের ভাবসমূহের পরিভাষার জন্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধারণাগুলির উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের মতে বিভিন্ন ধর্মমতসমূহের উদ্ভব একটি মূল সূত্র থেকে যার তাঁরা নামকরণ করেছিলেন "প্রাচীন জ্ঞান"। এই জ্ঞানের অধিকারী অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাত্মারা যাঁরা লোকালয়ের বাইরে সকলের অজ্ঞাতে বাস করেন এবং তাঁদের গূঢ় শক্তির দ্বারা জাগতিক ঘটনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মাদাম ব্লাভাট্স্কি এবং কর্ণেল ওলকট ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে অবতরণ করেন, এবং ঘোষণা করেন যে তাঁদের সঙ্গে হিমালয়ে সংগোপনে বসবাসকারী প্রাচীন মহাত্মাদের যোগাযোগ আছে যার হেতু তাঁদের আত্মিক শক্তির অলৌকিক ক্রিয়া।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের আদয়ার নামক স্থানে থিওসফিকাল সোসাইটির সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলকাতাসহ ভারতের বহুস্থানেই তার শাখা গড়ে ওঠে। শিক্ষিত সমাজের উপর থিওসফিকাল সোসাইটির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল কেননা থিওসফিস্টদের মতে প্রাচীন জ্ঞানের উৎস ভারতবর্ষ, হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজাসমেত প্রায় সকল দিকগুলিকেই তাঁরা যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করতেন এবং সর্বোপরি সাধুমহাত্মাদের অলৌকিক শক্তির উপর সাধারণ ভারতবাসীর বিশ্বাস থিওসফিস্টদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। তাছাড়া থিওসফিস্টরা ছিলেন জাতিপ্রথার বিরোধী, ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী, সর্বজগতের ক্ষেত্রে সাদা-কালো বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধী যা শিক্ষিত ভারতীয়দের কাম্য ছিল। বাস্তবক্ষেত্রে থিওসফিকাল সোসাইটি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল, নিম্নবর্ণের মানুষদের উন্নতির জন্য কাজ করেছিল, বয়-স্কাউট সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং আরও নানা-প্রকার সৎকর্মে লিপ্ত ছিল। থিওসফিস্টরা মদ্য স্পর্শ করতেন না।

কিন্তু মাদাম ব্লাভাট্স্কির অতি অলৌকিকতার দিকে ঝোঁক তাঁকে বহু সমালোচনার পাত্রী করে তুলেছিল। তিনি দাবি করতেন তিব্বতে গুপ্তভাবে অবস্থিত মহাত্মারা সূক্ষ্মদেহে তাঁর কাছে বার্তা নিবেদন করেন, এবং তাঁর যে বিশেষ ক্ষমতা আছে তা তিনি প্রদর্শন করতেন অস্বাভাবিক কান্ডকারখানা দেখিয়ে। এগুলি অনেকের কাছেই সমালোচনার বিষয় হয়েছিল, যাঁরা এইসব কান্ডকারখানাকে অলৌকিক শক্তির প্রকাশের বদলে ভোজবাজি আখ্যা দিয়েছিলেন। তৎসত্ত্বে

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যখন মাদাম ব্লাভাট্স্কি মারা যান, তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষের কাছাকাছি এবং তাঁদের অনেকগুলি মুখপত্র প্রকাশিত হত লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস এবং মাদ্রাজ থেকে।

ভারতে থিওসফিস্ট আন্দোলন বিখ্যাত দেশনেত্রী অ্যানি বেসান্তের যোগদানের ফলে বিশেষ জোরদার হয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকাগোর ধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন এবং ওই বছরেই তিনি ভারতে পাকাপাকিভাবে বসবাস করার জন্য চলে আসেন। মাদাম ব্লাভাট্স্কির মৃত্যুর পর প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তিনি থিওসফিকাল সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন। মাদাম ব্লাভাট্স্কির অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

I know, by personal experiment, that the Soul exists, and that my Soul, not my body, is myself; that it can leave the body at will; that it can, disembodied, reach and learn from living human teachers, and bring back and impress on the physical brain that which it has learnt; that this process of the transferring consciousness from one range of being, as it were, to another, is a very slow process, during which the body and brain are gradually correlated with the subtler form which is essentially that my experience of it, still so imperfect, so fragmentary, when compared with the experience of the highly trained, is like the first struggles of a child learning to speak compared with the perfect oratoy of the practised speaker; that consciousness, so far from being dependent on brain, is more active when freed from the gross forms of matter than when encased within them; that the great sages spoken of by H.P. Blavatsky exist; that they weild powers and possess knowledge before which our control of Nature and knowledge of her is but as child's play. All this, and much more, have I learned, and I am but a pupil of low grade, as it were, in the infant class of the Occult School...[১]

দীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে থিওসফিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মোটামুটি পরিচয় মেলে, যদিও এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে, যার একটা মোটামুটি বিবরণ দেবার সুযোগ পূর্বে আমাদের হয়েছে।

১৫। হিন্দু রক্ষণশীল আন্দোলন

উপরিউক্ত সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ দৃশ্যতই সমাজের একাংশের মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল যাঁরা ছিলেন পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু শিক্ষিত মানুষদের অপর একটি গোষ্ঠী প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন এবং পুরাতন ব্যবস্থাকেই যুক্তিসিদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যেক্ষেত্রে

১। A. Besant, *An Autobiography* (1893) 345-46.

তাঁরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাছাড়া থিওসফিকাল আন্দোলন, আর্যতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয় নেপথ্যে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব রামমোহনের ব্রাহ্মসভার প্রতিবাদে ধর্মসভা স্থাপন করেছিলেন যার মূল লক্ষ্য ছিল পুরাতন হিন্দুধর্মকে বজায় রাখা। ধর্মসভার তরফ থেকে সতীদাহবিরোধী আইনের প্রতিবাদে বিলাতে একটি আবেদন পাঠানো হয়। রাধাকান্ত ইংরাজী শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের কোন স্থানে সামান্য আঁচড় লাগারও বিরোধী ছিলেন। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের মূলেও তাঁর হাত ছিল। যাঁরা হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য রাধাকান্ত পতিতোদ্ধার সভা স্থাপন করেছিলেন।

রক্ষণশীল হিন্দুরা পরবর্তীকালে বড় প্রেরণা পেয়েছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণির কাছ থেকে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল যাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারততত্ত্ব চর্চার ফলে অতীতের প্রতি একটা প্রচণ্ড মোহ শিক্ষিত সমাজকে পেয়ে বসেছিল যার সুযোগ শশধর গ্রহণ করেন এবং হিন্দুধর্মের যাবতীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান এমন কি কুসংস্কার-সমূহেরও তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন, যা নিয়ে খুবই হৈ চৈ পড়ে যায়। কিন্তু শশধরের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শশধরের রাস্তা অনুসরণ করেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কিছুটা কুরুচিকর পন্থায়, যার নমুনাঃ গডকে উল্টে ডগ হয়, কিন্তু নন্দনন্দনকে উল্টে দিলে নন্দনন্দন থাকে। অর্ধশিক্ষিত লোকদের কাছে এইরকম মন্তব্য জনপ্রিয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেনঃ

> He was sentimental, vulgar and abusive, but this very sentimentality, vulgarity and abuse went down with a generation of half-educated Bengalees who had been wounded in their tenderest spots by the vulgarities of the Anglo-Indian politicals of the type of Branson and ignorant and unimaginative Christian propagandists.[১]

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন মূলত রক্ষণশীল হিন্দুধর্মেই আস্থাশীল ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন মতেই রক্ষণশীল পর্যায়ে ফেলা যায় না, যদিও তাঁকে রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক হিসাবেই ঐতিহাসিকেরা চিত্রিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

স্মার্ত-পৌরাণিক ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করার জন্য দক্ষিণের শঙ্করাচার্যপন্থীরা ব্যাপক প্রচেষ্টা করেছিলেন। এঁরা বেদান্তের শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্যে বিশ্বাসী, অথচ হিন্দুধর্মের সকল দেবতাকেই স্বীকার করেন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল দিকগুলিকে রক্ষা করার জন্য এঁরা কুম্বকোনমে অদ্বৈত সভা স্থাপন করেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক সুন্দররমন যাঁর মতে হিন্দুধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠান

১। B. C. Pal, *op. cit*, I. 439.

নির্গত হয়েছে ঈশ্বর থেকে, সেগুলির সব কিছুই সঠিক ও পরম সত্য এবং সেগুলির অবহেলার দরুনই হিন্দুদের দুরবস্থা। একটি পত্রে তিনি লিখেছেনঃ

The consequences of rebellion against ritualistic Hinduism are writ plainly on the face of the history of India for two thousand years and more. Buddha began his first revolt, and since then he had many successors and imitators. The unity and might of the once glorious fabric of Hindu society and civilization have been shattered, but not beyond hope of recovery. That recovery must be effected not by further doses of 'Protestant' revolt, but by the persistent and patient endeavour to observe the injunctions and precepts of the ancient Dharma in its entirety.১

১৬। আধুনিকতা ও হিন্দু সম্প্রদায়সমূহ

আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে উদ্ভূত বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়সমূহ উনিশ শতকের সংস্কারমূলক ভাবধারার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের মাধ্ব সম্প্রদায় কণ্ডি সব্বা রাওজী নামক একজন ডেপুটি কালেক্টরের নেতৃত্বে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্থা গঠন করে যার উদ্দেশ্য ছিল মধ্ব-পন্থার নবমূল্যায়ন এবং মধ্বের রচনাবলী প্রকাশ করা। দক্ষিণের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ও মহীশূরের গোবিন্দাচার্য স্বামীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। গোবিন্দাচার্য ইংরাজী ও স্থানীয় ভাষায় রামানুজের শিক্ষার উপর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্যের প্রচার ও অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি পৃথক্ সংস্থা গঠিত হয়। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়-গুলি গীতার শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রচেষ্টারই ফল একটি নূতন ধরনের কৃষ্ণ-ভক্তি আন্দোলন। প্রেমানন্দ ভারতী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক, বোষ্টন ও লস-এঞ্জেল্‌সে কৃষ্ণের উপর বক্তৃতা দেন এবং শেষোক্ত স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

শৈব সম্প্রদায়গুলিও এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। আধুনিক যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শৈব আদর্শকে নূতন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে অনেকগুলি শৈব সভা স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৮৬-তে প্রতিষ্ঠিত পালামকোট্টার শৈব সভা যার উদ্দেশ্য ছিল শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদের প্রচার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান, দ্রাবিড় ভাষাসমূহের চর্চা এবং দক্ষিণ ভারতের সামাজিক অবস্থার উন্নতি। বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎগণ বরাবরই প্রগতিশীল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা লিঙ্গায়ৎ এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন যার উদ্দেশ্য নিজ সম্প্রদায়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ১৯০৪ থেকে একটি সর্বভারতীয় লিঙ্গায়ৎ সম্মেলনের সূচনা হয় যার লক্ষ্য নিজেদের সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা।

১। Farquhar, *op. cit*, 307.

এই সকল পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় ছাড়াও হিন্দুধর্মের আওতার মধ্যেই কয়েকটি নূতন সংস্কারপন্থী সম্প্রদায় উনিশ শতকে গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মাদ্রাজের সাধারণ ধর্ম সম্প্রদায় যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং যার লক্ষ্য ছিল রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' নীতিকে বাস্তবে কার্যকর করা। উত্তর প্রদেশের শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, যিনি পেশায় একজন এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, দেব সমাজ নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি প্রথম জীবনে বেদান্ত পন্থী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি নিজেই একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন ব্রাহ্ম-আদর্শসমূহকে গুরুবাদের সঙ্গে মিশ্রিত করে। তাঁর ভক্তগণের চোখে তিনি দেবতা হয়ে উঠেছিলেন এবং সত্যদেব উপাধি পেয়েছিলেন। আগ্রার তুলসীরাম, যাঁর অপর নাম শিব দয়াল সাহেব, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাধা-সোয়ামি-সৎসঙ্গ নামে একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেন, যে আদর্শ অনুযায়ী কোন সদ্‌গুরুর পরিচালনায় ব্যক্তির পক্ষে শব্দরূপী চেতনা-প্রবাহের সঙ্গে নিজ সত্তাকে লীন করে (সুরৎ শব্দ্ যোগ) মুক্তিলাভ সম্ভব। ১৮৭৮-এ তিনি মারা যাবার পর আগ্রার রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর ১৮৯৮ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তৃতীয় গুরু ছিলেন একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাশঙ্কর মিশ্র, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম· এ·। তিনি সৎসঙ্গের একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করেন এবং রাধাসোয়ামি তত্ত্বের উপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সৎসঙ্গ আরও শক্তিশালী হয়েছে যদিও এই সম্প্রদায়ের প্রভাবের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

পরিশেষে আমরা শিবনারায়ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করব যিনি হিন্দুধর্মের আওতায় থেকেও প্রচণ্ডভাবে প্রগতিশীল ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ কেটেছে বাংলাদেশে। একেশ্বরবাদী, জাতিপ্রথা ও মূর্তি পূজা বিরোধী, সামাজিক সংস্কার ও নারী স্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক শিবনারায়ণ, দয়ানন্দকে ভীষণ শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও, বেদের প্রামাণ্য, জন্মান্তর ও কর্মফলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে জনসেবাই ভগবৎ সেবা। কোন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার তিনি বিরোধী ছিলেন।

১৭। হিন্দু জাতীয়তাবাদঃ টিলক ও বঙ্কিমচন্দ্র

হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বালগঙ্গাধর টিলকের নাম উল্লেখযোগ্য। টিলক গোঁড়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মারাঠাদের অতীত কীর্তিকাহিনী তাঁর হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল। সর্বোপরি তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ভারততত্ত্বের চর্চা করেছিলেন যার ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর একটা গৌরবময় ধারণা ছিল। টিলকের হিন্দুধর্মানুরক্তিতে কেউ কেউ তাঁর মধ্যে রক্ষণশীলতা দেখেছেন, কিন্তু টিলক নিজেই লিখেছেন যে তিনি সংস্কারবিমুখ নন। তাঁর মতে সকল সংস্কার প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হতে বাধ্য যতক্ষণ না পর্যন্ত বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটছে। বৃটিশ রাজত্বের অবসানের পর সঠিকভাবে হিন্দু তার পুনর্জাগরণ ঘটাবে, অতএব বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কার প্রচেষ্টা শুধু নিষ্ফলই নয়, সমাজ একটা গুণগত রূপান্তর পরিগ্রহ করবে, হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিই ক্ষতিকর। তাঁর মতে আগে রাজনীতি পরে ধর্ম, ধর্মকে একমাত্র মুক্তিসংগ্রামের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর রচিত গীতাভাষ্যের প্রেরণা পুরোদস্তুর

রাজনৈতিক। টিলক জীবনের অধিকাংশকালই রাজনীতিতে কাটিয়েছেন এবং হিন্দুর ধর্মীয় উৎসবগুলিকে তিনি রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক জটিল চরিত্রের মানুষ, যিনি তৎকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল জ্ঞানবিজ্ঞানই মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলেন, এবং কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই কলম ধরেছিলেন। তাঁর খ্যাতি মূলত ঔপন্যাসিক হিসাবে, কিন্তু তাঁর রচিত প্রবন্ধের পরিমাণ উপন্যাসের চেয়ে বড় কম নয়, যেগুলির মাধ্যমে তিনি নিজের মত ও আদর্শ ব্যক্ত করেছেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম ও হিন্দুধর্মের প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা বঙ্কিমের মধ্যে কার দাপট বেশি বলা শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মকে বিশ্লেষণী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছেন এবং আধুনিক মনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুধর্মের মূল প্রত্যয়গুলির উপর ভিত্তি করে তিনি একটি সার্বজনীন বুদ্ধিগ্রাহ্য ধর্মমত গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং জাতীয় জাগরণের প্রয়োজনেই প্রাচীন ভারতের গৌরবময় দিক্‌গুলির প্রতি তাঁর সমকালীন মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে তিনি রক্ষণশীল ও অন্ধ হিন্দুত্ববাদী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র জাতিপ্রথা বিরোধী ছিলেন, এবং হিন্দুদের পতনের কারণ যে জাতিপ্রথা তা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি শাস্ত্রবাক্যের অন্ধ অনুকারক নন। তাঁর মতেঃ

"বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত এমত নহে। যে সমাজ মধ্যে ধর্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল, যাহা লোকাচারসম্মত তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত, যাহা লোকাচার বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রচলিত হইবে না।...কোন একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁর কৃতানুষ্ঠান মিলিবে? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প।...বাস্তবিক মানবাদিধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধিগুলির সম্পূর্ণ চলন কোন সমাজ মধ্যে সম্ভব নহে। কস্মিন কালে, কোন সমাজে ঐ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মনুষ্যের পক্ষে এতদূর ক্লেশকর যে, তাহা স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখনও ঘটিয়া থাকে বা কখনও ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে প্রাচীন ভারতে এই ধর্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে পূর্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতক দূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতক দূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল এবং প্রচলিত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি।...আমরা হিন্দুধর্ম বিরোধী নই; হিন্দুধর্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া যাহা কিছু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ এবং সমাজের মঙ্গলকারক, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ধর্মীয় আদর্শের পরিচায়ক হিসাবে তাঁর থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে নাঃ

"বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করার আগে বৈষ্ণব ধর্ম কি, বোঝ। তোমার কণ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পঞ্চসংস্কারেও নয়, দেড় কাহন বৈষ্ণবীতেও নয়।...তোমরা সর্বত্র সমদর্শী হও। সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা।...এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংসাধর্মের যথার্থ তাৎপর্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণুনাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল। যে খ্রীষ্টীয়ান কি মুসলমান মনুষ্য মাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যিশুরই পূজা করুক আর পীর-পয়গম্বরেরই পূজা করুক, সে-ই পরম বৈষ্ণব।...যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি, এইরূপ ভেদজ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।"

১৮। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ

উনিশ শতকের ধর্মগুরুদের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের তো কথাই নেই। এই দুজন সম্পর্কে এত বেশি খবর বাঙালী মাত্রেরই জানা যে নূতন করে বিশেষ কিছু বলার সুযোগ নেই। এখানে আমরা শুধু কয়েকটি বিষয়ের কথাই বলতে পারি যা কিছুটা ঐতিহাসিক কৌতুহলের নিবৃত্তি করতে পারে। রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিখ্যাত ব্রাহ্ম পণ্ডিত ও প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (যিনি চিকাগোর ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন) লিখেছেনঃ

তাঁর সঙ্গে আমার সাদৃশ্যের ভিত্তি কোথায়? আমি, একজন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, আত্মকেন্দ্রিক, প্রায় সন্দেহবাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী, আর তিনি একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, অমার্জিত, আধাপৌত্তলিক, বন্ধুহীন হিন্দু ভক্ত। আমি কেন দীর্ঘ সময় তাঁর কাছে বসে থাকি, যে আমি ডিস্‌রেলি ও ফকেট, স্ট্যানলি ও ম্যাক্‌সমুলার এবং অসংখ্য ইউরোপীয় বিজ্ঞ ও সুধীজনের বক্তৃতা শুনেছি?...এবং শুধু আমিই নই, আমার মত ডজন ডজন মানুষ তা করে।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ সকলকে সমভাবে যে রামকৃষ্ণ আকর্ষণ করতে পারতেন, তার একমাত্র কারণ ছিল তিনি আক্ষরিক অর্থেই মাটির মানুষ ছিলেন, তাঁর পায়ের তলায় শক্ত মাটি ছিল, বৃহত্তর জনসাধারণের মনোভাব, সংস্কার, সমস্যা, সুখদুঃখ তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব ছিল না, যাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু তাঁরা মাটির কাছাকাছি থাকতে পারেননি বলেই, তাঁদের আবেদন যতটা শিক্ষিত নাগরিক মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়েছে, তা আপামর সাধারণের হৃদয়গ্রাহ্য হয়নি। রামকৃষ্ণ এখানেই সফল হয়েছিলেন। তিনি পুরোহিত পরিবারের সন্তান ছিলেন, এবং ঐতিহ্যগতভাবে তিনি কতকগুলি হিন্দু সংস্কারের বশীভূত ছিলেন যেমন জাতিপ্রথা ইত্যাদি। কিন্তু তাসত্ত্বেও তাঁর আন্তরিকতা ও সারল্য নীচজাতিসমূহকে আকৃষ্ট করেছে কেননা তারা তাঁর মধ্যে দেখেছে এমন

একজনকে যিনি জাতিপ্রথা মেনেও জাতির উপর মনুষ্যত্বকে স্থান দেন। এই সহৃদয়তাই তাঁকে সকল ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু করে তুলেছিল, এবং তাঁর এই শিক্ষাই বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্মসম্মেলনে এইভাবে ধরে তুলে ধরেছিলেনঃ

The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth. If the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is this: It has proved to the world that holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any Church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart, and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of his resistance: 'Help and not Fight.' 'Assimilation and not Destruction,' 'Harmony and Peace and not Dissension'.

রামকৃষ্ণের এইটাই মূল শিক্ষা, যা একদিকে বিবেকানন্দের কণ্ঠে এমন জোরালো ভাষা পেয়েছে, অপরদিকে তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে গৃহীত হয়েছে। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী রামকৃষ্ণ কিভাবে গড়ে তুলেছিলেন বলা শক্ত, তবে একথা ঠিক যে রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম ছাড়াও ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের চর্চা করেছিলেন, এবং সেটা কোন অ্যাকাডেমিক বা পণ্ডিতসুলভ চর্চা নয়, নিছকই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি এমনকি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। আগাগোড়া হিন্দু সংস্কারের মধ্যে লালিত হয়ে এই রকম একটা দুর্জয় মনোবল তিনি কিভাবে পেয়েছিলেন জানি না। তবে মনে হয় তাঁর প্রথম জীবনের তান্ত্রিক শিক্ষাই তাঁকে ধর্ম সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। তন্ত্রের উদার আদর্শের কথা পূর্বে উল্লেখ করার সুযোগ হয়েছে। রামকৃষ্ণ প্রথম জীবনেই কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে তন্ত্রে দীক্ষা নেন। ১৮৬২ সালে দক্ষিণেশ্বরে জনৈকা ভৈরবী তাঁকে বিশেষ তান্ত্রিক শিক্ষা দেন, এবং ইনি দীর্ঘকাল রামকৃষ্ণের সহায় ছিলেন। এই ভৈরবীই রামকৃষ্ণকে প্রথম অবতার হিসাবে ঘোষণা করেন।

রামকৃষ্ণ নিজে জনগণের ভাষায় কথা বলতেন, এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে এটাই দাবি করতেন যে তাঁরা যেন তত্ত্বকথায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত না করে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজে নামেন। মানুষের দুঃখদুর্দশা তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করত এবং এমন অনেক উদাহরণ আছে যে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক মথুরবাবুকে দিয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, খাজনা মাফ প্রভৃতি করিয়েছিলেন। দেশের দারিদ্রের এই সমস্যাটির প্রতি তিনি তাঁর শিষ্যবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লাটু (অদ্বৈতানন্দ), তারক (শিবানন্দ), হরি (তুরীয়ানন্দ), সুবোধ (সুবোধানন্দ), গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ), কালী

(অভেদানন্দ), শারদা (ত্রিগুণাতীতানন্দ), হরিপ্রসন্ন (বিজ্ঞানানন্দ), শরৎ (শারদানন্দ), শশী (রামকৃষ্ণানন্দ), নরেন (বিবেকানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (প্রেমানন্দ), যোগীন (যোগানন্দ), নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ) প্রভৃতি যাঁরা তাঁর এই জনসেবামূলক আদর্শকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যাঁদের হাত দিয়েই রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণের আদর্শগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছিল বিবেকানন্দের ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। বিবেকানন্দ তাঁর সমকালীন সমস্যাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষ, জাতিপ্রথায় দীর্ণ-বিদীর্ণ ভারতবর্ষ, অনাহার, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং সর্বোপরি হীনমন্যতায় বিপর্যস্ত এই দেশটির পুনর্জাগরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশবাসীর আত্মচেতনার বিকাশ এটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মকে তিনি এই প্রয়োজনেই ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। আমেরিকায় তাঁর সাফল্য আত্মবিস্মৃত এই জাতিকে অনেকখানি প্রেরণা দিয়েছিল। সেখানে তিনি কি বলেছিলেন, কতখানি বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, কাদের মত খণ্ডন করেছিলেন, সেটা বড় কথা নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্বসভায় ভারতীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারাকে জোরের সঙ্গে পেশ করা, বরং বলা যায় গায়ের জোরে সবচেয়ে উচ্চ আসনটি অধিকার করা, এবং সেটা তিনি পেরেছিলেন। মুষ্টিমেয় যে কটি ঘটনা ইংরাজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ভারতবাসীকে সবেগে নাড়া দিয়েছিল, আমেরিকায় বিবেকানন্দের সাফল্য সেগুলির মধ্যে একটি এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে বলিষ্ঠতা ও বেগ নিয়ে তিনি পাশ্চাত্য চষে বেড়িয়েছেন, তা তিনি কখনও স্তিমিত করেন নি, সেই বেগ ও বলিষ্ঠতা দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের আদর্শ অনুযায়ী তিনি বৃহত্তর জনসাধারণের নিকটে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলেন, সমাজের অবদমিত, উৎপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের জন্যই অনলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, ভারতে নানা প্রান্তে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা যার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। বেদান্তের তিনি যে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে জগৎ, জীবন ও ব্রহ্মের পারস্পরিক ব্যাপারটা মুখ্য নয়, তার মূলে আসলে ছিল অবদমিতের জন্য তাঁর ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার তাত্ত্বিক সমর্থন লাভ। পাশ্চাত্যের সাফল্যের কারণগুলি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এবং জাতীয় জীবনে সেই সাফল্যের পূর্বশর্তগুলি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। বাইরে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি শুধু ধর্মপথের লোকদের সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ করেননি, যাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটাতে আগ্রহী এমন লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে নৈরাজ্যবাদী রুশ বিপ্লবী ক্রুপটকিনের পরিচয় হয়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ সম্পর্কেও তিনি খোঁজ-খবর রাখতেন, নিজেকেও সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করতে পছন্দ করতেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেনঃ

এমন দিন আসবে যখন প্রত্যেকটি দেশেই শূদ্র শ্রেণীর মানুষেরা তাদের সহজাত প্রকৃতি ও আচরণাদি সমেত...পূর্ণ আধিপত্য লাভ করবে। পাশ্চাত্য জগতে ওই নব শক্তির প্রভাত-অভ্যুদয়ের প্রথম রশ্মিগুলি ধীরে ধীরে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে।

১৯। উনিশ শতক ও ভারতীয় ইসলামধর্ম

ইংরাজ রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে উত্তর ভারতের মুসলমানরা প্রচণ্ড-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য চরম মূল্য তাদেরই দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে আলফ্রেড লায়াল লিখেছিলেনঃ

The English turned fiercely on the Mahomedans as upon their real enemies and most dangerous rivals; so that the failure of the revolt was much more disastrous to them (Muslims) than to the Hindus. The Mahomedans lost almost all their remaining prestige of traditionary superiority over Hindus; they forfeited for the time the confidence of their foreign rulers; and it is from this period that must be dated the loss of their numerical majority in the higher subordinate ranks of the civil and military services.১

এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের পরাজয় ও হতমানতার মূলে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাই দায়ী এই রকম ধারণা তাদের মধ্যে সহজেই দানা বেঁধেছিল। একশ্রেণীর চিন্তাবিদ্ এর জন্য মুঘল আমলের ইসলামের বিশুদ্ধি-হানিকেই দায়ী করেছিলেন। এদেশে নানা ধরনের সুফীবাদের বিকাশ প্রকৃত ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী এই রকম ধারণা মুঘল যুগ থেকেই কেউ কেউ পোষণ করতেন, যা আমরা পূর্বে দেখেছি। এই ধারাকে অবলম্বন করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বেরিলীর সঈদ আহমদ ইসলামের বিশুদ্ধি রক্ষার আন্দোলন শুরু করেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতাতেও এসেছিলেন। তিনি শিখ প্রভুত্বের হাত থেকে পাঞ্জাবের মুসলমানদের মুক্ত করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

সঈদ আহমদ বেরিলভি যে শুদ্ধি আন্দোলন করেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর তা জোরদার হয় এবং তারই সূত্র ধরে এদেশে ওহাবী আন্দোলনের (আজকাল এই নামটি কেউ কেউ আপত্তি করছেন) বিকাশ ঘটে। চতুর্দশ শতকে বিখ্যাত আরব পণ্ডিত ইবন তাইমিয়া ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কার ও বিচ্যুতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামের বিশুদ্ধি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরই পন্থায় বিশ্বাসী নজ্দের আব্দুল ওহাবের নাম থেকে ওহাবী আন্দোলন কথাটির উদ্ভব হয়েছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর পতনের পর শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র আব্দুল আজিজ ফতোয়া দেন যে ভারতবর্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে (দার-উল-হার্ব) পরিণত হয়েছে। কাজেই মুসলমানদের হয় জিহাদ্ ঘোষণা করতে হবে, না হয় ভারতবর্ষ ত্যাগ করে অন্য কোন মুসলিম দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। পূর্বোক্ত সঈদ আহমদ বেরিলভি জিহাদের পথই নিয়েছিলেন এবং তিনি আব্দুল আজিজের আত্মীয়বর্গ ও শিষ্যদের সাহায্যও পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও ওহাবীরা ১৮৫৭-র

১। A. C. Lyall, *Asiatic Studies: Religious and Social* (1884), 239-40.

মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল, এবং তার পরেও বিচ্ছিন্ন ভাবে এখানে ওখানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, এমন কি বাংলাদেশেও। সে ইতিহাস স্বতন্ত্র।

ওহাবীদের ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলন বৃহত্তর মুসলিম সমাজে বিশেষ দাগ কাটেনি। এখানে বেশিরভাগ মুসলমানই হানিফী পন্থার অনুগামী এবং সুফী মতবাদসমূহের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ওহাবীদের কঠোর নীতিনিষ্ঠা তাদের মধ্যে উল্টো প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, ফলে তারা অধিকতরভাবে সুফীবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। এখানকার প্রধান দুটি সুফী সিলসিলা, চিশ্তীয় এবং নকশ্বন্দীয়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত ফরঙ্গিমহলের মাদ্রিসা-ই-কাদিমা ইসলামী তত্ত্বচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই প্রতিষ্ঠান মূলত প্রচলিত হানিফী পন্থারই অনুগামী ছিল, তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই যেখানে অবলম্বিত হত। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদে ওহাবীরা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দেওবন্দে একটি পৃথক্ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলেন যার নাম দার্-অস্-উলুম, যেখানে শুধু ভারতীয় ছাত্ররাই নয় ভারতের বাইরের মুসলিম দেশগুলি থেকেও ছাত্ররা আসতেন। এখানে প্রাচীন পন্থায় ঐতিহ্যগত জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হত যে পাঠক্রমের নাম ছিল দার্শ-নিজামী। এই পাঠক্রমের প্রণেতা ছিলেন মোল্লা নিজামুদ্দীন, পাঠ্যবিষয় ছিল আরবী ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, গণিত, অলংকার, আইন, ধর্মতত্ত্ব বা কলাম, কোরানের তফ্সির নামে চিহ্নিত অংশগুলি এবং হাদিশ। এই পাঠক্রম কিন্তু চিন্তাবিদ্ ও যুক্তিশীল ব্যক্তিরা পছন্দ করতে পারেননি, যুগোপযোগী নয় বলে, এবং পরিণামে লক্ষ্ণৌর শিবলি নুমানির উদ্যোগে নদবৎ অল-উলামা নামক আরও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, যেখানে দার্শ নিজামী একেবারেই পরিত্যক্ত হয়।

এই ধারার পাশাপাশি আরও একটি চিন্তাধারা কোন কোন মুসলমান নেতা গড়ে তোলেন যা হচ্ছে, ইংরাজদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে না থেকে, ইংরাজী শিক্ষাকেই আশ্রয় করে, ঠিক যে পদ্ধতি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবলম্বন করেছে, সেইভাবে মুসলমান সমাজের উন্নতি ঘটানো দরকার। এই চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। সমসাময়িক মুসলমান সমাজের দুর্গতি ও অবক্ষয় দেখে তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিজস্ব পত্রিকা তাহ্জিব্র-অল-অখ্লাক-এ মুসলমান সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতির তীব্র সমালোচনা করেন, যাতে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা খুবই ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে কাফের আখ্যা দেন। এতে দমিত না হয়ে তিনি মোরাদাবাদ ও গাজিপুরে দুটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, পরে আধুনিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আলিগড়ে একটি স্কুল খোলেন যা পরে কলেজে রূপান্তরিত হয়। এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেন তাঁর বন্ধু মৌলভী সলিমুল্লা খান, নবাব মহসীন-উল-মুল্ক ও ভকার-উল-মুল্ক, ডঃ নাজির আহ্মদ এবং বিখ্যাত কবি আলতাফ হুসেন হালি। পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের প্রবর্তন করেন, যেটি পরে অবশ্য একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়। ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় ভাবাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটানোর এই ব্যাপারটিকে গোঁড়া মুসলমানেরা সুনজরে দেখেননি, কিন্তু স্যার সৈয়দ সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে, হিন্দুরা যে কৌশলে ইংরাজী শিক্ষাকে আয়ত্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদেরও সেই পথ গ্রহণ করা উচিত। আলিগড়কে অনুসরণ করে অনুরূপ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান ভারতের নানাস্থানে গড়ে ওঠে। স্যার সৈয়দ মুসলিম সমাজকে আধুনিক করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছিলেন, হিন্দুদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার ও

ভ্রাতৃত্বমূলক, যদিও শেষ জীবনে আলিগড়ের ইংরাজ অধ্যাপক মিঃ বেকের প্ররোচনায় তিনি হিন্দুবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। এই অধ্যাপকটি, ইংরাজ শাসক শক্তির প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়, আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটান, এবং স্যার সৈয়দের মত উদারচেতা মানুষ বৃদ্ধবয়সে এই ফাঁদে যে পা দিয়েছিলেন এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এর জন্য তাঁর অনেক প্রাক্তন সহযোগী তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

হিন্দু সংস্কারবাদী নেতাদের মত স্যার সৈয়দের কর্মধারা মূলত মুসলিম সমাজের উপরতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বৃহত্তর মুসলিম জনসমাজের সঙ্গে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না। পক্ষান্তরে ওহাবী আন্দোলন কিছুটা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। ওহাবীরা দেওবন্দে যে শিক্ষায়তন স্থাপন করেছিলেন তা মূলত পাঁচটি মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত ছিল—শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধি রক্ষা, বহির্দেশের মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ, সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা, স্বৈরাচারী পদ্ধতি-সমূহ পরিহার এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র শিক্ষাধারাকে অনুসরণ। স্যার সৈয়দ ও আলিগড় শিক্ষায়তন ইংরাজদের সহযোগী হওয়ায় দেওবন্দের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। এই দুই মতের সমন্বয় এবং কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় পূর্বোল্লিখিত নদবৎ-অল-উলামা নামক শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা শিবলি নুমানির মধ্যে। ওহাবীদের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাক্রম দর্শি নিজামী তাঁরা পরিত্যাগ করেন এবং ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেন, যদিও নুমানির দৃষ্টিভঙ্গী স্যার সৈয়দের থেকে পৃথক্। তিনি হিন্দুদের ও কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন। স্যার সৈয়দ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনঃ

> ইংরাজ অধ্যাপকেরা স্যার সৈয়দের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে কংগ্রেসবিরোধিতা ও ইংরাজদের সঙ্গে মাখামাখির মধ্যেই কলেজ এবং মুসলমানদের স্বার্থ সিদ্ধি হবে। তাঁদের জাদুতে তিনি এতই মুগ্ধ যে তাঁর নিজের মতামত গভীর জলে তলিয়ে গেছে। এখন তিনি যা দেখেন তা মিঃ বেক্ এবং ইংরাজ অধ্যাপকদের চোখ দিয়েই দেখেন, যা শোনেন তা তাঁদেরই কান দিয়ে শোনেন।[১]

পাঞ্জাবে, কিছুটা ওহাবী প্রেরণাতেই, দুটি নূতন সম্প্রদায়ের (ঘইর্-মুকাল্লিদ্) উদ্ভব হয় যারা যথাক্রমে অহ্‌ল-ই-হদিশ (হদিশ-পন্থী) এবং অহ্‌ল-ই-কুরান (কোরান পন্থী) নামে পরিচিত যার বক্তব্য সকল মুসলিম আচার অনুষ্ঠান অনুশাসনের জন্য শুধু হদিশ বা কোরানের উপরই নির্ভর করতে হবে, বাকি সবই অপ্রয়োজনীয়। এঁরা মুসলিম অনুশাসনের প্রচলিত চারটি ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করেন যেগুলি ছিল আবু হানিফা প্রবর্তিত হানিফী, অল্ সাফী প্রবর্তিত সাফী, মালিক ইবন অনস প্রবর্তিত মালিকী এবং আহ্‌মদ বিন হন্‌বল্ প্রবর্তিত হন্‌বালী। এই দুই উপসম্প্রদায় ছাড়া পাঞ্জাবে আরও একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যা আহমদী বা কাদিয়ানী নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মীর্জা গোলাম আহমদ্ গুর্‌দাসপুরের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম জীবনে তিনি স্যার সৈয়দের অনুগামী ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মের সংস্কার ও খ্রীষ্টান মিশনারী ও আর্যসমাজীদের ইসলাম বিরোধী আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেওয়া। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ বরাহীনি আহমদীয়াতে

১। Syed Sulaiman Nedvi, *Hayat-i-Shibli* (Darul Musannifin, Azamgar 1943), 296.

তিনি প্রতিপক্ষের আক্রমণাত্মক বক্তব্যসমূহকে খণ্ডন করেন যার ফলে মুসলমান সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেকে পয়গম্বর, মাহদী এবং মশীহ বলে দাবি করেন, শুধু তাই নয় নিজেকে কৃষ্ণেরও অবতার বলে ঘোষণা করেন। এতে অধিকাংশ মুসলমানই কুপিত হন, কেননা ইসলাম অনুযায়ী মহম্মদই শেষ প্রেরিত পুরুষ। কিন্তু তাঁর সমর্থকও অনেকে হন যাদের নিয়ে তিনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন এবং রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স নামক একটি ইংরাজী পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ওই সম্প্রদায়ের নেতা হন নরুদ্দীন, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যাঁর মৃত্যুর পর কাদিয়ানীরা দুটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান, মহম্মদ বসিরুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সম্প্রদায়টি গোলাম আহমদ্‌কে প্রেরিত পুরুষ হিসাবে গণ্য করে। খাজা কামালুদ্দীন ও মৌলভী মহম্মদ আলির নেতৃত্বাধীন দলটি তাঁকে একজন সংস্কারক হিসাবে গণ্য করে।

আমরা এ পর্যন্ত সুন্নী মুসলমানদের কথাই বলেছি, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। শিয়ারা ইমাম্‌দের দৈবী চরিত্রে বিশ্বাসী এবং পয়গম্বরের শিক্ষার ব্যাখ্যাতা হিসাবে ইমামদের অভিমতকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। এছাড়া তাঁরা মনে করেন না যে ইজ্‌তিহাদের (অনুশাসনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ) দরজা একেবারেই বন্ধ, যা সুন্নীদের বিশ্বাস। তাঁরা দা'ইস্‌ (অর্থাৎ ইমাম্‌দের প্রতিনিধি, যেমন ইসমাইলী শিয়াদের মধ্যে বর্তমান) এবং মুজ্‌তাহিদেরও (যাঁরা ইরাকী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুশাসনের ব্যাপারে মতামত দেবার অধিকার পেয়েছেন) অধিকারকে স্বীকার করেন। এই সকল নমনীয়তা থাকার দরুন শিয়াদের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকলে তা বিনা হাঙ্গামাতেই সম্ভবপর ছিল। উনিশ শতকে শিয়াসম্প্রদায়ও নিজেদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে এবং কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যেমন লক্ষ্ণৌ-এর শিয়া আরাবিক কলেজ, নাজিমিয়া কলেজ, অল্‌ মদারিস, বারানসীতে মাদ্রাসা-ই-জবাদিয়া প্রভৃতি। নাজিমিয়া কলেজের সঙ্গে সম্পর্কিত ইমামিয়া মিশন শিয়া সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছে।

উনিশ শতকে মুসলমান পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় উর্দুভাষার ব্যাপক উন্নতি হয়, এবং বহু ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থ উর্দুতে অনূদিত ও লিখিত হয়। এর ফলে প্রচলিত পার্শীভাষা একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আলিগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা রীতিমত সাহেবী ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে যার পিছনে স্যার সৈয়দের অনুমোদন ও উৎসাহ ছিল। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে আধুনিকতা অনুমোদিত হলেও নারীদের ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত ছিল না, এমন কি আলোকপ্রাপ্ত পরিবার-সমূহেও নয়। শুধু তাই নয়, যেটুকু সুযোগ সুবিধা ইসলামধর্ম নারীকে দিয়েছিল, যেমন বিধবা বিবাহ প্রভৃতি, সেগুলিও কার্যত প্রত্যাখ্যাত হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভূপালের সুলতান জাহান বেগম নারী মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, পরেও কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা খুব ফলদায়ক হয়নি আজও পর্যন্ত।

নির্দেশিকা

ভারত-উপমহাদেশ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বহু বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আদিম জাদুবিশ্বাস থেকে শুরু করে নানা ধরনের চিন্তা-নির্ভর, এমনকি একালের পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত, বিভিন্ন ধর্মমতের একত্র সমাবেশ ভারতীয় জীবনধারার এক বিশেষ চরিত্র-লক্ষণ।

বাংলা ভাষায় ধর্ম নিয়ে লেখা নানা ধরনের বই থাকলেও, সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতের ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে সুবিস্তৃত এবং ধারাবাহিক পর্যালোচনা এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম উপস্থাপিত হ'ল।

বিভিন্ন ধর্মের দুরূহ ও জটিল ধারণাগুলিকে এই গ্রন্থে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেগুলির উদ্ভব, সামাজিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। সমগ্র বিষয়টি আবেগবর্জিত, পক্ষপাতহীন, বিশ্লেষণাত্মক ও বিজ্ঞানসম্মতরীতিতে উপস্থাপিত। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে গ্রন্থটি অপরিহার্য পরিগণিত হবে।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম। ইংরেজী ভাষার প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। বাংলায় লেখা তাঁর গ্রন্থগুলির ভেতর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস', 'প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা', 'ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা', 'প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের সভাপতি করা হয়। ডঃ ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভাগে অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)।